শ্রেষ্ঠ গল্প : শ্রেষ্ঠ লেখক

স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্পসংকলন

সম্পাদনা

ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়দীপ পাবলিকেশনস্

দুই বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা বারো

প্রকাশক :
দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়দীপ পাবলিকেশনস্
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ১২

মুদ্রক :
দেবদাস নাথ
সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ১২

প্রচ্ছদ :
মনোজ বিশ্বাস

কুড়ি টাকা

কথা

এই গল্প-সংকলনের ভূমিকা হিসেবে দু-একটি কথা নিবেদন করার প্রয়োজন বোধ করছি—যদিও জানি রসসাহিত্যের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। মোদকের মিষ্টত্ব যাচাই হয় রসনায়, সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের মূল্য নির্ণীত হয় রসাস্বাদনে। ভূমিকা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, গবেষণা রসসাহিত্যসম্ভোগে শুধু অধিকন্তু নয়, কোনো কোনো সময়ে হানিকরও বটে। ব্যাখ্যা ও সমালোচনা পড়ে অনেক সময়ে পাঠকের রস-ভোগের ক্ষুধায় অগ্নিমান্দ্য ঘটে। মূল রচনার রসগ্রহণে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও প্রবর্তনা ধীরে ধীরে শুষ্ককাষ্ঠ বুদ্ধির ব্যায়ামে পর্যবসিত হয়। সুতরাং এই সংকলনটি বিনা মন্তব্য ও সমালোচনায় পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিয়েই আমার সম্পাদকীয় কর্তব্য সমাধা হল বলে মনে করব। কিন্তু গাওনার বায়না নিয়ে আসরে নেমে দু-এক কলি ধরতাই না ধরলে শ্রোতার দল ছাড়বেন কেন? সুতরাং পেলার প্রত্যাশা না রেখেই দু'চার কথা বলি।

বাংলা ছোট গল্পের শ্রেষ্ঠ লেখকদের শ্রেষ্ঠ লেখার এই সংকলনে—অবশ্য লেখকই নির্বাচিত করে দিয়েছেন কোন্‌টি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প, এবং কেন শ্রেষ্ঠ সে-সম্বন্ধেও দু-চার কথা বলেছেন। যে সমস্ত গল্পলেখক তাঁদের সৃষ্টিশক্তি নিয়ে এখনো আমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন, তাঁদের কেউ বয়সের দিক থেকে সত্তরের প্রান্ত ছুঁয়েছেন, কেউ চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের গল্পের বিষয়, আংগিক, বক্তব্যে কত না বৈচিত্র্য। বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের পর অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে বাংলা গল্প বিস্ময়কর নতুনত্ব, বিচিত্র প্রাণশক্তি ও বিশাল অভিজ্ঞতার সমবায়ে যে শিল্পমূর্তি গড়ে তুলেছে, তার সঙ্গে পশ্চিমের সুখ্যাত ছোট গল্পই তুলনীয়। এখনো পর্যন্ত ভারতের অন্য প্রদেশের ছোট গল্প গুণগত উৎকর্ষে বাংলাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

বাংলা ছোটগল্প ভূমিষ্ঠ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে ১২৯১ বঙ্গাব্দে (১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ)। প্রথম ছোট গল্পটির নাম 'ঘাটের কথা', ১২৯১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গল্প 'রাজপথের কথা' ঐ সালেই 'নবজীবন'-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। তাঁর প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ছোট গল্প' ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। এইটি বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সংকলন। ১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ থেকে বাংলা ছোটগল্পের শতবর্ষ পূর্ণ হতে আর মাত্র ছ'বছর বাকি।

রবীন্দ্রনাথ থেকে বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু হলেও তাঁর আগে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯) ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) ছোটগল্প লেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখনো ছোটগল্পের বিশিষ্ট আঙ্গিক তাঁদের আয়ত্ত হয়নি, কাজেই তাঁদের গল্পগুলি আখ্যানের স্তরেই রয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ড (১৮৯৪) প্রকাশিত হবার পর বাংলা সাহিত্যে

ছোটগল্প লেখার বান ডাকে, অবশ্য তাঁর সমকালীন গল্পলেখকেরা বাঙালী-জীবনকে কেন্দ্র করে অনেক ছোট-বড়ো গল্প লিখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-বিচিত্র ঐশ্বর্য ও জীবনবোধের গভীরতা বড়ো-একটা আয়ত্ত করতে পারেন নি। প্রথম মহাযুদ্ধ সমাপ্তির পর য়ুরোপের জীবন, সমাজ ও সাহিত্যে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল, তার কিছু কিছু আঘাত করল 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'সংহতি' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাকে। তার পূর্বেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং ঈষৎ পরে শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি কখনও প্রসন্ন হাসিতে, কখনও সহজিয়া চোখের জলে মধ্যবিত্ত বাঙালী পাঠকের মন লুঠ করে নিল। কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে নবীন গল্পকারগণ নতুনভাবে ছোটগল্পের জমি জরিপ শুরু করলেন। ছোটগল্পের মধ্যবিত্ত চৌহদ্দি ও ভূস্বামীদের অন্তঃপুরের সীমা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হল নিম্নবিত্ত সমাজে, পরে তাও ছাড়িয়ে বিত্তহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্লেদকালিমায় পংকস্নান করে বাংলা ছোট গল্প দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে নানা দিকে যাত্রা শুরু করল। বস্তুত বাংলা ছোটগল্প অতি দ্রুত ভূগোলের সীমা ছাড়াল, ড্রইং রুমের রোমান্টিক প্রেম-প্রণয়ের বিশ্রব্ধ গুঞ্জন ক্রমে স্তব্ধ হয়ে গেল, মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙাগড়ার ঘরোয়া গল্পও ক্রমে স্বাদহীন হয়ে পড়ল। গল্পকারদের কেউ কেউ 'লিবিডো'-নাগিনীর অষ্টপাশে জড়িয়ে পড়লেন, কেউ মতপ্রচারের রক্ত পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে জনসমুদ্রে নেমে এলেন।

ছোটগল্প বিশেষভাবে দেশ-কালের অধীন, ইতিহাসের ছোটবড়ো তরঙ্গ ছোটগল্পকে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে নিয়ে যায় তার সীমাসংখ্যা নেই।

এই গল্পসংকলনে প্রবীণ নবীন গল্পকারদের যে গল্পগুলি পুনর্মুদ্রিত হল, সেগুলি পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে, বাঙালী পাঠকসমাজে এগুলি সুপরিচিত। কোন্‌টি লেখকদের মতে শ্রেষ্ঠগল্প তা তাঁদেরই নির্বাচন করে দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। অনুমান করি, এ অনুরোধে তাঁদের কেউ কেউ কিছু বিব্রত বোধ করেছেন, এবং সেটাই স্বাভাবিক। তাঁদের সব আত্মজই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এ প্রশ্ন তাঁদের কাছে কিছু অস্বস্তিকর বটে। বরং যদি তাঁদের 'প্রেষ্ঠ' গল্প কোন্‌টি জিজ্ঞাসা করা হত, তা হলে সহজেই তাঁরা তার যা-হয়-একটা উত্তর দিতে পারতেন। তবে সব চেয়ে প্রিয় বা 'প্রেষ্ঠ' শব্দটিতে পাণিনি-বোপদেবের তর্জনী উঁচিয়ে আছে বলে, সাহিত্যক্ষেত্রে এ শব্দটি আমদানি করে লেখক ও পাঠকের শিরঃপীড়া ঘটাতে চাই না। লেখক গল্প লেখেন, পাঠকে তা পড়ে। কিন্তু রচনাকারের অন্তঃপুরের দিকেও মাঝে মাঝে পাঠকের স্বাভাবিক কৌতূহল ধাবিত হয়। কেউ কেউ রসনালোভন খাদ্য পাতে পড়লেই খুশি হন না, মনে মনে পাক-শালারও খবরাখবর নেবার চেষ্টা করেন। সেদিক থেকে আমরা লেখকদের অনুরোধ করেছিলাম, কোন্‌টি তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ গল্প, এবং তিনি কেন সেটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন তার কারণ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে। তাঁরা আমাদের এ অনুরোধ রেখেছেন, এজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। গল্পটি কেন তাঁর প্রিয়, এবং কোন্ সামাজিক পরিবেশে তিনি সে গল্প লিখেছেন, তাঁর দিক থেকে গল্পটির বক্তব্যই বা কী, সে-সম্বন্ধে তাঁরা সংক্ষেপে যা বলেছেন, পাঠক-পাঠিকারা তার থেকেই তাঁদের প্রিয় গল্পলেখকদের মনের কথা জানতে পারবেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রতি গল্পের প্রারম্ভে লেখকের সমগ্র প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে এবং পাঠক-পাঠিকারা সেই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থেকে গল্প-

কাব্যময়তাভঙ্গীও লক্ষ্য করতে পারবেন। 'শ্রেষ্ঠ গল্প, শ্রেষ্ঠ লেখক'—এই শিরোনামে সংকলনটি প্রকাশিত হল। বলা বাহুল্য নিজ নিজ গল্পের এ নির্বাচন লেখকরাই করেছেন, কিন্তু আনন্দের কথা, এ-বিষয়ে পাঠকেরাও লেখকদের সঙ্গে একমত হবেন।

এই গল্পগুলি বিবিধ প্রকরণের ও নানা স্বাদের। কোনোটি লেখকের নিজস্ব মনোবোধ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, কোনোটিতে আছে লেখকের পরিজন-পরিবেশের নিবিড় ছায়ারূপ। কোন লেখক দুঃখবেদনার অন্তরালবর্তী চিরসুন্দরেকে প্রত্যক্ষ করেছেন, কেউ বা মৃত্যু-নিশীথিনীর নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুনেছেন। গল্পগুলির প্রবণতার মধ্যে তারতম্য আছে, কিন্তু স্বাদের মধ্যে নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ঘোলাজলের ছোটছোট ঢেউ কোন কোন গল্পে কিছু আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, কোথাও-বা ফুটে উঠেছে অতল জলের আহ্বান। কোথাও দহন, কোথাও বর্ষণ, কোথাও আশাহীন আনন্দহীন প্রাণধারণের গ্লানি, কোথাও-বা ধূমধূলিম্লান কানাগলি থেকে নিষ্ক্রমণের ইচ্ছা এ গল্পগুলিকে সমকালীন বাঙালী জীবনের ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা দিয়েছে। একালে পশ্চিমে ছোট গল্প নিয়ে নানা পরীক্ষা চলেছে। কেউ হয়তো লক্ষ্য করেছেন, এ-কালের গল্প থেকে গল্প-কাহিনী উধাও হতে চলেছে। ক্ষণিকের ইম্প্রেশন ও অসংলগ্ন চিন্তার হিজিবিজি যদি লেখকের মস্তিষ্কে ভর করে এবং তিনি সেই অসংবদ্ধ ছায়াবাজিকেই যদি প্রতীকের ইশারায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন তবে তা কেন গল্প বলে গ্রাহ্য হবে না। যদি ছোট গল্প ও গীতিকবিতার সীমারেখা লুপ্ত হয়ে যায় তাতেই বা আপত্তি কিসের। আজকের মানুষ সঙ্গতিহীন জীবনের অর্থহীন পরিণামের দিকে ভেসে চলেছে, ছোটগল্পে সেই 'অকারণ অবারণ চলা' যদি ফুটে ওঠে তাহলে লেখক-পাঠক উভয়েই এই ভেবে আশ্বস্ত হবেন যে, গল্প ও জীবন সমান্তরাল রেখায় বইছে না, একে অপরের উপর আপতিত হয়েছে। একালের বাংলাগল্পে পশ্চিম বিশ্বের গল্পের মতোই সেই বিচিত্র চমক সৃষ্টি করেছেন প্রবীণ ও নবীন লেখকেরা। এঁরা জীবন-প্রত্যয়ের উচ্চাবচ পথে বিচরণ করলেও সমভূমি থেকেই জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন, সে সমভূমি হল মানুষের প্রতি বিস্ময়-মিশ্রিত ভালোবাসা। সে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়নি মানবেতর প্রাণী, উদ্ভিদ। জীবনের অস্তিবাদে এঁরা বিশ্বাসী। এ অস্তিবাদ হল দর্শনের সর্বাস্তিবাদ, জীবনের সবকিছুই আছে, সব কিছুকেই গ্রহণ করতে হবে। এই লেখকেরা সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি-বেদনার ঊর্ধ্বে মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এজন্য আগামীকালের পাঠকও এঁদের লেখা থেকে জীবন-চেতনার সম-বিষমবাদী সুরসঙ্গতিকে উপলব্ধি করতে পারবেন।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই গল্পগুলি থেকে বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ ও বিবর্তনের যে ইতিহাস ফুটে উঠেছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পাঠকও তার থেকে আনন্দময় অভিজ্ঞতা খুঁজে পাবেন। গল্পগুলি বলাই বাহুল্য বাঙালী-জীবনের বাতায়ন থেকেই রচিত হয়েছে, কিন্তু তাঁদের আবেদনের মধ্যে এমন একটি সর্বজনীন রসের ইঙ্গিত আছে যে, ভিন্নপ্রদেশ ও ভিন্নভাষী পাঠকের পক্ষেও এর থেকে রসভোগের আনন্দ খুঁজে নেওয়া দুরূহ হবে না।

স্থানাভাববশত আরও কয়েকটি গল্প এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল

না। এজন্য কোন কোন পাঠক হয়তো কিছু ক্ষুণ্ণ হবেন। আমরাও খুব প্রসন্ন নই।

এবার ধন্যবাদের পালা। লেখকগণ সকলেই আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। তাঁরা যে আগ্রহে আমাদের সহযোগিতা করেছেন এজন্য তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাধানাথ মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত সঞ্জীব রায়চৌধুরীর সহায়তাও প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করি। পরিশেষে প্রকাশক শ্রীযুক্ত দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি যেভাবে একক প্রচেষ্টায় এই অভিনব পরিকল্পনার রূপ দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ দিই। প্রকাশক নানা বিভ্রাটের মধ্য দিয়ে তরীটিকে যেভাবে ঘাটে ভিড়িয়েছেন তাতে তাঁকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করাই উচিত।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকের কথা

প্রথমে ভারতীয়, তারপর বাঙ্গালী। এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু আজও আমরা বাঙ্গালীই রয়ে গেছি। আর তাই স্বাধীনতার একত্রিশ বছর পরেও একজন গুজরাতী, অসমীয়া বা ওড়িশাবাসী আমার নিজের ভাই হয়ে উঠতে পারেন নি। India offers unity in diversity—এই মহৎ উচ্চারণটি আমরা শুধুই শুনি, উপলব্ধি করিনা। এবং সেই উপলব্ধির অভাবেই 'জাতীয় সংহতি' নামধেয় রাজনৈতিক স্লোগানটি আজ কীরকম নিদারুণ ব্যর্থ! উপলব্ধি জিনিসটা হৃদয়ের, শুধু হৃদয়ের উত্তাপেই তার পরিচয়। কেননা, কে না জানে, হৃদয়ের আদান প্রদান ব্যতিরেকে তা কিছুতেই সার্থক হতে পারে না। ফলত আমাদের পরিকল্পনা সেই অভাবপূরণেরই মহৎ দায়িত্ব। একজন অবাঙ্গালীর সুখ, দুঃখ আনন্দানুভূতি যখন উত্তাপ সৃষ্টি করবে আমাদের মনে তখনই শুধু আমরা ভারতীয় হয়ে উঠব—গড়ে উঠবে সুদৃঢ় জাতীয় সংহতি। এবং শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদানই সম্ভব করে তুলতে পারে এই রাখী-বন্ধন। একজন তামিল বা কাশ্মীরী হয়ে উঠতে পারেন একজন বাঙ্গালীর আত্মার আত্মীয়। এই মহান লক্ষ্য সামনে রেখেই শুরু হচ্ছে আমাদের এই 'মিত্রতার যাত্রা'। সামর্থ্যের অভাব? সে তো আছেই। উদ্দেশ্যের গৌরবদীপ্তি ধুয়ে মুছে একাকার করে দেবে আমাদের ক্ষুদ্রতা, দীনতা। এই প্রগাঢ় বিশ্বাসই আমাদের এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা।

প্রথমেই আমরা কয়েকজন অগ্রগণ্য বাঙ্গালী লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প, শ্রেষ্ঠ লেখক' নামের এই সংকলনটি অনুবাদের মাধ্যমে অবাঙ্গালী ভাইবোনদের উপহার দিতে চাই। কিন্তু ছোটগল্প কেন? যাকে ভাই বলেছি, একান্ত নিজের করে যাকে পেতে চাই—তাকে দেবার সময় আমার যা 'শ্রেষ্ঠ' তাইতো দেব শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে। আমাদের ছোটগল্প শুধু বাংলা সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয় বিশ্বসাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

প্রসঙ্গত একটি সম্ভাব্য বিতর্কের প্রত্যুত্তরে পূর্বাহ্নেই জানাতে চাই—আমরা সংকলনের প্রত্যেক শ্রদ্ধেয় লেখককেই লিখিত অনুরোধ জানিয়েছিলাম তাঁদের নিজেদের বিচারে শ্রেষ্ঠ গল্পটি মনোনীত করতে। নিঃসন্দেহে আমরা সকলের সহৃদয় সহানুভূতিতে অভিষিক্ত, যদিও কেউ কেউ কোন একটি বিশেষ গল্পকেই শ্রেষ্ঠত্বের চন্দন পরাতে কিছুটা দ্বিধা করেছেন। এবং তা সঙ্গত কারণেই। নমস্কার।

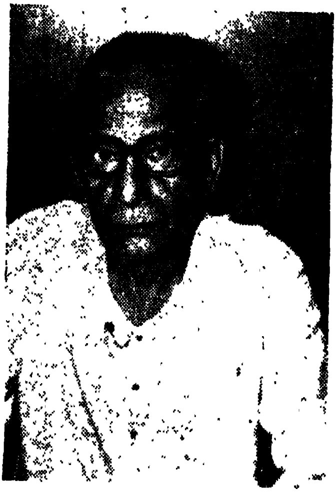
বিনীত

১৫ই আগস্ট

কলকাতা

দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র



সুবোধ ঘোষ

জন্ম: ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮। হাজারিবাগে। ছোটবেলাটা বিহারেই কাটে। বিচিত্র জীবনধারা। নানান বৃত্তি কখনও চাকুরি, কখনও ব্যবসা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তাঁর লেখাও চলে। এখন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক।

সঠিক বাঙালী মানসিকতা বলতে যা বোঝায়, তা আশ্চর্য রমণীয় হয়ে ধরা পড়েছে এই লেখকের লেখায়। অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়ও তাঁর রচনা-গুণে সুন্দর হয়ে ওঠে। তাঁর 'ত্রিযামা', 'শ্রেয়সী', 'জতুগৃহ', 'সুজাতা' প্রভৃতি বাঙালী পাঠক বহু বহুবার পড়েছে, সিনেমায় দেখেছে, তবু এর ভিতরকার কথাটা আজও পুরোনো হয়নি। এমনই সর্বজন-গৃহীত আর একটি গ্রন্থ: শতকিয়া। এই লেখকই আবার 'ভারত প্রেমকথা'র লেখক। রচনার বৈশিষ্ট্যে, ভাষায়, বিষয়ে বাংলা-সাহিত্যে এমন বই নেই। মহৎ এই গ্রন্থখানি বিপুল আলোড়ন তোলে বাঙালী পাঠক-সমাজে। সুবোধ ঘোষের অন্য একটি উপন্যাস সম্প্রতি বিদগ্ধ সমাজে আলোচ্য হয়ে উঠেছে, নাম: 'কালকেতু'।

অসামান্য সব ছোটগল্পও লিখেছেন এই লেখক। তার মধ্যে ফসিল, কর্ণফুলির ডাক, অলীক, অযান্ত্রিক, চতুর্ভুজ ক্লাব, ভাটতিলক রায়, পরশুরামের কুঠার ইত্যাদি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গল্প। তাঁর গল্প তো নয়, যেন উপন্যাস, এমনই বিশাল তাদের পরিপ্রেক্ষিত।

অনেক বড় পুরস্কারে এই লেখককে ভূষিত করা উচিত ছিল। আনন্দ পুরস্কারের সম্মান অবশ্য তিনি পেয়েছেন। আর যা পেয়েছেন, তা হল অজস্র পাঠকের ভালোবাসা।

যে লেখক অনেক গল্প লিখেছেন, তাঁর পক্ষে বেছে-বেছে বিশেষ একটি গল্পকে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রিয় বলে অভিহিত করতে অসুবিধে নেই। কারণ লেখকের কাছে তাঁর অনেক গল্পই প্রিয় হয়ে থাকে ও সমাদর পায়। আমার লেখা 'সুন্দরম্' গল্পটিকে আমার প্রীতিভাজন একটি গল্প বলে মনে করি। পাঠকের পক্ষে এই কৌতূহলের প্রশ্নটি খুবই সঙ্গত ঃ কেন লেখক এই গল্পটিকে অন্যতম প্রিয় গল্প বলে মনে করেন? জীবনের নানা বিস্ময়ের একটিকে বিশেষ একটি রূপ দিয়ে আখ্যায়িত করবার ইচ্ছা এই গল্পে বিশেষ সফলতায় বিমূর্ত হয়েছে। তাই এই গল্প লেখকের কয়েকটি আন্তরিক জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করেছে।

তাই 'সুন্দরম্' লেখকের একটি প্রিয় গল্প। সৌন্দর্য মানবীয় জীবনের একটি গূঢ় আনন্দের সম্বল এবং অবলম্বন। প্রাচীন জ্ঞানীর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল: যদি আকাশে আনন্দ না থাকতো তবে কেউ কি আকাশকে চাইতো? সৌন্দর্য মানুষের বোধে ও অনুভবে যে রসাত্মক আবেশ সঞ্চারিত করে, তাই আবার আনন্দরূপে নিষ্পন্ন হয়। এই সৌন্দর্যের একটি লৌকিক সংস্কার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ একটি তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা এই গল্পে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশেষ করে শারীর সৌন্দর্যের সংস্কার সম্বন্ধে একটি কঠিন জিজ্ঞাসার নির্মাণ। প্রসঙ্গত এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার দুই-একটি কথা নিবেদন করতে পারি।

লেখক যখন হাজারিবাগ জেলা স্কুলের ছাত্র, তখন মানুষের দেহগত রূপের একটি অনাবরণ পরিচয় লাভ করবার সুযোগ তার হয়েছিল। স্কুলের ড্রিল ময়দানের কাছে একটি পুকুর: সেই পুকুরের পশ্চিমে পুলিশ ফৌজের প্যারেড গ্রাউণ্ড, সেই গ্রাউণ্ডের উত্তরভাগে বড়-বড় বেল গাছের ছায়ার গা ঘেঁষে লাস-কাটবার ময়না ঘর। এই ময়না ঘরের টেবিলের উপর রাখা কাটা লাসের চেহারা অনেকবার দেখেছিলাম। ময়না ঘরের ডোম জমাদার মাঝে-মাঝে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিত কাটা-ছেঁড়া লাসের নিদারুণ পরিচয়। পুলিশের গুলিতে নিহত ডাকাতের লাস, কিংবা আত্মঘাতিনী কোন পতিতার লাস, ইত্যাদি। দেহের রূপতত্ত্ব সম্বন্ধে কঠিন একটি জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করবার আখ্যায়িকা এই 'সুন্দরম্'কে একটি দুরূহ সমস্যায় কিছুদিন অসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল। ব্যবচ্ছিন্ন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপ বর্ণনা করবার ভাষা ও পরিভাষা কোথায় পাই? আনন্দবাজার পত্রিকার লাইব্রেরীতে সহসা একদিন চোখে পড়লো একটি বই, মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেনের লিখিত 'প্রত্যক্ষশারীরম্', সংস্কৃত ভাষায় অ্যানাটমির একটি প্রশস্ত পাঠ্যপুস্তক। এর পর ভাষা ও পরিভাষা পেতে অসুবিধা হয়নি।

সুবোধ ঘোষ

সুন্দরম্

সমস্যাটা হল সুকুমারের বিয়ে। কি এমন সমস্যা! শুধু একটি মনোমত পাত্রী ঠিক করে শুভলগ্নে শাস্ত্রীয় মতে উদ্বাহ কার্য সমাধা করে দেওয়া; মানুষের একটা জৈব সংস্কারকে সংসারে পত্তন করে দেওয়া। এই তো! কিন্তু বাধা আছে—সুকুমারের ব্রহ্মচর্য। বার বছর বয়স থেকে নিরামিষ, ফোঁটা তিলক করেছে সে। আজও পায়ে সেধে তাকে মুসুরির ডাল খাওয়ান যায় না। সাহিত্য কাব্য তার কাছে অস্পৃশ্য। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া জীবনে সে পড়েছে শুধু ক'খানি যোগশাস্ত্রের দীপিকা। বাগানের পুকুরঘাটে নির্জন দুপুর রাতে একাগ্র প্রাণায়ামে কতবার শিউরে উঠেছে তার সুষুম্না। প্রতি কুম্ভকে রেচকে সুকুমার অনুভব করেছে এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তির তড়িৎস্পর্শ—শ্বাসে প্রশ্বাসে, রক্তে ও স্নায়ুতে।

সুকুমার চোখ বুঁজলেই দেখতে পায়, তার অন্তরের নিভৃত কন্দরে সমাসীন এক বিবাগী পুরুষ। আবিষ্ট অবস্থায় কানে আসে, কে যেন বলছে—মুক্তি দে, মুক্তি দে। জপ ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পায়, কার এক গৈরিক উত্তরীয় ক্ষণিকের দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সুকুমার বন্ধুদের অনেকবার জানিয়েছে—বাস্, এই এগজামিনটা পর্যন্ত। তারপর আর নয়। হিমালয়ের ডাক এসে গেছে আমার। সুকুমারের বাবা কৈলাস ডাক্তার বলতেন—প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভাল জিনিস পড়ুক, গায়ে মাংস লাগুক—এসব ব্যামো দুদিনেই কেটে যাবে। কত পাকামি দেখলাম! কিন্তু মা, পিসীমা, ছোট বোন রানু আর ঝি—তাদের মন প্রবোধ মানে না। সকলে মিলে চেপে ধরল কৈলাস ডাক্তারকে—যত শাগগির পার, পাত্রী ঠিক করে ফেল। আর দেরী নয়! ঝিয়ের কোঁদল তো লেগেই আছে—ছি ছি, সংসারে থেকেও ছেলের বনবাস। ছোট-জাতের ছোট-ঘরেও এমন কসাইপনা করে না বাপু। সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হল। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখবেন। ভগ্নীপতি কানাইবাবু সুকুমারের মতিগতির চার্জ নিলেন। যেমন করে পারেন, কানাইবাবু সুকুমারকে সংসারমুখো করবেন।

পাশের খবর বেরিয়েছে। কানাইবাবু সুকুমারকে দিয়ে জোর করে দরখাস্তে সই করালেন। নাও, সই কর। মুন্সেফী চাকরী ঠাট্টার নয়। সংসারে থেকেও সাধনা হয়। ঐ যাকে বলে পাঁকাল মাছের মত থাকবে। জনক রাজা যেমন ছিলেন।

বাড়ির বিষণ্ণ আবহাওয়া ক্রমে উৎফুল্ল হয়ে আসছে। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখে এসেছেন। এখন সমস্যা—সুকুমারকে কোন মতে পাত্রী দেখতে নিয়ে যাওয়া। কানাইবাবু সকলকে আশ্বস্ত করলেন—কিছু ভাববার নেই; সব হো যায়গা।

সংসারের ওপর সুকুমারের এই নির্লেপ, এখনো কেটে যায়নি ঠিকই! তবু একটু চাঞ্চল্য, আচার আচরণে রক্তমাংসের মানুষের মেজাজ এক-আধটু দেখা দিয়েছে যেন।

তবু একদিন পড়ার ঘরে কানাইবাবুর সংগে সুকুমারের একটা বচসা শোনা গেল। বাড়ির সবারই বুক দুরদুর করে উঠল। ব্যাপার কি? কানাইবাবুর কথার ফাঁদে পড়ে সুকুমারকে উপন্যাস পড়তে হয়েছে। জীবনে এই প্রথম। নাভিমূলে চন্দনের

প্রলেপ দিয়ে, অগুরু পুড়িয়ে ঘরে বাতাস পবিত্র করে নিয়ে অতি সাবধানে পড়তে হয়েছে তাকে। বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম—কি হয়, বলা তো যায় না।

কিন্তু উপন্যাস, না নরক। যত সব নীচ রিপু সেবার বর্ণনা। সমস্ত রাত ঘুম হয়নি, এখনো গা ঘিন ঘিন করছে।

সুকুমার বলল—আপনাকে এবার ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম কানাইবাবু। মানে-অপমানে সম্পূর্ণ উদাসীন কানাইবাবু বললেন—আজ সন্ধ্যেয় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব তোমায়। যেতেই হবে ভাই, তোমার আজ্ঞাচক্রের দিব্যি। তাছাড়া ভাল ছবি—ধ্রুবের তপস্যা। মনটাও তোমার একটু পবিত্র হবে।

কানাইবাবুর এক্সপেরিমেন্ট বোধ হয় সার্থক হয়ে উঠল। সুকুমার কাব্য পড়ে, কবির আখড়ায় গিয়ে মাথুর শুনে এসেছে, ঘন ঘন সিনেমায় যায়। এদিকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পত্রও চলে এসেছে।

কিন্তু অনাসক্তির ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। আজকাল সুকুমারের অতীন্দ্রিয় আবেশ হয়। জ্যোৎস্না রাতে বাগানে একা বসে বসে নেবুফুলের সগন্ধে মনটা অকারণেই উড়ে চলে যায়—ধূলিধূসর সংসারের বন্ধন ছেড়ে যেন আকাশের নীলিমায় সাঁতার দিয়ে বেড়ায়। একটা বিষণ্ণ সুখকর বেদনা। কিসের অভাব! কাকে যেন চাই! কে সেই না-পাওয়া? দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে লজ্জা পায় সুকুমার। রাত করে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরবার পথে কানাইবাবু সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন—নাচটা কেমন লাগল? সুকুমার সহসা উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বলল— কানাইবাবু!

—কি?

—মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

—নিশ্চয়। কালই চল বারাসত। যাদব বোসের মেয়ে বনলতা। তোমার মেজদি যেতে লিখেছে আর বাবা তো আগেই দেখে এসেছেন।

উকীলের মুহুরী যাদব বোস। বংশ ভাল আর মেয়ে বনলতা দেখতে ভালই। যাদব বোস অল্প পণে দয়ালু সৎপাত্র খুঁজছেন।

মেজদি একটি বছর পনের বয়সের মেয়েকে হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এলেন। —ভাল করে দেখে নে সুকু। মনে যেন শেষে কোন খুঁত খুঁত না থাকে।

যাত্রাদলের রাজকুমারীর মত মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব জবরজং করে সাজান হয়েছে। বিরাট একটা ঝকঝকে বেনারসী শাড়ি আর পুরু সাটিনের জ্যাকেট। পাড়ার মেয়েদের কাছে ধার করা চুড়ি, রুলি, বালা ও অনন্ত কনুই পর্যন্ত বোঝাই করা দুটি হাত। ঘামে চুপসে গেছে কপালের টিপ, পাউডারের মোটা খড়ির স্রোত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গলার উপর। মেয়েটি দম বন্ধ করে, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেন যজ্ঞের পশুর মত এসে দাঁড়াল।

বনলতার শক্ত খোঁপাটা চট করে খুলে, চুলের গোছা দুহাতে তুলে ধরে মেজদি বললেন—দেখে নে সুকু। গাঁয়ের মেয়ে হলে হবে কি? তেলচিটে ঘাড় নয়, যা তোমাদের কত কলেজের মেয়ের দেখেছি। রামো!

মেজদি যেন ফিজিয়লজি পড়াচ্ছেন। বনলতার খুতনিটা ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখালেন। চোখ মেলে তাকাতে বললেন—ট্যারা কানা নয়। পায়চারী করালেন—খোঁড়া নয়।

সুকুমারের মুখের সামনে বনলতার হাতটা টেনে নিয়ে আঙুলগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখালেন—দেখছিস তো, নিন্দে করার জো নেই!

দেখার পালা শেষ হল। বাড়ি ফিরে কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে যোগিবর, পছন্দ তো?

সুকুমার চুপ করে রইল। মুখের চেহারা প্রসন্ন নয়। কানাইবাবু বুঝলেন, এক্ষেত্রে মৌনিং অসম্মতি লক্ষণং।

—সিনেমায় বনানী দেবীর নাচ দেখে চোখ পাকিয়েছ ভায়া, এ সব মেয়ে কি পছন্দ হয়! —কানাইবাবু মনের বিরক্তি মনে চেপে রাখলেন। পিসীমা বললেন—ছেলের আপত্তি তো হবেই। হা-ঘরের মেয়ে এনে হবে কি? মুহুরী-টুহুরীর সঙ্গে কুটুম্বিতে চলবে না।

সুন্দরী মেয়ে চাই এইটেই বড় বাধা দাঁড়িয়েছে এখন। কৈলাস ডাক্তার পাত্রী দেখছেন আর বিপদের কথা এই যে, তাঁর চোখে অসুন্দর তো কেউ নয়। তাই কৈলাস ডাক্তার কাউকে সুন্দরী বলে সার্টিফিকেট দিলেই চলবে না। এ বিষয়ে তাঁর রুচি সম্বন্ধে সকলের যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রথম ছেলে, জীবনসঙ্গিনী নিয়ে ঘর করতে হবে যাকে, তারই মতটা গ্রাহ্য। তারপর আর সকলের।

কৈলাসবাবু নিজে কুরূপ। কুৎসা করা যাদের আনন্দ, তারা আড়ালে বলে 'কাল-জিভ' ডাক্তার। ভদ্রলোকের জিভটাও নাকি কাল। যৌবনে এ গঞ্জনা কৈলাস ডাক্তারকে মর্মপীড়া দিয়েছে অনেক। আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে এসে এ দৌর্বল্য তাঁর আর নেই।

বাংলোর বারান্দায় সোফায় বসে নিবিষ্টমনে কৈলাস ডাক্তার এই কথাই ভাবছিলেন। এই রূপতত্ত্ব তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝানু সার্জন ময়না-ঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না—কাকে সোনার দেহ বলে। মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ—এর পরিচয় কৈলাস ডাক্তারের মত আর কে জানে! কিন্তু তাঁর এই ভিন্‌জগতের সুন্দরম্‌, তাকে কদর দেবার মত দ্বিতীয় মানুষ কই? দুঃখ এইটুকু।

হঠাৎ শেকল-বাঁধা হাউণ্ডটার বিকট চীৎকার আর লাফ ঝাঁপ! ফটক ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকল মানুষের ভগ্নমূর্তি কয়েকটি প্রাণী। যদু ডোম আর নিতাই সহিস দৌড়ে এল লাঠি নিয়ে।

যদু ও নিতাইয়ের গলাধাক্কা গ্রাহ্য না করে ফটকের ওপর জুৎ করে বসল একটা ভিখারী পরিবার। নোংরা চটের পোঁটলা, ছেঁড়া মাদুর, উনুন, হাঁড়ি, ক্যানেস্তারা, পিঁপড়ে ও মাছি নিয়ে একটা কদর্য জগতের অংশ। সোরগোল শুনে বাড়ির সবাই এল বেরিয়ে। কৈলাসবাবু বললেন—কে রে এরা যদু? চাইছে কি?

—এ ব্যাটার নাম হাবু বোষ্টম, তাঁতীদের ছেলে। কুষ্ঠ হয়ে ভিক্ষে ধরেছে। কুষ্ঠী হাবু তার পটি বাঁধা হাত দুটো তুলে বলল—কৃপা কর বাবা!

—এ বুড়ীটা কে?

—এ মাগীর নাম হামিদা। জাতে ইরানী বেদিয়া—বসন্তে কানা হবার পর দল ছাড়া হয়েছে। ও এখন হাবুরই বৌ। হামিদা কোলের ভিতর থেকে নেকড়ায় জড়ানো ক'মাসের একটা ছেলেকে দু'হাতে তুলে ধরে নকল কান্নায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলল—বাচ্চাকা জান হুজুর! এক পিয়ালী দুধ হুজুর! এক মুঠি দানা হুজুর!

—আর এই ধিঙ্গি ছুঁড়িটা কে? পিসীমা প্রশ্ন করলেন।

—ওর নাম তুলসী। হাবু আর হামিদার মেয়ে।

—কোন মেয়ে?

হাঁ পিসীমা। যদু উত্তর দিল।

তুলসী একটা কলাই-করা থালা হাতে বসে আছে চুপ করে। পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানো। আভরণের মধ্যে হাতে একটা কৌড়ির তাবিজ। দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি। কোন ডাকিনীর টেরা কোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার খুলিটা বেঢপ, টেরে বেঁকে গেছে। চোয়াল জুড়ে জন্তুর একটা হিংসা ফুটে রয়েছে যেন। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙ্গে চুরে গেছে ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যায়। গা শির শির করে। কিন্তু যদু বলল—তুলসীর ভিক্ষের রোজগারই নাকি এদের পেটভাতের একমাত্র নির্ভর।

হাবু ঠিক ভিক্ষে করতে আসে নি। মিউনিসিপ্যালিটি এদের বস্তি ভেঙ্গে দিয়েছে। নতুন আফিসের গুদাম হবে সেখানে। শহর এলাকায় এদের থাকবার আর হুকুম নেই।

হাবু কান্নাকাটি করল—একটা সারটিফিকেট দিন বাবা। মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পিছনে থাকব। দীননাথের দিব্যি, হাটবাজার ঘেঁসবো না কখনো। তুলসীই ভিক্ষে খাটবে, ওর তো আর রোগ বালাই নেই।

পিসীমা বললেন—যেতে বল, যেতে বল। গা ঘিন ঘিন করে। কিছু দিয়ে বিদেয় করে দে রাণু।

রাণু বলল—আমার ছেঁড়া ফ্লানেলের ব্লাউজটা দিয়ে দিই। এই শীতে তবু ছেলেটা বাঁচবে।

—হাঁ, দিয়ে দে। থাকে তো একটা ছেঁড়া শাড়িও দিয়ে দে। বয়েস হয়েছে মেয়েটার, লজ্জা রাখতে হবে তো। কৈলাস ডাক্তার বললেন—আচ্ছা, যা তোরা। সার্টিফিকেট দেব, কিন্তু খবরদার, হাটবাজারে আসিস্ না।

হাবু তার সংসারপত্র নিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলে তুলসীর কথাটাই আলোচনা হল আর একবার। কৈলাসবাবু হেসে হেসে বললেন—দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকে। ওরও বিয়ে হয়ে যাবে জানো?

ঝি উত্তর দিল—বিয়ে হবে না কেন? সবই হবে। তবে সেটা আর বিয়ে নয়।

কৈলাসবাবু আর একটি পাত্রী দেখে এসেছেন। নন্দ দত্তের বোন দেবপ্রিয়া। মেয়েটি ভালই, তবে সুকুমার একবার দেখে আসুক।

দেখান হল দেবপ্রিয়াকে। মেদের প্রাচুর্যে বয়স ঠিক ঠাহর হয় না। চওড়া কপাল, ছোট চিবুক, গোল গোল চোখ। গায়ের রং মেটে, কিন্তু সুমসৃণ। ভারি ভুরু দুটোতে যেন তিব্বতী উপত্যকার ধূর্ত একটু ছায়া—প্রছন্ন এক মঙ্গোলিনীকে ইশারায় ধরিয়ে দিচ্ছে। ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। সে বোধ হয় জানে, তার এই অপ্রাকৃত পৃথুলতা লোক হাসাবার মতই। দেবপ্রিয়ার গলা মিষ্টি, গান গায় ভাল।

সুকুমার হাঁ না কিছুই বলে না। বলা তার স্বভাব নয়। বোঝা গেল, এ মেয়ে তার পছন্দ নয়।

পিসীমাও বললেন—হবেই না তো পছন্দ। শুধু গলা দিয়েই তো আর সংসার করা যায় না।

তা ছাড়া নন্দরা বংশেও খাটো।

কৈলাস ডাক্তার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সমস্যা ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। এ মোটেই সহজ সরল ব্যাপার নয়। নানা নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে একে একে। শুধু সুন্দরী হলেই চলবে না। বংশ, বিত্ত, শিক্ষা ও রুচি দেখতে হবে।

মাঝে পড়ে পুরুত ভট্টাচায্যি আরো খানিকটা ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন। সমস্যাটা ক্রমেই তেতে উঠছে। ভটাচায্যি বাড়ির সকলকে বঝিয়ে গেছেন—নিতান্ত আধ্যাত্মিক এই বিয়ে জিনিসটা। কুলনারীর গুণ লক্ষণ মিলিয়ে পাত্রী নির্বাচন করতে হবে—গৃহিণী সচিব সখী প্রিয় শিষ্যা, সব দিক্ যাচাই করে দেখতে হবে। সারা জীবনের ধর্মসাধনার অংশভাগিনী, এ ঠাট্টার ব্যাপার নয়। ধরে বেঁধে একটা নিয়ে এলেই হল না। ওসব যাবনিক অনাচার চলবে না। হাঁ, তবে সুন্দরী হওয়া চাই-ই। কারণ, সৌন্দর্য একটা দেবসুলভ গুণ।

এবার যতদূর সম্ভব সাবধানে, খুব ভেবে চিন্তে কৈলাস ডাক্তার এক পাত্রী দেখে এলেন। অনাদি সরকারের মেয়ে অনপমা, সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী। অনুপমার বয়স একটু বেশী। রোগা বা অতিতন্বী, দুইই বলা যায়। মুখশ্রী আছে কিনা আছে, তা বিতর্কের বিষয়। তবে চালচলনে সুরুচির আবেদন আছে নিশ্চয়। রূপে যেটুকু ঘাটতি, তা পুষিয়ে গেছে সুশিক্ষার হ্লাদিনী গুণে।

প্রতিবাদ করল রাণু। —না, ম্যাচ হবে না। যা ঝিরকুট চেহারা মেয়ের।

ঋষি বালকের মত কাঁচা মন সুকুমারের। হাঁ না বলা তার ধাতে সম্ভব নয়। কিম্বা অতিরিক্ত লজ্জা, তাও হতে পারে। তবে তার আচরণেই বোঝা গেল, এ বিয়েতে সে রাজী নয়।

পিসীমা বললেন—ভালই হল। জানি তো, যা কিপ্‌টে এই অনাদি চাষা। বিনা খরচে কাজ সারতে চায়। পাত্র যেন পথে গড়াচ্চে।

দৈবজ্ঞ মশায় এসে পিসীমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—পাত্রীর রাশি আর গণ, খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন পিসীমা। ওসব কিন্তু তুচ্ছ করার জিনিস নয়।

—সবই গ্রহের কৃপা। দৈবজ্ঞ সুকুমারের কোষ্ঠি বিচার করে বাড়ির সকলকে বড় রকম একটা প্রেরণা দিয়ে চলে গেল। —যা দেখছি, তা তো বড়ই ভাল মনে হচ্ছে। পতাকিরিষ্ট আর নেই, এবার কেতুর দশা চলেছে। এই বছরের মধ্যেই ইষ্টলাভ—সুন্দরী রামা, রাজপদং, ধনসুখং, আর কত বলব।

—এই ছুঁড়ি, ওখানে কি করছিস? কৈলাসবাবু ধমকে উঠলেন। সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনের বারান্দায় ফুলগাছের টবের পাশে বসে আছে তুলসী। হাতে কলাই করা থালাটা।

যদু কোত্থেকে এসে সঙ্গে সঙ্গে হুমকী দিল। —ওঠ এখান থেকে হারামজাদি! কেমন ঘুপটি মেরে বসে আছে চুরির ফিকিরে।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—যাক, গালমন্দ করিস নে। খিড়কির দোরে বসতে বল।

সামনে কানাইবাবুকে পেয়ে বললেন—কি কানাই? এবার আমাকে বিড়ম্বনা থেকে একটু রেহাই দেবে কিনা? সুন্দরী পাত্রী জুটল তোমাদের?

—আজ্ঞে না, চেষ্টার তো ত্রুটি করছি না।

—চেষ্টা করেও কিছু হবে না। তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ড কিছু নেই।

—কি রকম? কি রকম আবার? চুল কাল হলে সুন্দর, আর চামড়া কাল হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শাশ্বত কালি দিয়ে?

একটু চুপ করে থেকে কৈলাস ডাক্তার বললেন—পদ্মপত্রযুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি।

ধন্যি বাবা কাশীরাম! একবার ভাবো তো কানাই, কোন ভদ্রলোকের যদি নাক থেকে কান পর্যন্ত ইয়া ইয়া দুটো চোখ ছড়িয়ে থাকে, কি চীজ হবে সেটা! কানাইবাবু বললেন—যা বলেছেন। কত যে বাজে সংস্কারের সাত পাঁচ রয়েছে লোকের। তবে মানুষের রূপের একটা স্ট্যাণ্ডার্ড অবশ্য আছে; এ্যানথ্রোপলজিস্টরা যেমন বলেন----।

—এ্যানথ্রোপলজিস্ট, না চামড়াওয়ালা। কৈলাসবাবু চড়া মেজাজে বললেন।—আসুক একবার আমার সংগে ময়না-ঘরে। দুটো লাশের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন, নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রাল। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ! মেলা বকো না আমার কাছে।

কানাইবাবু সরে পড়ার পথ দেখলেন। —জান কানাই, আমাকে আড়ালে সবাই কালজিভ বলে ডাকে। বর্বর আর গাছে ফলে? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ব করে। আধুনিক হয়েছে! যত সব ফাজিলের দল!

কৈলাস ডাক্তার ক্ষুব্ধ লালচোখ দুটিকে শান্ত করে চুরুট ধরালেন।

সত্যদাসের বাড়ি থেকে ভাল একটি পাত্রী দেখে খুসী মনে কৈলাস ডাক্তার ফিরলেন। ফটকে পা দিয়েই দেখেন, সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে বসে যদু আর নিতাই তুলসীর সংগে মস্করা করছে।

—এই রাস্কেল সব! কি হচ্ছে ওখানে? তুলসী ওর থালা হাতে দৌড়ে পালিয়ে গেল। যদু, নিতাই আমতা আমতা করে কিছু একটা গুছিয়ে বলতে বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে রইল। কৈলাসবাবু সুকুমারকে ডেকে বললেন—ঘরের দোর খোলা রাখ কেন? সেই ভিখিরি ছুঁড়িটা ক'দিন থেকে ঘুর ঘুর করছে এদিকে। খুব নজর রাখবে, কখন কি চুরি করে সরে পড়ে বলা যায় না।

সুকুমারের মাকে ডেকে কৈলাসবাবু জানালেন—সত্যদাসের মেয়ে মমতাকে দেখে এলাম। একরকম পাকা কথাই দিয়ে এসেছি। এবার সুকুমার আর তোমরা একবার দেখে এস। আমায় আর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিও না।

যথারীতি মমতাকে দেখে আসা হল। মমতার রূপে অসাধারণত্ব আছে সন্দেহ নেই। ঘুটঘুটে অমাবস্যার মত ঘনকৃষ্ণ গায়ের রং। সমস্ত অবয়বে সুপেশল কাঠিন্য। মণিবন্ধ ও কনুইয়ের মজবুত অস্থিমজ্জা আর হাতপায়ের রোমঘন পারুষ্য পুরুষকেও লজ্জা দেয়। চওড়া করোটির ওপর অতি কুঞ্চিত স্থূলতন্তু চুলের ভার, নীলগিরির চূড়ার ওপর স্নিগ্ধ মেঘস্তবকের মত। এক দৃঢ়া দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্তি। মমতার প্রখর দৃষ্টির সামনে সুকুমার সঙ্কুচিত হল। বরমালা—কাঙাল অবলার দৃষ্টি এ নয়; বরং এক অকুতোলজ্জ স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসাই যেন জ্বলজ্বল করছে। সত্যবাবু মেয়ের গুণপণার পরিচয় দিলেন। —বড় পরিশ্রমী মেয়ে; কারণ, স্বাস্থ্য খুব ভাল। ছাত্রীজীবনে প্রতি বছর স্পোরটসে প্রাইজ পেয়ে এসেছে। মেয়ে দেখে এসে সুকুমার মুখ ভার করে শুয়ে রইল। রাণু বলল—এ নিশ্চয় রাক্ষসগণ পিসীমা। পিসীমাও একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন—হাঁ, সেই তো কথা। বড় হট্টা কট্টা চেহারা। নইলে ভাল বরপণ দিচ্ছিল, দান সামগ্রীও। তবু কৈলাস ডাক্তার তোড়জোড় করছেন। মমতার সংগেই বিয়ের এক রকম ঠিক। এবার একটু শক্ত হয়েছেন তিনি। দশ-জনের দশ কথার চক্রে আর ভূত সাজতে পারবেন না। কিন্তু যা কখনো হয়নি, তাই হল। সুকুমারের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। সুকুমার এবার মুখ খুলেছে। রাণুকে ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে—সত্যদাসের সঙ্গে বড় গলাগলি দেখছি বাবার। ওখানে যদি বিয়ে ঠিক হয়, তবে একটু আগে-ভাগে আমায় জানাবি। আমি যুদ্ধে সার্ভিস নিচ্ছি।

কথাটা শুনে পিসীমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সুকুমারের মা রান্না ছেড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে কৈলাসবাবুর সংগে একপ্রস্থ বাক্‌যুদ্ধ সেরে এলেন। কিন্তু ফল হল না কিছুই। কৈলাসবাবু এবার অটল। সুকুমারের মা কেঁদে ফেললেন—ঐ হৃদ্দকুচ্ছিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে! তোমার ছেলে ঐ মেয়ের ছায়া মাড়াবে ভেবেছ? এমন বিয়ে না দিয়ে ছেলের হাতে চিম্‌টে বিদেয় করে দাও না! কৈলাসবাবুর অটলতার ব্যতিক্রম হল না কিছুই। তিনি শুধু একটা দিন স্থির করবার চেষ্টায় রইলেন।

সুকুমার মারমূর্তি হয়ে রাণুকে বলল—সেই দৈবজ্ঞটা এবার এলে আমায় খবর দিবি তো!

—কোন্ দৈবজ্ঞ?

ঐ যে-ব্যাটা সুন্দরী রামাটামা বলে গিয়েছিল। জিভ উপড়ে ফেলব ওর। আড়ালে দাঁড়িয়ে কৈলাস ডাক্তার শুনলেন এই বার্তালাপ। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল তাঁর। সুকুমারের মাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন—কি পেয়েছ।

শঙ্কিত চোখে কৈলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মা বললেন—কি হয়েছে?

—ছেলের বিয়ে দিতে চাও?—কেন দেব না?—সৎপাত্রী চাও, না সুন্দরী পাত্রী চাও? সুকুমারের মা ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন—সুন্দরী পাত্রী।

—বেশ, তবে লিখে দাও আমাকে—সুন্দরী কাকে বলে। তন্বীশ্যামা পক্ক-বিম্বাধর—আরও যা আছে, সব লিখে দাও। আমি সেই ফর্দ মিলিয়ে পাত্রী দেখব। এই বিদঘুটে প্রস্তাবে সুকুমারের মার মেজাজ ও ধৈর্য্য হারাবার উপক্রম করল। তবু মনের ঝাঁজ চেপে নিয়ে বললেন—তার চেয়ে ভাল, তোমার পাত্রী দেখতে হবে না। আমরা দেখছি। —ধন্যবাদ। খুব ভাল কথা। এবার তাহলে আমি দায়মুক্ত?

হ্যাঁ।

কৈলাস ডাক্তার এখন অনেকটা সুস্থির হয়েছেন। হাসপাতালে যান আসেন। রুগী নিয়ে, ময়না-ঘরের লাশ নিয়ে দিন কেটে যায়। যেমন আগে কাটতো। বাগানের দিকে একটা হট্টগোল। কৈলাস ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দেখেন, যদু ডোম আর নিতাই মিলে তুলসীকে ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাগানের ফটক দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

—কি ব্যাপার নিতাই?—বড় পাজি এই ছুঁড়িটা হুজুর। পয়সা দেয় নি বলে দাদাবাবুর ঘরে ঢিল ছুঁড়ছিল। আর এই দেখুন আমার হাত কামড়ে দিয়েছে। কৈলাস ডাক্তার বললেন—বড় বাড় বেড়েছে ছুঁড়ির। ভিখিরীর জাত, দয়া করলেই কুকুরের মত মাথায় চড়ে। কেবলি দেখছি, মাস তিন চার শুধু এদিকেই নজর। এবার এলে পুলিশে ধরিয়ে দিবি।

তুলসী ফটকের বাইরে গিয়েও মত্তা বাতুলীর মত আরও কটা ইটপাটকেল ছুঁড়ে চলে গেল। কৈলাস ডাক্তার বললেন—সব সময় ফটকে তালাবন্ধ রাখবে।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা। অনেক রাতে রুগী দেখে বাড়ি ফিরতেই কৈলাস ডাক্তার দেখলেন, ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে টিপে সরে পড়ছে তুলসী। কৈলাসবাবুকে দেখে আরও জোরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হাঁক দিতেই যদু ও নিতাই হাজির হল লাঠি হাতে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কৈলাস ডাক্তার বললেন—একি?

ফটক খোলা, বারান্দায় আলো জ্বলছে, সুকুমারের ঘরে আলো, আমার বৈঠকখানা খোলা, তোমরা সব জেগেও রয়েছ, অথচ ছুঁড়িটা বেমালুম চুরি করে সরে পড়ল!

কৈলাস ডাক্তার সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলেন।—আমার ঘরটা সব তছনছ করেছে কে? টেবিল থেকে নতুন বেলেডোনার শিশিটাই বা গেল কোথায়?

অনেকক্ষণ বকাবকি করে শান্ত হলেন কৈলাস ডাক্তার। কিছু চুরি হয়নি বলেই মনে হল।

দিনটা আজ ভাল নয়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আছে। কানাইবাবু এসে কৈলাস ডাক্তারকে জানালেন—সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গেছে। জগৎ ঘোষের মেয়ে। সুকুমারের এবং আর সবারও পছন্দ হয়েছে। বংশে, শিক্ষায় ও গুণে কোন ত্রুটি নেই। কৈলাস ডাক্তার বললেন—বুঝলাম, তোমরা কল্পতরুর সন্ধান পেয়েছ, সুখবর।

—আপনাকে আজ রাত্রে আশীর্বাদ করতে যেতে হবে।

—তা যাব।

যদু ডোম এসে তক্ষুণি খবর দিল—তিনটে লাশ এসেছে ময়না তদন্তের জন্য। কৈলাস ডাক্তার বললেন—চলরে যদু। এক্ষুণি সেরে রাখি। রাত্রে আমার নানা কাজ রয়েছে।

ময়না-ঘরে এসে কৈলাস ডাক্তার বললেন—বড় মেঘলা করেছে রে। পেট্রোমাক্স বাতি দুটো জ্বাল।

যন্ত্রপাতিগুলো গামলায় সাজিয়ে আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার বললেন—রাত হবে না কিরে যদু? —আজ্ঞে না। দুটো আগুনে পোড়া লাশ, পচে পাঁক হয়ে গেছে। ওতো জানা কেস, আমিই চিরে ফেড়ে দেব। বাকি একটা শুধু---।

—নে, কোনটা দিবি দে। কৈলাস ডাক্তার করাত হাতে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন।

লাশের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই কৈলাস ডাক্তার চমকে বললেন—অ্যাঁ, একে রে যদু?

যদু ততক্ষণে আলগোছে সরে পড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৈলাস ডাক্তারের প্রশ্নে ফিরে এসে বলল—হাঁ হুজুর তুলসীর, সেই ভিখিরী মেয়েটা। কৈলাস ডাক্তার বোকার মত যদুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। যদু সেই অবসরে তুলসীর পরিহিত নোংরা শাড়িটা, গায়ের ছেঁড়া কোটটা খুলে মেঝের উপর ছুড়ে ফেলে দিল। আবার বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই কৈলাস ডাক্তার বললেন—যাচ্ছিস কোথায়? স্পিরিট দিয়ে লাশটা মোছ ভাল করে। ইউকালিপটাসের তেলের বোতল-টা দে। কিছু কর্পূর পুড়তে দে। আর একটা বাতি জ্বালা—ওয়ান মোর আনফরচুনেট!

কথাটার মধ্যে যেন একটু বেদনার আভাস ছিল। তুলসীর লাশে হাত দিলেন কৈলাস ডাক্তার।

করাতের দু'পোঁচে খুলিটা দুভাগ করা হল। কৈলাস ডাক্তারের হাতের ছুরি ফোঁস ফোঁস করে সনিশ্বাসে নেচে কেটে চলল লাশের উপর। গলাটা চিরে দেওয়া হল লম্বালম্বিভাবে। বুকের মাঝখানে ও দুপাশে বড় বড় পোঁচ দিয়ে ধড়টা খুলে ফেলা হল। সাঁড়াশী দিয়ে পট্‌পট্ করে পাঁজরাগুলো উল্টে দিলেন কৈলাস ডাক্তার। যেন ঘুমে ঢলে রয়েছে তুলসীর চোখের পাতা। চিমটে দিয়ে ফাঁক করে কৈলাস ডাক্তার দেখলেন—নিশ্চল দুটি কণীনিকা যেন নিদারুণ কোন অভিমানে নিষ্প্রভ হয়ে আছে। শুকিয়ে কুঁচিয়ে গেছে চোখের শ্বেত পটল। সুজলা অশ্রুশীলা নাড়ীগুলো অতিস্রাবে বিষণ্ণ।

—ইস্, মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব। কৈলাস ডাক্তার বললেন।

যদু বলল—হাঁ হুজুর, কাঁদবেই তো। সুইসাইড কিনা। করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়। তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে।

—গলা টিপে মারে নি তো কেউ? কৈলাস ডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। কৈ, কোন আঘাতের চিহ্ন তো নেই! গুচ্ছ গুচ্ছ অম্লান স্বররজ্জু, শ্বাসবহানালীটাও তেমনি প্রফুল্ল। অজস্র লালায় পিচ্ছিল সুপুষ্ট গ্রসনিক।

—এত লালা! মরার আগে মেয়েটা খেয়েছে খুব পেটভরে।

—হাঁ হুজুর, ভিখারী তো খেয়েই মরে।

দেহতত্ত্বের পাকা জহুরী কৈলাস ডাক্তার। তাঁকে অবাক্ করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কুলবধূ, কত রূপাজীবা নটীর লাশ পার হয়েছে তার হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের অন্তরঙ্গ রূপ—ফিকে ফ্যাকাশে ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। অদ্ভুত!

বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন—প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ; এই নবনীত পিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃদকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশিক জাল।

কৈলাস ডাক্তার বিমুগ্ধ হয়ে দেখলেন—থরে বিথরে সাজান সারি সারি যত রক্তিম পর্শুকা। বরফের কুঁচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেবে গেছে প্রাণদা লীলার প্রবাহিকা।

কৈলাস ডাক্তার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিলেন—খণ্ড স্ফটিকের মত পীতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুট ধমনি! সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিক্ষীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশুপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা। ঝাঁপি খোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠল।

আবিষ্ট হয়ে গেছেন কৈলাস ডাক্তার। কুৎসিতা তুলসীর ঐ রূপের পরিচয় কে রাখে! তবুও, এ তিমির দৃষ্টি হয় তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্যাদা; নতুন তাজমহল হয় তো গড়ে উঠবে সেদিন! যাক্ – – –।

কৈলাস ডাক্তার আবার হাতের কাজে মন দিলেন। যদু বলল—এ সবে কোন জখম নেই হুজুর। পেটটা দেখুন। ছুরির ফলার এক আঘাতে দু'ভাগ করা হল পাকস্থলী। এইবার কৈলাস ডাক্তার দেখলেন, কোথায় মৃত্যুর কামড়। ক্লোমরসে মাখা একটা অজীর্ণ পিণ্ড। সন্দেশ, পাউরুটি—বেলেডোনা।

—মার্ডার!

হাতের ছুরি খসে পড়ল মেঝের উপর। সে শব্দে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৈলাস ডাক্তার।

উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাস ডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠল দপদপ করে। গোক-রাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়ল মেঝের ওপর।

হঠাৎ ছটফট্ করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাস ডাক্তার। ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিক্কন বাহুপুটে চেপে নিয়ে স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে খুলে ধরলেন

--পরিশল্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল এক পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর মানবজাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।

আবেগে কৈলাস ডাক্তারের ঠোঁটটা কাঁপছিল থর থর করে। যদু এসে ডাকল--হুজুর।

ডেকে সাড়া না পেয়ে যদু বাইরে গিয়ে নিতাই সহিসের পাশে বসল।

নিতাই বলল--এত দেরী কেনরে যদু?

--শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।



আশাপূর্ণা দেবী

জন্ম : ১৯০৯ সালে কলকাতায়। প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, ছাড়পত্র, দোলনা, নয়ছয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস দিয়ে আশাপূর্ণা দেবী ভরিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার। ব্যক্তিগত জীবনের মতই সহজ অনাড়ম্বর ভাষার সাহায্যে তিনি এঁকেছেন বিভিন্ন চরিত্র। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র নায়িকা সত্যবতী তার কল্পনা এবং অনুভূতির জীবন্ত রূপ, পর্দানশীন যুগে যে মেয়েরা কঠিন পাথরকে কেটে কেটে পথ তৈরি করল, সত্যবতী তাদেরই প্রতীক। শিল্পী যেমন রঙ আর তুলি নিয়ে আঁকতে বসেন আপন খেয়ালে আশাপূর্ণার নায়িকারাও যেন তাঁর খেয়ালের স্কেচ। এবং এদের রঙ বিভিন্ন, কেউ কারো মত নয়। ‘সীমারেখার সীমা’, ‘বন্দিনী’ গল্পে দেখা যায় মেয়েদের চরিত্রে কি অসীম ধৈর্য। অতি আধুনিক সমাজকে নিয়ে চরম রসিকতা ওঁর হারজিৎ গল্পটি। রবীন্দ্রপুরস্কারের পর সদ্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেলেন।

শ্রেষ্ঠ গল্প : শ্রেষ্ঠ লেখক

কোনো গল্প লেখকের গল্পের সংখ্যা যদি হাজারের উপরে
গিয়ে পৌঁছয়, সেই লেখকের পক্ষে তার 'সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পটি' বেছে বার করা
শুধু মুশকিলই নয়, অসম্ভবই।
গল্প বহু রকমের হয়। বিচিত্র চিন্তার মধ্য দিয়ে তাদের গঠন, অতএব
গল্পের শ্রেণীবিভাগও থাকে। কোনো একটি, অথবা একাধিকই গল্প স্ব স্ব শ্রেণীতে
'শ্রেষ্ঠ' হতে পারে, অবশ্য লেখকের মান অনুযায়ী, কাজেই
শ্রীমান দীপকের (প্রকাশক) ইচ্ছা পূরণ সম্ভব বলে মনে করতে পারছি না।
এই 'বিপন্ন সুখ' গল্পটি বেছে নেওয়ার কারণ, প্রায়শঃই আমার গল্প
সমাজ চিন্তামূলক, এ গল্পটি তার একটু প্রতিনিধিত্ব করলেও করতে পারে।
বর্তমান সমাজে যে ভাগ্যমন্তেরা রুপোর রথে চেপে
জয়যাত্রায় এগিয়ে চলেছে, তাদের চাকার তলায় পিষ্ট হচ্ছে কারা?
এই প্রশ্ন থেকেই এই গল্পের উদ্ভব।

আশাপূর্ণা দেবী

বিপন্ন সুখ

জম-জমাটি আসরের মধ্যে নিঃশব্দে পিছন দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে ফস করে মৃণালের হাতের তাসগুলো তুলে নিয়ে বলে উঠলো নিখিল, 'উঃ খুব মারকাটারি হাতখানা পেয়েছিস তো?'

নিখিলের জীবনে অনেক সমারোহ এসেছে, অনেক বাড়বাড়ন্ত, নিখিল যে সব কেস্টবিস্টু মহলে ঘুরে বেড়ায়, যে সব হোটেলে-ফোটেলে গিয়ে ওঠে, তা শুনে এই 'পেয়ারা বাগান তরুণ সংঘের' সদস্যদের চোখ ট্যারা হয়ে যায়, তবু নিখিলের কথার ধরনটি বদলায়নি। অন্তত এদের কাছে নয়।

বদলানোই তো স্বাভাবিক ছিল।

তাহলে হয়তো নিখিলের চরিত্রও বদলায় নি, না হলে কবেকার কোন ছেলেমানুষীর ফসল এই একটা 'আড্ডা ঘর', যার দেয়ালে স্যাঁতসেঁতে ছাপ, মেজেটা আটফাটা, কড়ি-বরগা ঝুলন্তপ্রায়, এবং দরজা জানলারা রান্নাঘরের সমতুল্য সেই ঘরটার জন্যে ওর মন টানে কেন? নিখিলের বম্বের বাড়ির চাকর বাকর যদি দেখে 'সাহেব' এই ঘরে ঢুকে ডজন ডজন চায়ের পেয়ালার দাগে চিত্রিত এবং শত শত আগুনের ফুলকির দাহে জর্জরিত একখানা মলিন ফরাসপাতা নড়বড়ে চৌকিতে পরম আনন্দে বসে আছেন, স্রেফ্ অজ্ঞান হয়ে যাবে তারা।

অথচ সত্যিই পরম আনন্দ পায় নিখিল এখানে এসে। বর্তে যায় যেন।

হেড অফিস বোম্বাইতে স্থায়ী হলেও মাঝে মাঝেই কলকাতায় আসতে হয় নিখিলকে কোম্পানির কাজে। কোম্পানির পয়সাতেই উড়ে উড়ে আসে-যায়, কোম্পানির গাড়িতেই কলকাতা চষে বেড়ায়, আর কোম্পানির ঢালাও হুকুমে তার মান্যগণ্য খদ্দেরদের নিয়ে গিয়ে দামী হোটেলে তুলে লপচপানি করে।

'রতনচাঁদ মাণিকচাঁদ এণ্ড কোং'র অনেক রকম বিজনেস, নিখিল তাদের ডান হাত।

তবু নিখিল কলকাতায় এলেই কোনো ফাঁকে একবার এই চটা-ওঠা মেজের ঘরটায় দু দণ্ড বসে যায়। হয়তো এক হাত তাসও খেলে যায়।

নিখিলের এই ভালবাসার নম্রতায় সংঘের অন্য সদস্যরা অভিভূত, বিগলিত।

কিন্তু নিখিলও কি এদের কাছে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত নয়? এরা যে নিখিলকে 'পয়সা-ওলা' বলে ঠেলে ফেলে দেয়নি, এখনো 'তুই-তোকারি' করে কথা বলে, নিখিলের কাছে ক্লাবের জন্যে 'ডোনেশান' চায়, পুজোর মোটা চাঁদা আদায় করে এটাকে নিখিল ওদের কৃপা বলেই মনে করে।

'পেয়ারা বাগান' নামটা এখন শহরের নামের খাতা থেকে লুপ্ত, 'তরুণ সংঘের তরুণরাও এখন আর 'তরুণ' নেই, খুঁজলে অনেকেরই রগের চুলের ফাঁকে 'আলপিনের' আগাদের উঁকি মারতে দেখা যাবে, তবু তরুণ সংঘের প্রতি আনুগত্যের অভাব নেই কারো। নেহাৎ যারা কর্মসূত্রে বাইরে চলে গেছে, তারা বাদে।

চলে গিয়েও নিখিলের মতো এতটা যোগসূত্র কেউ রাখতে পারেনি। কেউ কেউ চাঁদা বন্ধ করে দিয়েছে, কেউ হয়তো বার্ষিক চাঁদাটা দু বছরের জমিয়ে ফেলে যখন

কলকাতায় আসে, দিয়ে দেয়, পুজোর সময় কলকাতায় এলে অষ্টমীর অঞ্জলীটা হয়তো 'তরুণ সংঘের' ঠাকুরকেই দেয়, হয়তো বা এসে উঠতে পারে না, ফিরে গিয়ে একটা পোস্টকার্ডে একত্রে সবাইকে বিজয়ার সম্ভাষণ জানিয়ে লেখে, 'নানা কাজে পড়ে—' আর এবারে ইত্যাদি।

এ বছরটা ক্লাবের রজতজয়ন্তী বছর, তাই এবার পুজোর সময় প্রাক্তন সদস্য সম্মেলনের পরিকল্পনা চলছে, এবং বাজেট সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, এ হেন কালে হঠাৎ নিখিলের আবির্ভাব যেন বিপদকালে ঈশ্বরের আবির্ভাবতুল্য, বাজেটে যা কিছু সমস্যা দেখা দেবে, নিখিল সেটা হাতে তুলে নেবে এটা নিশ্চিত। অতএব হৈচৈ রবে ঘর প্রায় ফাটিয়ে ফেললো ওরা।

'কবে এলি? কখন এসে ঢুকলি? কেউ টের পেলাম না—আশ্চর্য।'

নিখিল সেই মলিন ফরাসের উপর এক ধারে বসে পড়ে বলে, 'সব কথার জবাব হবে, এ 'দান'টা হয়ে যাক্ না! তাসটা দারুণ এসেছে—'

'আরে দূর, রেখে দে তোর দারুণ। কথাগুলো হয়ে যাক। তারপর না হয় নতুন করে খেলা শুরু হবে।'

'নতুন করে খেলা শুরু?'

নিখিল একটু রহস্যময় হাসি হাসে, 'তাই ভালো।'

ওরাও জানে তাই ভালো।

খেলা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, কাজের কথা হয়ে যাক। হয়তো এক্ষুনি নিখিল বলে বসবে, 'উঠি ভাই' আর ঠিক পঞ্চান্ন মিনিট পরে প্লেন ছাড়বে।'

ওই রকম মিনিট গুণেই কাজের হিসেব রাখতে হয় নিখিলকে। সংঘের সেক্রেটারি বিভূতি বোস তাই তাড়াতাড়ি নিজেদের কাজের কথা তোলে।

'হবে হবে। তাড়া কী?' নিখিল বলে, 'কথা তো পালাচ্ছে না, এই দানটা হয়ে যাক না।'

'থাকবি বুঝি আজ?'

'থাকবো।' নিখিল আবার রহস্যময় হাসি হাসে, 'আজ থাকবো, কাল থাকবো, পরশু থাকবো, তরসু নরসু সব দিন থাকবো।'

'বলিস কী?' সত্যি? গুড গুড। কলকাতায় বদলী হয়ে এলি বুঝি?'

'দূর! হেড অফিস থেকে কেউ ব্রাঞ্চে ঠেলতে পারে? পারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় পারে, তা আমার ব্যাপারে তো—আর একটু হেসে কথাটিকে শেষ না করেই শেষ করে নিখিল।

'ওঃ তাহলে বুঝি ছুটি নিয়েছিস? ভালো করেছিস। মাঝে মাঝে একটু রেস্টের দরকার। যা ছুটোছুটি কাজ তোর। আজ বম্বে, কাল মাদ্রাজ, পরশু দিল্লি, তরশু কানপুর বাপ্‌স্!---তা কতদিনের জন্যে ছুটি নিয়েছিস? পুজো পর্যন্ত থাকতে পারবি না?'

'পারবো। পুজো পর্যন্ত, পুজোর পর পর্যন্ত। থেকেই যাবো।'

'থেকেই যাবি?'

এতগুলো বুড়োধাড়ি লোক অবোধ চোখে তাকায়।

'তার মানে?'

'উঃ এই সামান্য কথাটার মানে বুঝতে এতগুলো মাথার এত সময় লাগছে চাঁদু? ছুটিটা বরাবরের জন্যে নিয়ে নিয়েছি, বুঝলে বাপ!'

'তবুও যে মাথায় ঢুকছে না ভাই।'

'উঃ কী দিয়ে মাথা তৈরি রে! পাথর? চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

ওঃ ঠাট্টা!

ওরা কলরব করে ওঠে, 'ইয়াকি!' ---'মাইরী আর কি!'---'যাদুরে, তোর ছাড়া-চাকরিটা কোথায় ফেললি গোপাল, বল না? কুড়িয়ে নিয়ে বুকে জড়াই।'

চল্লিশ পার করে ফেলেও এখানে ওরা দিব্যি চব্বিশের ভাষায় কথা কয়।

'রতনচাঁদ মানিকচাঁদ এণ্ড কোং-র তুমিই তো যাদু বুকের মাণিক, মাথার রতন, তুমি ছেড়ে দেবে চাঁদ ব্রাদারদের?'

'বিশ্বাস না করলে আর কী করবো?' নিখিল নিজস্ব ভঙ্গীতে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'রেজিগ্নেশান লেটারের কপিটা তো নিয়ে আসিনি যে, বিশ্বাস করাবো।'

অবোধদের মুখের অবোধ কৌতুকের হাসির ফুলকিগুলিকে হঠাৎ নিভু নিভু দেখালো।

ব্যাপার কী!

সত্যি বলেই মনে হচ্ছে যেন।

একজন নেভা গলায় বললো, 'কথাটা অবিশ্বাস্য, এটা তো অস্বীকার করা যায় না?'

'তা যায় না বটে।' কথাটা বলে সহজ ভঙ্গীতে নিখিল পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে একটা বার করে নিয়ে কেসটা ওদের দিকে বাড়িয়ে ধরে, বলে বার কর।'

'রাখ্ তোর পানামা। হয়েছে টা কী? খুব তেল হয়েছে বুঝি? তাই মেজাজ দেখিয়ে—'

নিখিল আবার হাঁটু ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'আরে দূর! ওদের সঙ্গে আমার কত ভালো রিলেশান! আমার এই ডিসিশানে যা মর্মাহত হয়েছে ওরা, সেটা মনে পড়ে সারাক্ষণ মনটা দগ্ধাচ্ছে।'

'তবু ছেড়ে দিলি?'

'দিলাম। নতুন করে খেলা শুরু করবো। নইলে ওরা তো আমায় আরো অফার করছিল। এমনিতেই তো সাড়ে তিন হাজার মত দিচ্ছিলো, তা ছাড়া ওয়েল ফার্নিশড ফ্রী ফ্ল্যাট, গাড়ি, টেলিফোন, তার ওপরও পুরো চারই দিতে চাইছিল—'

'নিলি না?'

'নাঃ। বড় দুঃখ পেলো ওরা। তবে '’রে নিয়েছে আমার হঠাৎ মাথার অসুখ করে গেছে। আমার মিসেসই সেটি রটিয়েছেন অবশ্য।'

আলোকবিন্দুগুলো আবার উজ্জ্বল হয়।

'ধ্যেৎতারি। কী গুল মারছিস বসে বসে?'

'গুল নয় হে গুল নয়, স্রেফ্ গোলা, ছুঁড়ে মারলাম একখানা!'

'ছুঁড়ে মারলি? কাকে?'

'মিসেসকে!' নিখিল দিব্য আত্মস্থ গলায় বলে, 'মারা ছাড়া উপায় ছিল না রে ভাই! এত বাড় বাড়িয়েছিল, সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। মারলাম ধাঁই করে একখানি ব্রহ্মাস্ত্র। কখনো মারতাম না বলে, ভাবত নিরস্ত্র। দেখুক এখন। ফুলো বেলুন একেবারে ফুট! --- সেকালে—বৌ জব্দ করবার একটা পথ অন্তত ছিল, একালের আইন যে আমাদের মতো হতভাগ্যদের একেবারে হাত পা বেঁধে রেখেছে—'

কটকটে বরুণ শীল বলে ওঠে, 'বড়ো আক্ষেপ হচ্ছে, না?'

'দারুণ হতো! এখন আর হচ্ছে না। জব্দ করে দেবার এই অস্ত্রটা আবিষ্কার করে ফেলে বড় আহলাদে আছি।'

বরুণ চড়া চড়া গলায় বলে, 'করেছেনটা কী মিসেস? আর কারুর সঙ্গে 'লাভ্' করছিলেন?'

'আরে বাবা, তাতেও এত অসহ্য হত না। বুঝতাম মানুষের চিত্তে অমন দৌর্বল্য এসেও থাকে।'

'তা হলে হলোটা কী? মিসেসকে জব্দ করবার জন্যে তুমি চাকরি ছাড়লে? তিন চার হাজারি চাকরি! মশার জন্যে কামান! অথচ—কারণটা জেলাসি নয়। তাহলে হয়েছিলটা কী?'

বললো বিজয় বোস।

'হয়েছিল অহঙ্কার! ধরাকে সরাজ্ঞান! রাবণ রাজার অবস্থা!'

এযাবৎ নিখিলের সঙ্গে কেউ খিচিয়ে কথা বলেনি, অবস্থাও ঘটেনি। নিখিলের বুদ্ধিমত্তাকে বাহবাই দিয়েছে সবাই। নিখিলের সাদাসিধেমিতে মুগ্ধ হয়েছে।

আজ কটকটে বরুণ শীল খিঁচিয়ে উঠলো। নিখিলের মুখ্যুমীর জন্যেই অবশ্য। তবে বলা যায় না ওই 'চাকরীবিহীনতাটা' অলক্ষ্যে কোনো কাজ করলো কিনা। জজসাহেব রিটায়ার করলে নাকি পরদিনই পেশকার মোক্তাররা আর মাথা নোয়ায় না।

যাই হোক বরুণ শীল খিচিয়ে উঠলো, 'এর মধ্যে আর নতুনত্বের কী আছে? পয়সা হলেই অমন ধরাকে সরাজ্ঞান হয়ে থাকে।'

'জানি', নিখিল একটা পোড়া দেশলাই কাঠি দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে আমেজি গলায় বলে, 'গোড়ায় গোড়ায় মেনে নিয়েছিলাম সেটা। আমার পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ওনারও ক্রমোন্নতি হচ্ছিল, দেখছিলাম, ড্যাবডেবিয়ে, কিন্তু বম্বে গিয়ে, সেই ওয়েল ফার্নিশড্' বাড়িফাড়ি দেখে, আর অন্য সব ধনপতিদের গিন্নীদের সঙ্গে বাৎ চিৎ করতে পেয়ে টেয়ে যেন সাপের পাঁচটা পা দেখলো ভাই! শুঁয়ো পোকা পাখনা মেলে প্রজাপতি হয়ে উড়তে শিখলো। কোটিপতি 'চাঁদ ব্রাদার'দের বাড়ির মেয়েদের মতো সাজ করতে ইচ্ছে হয়, নিজেকে তাদের দরে ভাবতে ইচ্ছে হয়, দেখে দেখে লজ্জায় মারা যাই।'

'এটা তোর শুচিবাই! মেয়েরা অমন আনব্যালেন্সড হয়েই থাকে।' বললো বিজয় বোস।

'জানি। তাও জানি হয়েই থাকে।' নিখিল হাতের কাঠিটা ও কান থেকে এ কানে এনে বলে, 'তাই নীরবেই দেখে যাচ্ছিলাম। মায়ে মেয়েয় এক সঙ্গে স্ল্যাকস্ পরে বেড়াতে যাচ্ছো? যাও। ছু' গিরে কাপড়ে ব্লাউজ বানাচ্ছ? বানাও। নখে মুখে রং লাগাচ্ছ, লাগাও। ভুরুটাকে আমাদের দাড়ি গোঁফের মত স্রেফ চেঁছে উড়িয়ে দিয়ে তুলি দিয়ে ভুরু আঁকছ, আঁক, স্থানীয় মহিলাদের মত, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হি হি করে ফুচকা খাও, ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে সিগারেট খাও—'

'এই ধ্যেৎ! বড্ড রং চড়ানো হচ্ছে না?'

'হচ্ছে না রে ভাই, হচ্ছে না। যা বলছি সব সত্যি। তবু তো শেষটা বলতেই দিলি না। যাক্ বুঝে নে। বারণ করতে গেলে আমাকে স্রেফ নস্যাৎ করে ছাড়ে! ---আমি গাঁইয়া, আমি বুনো, আমি সেকেলে, আমার চালচলন দেখলে না কি তার মাথা কাটা যায়। মিসেস থাপা, মিসেস চেটিনা, আর মিসেস ব্যানার্জি নাকি অবাক হয়ে ওকে প্রশ্ন করেন, 'এতদিনেও আপনি ওকে মানুষ করে তুলতে পারলেন না?' ---একা নিজেই নয়, মেয়েও দোসর।---মেয়েরও না কি ওর বন্ধুদের সামনে

আমাকে বার করতে লজ্জা করে। আমি হাঁটু দোলাই, আমি মুখে রুমাল চাপা না দিয়েই কাসি, আমি ড্রিঙ্ক করতে পারি না আরো কত সব 'অদ্ভুত কাণ্ড' না কি করি। এতে ওরা লজ্জায় মারা যায়। ---ছেড়েই দিতাম, ভাবতাম মরগে যা মায়ে মেয়েয়। লোকে তোদের দেখেই হাসে।---কিন্তু সব জিনিসই কি উড়িয়ে দেওয়া যায়?'

নিখিলের সেই এলিয়ে বসে কৌতুকের গলায় কথা বলার চেহারাটা হঠাৎ যেন বদলে যায়। নিখিল সোজা হয়ে বসে, বলে ওঠে, 'আমারই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা রোজগারের টাকা মায়ে ঝিয়ে চারখানা হাতে মুঠো মুঠো উড়িয়ে ছড়িয়ে, আমার রুচির ওপর হাতুড়ি মেরে মেরে ওঁদের আদর্শ 'সমাজে'র একজন হচ্ছেন, ---যখন তখন পার্টি দেওয়া হচ্ছে, পিকনিকে যাওয়া হচ্ছে, এবং যে সব মোদো মাতাল চরিত্রহীন লোকগুলোকে দেখলে বিষ ওঠে, সেইগুলোকে আদর করে বাড়িতে ডাকা হচ্ছে কেবলমাত্র তারা 'বড় লোক' এই গুণে।---আমার বৌ মেয়ে তাদের সঙ্গে হি হি করবে, এবং আমি পরম আহ্লাদে সেই পার্টিতে যোগ না দিলে, তারা চলে যাবার পর বৌ আমাকে তুলোধোনা ধুনবে। এই সব বরদাস্ত করে চলেছি---।'

'এগুলো তুমি 'চেক্' করতে পারতে' বললো কটকটে বরুণ শীল।

'পারতাম না!' নিখিল গম্ভীরভাবে বলে, 'ব্রেক্ খারাপ হয়ে যাওয়া গাড়িকে চেক্ করা যায় না!---কলকাতায় থাকতে দেখেছি মাঝে মাঝে ষষ্ঠি মঙ্গলচণ্ডী কী সব করতো টরতো, ওখানে গিয়ে সব ছেড়ে দিল। আমার মা একবার কোথাকার যেন ঠাকুরের ফুল যত্ন করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চিঠির খামে ভরে, ফেলে দিয়ে হি-হি করে হেসে বললো, 'মহিলাটি যে এখনো কোন যুগে আছেন!'---কেন? কেন? এ-সব হবে কেন? পয়সা হলে যদি এ সব হতে হয়, পয়সাটাই যাক্, এই আমার সিদ্ধান্ত।---মেয়েটা সুদ্ধু কী ধিঙ্গী হয়ে উঠছিল জানিস? আমার মাকে আমি চিঠি দিচ্ছি, হি-হি করে বলে কিনা, 'ও মা-মণি, দেখে যাও বাপী বাপীর মাকে চিঠি লিখতে বসে চিঠির ওপর চীনে ভাষায় কী লিখছে। 'ও' আর 'অনুস্বর', কী হয় মা? জানো?'

কথাটা হাসিরই, হেসেও ফেলে সবাই। শুধু নিখিল হাসে না। নিখিল বলে, 'তোরা বললি মশা মারতে কামান, কিন্তু আমি বুঝছিলাম কামান ভিন্ন উপায় নেই। আমার হাতে ওই একটি ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই।---আমি প্রতি বিষয়েই জব্দ। আমি লোক সমাজের কাছে জব্দ, আমি চাকর-বাকররের সামনে কেলেঙ্কারীর ভয়ে জব্দ, আমি শান্তিপ্রিয়তার কাছে জব্দ। আমার স্ত্রী এটি বুঝে ফেলেছিল। আর বুঝে ফেলেছিল, সব ঘাঁটির চাবি নিজের হাতে রাখতে হয়। ওর পৃষ্ঠবল ওর 'সমাজ', ওর পৃষ্ঠবল ওর মেয়ে, ওর পৃষ্ঠবল আমার টাকা। আমার কোন পৃষ্ঠবল নেই। আমি একা। আমার বাড়িতে আমার কোনো অধিকার নেই। আমার বিধবা মা, যিনি কতো দুঃখে আমায় মানষ করেছেন, আমার সেই মানুষ হয়ে ওঠার আশায় দিন গুনেছেন, তাঁকে আমার বাড়িতে এনে রাখার উপায় নেই। রাখার প্রশ্নই নেই। স্বচ্ছন্দে বলে দিলো, 'মা এসে থাকবেন? এইখানে? তোমার মার সেই গোবর গঙ্গাজলের ব্যাপারটি এখানে কোথায় হবে শুনি? আমার কিচেনে খেতে পারেন তো থাকুন এসে।'

'যাাঃ। তুই মামলা জিততে নিজের স্বপক্ষে মিথ্যে সাক্ষী খাড়া করছিস।'

'মিথ্যে হলে আমার চাইতে বেশী খুশি কেউ হতো না বিজয়, কিন্তু দিস ইজ ফ্যাক্ট! অথচ ওর দিকের গুষ্ঠির কারো বস্তে বেড়ানো বাকি থাকলো না এই ক'বছরে। যেহেতু তাদের ওর কিচেনে ভর্তি করা যায়।'

'আজকাল ওই রকমই হয়েছেরে ভাই', বিভূতি বোস বলে, 'দেখছি তো চারদিকে।'

'দেখার চোখ সবাইয়ের সমান নয় বিভূতি', নিখিল বলে, 'বললে বিশ্বাস করবি, মা সেবার কাদের সঙ্গে যেন তীর্থে বেরিয়ে দ্বারকা ফেরৎ আমার ওখানে উঠলেন আমায় দেখতে, পুরো তিনটি দিন মা শুধু ফল খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। বৌ বললো কী জানিস, 'তুমি এমন করছো যেন জগতে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। বিধবারা তো ফলটল খেয়ে থাকেই কতো সময়।' --- অথচ মা আসবেন বলে একগাদা নতুন বাসন পর্যন্ত কিনে এনেছিলাম। কিন্তু ব্যবস্থাটা তো ওর হাতে!'

'অসুবিধেটা তো ওইখানেই—' মৃণাল বলে, 'আমরা যে ওদের হাতে—'

'আমিও তাই ভাবতাম।' নিখিল বলে, 'হঠাৎ একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। দেখলাম রাজ্য সরকারের ওপর আছে কেন্দ্রীয় সরকার। অবস্থা বুঝলে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়।---কিন্তু সাধ্যপক্ষে সে ক্ষমতা কে চায় প্রয়োগ করতে? অবস্থা তাই চরমে পৌঁছয়। আমার মা শুচিবাই বিধবা, আমার বোন তো তা নয়? ওর ছোট মেয়েটা ভুগছে শুনে আমার কাছে আনতে চেয়েছিলাম, সাতশো অসুবিধের ফিরিস্তি শুনিয়ে চিঠির কাগজে কেড়ে নিয়ে বললো, 'আমি লিখে দেব এখন গুছিয়ে গাছিয়ে।'

'বল, বল তোরা এই জন্যেই কী আমি 'অনেক টাকা' রোজগার করতে চেয়েছিলাম? হ্যাঁ, ওইটাই আমার আ-শৈশবের স্বপ্ন ছিল। অনেক টাকা রোজগার করবো। সবাইকে সুখে রাখবো---করেওছি অনেক টাকা, বলতে কি আশাতীত। কিন্তু সে কী মাতাল থাপা, কোটলা, আর ব্যানার্জিকে বাড়িতে ডেকে ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়ানোর জন্যে? আর সেই নেমন্তন্নর সুবিধের জন্যে তিনশো টাকা মাইনের গোয়ানিজ কুক রাখবার জন্যে?'

তিনশো!

তিনশো!

অনেকগুলো গলা থেকে ওই একটা শব্দই উচ্চারিত হয়। আর কোনো কথা বোধহয় চট করে জোগায় না কারো মুখে। একটা রান্না করবার লোকের মাইনে তিনশো। এটা তাদের সহ্য করে নেবার ক্ষমতার বাইরে।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ক্ষুব্ধস্বর আছড়ে পড়ে, 'হ্যাঁ তিনশো টাকা। চাল ফলাচ্ছি না ভাই, সত্যি।---তাও শুনলাম—খুব নাকি সস্তায় পাওয়া গেছে। ওই পুংদ্রৌপদী যা রান্না জানে, তাতে নাকি হোটেলে টোটেলে ওর চারগুণ মাইনে পেতে পারতো ও। হতে পারে, অসম্ভব নয়। কিন্তু বলতে পারিস, সে লোক আমার সংসারে কেন? আমার বাবা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ছোট ভাইকে মানুষ করে মাত্র আড়াইশো টাকায় সংসার চালিয়ে গেছেন। আমার কাকা, যিনি বাবা মারা যাবার পর আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, তিনি এখনো তিনশোটি টাকার জন্যে ভাঙা শরীর নিয়ে বদ্যিবাটি থেকে কলকাতা ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে মরছেন, আর আমার রাঁধুনীর মাইনে তিনশো। অথচ আমি শালা হাইপ্রেসার আর ডায়বিটিসের রুগী, খাই শুধু দুবেলা দু-খানা করে শুকনো রুটি আর আলুনি আঝালি একটা স্টু!---এই প্রশ্ন তুলেছিলাম বলে আমায় শুধু রাস্তা থেকে ধুলো কুড়িয়ে গায়ে দিতে বাকি রেখেছিল। বলে, 'বোকার মতো কথা বোলো না, ওরকম একটা কুক রাখা বাড়িগাড়ি থাকার মতোই প্রেসটিজ।--- ওঁর যতো বান্ধবী, মিসেস কোটলা, মিসেস থাপা, মিসেস বাটলীওয়ালা, আর মিসেস ব্যানার্জির দল নাকি ওই 'কুক' গৌরবে গৌরবান্বিতা আমার মিসেসকে ঈর্ষা করছে।

বলছে, 'ভাঙিয়ে নেবো।' আমার মিসেস নাকি কেবলমাত্র তোয়াজের জোরে লোকটাকে টিকিয়ে রেখেছেন। হ্যাঁ, তোয়াজ উনি ওদের করেন বৈকি। তোয়াজ, সমীহ। ম্যাড্রাসী আয়াটাকে যা সমীহ করেন ভদ্রমহিলা, তার দশ ভাগের একভাগ আমার-মা-কাকীমা পেলে ধন্য হয়ে যেতেন।

সবই সহ্য করে যাচ্ছিলাম, পড়ে মার খাচ্ছিলাম নিজের সংসারে 'চোর' নিজের বাড়িতে অনধিকারী, নিজের স্ত্রী-কন্যার কাছে অবজ্ঞেয়—'

'অবজ্ঞেয়। থেকে থেকে তুই তো ভারী গোলমেলে এক একটা কথা বলছিস নিখিল। অবজ্ঞাটা আসছে কোথা থেকে?'

'কেন ওঁদের কালচার থেকে।'

নিখিল হঠাৎ তক্তপোষ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে বলে, 'ওই উচ্চ কালচারসম্পন্ন মহিলাটি আর তাঁর পনেরো বছরের মেয়েটি অহরহই আমায় বলছেন 'বোকার মতো কথা বোলো না।' আমার গাঁইয়ামি আর বোকামীর জন্যেই না কি সমাজের যে স্তরে ওঁদের পৌঁছবার কথা, সে স্তরে উঠতে পারেননি। ---সেই আক্ষেপে মরে ছিলেন, আর ভেবেছিলেন হেস্ত-নেস্ত করে ছাড়বেন।

জিগ্যেস করেছিলাম, 'সেই সমাজটা কাদের?'

উত্তরে হাসির ছুরিতে আমায় ফালাফালা করে বলেছিল, 'তা বটে। আমার আসল সমাজ যে তোমার ওই বদ্যিবাটির গুষ্ঠির তোমার ওই রানাঘাটের মাসীর, শিবপুরের পিসির, সে কথাটা মনে ছিল না। কিন্তু কী করবো বল, আমার ক্ষমতা নেই তোমার ওই বদ্যিবাটির গুষ্ঠির সঙ্গে সামজবদ্ধ হয়ে সম্পর্ক বজায় রাখবার।'---এই কথা-গুলো আমায় শুনে যেতে হবে। দিনের পর দিন। কারণ? কারণ আমি শালা মুখে রক্ত উঠিয়ে রুপোর রথ কিনে চড়িয়ে ওকে সেই ওঁর স্বর্গ অর্থ কাম মোক্ষ সমাজটির দরজায় পৌঁছে দিয়েছি।'

নিখিলের কথাগুলো উপভোগ্য, ওর বন্ধুরাও করছিল উপভোগ, কিন্তু যখনি স্মরণে আনছিল বৌকে জব্দ করবার জন্যে নিখিল সাড়ে তিন হাজারি চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে তখনই উপভোগের রস ফিকে হয়ে আসছিল।

নিখিল ওদের একটা বলভরসা, নিখিল ওদের তরুণ সঙ্ঘের গৌরব। ভেবেছিল রজত-জয়ন্তীর ছুতোয় নিখিলের হৃদয়ে কিছু প্রেরণা জাগিয়ে দিয়ে ক্লাবের ঘরটাকে সংস্কার করিয়ে নেবে, সে গুড়ে বালি পড়লো।

অথচ দুর্ভাগ্য নয়, স্রেফ দুর্মতি।

বরুণ শীল চড়া গলায় বলে, সেই রুপোর রথে তুমি নিজেও চড়েছো।'

'চড়িনি, টেনেছি!' উদাস উদাস স্বরে বললো নিখিল, 'ছপ্‌টি খেয়ে টেনে নিয়ে গেছি।---এদিক ওদিক তাকাবার সুযোগ পাইনি। আমার মা যখন লিখেছেন, 'অনেকদিন তোমায় দেখিনি, আমি তখন প্লেনে চড়ে সস্ত্রীক কাশ্মীরে বেড়াতে চলে গেছি। যেদিন খবর পেয়েছি আমার বোনের রুগ্ন মেয়েটা মারা গেছে, সেদিন আমার বাড়িতে রাজকীয় পার্টি বসিয়েছি—।

এই মুহূর্তে নিখিল আর সাড়ে তিন হাজারি নয়, নিখিল এখন বেকারের খাতায় নাম লিখিয়েছে। তাই রেগে যাওয়া বন্ধু বিনা কুন্ঠায় বলে, 'তা তুমি যদি এতে স্ত্রৈণ হও, হবেই তো এসব।'

নিখিল রাগে না, নিখিল গম্ভীর হাসি হেসে বলে, 'লোকে তাই বলেছে বটে, আমার স্ত্রীও সেই অহঙ্কারেই বোধহয় 'রথের দড়ি নাকে পরিয়ে চড়ে বসেছিল। কিন্তু

ভাই-রে, যারা একটু শান্তিপ্রিয়, তারাই জানে কতোখানি দাম দিয়ে ওই শান্তিটা কিনতে হয়।'

'কিন্তু এখন? এখন কী হলো?'

নিখিল এতোক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল, আবার বসে পড়ে হাঁটু নাচাতে নাচাতে বলে, 'এখন হঠাৎ টের পেয়ে গেলাম 'শান্তি' ভেবে যেটাকে অনেক দাম দিয়ে কিনছিলাম, সেটা স্রেফ্ একটা বিষ গাছের চারা। তাকেই বাড়াচ্ছিলাম বসে বসে। টের পেয়ে আর ঠকি? নাক থেকে দড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে দিলাম রথখানা সুদ্ধু উল্টে। নে এখন কিসে চড়ে অহঙ্কার করবি কর।---তবু শেষ ডিসিশান নিয়েছিলাম কেন জানিস? দেখতে পাচ্ছিলাম চোখের সামনে মেয়েটা সুদ্ধু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রাতদিন আমায় নিয়ে হি-হি করছে, আমি গাঁইয়া, আমি ভূত, আমি সভ্য সমাজে অচল। আমি মেয়ে বড় হলে তাকে আগলাবার কথা ভাবি। অবাক হয়ে ভাবি ভাই, একবার খেয়ালে আনে না—এই আনকালচার্ড লোকটার ক্যাপাসিটির বৃক্ষেই তোদের কালচারের ফুল ফুটছে। তোদের কালচার কি আমাদের মা-ঠাকুমার কালচারের মতো নিজস্ব? তোদের তো পয়সা দিয়ে কেনা কালচার। আমার যতো রোজগার বাড়বে, তোদের ততো কালচার বাড়বে।---খেয়াল করে না। খুব বুদ্ধিধারী তো? তাই গাছের যে ডালে বসেছে, সেই ডালেরই গোড়ায় কোপ্ দিয়েছে।---ভোগ এখন তার ফল। যা কতোদিন বাপের বাড়ি থাকতে পারিস থাকগে যা। আমার বাড়িতে আসতে চাইলেই স্রেফ্ বদ্যিবাটি দেখিয়ে দেবো। বাপ তো ওই বদ্যিবাটি দেখেই বিয়ে দিয়েছিল!'

কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য।

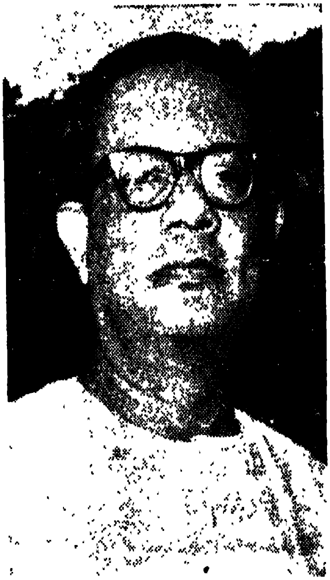
তবু নিখিলের দিকে ভোট পড়ে না।

কটকটে বরুণ শীলই শুধু নয়, সকলেই বলে ওঠে 'যতোই যা বলো ভাই, আমরা কিন্তু বলবো, এ তোমার হলো সেই নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ।'

'হয়তো তাই—' হঠাৎ আচমকা একটা জোর হাসি হেসে নিখিল বলে ওঠে, 'তবু যাত্রাভঙ্গটা তো হলো! প্রায় দুর্যোধনের উরুভঙ্গের মতোই হলো। একদিনে তেলা মুখ একেবারে ঝোলা। দেখুক এখন—'নিরুপায়ের পার্ট' প্লে করতে কেমন লাগে। সাধের সংসারটি আর সেই ওনার সোনার সমাজটি ত্যাগ করে চলে আসবার সময় যা একখানি চেহারা হয়েছিল। উঃ! ওতেই আমার সব দাম উসুল হয়ে গেছে।'

'দুর! দুর! তোর কোনো যুক্তিই কাজের নয়। বৌকে জব্দ করতে তোর জীবনটা তুই ভেঙে ছত্রখান করে ফেললি।'

নিখিল গম্ভীর একটু হেসে শান্ত গলায় বলে, 'সবাই ওই কথাই বলছে বটে। এমন কি আমার নিজের মাও। কিন্তু ভেবে ভেবে তো ঠিক করতে পারছি না তোদের কথাই সত্যি কিনা। ভেবেই মরছি ওই জীবনটা কী 'আমার ছিল!'



বিমল মিত্র

জন্ম : ১৯১২ সালের ১৮ মার্চ। এই কলকাতাতেই। এক সময় ছিলেন রেল-এর কর্মী, পরে কিছুদিন সেনট্রাল ব্যুরো অব্ ইনস্পেকশনে দায়িত্বশীল পদে। ১৯৫২ থেকে কেবলমাত্র লেখা। এক সময়কার জমিদার, ধনিকশ্রেণী তাঁর রচনায় বিশেষ এক তাৎপর্য পেয়েছে। বিপুলভাবে জনপ্রিয় তাঁর বিশালকায় উপন্যাসগুলি বহু-পঠিত। মঞ্চেও গৃহীত হয়েছে তাঁর রচনার নাট্যরূপ। 'একক দশক শতক', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'আসামী হাজির', 'বেগম মেরী বিশ্বাস' কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ বলব জানি না। মহাভারতোপম এই উপন্যাসগুলির সবগুলোতেই এক-একটা যুগকে পাওয়া যায়। দারুণ কিছু গল্পও লিখেছেন। 'রাণী সাহেবা', 'জেনানা সংবাদ', 'পুতুল দিদি' ইত্যাদি তার মধ্যে মাত্র কয়েকটা। বহু ভাষায় অনূদিত, বহুলভাবে গৃহীত এই লেখক ১৯৬২-তে পেয়েছেন যুগান্তরের মতিলাল পুরস্কার, ১৯৬৪-তে রবীন্দ্রপুরস্কার।

'আমেরিকা' গল্পটি আমার লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প এ কথা বলবো না।
তবে পাঠক-পাঠিকাদের মতামতেরও একটা মূল্য আছে। বিভিন্ন পাঠক-পাঠিকা
বিভিন্ন রসের রসিক। রসের বিচারে কেউ রহস্য-রোমাঞ্চ চায়
আবার কেউ বা আদিরসকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। কিন্তু আমার মতে যে গল্পে
সমাজ-বিজ্ঞানের শিল্পকর্ম বিশেষভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে সাহিত্যে তার মূল্যই
সর্বাধিক। 'আমেরিকা' গল্পে তা বিকশিত হয়ে উঠেছে বলে আমি মনে করি।
গল্পটি যে নিছক কল্পনা-প্রসূত তা নয়। সমাজের অবক্ষয় যে কত নিচে
নামতে পারে তারই উদাহরণ হিসেবে তা এ লেখায় ধরা পড়েছে। এবং প্রত্যক্ষ
অভিজ্ঞতাজনিত বলেই এ কাহিনীটি আমার নিজের কাছে
আরো প্রিয়। সব দিক বিচার করে এই গল্প-সংকলন গ্রন্থের জন্য
আমার 'আমেরিকা' গল্পটিকেই আমি মনোনীত করলাম।

বিমল মিত্র
২রা জুলাই, ১৯৭৮

আমেরিকা

মিস্টার রিচার্ড বললেন—গল্পটা গোড়া থেকে বলবো, না শেষ থেকে বলবো? কলকাতা থেকে বম্বে যাবার পথেই মিস্টার রিচার্ডের সঙ্গে আলাপ। মাত্র চার ঘণ্টার আলাপ। দমদম থেকে উড়তে শুরু করেছিলুম সন্ধ্যে ছ'টার সময়। ভাইকাউন্ট-এর ভেতরে মিস্টার রিচার্ডের সিট নাম্বার ছিল থ্রি-সি আর আমার থ্রি-ডি। একেবারে পাশা-পাশি। মিস্টার রিচার্ডের বোধ হয় গল্প করবার মেজাজ ছিল তখন। তিনিই প্রথম আরম্ভ করেছিলেন।

বলেছিলেন—আর ইউ এ ভেজিটারিয়ান? আপনি কি নিরামিষভোজী?

আমি নিরামিষভোজী কি না, তা নিয়ে মিস্টার রিচার্ডের মাথা ঘামানোর কথা নয়। বুঝেছিলাম তিনি গল্প করতে চান পাশের লোকের সঙ্গে। তার পর আস্তে আস্তে অনেক কথা উঠলো। ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে। তেরো বছরে কী কী উন্নতি অবনতি হয়েছে, কী কী হয় নি, তারই ছেঁদো কথা সব। এ-সব বিদেশীদের মুখ-রোচক আলোচনা। এই প্রথম ইণ্ডিয়ায় এসেছেন মিস্টার রিচার্ড। গৌতম বুদ্ধের দেশ, লর্ড চৈতন্যের দেশ, সোয়ামী ভিভেকানন্দের দেশ, ল্যাণ্ড অব টেম্পলস্। দি গ্রেট ইণ্ডিয়া। ওদিকে ক্যাশমিয়ার আর এদিকে কুম্যারিকা, দি হিমালয়াস্ আর দি গ্যাঞ্জেস। বেনারসের সাধু, মথুরার পাণ্ডা, বৃন্দাবনের ভিখারী, দিল্লীর টাঙ্গাওয়ালাজ, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ। সব দেখা শেষ করে এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে উঠেছিলেন। এখন ফিরে যাচ্ছেন নিজের দেশে, আমেরিকায়।

কলকাতার নাম শুনেই একটু কৌতূহল হলো।

জিজ্ঞেস করলাম—কলকাতা কেমন লাগল আপনার?

মিস্টার রিচার্ড আমার দিকে পাশ ফিরলেন। বললেন—বলবো?

বললাম—বলুন না—

মিস্টার রিচার্ড বললেন—গল্পটা গোড়া থেকে বলবো, না শেষ থেকে বলবো?

বললাম—তার মানে?

মিস্টার রিচার্ড বললেন—মাত্র এক দিন ছিলাম কলকাতার হোটেলে, এক দিনের অভিজ্ঞতায় কোনও দেশ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, কিন্তু প্রথম দিনেই একটা ঘটনা ঘটেছিল—সেই ঘটনাটা বললেই আপনি একটা স্টোরি পেয়ে যাবেন—কারণ শেষটা আমার আর দেখা হয় নি—

বললাম—তা হলে গোড়া থেকেই বলুন—

মিস্টার রিচার্ড বললেন—ঘটনাটা ঘটলো প্রথম নাইটেই। প্লেন এসে পৌঁছেছিল বিকেল চারটের সময়। এরোড্রোম থেকে সোজা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। বিরাট হোটেল, আগে থেকেই আমার রিজার্ভ করা ছিল রুম। স্টিউয়ার্ড, বয়, বাবুর্চি, ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার, বোর্ডার সবাইকে দেখলাম—দেখলাম সবাই খুব কেয়ার নিলে আমার—আমি কী খাই, আমি কী খেতে ভালবাসি, আমি হট্ না কোল্ড কী খাবার

পছন্দ করি, আমার কখন কী দরকার সব খবর তারা জিজ্ঞেস করে নিলে—। বিকেল বেলা বেড়াতে গেলাম সিটিতে। গেলাম হগ্ মার্কেটে, দুই একটা জিনিসপত্র কিনলাম—দেখলাম বেঙ্গলীজ আর ফানি পিপল্! ফরেনারদের তারা দেবতা মনে করে এখনও, এই ইণ্ডিপেনডেনসের তেরো বছর পরেও—

মিস্টার রিচার্ড এবার একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিলেন—

বললাম—তার পর?

মিস্টার রিচার্ড বলতে লাগলেন—চমৎকার লাগলো এই ক্যালকাটা আপনাদের—আগেকার সেই সেকেণ্ড সিটি ইন দি ব্রিটিশ এম্পায়ার! পশ্চিম দিকে অত বড় মাঠ, সিটির হার্টের মধ্যে এত বড় খোলা মাঠ কোথাও দেখি নি! গভরনর্স্ হাউসও দেখলাম! আপনাদের লেট্ মহাট্মা গান্ডি বলেছিলেন ইণ্ডিপেনডেনসের পরে ওটা মিউজিয়াম হবে! ভেবেছিলাম মিউজিয়ামটা দেখতে যাবো। আমার বেঙ্গলী গাইড বললে—তা নাকি হয় নি। তা না হয়েছে ভালই হয়েছে—এতদিন স্ট্রাগল্ করে এখন একটু আরাম করাই ন্যাচারাল, শুনলাম আগেকার সবই আছে, সেই গার্ড অব অনার, সেই আট ঘোড়ার বডিগার্ড, সেই এ-ডি-কং, ব্রিটিশ লিগেসির যা কিছু সব ইণ্ডিয়ানরা পুরো দমে ভোগ করছে—। বড় আনন্দ হলো দেখে—অবশ্য দেখলাম আপনারা ময়দান থেকে জেনারেল আউটরামের স্ট্যাচুটা সরিয়ে দিয়েছেন, দিয়ে সেখানে মহাট্মা গানডির স্ট্যাচু বসিয়ে দিয়েছেন—ভেরি গুড, ভেরি গুড—ভারি আনন্দ হলো ক্যালকাটা দেখে—! এতদিন মিস মেয়ো আর আলডাস্ হাক্সলির বইতে যা পড়েছি, দেখলাম সব মিথ্যে, সব প্রোপাগাণ্ডা—সব ভিলিফিকেশন—আমি সন্ধ্যে-বেলা টেরাসের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিটি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম—কবে একদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই সিটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, আজ এতদিন পরে কোথায় রইল সেই ব্রিটিশ জাত—আর কোথায় রইল সেই কুইন ভিক্টোরিয়া, যিনি একে ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে নিয়ে একে জাতে তুলে নিলেন। হিস্ট্রিতে পড়েছি সেদিন নাকি কুইন ভিক্টোরিয়াকে ইণ্ডিয়ানরা 'মা' বলে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম করে-ছিল—! আজ সেই কান্ট্রি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট হয়েছে—এটা ব্রিটেনেরও প্রাইড, ইণ্ডিয়ারও গ্লোরি—চমৎকার, বিউটিফুল—

—তার পর?

—তার পর ডিনারের পর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছি। শোবার আগে আমার বয় আমাকে কফি দিয়ে গেছে। গাইড-বুকটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কত রাত মনে নেই, দরজায় একটা নক্ পড়লো। মনে হলো কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে—! প্রথমে মনে হলো ভুল শুনছি! খানিক পরে আবার একটা নক্—

উঠে পড়লাম। দরজার ভেতর থেকে বললাম—কে? হুজ দ্যাট্?

খানিকক্ষণ চুপচাপ!

উত্তর না পেয়ে আমি দরজা খুললাম। দেখি আমার বয় হুকুমালী।

হুকুমালী মাথা নিচু করে সেলাম করতে লাগলো বার-বার। বিকেল থেকেই হুকুমালী আমার সেবা করছে। বড় ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। বুঝলাম ব্রিটিশ-আমলের ফরেনারদের সার্ভ করে করে হুকুমালী আদব-কায়দায় দুরস্ত হয়ে গেছে।

হুকুমালী বললে—হুজুর গোস্তাকি মাফি হয়—

—কী হুকুমালী? ক্যায়া মাঙতা?

হুকুমালী বললে—একজন সাহেব হুজুরের সঙ্গে মোলাকাত করতে চায়—

—কোন্ সাহেব?

এতক্ষণ দেখতে পাই নি। টেরাসের কোণে অন্ধকারে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। এতক্ষণে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমেরিকান হাওয়াই কোট আর ট্রাউজার পরা, ইয়ং ম্যান অব সে থারটি—বড় জোর তিরিশ বছর বয়েস হবে। গায়ের রং ব্ল্যাক ট্যান। হাতে একটা লেদার পোরটফোলিও ব্যাগ! কাছে এসেই বললে—গুড ইভনিং স্যার,—গুড ইভনিং—

বললাম—গুড ইভনিং! ইয়েস?

ইয়ং ম্যান বললে—ডু ইউ ওয়ান্ট আরটিস্ট স্যার? আপনি আরটিস্ট চান?

—আরটিস্ট!

আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। আরটিস্ট! কিসের আরটিস্ট! কিসের আরট! ছবি আঁকবার জন্যে? আমার ছবি আঁকবে! পোরট্রেইট! কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—আরটিস্ট?

ইয়ং ম্যান বললে—ভেরী গুড আরটিস্ট স্যার, ইয়ং অ্যাণ্ড বিউটিফুল—

—তার মানে?

ইয়ং ম্যান বললে—গার্লস স্যার—কলেজ গার্লস—এই স্যাম্পেল ছবি আছে আমার কাছে, এই দেখুন—

বলে পোরটফোলিও ব্যাগটা খুলে একগাদা ফোটোগ্রাফস্ বার করলে। একগাদা মেয়েদের ছবি। ইয়ং সুইট গার্লস। চমৎকার চেহারা, ওয়েল ড্রেসড্, প্রায় ডজন খানেক—

ছবিগুলো দেখিয়ে বলতে লাগলো—যাকে আপনার ইচ্ছে, পছন্দ করতে পারেন, যাকে ইচ্ছে! সবাই রেসপেকটেব্‌ল সোসাইটির গার্ল, এই দেখুন, এ হচ্ছে মিস লোলিটা, এর বয়েস নাইনটিন, এর বয়েস সেভেনটিন, আর এই যে দেখছেন বব্ করা চুল, এ হলো পাঞ্জাবী গার্ল—সব রকম আরটিস্ট পাবেন আমার কাছে, চাইনিজ, বার্গিজ, বেঙ্গলীজ, অল ভ্যারাইটিজ—

আমি চুপ করে আছি দেখে ইয়ং ম্যান আরো বলতে লাগলো—অন্য এজেন্টেরাও আপনার কাছে হয়তো আসবে, হয়তো অনেক রকম পিকচার দেখাবে, তবে জী জানেন, আমার কাছে আপনি কোনও ডিজঅনেস্টি পাবেন না—তা ছাড়া আমার স্টক-এর সঙ্গে অন্য এজেন্টদের স্টক-এর তুলনা করলে আপনি নিজেই তফাৎটা ধরতে পারবেন—আপনি ফরেনার, আপনাকে ঠকিয়ে অন্তত ইণ্ডিয়ার বদনাম করবো না আমি—

তার পর ছবিগুলো নাড়তে নাড়তে আবার বলতে লাগল—আপনি হয়তো আমার কথা শুনে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না, ভাবছেন আপনাকে বিদেশী পেয়ে হয়তো আমি এই রাত্তির বেলা ঠকিয়ে দেব, আসলে এ-লাইনে সবাই-ই ঠকায়, তবে আমি নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি এইটুকু যে, আমি ভদ্রলোকের ছেলে, আর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির একজন গ্র্যাজুয়েট—

বলে ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বার করলে। বার করে আমার হাতে এগিয়ে দিলে। দেখলাম—কার্ডটায় লেখা রয়েছে—A. C. Chakraverty, Artist Supplier.

হুকুমলাল তখনও দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। সে এবার সাহস পেয়ে কাছে এগিয়ে এল। বললে—হুজুর, এ-সাহেব বরাবর এই হোটেলের সাহেবদের সেবা করে আসছে, আজ পর্যন্ত ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা থেকে যত সাহেব এসেছে, সকলকে ইনিই টিস্ট সাপ্লাই করেছেন—

চক্রবর্তী বললে—এরা সব জানে স্যার, এদের সঙ্গে আমার বহুদিনের কারবার, আমার কাছে কোনও ফ্রড্ পাবেন না—বিশ্বাস করে একবার আমাকে টেস্ট করে দেখুন, তার পর কার্ড তো আপনার কাছে রইলই—

মনে মনে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম তখন। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট, ইয়ং হ্যাণ্ডসাম চেহারা, এ এ-প্রফেসনে এলো কেন? কত জায়গায় তো ঘুরেছি, কায়রো, বেইরুট, ইরান, পিকিং, ফার ইস্ট, মিডল ইস্টের সব শহর দেখেছি, রাত্রেও সেখানকার হোটেলে কাটিয়েছি। কিন্তু এমন ঘটনা তো কখনও ঘটে নি। একেবারে এই হোটেলের ভেতরে!

আমি চুপ করে আছি দেখে চক্রবর্তী যেন উৎসাহ পেয়ে গেল হঠাৎ।

বললে—রেট্ সম্বন্ধে আপনি ভাববেন না, আমার ফিক্সড্ রেট্ বটে কিন্তু কমপ্যারেটিভলি চীপ্—খুব সস্তা, ঘন্টা পিছু পঞ্চাশ টাকা, ফিক্সটি রুপীজ—

আমি হঠাৎ বললাম—হোটেলের ম্যানেজারের পারমিশন আছে?

আমার কথাটা শুনে ইয়ং ম্যান যেন চমকে উঠলো।

বললে—পারমিশন?

—হ্যাঁ, তুমি যে এই আরটিস্টের ব্যবসা করছো, হোটেলের ভেতরে ঢুকেছ, ম্যানেজার জানে এটা? ম্যানেজারের অনুমতি আছে?

চক্রবর্তী কি বলবে বুঝতে পারলে না। এবার একবার হুকুমালীর মুখের দিকে চাইল।

বললে—স্যার, এর জন্যে আর পারমিশনের কী দরকার?

—পারমিশন আছে কি না তাই বলো? আমার গলার আওয়াজে যেন পাজলড্ হয়ে গেল ছোকরা। একটু থতমত খেয়ে গেল। বুঝুন, কী তাজ্জব কাণ্ড আপনাদের হোটেলের ভেতর। টুরিস্টরা আসে ইণ্ডিয়া দেখতে, সবাই জানে তাদের হাতে অনেক টাকা থাকে। টুরিস্ট দেখলেই সবাই সব জিনিসের চড়া দর হাঁকে। সেটার তবু কারণ বুঝতে পারি। সব ইস্টার্ন দেশেই সেটা আছে। তাতে তেমন কিছু দোষ নেই। কিন্তু খাস ক্যালকাটার রেস্পেক্টেবল্ হোটেলের মধ্যে এ কী কাণ্ড বলুন তো। আবার বলছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট! আবার বলছে কলেজ-গার্ল, রেস্পেক্টেবল্ সোসাইটির গার্ল। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছে! এ-ও নিশ্চয়ই ব্লাফ। আমাকে টুরিস্ট পেয়ে ব্লাফ দিচ্ছে! রাস্তার ফুটপাতে এ-রকম ঘটনা ঘটে, তা স্বাভাবিক! কিন্তু একেবারে হোটেলের ভেতরে। তবে কি শেয়ার আছে সকলের! ম্যানেজার, বয়, বাবুর্চী সবাই জড়িত!

আবার বললাম—পারমিশন আছে কি না, বলো শিগগির? কুইক্—

এবার যেন ছোকরা ভয় পেয়ে একটু পেছিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

হুকুমালী এতক্ষণ কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে টপ্ করে কোন্ দিকে উধাও হয়ে গেল।

ছোকরাও পালিয়ে যায় দেখে আমি খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলেছি।

বললাম—চলো, ম্যানেজারের কাছে চলো, চলো, শিগগির—

আমার মূর্তি দেখে ছোকরা ভয়ে শুকিয়ে গেল। মনে হলো যেন কেঁদে ফেলবে।

বললে—আমাকে ছাড়ুন স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন স্যার, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি স্যার—

—নো, নেভার!

বলে ছোকরার হাতটা আরো জোরে চেপে ধরলাম। আমার জোরের সঙ্গে পারবে কেন? আমার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ছটফট করতে লাগলো সে।

বললাম—তোমাকে আমি পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করে দেব, চলো—

ছোকরা বলতে লাগলো—ছাড়ুন স্যার, প্লিজ, আমি আর কোনও দিন আপনার কাছে আসবো না—কথা দিচ্ছি স্যার—

সেই রাত্রের অন্ধকারের মধ্যেও যেন তার মুখটা করুণ হয়ে উঠলো বড়। বড় প্যাথেটিক সে চেহারা। বড় অসহায়। বুঝলাম এ-ও এদের একরকম ছল্। আমার কাছে এমনি কথা দিয়ে পরের রাত্রে আবার কোনও টুরিস্টের ঘরে গিয়ে নক্ করবে। আবার তাকে জিজ্ঞেস করবে—ডু ইউ ওয়ান্ট আরটিস্ট স্যার? আবার পোর্টফোলিও থেকে ছবি বার করে স্যাম্পেল দেখাবে। এ-রকম ঘটনা আমাদের আমেরিকায় চলে। সেখানে এর চেয়েও বীভৎস কাণ্ড হয়। কিন্তু এখানে, এই ইণ্ডিয়ায়? এ যে আমাদের কাছে ল্যাণ্ড অব লর্ড চৈতন্য, ল্যাণ্ড অব গৌটম বুডচ, ল্যাণ্ড অব মহাট্মা গান্ডি।

জিজ্ঞেস করলাম—কী করে ঢুকলে তুমি এই হোটেলে? এত রাত্রে?

ছোকরা সবিনয়ে স্বীকার করলে। বললে—হুকুমালীকে বখ্‌শিস্ দিয়ে—

—কত বখ্‌শিস্ দিয়েছ?

ছোকরা বললে—এক টাকা—

তার পর একটু থেমে বললে—আমায় আপনি ছেড়ে দিন প্লীজ, আমি কথা দিচ্ছি আর কখনও আসবো না—বিশ্বাস করুন, আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট, অভাবে পড়ে আমি এ-কাজ করেছি—আমার ছেলেমেয়েরা সব ক'দিন ধরে খেতে পাচ্ছে না, আমার ওয়াইফের টি বি—আমার - - -

বুঝলাম এ-সমস্ত ছল্। এ-সমস্ত বাঁধা বুলি। যখনই ধরা পড়ে যায়, তখনই এই সব বুলি আওড়ায়।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি যে গ্র্যাজুয়েট, তোমার সারটিফিকেট আছে? তোমার ডিগ্রী আছে? আমাকে দেখাতে পারবে?

—হ্যাঁ স্যার, দেখাবো, আমি কালকে নিজে এসে আপনাকে দেখিয়ে যাবো!

ভাবলাম আমাকে বোকা পেয়েছে। কাল কি আবার ছোকরার পাত্তা পাওয়া যাবে!

বললাম—কাল দেখালে চলবে না, আজই দেখাতে হবে!

—আজ?

বললাম—হ্যাঁ, আজই—

ছোকরা বললে—কিন্তু এখন যে অনেক রাত, এত রাত্রে আমি কী করে দেখাবো আপনাকে স্যার? আমার কাছে তো নেই, সে আমার বাড়িতে আছে—

বললাম—আমি তোমার বাড়িতেই যাবো—চলো—

—আমার বাড়িতে যাবেন? এত রাত্তিরে?

বললাম—তুমি যে মিথ্যে কথা বলছো না তার প্রমাণ কী? আজ রাত্রেই তোমার বাড়িতে গিয়ে দেখে আসবো—চলো—

ছোকরা যেন কী ভাবলে খানিকক্ষণ। বললে—আপনি যাবেন?

বললাম—হ্যাঁ যাবো, ট্যাক্সি ভাড়া আমি দেব, তোমায় সেজন্যে ভাবতে হবে না। তোমার কথা যদি মিথ্যে হয় তো আমি তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দেব—বি কেয়ারফুল!

ছোকরা বললে—কিন্তু আমি তো আপনাকে আমার কার্ড দেখালাম,—

আমারও রাগ হয়ে যাচ্ছিল তখন। বললাম—কথা বলে সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই—আইদার তুমি আমাকে তোমার কথার প্রমাণ দাও, নয়তো তোমাকে আমি পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করে দেব—

—চলুন।

শেষে সত্যিই রাজি হয়ে গেল ছোকরা। বললে—আপনার কিন্তু অনেক রাত হয়ে যাবে, আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর—

তা হোক্, তবু আমার যেন কেমন জিদ চেপে গেল। মনে হলো যখন ইণ্ডিয়ায় এসেছি এখানকার আসল লাইফের সঙ্গে খাঁটি পরিচয় হয়ে যাক্। সমস্ত হোটেলের বোর্ডাররা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু নিচের লাউঞ্জ থেকে নাচ গানের শব্দ আসছে। ও-সব আমি অনেক দেখেছি। ইণ্ডিয়ায় এসে ওয়েস্টার্ন নাচ-গানের ওপর কোনও আকর্ষণ আমার তখন নেই, আমি আমেরিকান। এসেছি ইণ্ডিয়ায়—ইণ্ডিয়া দেখবার জন্যে তখন ব্যস্ত। দেখবো লর্ড চৈতন্যের দেশকে, দেখবো লর্ড বুড্ডের দেশকে, দেখবো ফ্রি ইণ্ডিয়াকে।

তখনও চক্রবর্তীর হাতটা ধরে আছি।

হাতটা থরথর করে কাঁপছে তখনও। কী পাতলা হাত। মনে হলো একটা মোচড় দিয়ে যেন হাতটা ভেঙে ফেলা যায়। যেন ভাল করে পেট ভরে খেতেও পায় না। তবু মনে হলো যদি পালিয়ে যায়। যদি পুলিশের ভয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে যায়। তখন কি আর কোথাও খুঁজে পাবো আমি একে।

দারোয়ান ট্যাক্সি ডেকে দিলে।

ট্যাক্সিতে চড়ে চক্রবর্তীকে বললাম—কোন্ দিকে যেতে হবে ওকে বলে দাও—

চক্রবর্তীর মুখ দিয়ে যেন কোনও কথা বেরোচ্ছে না তখনও। ট্যাক্সিওয়ালা চক্রবর্তীর চেনা মনে হলো। সে জানে কোথায় যেতে হবে। বহুদিন বহু টুরিস্টকে নিয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন পাড়ায়। ভেবেছে আমিও তেমনি একজন টুরিস্ট। আমিও যথা-নির্দিষ্ট জায়গায় যাবো, তার পর যথারীতি ঘণ্টা দু-এক সেখানে কাটিয়ে চলে আসবো। চক্রবর্তীকে তার কমিশন দেব। ট্যাক্সিওয়ালাকেও মোটা বখ্‌শিশ দেব। যা সবাই দিয়ে থাকে। যা নিয়ম আর কি! তাই ট্যাক্সিওয়ালাও লম্বা স্যালিউট করেছিল আমাকে।

এ-সব আমার জানা ছিল। তাই চক্রবর্তীকে বললাম—তুমি ওকে ডেস্টিনেশন বলে দাও চক্রবর্তী—

চক্রবর্তী ড্রাইভারকে জায়গার নাম বলে দিলে। ট্যাক্সি হু হু করে চলতে লাগলো।

চক্রবর্তী হঠাৎ কথা বললে।

বললে—স্যার, আপনার কিন্তু কষ্ট হবে খুব—

বললাম—কেন, কষ্ট হবে কেন?

—সে অনেক দূর।

বললাম—কতদূর?

চক্রবর্তী বললে—সে টালিগঞ্জ বলে একটা জায়গা—

টালিগঞ্জ! আমার গাইড-বুকটা খুললাম। আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। নামটা কোথাও পেলাম না। তাতে বোটানিক্যাল গার্ডেনস্, ভিকটোরিয়া

মেমোরিয়্যাল, লেকস্, জুগার্ডেন, গানুচি-ঘাট, মু্যাজিয়াম—সব নাম আছে, কিন্তু টালিগঞ্জের নাম তো নেই।

বললাম—টালিগঞ্জ কি কলকাতার বাইরে?

চক্রবর্তী বললে—না স্যার, কলকাতার মধ্যে—

—কলকাতার মধ্যে তো গাইড-বুক-এ নাম নেই কেন?

চক্রবর্তী বললে—সেখানে যে টুরিস্টরা কেউ যায় না স্যার! টুরিস্টদের দেখবার মতন জায়গা নয় যে সেটা—

তা হবে! হয়তো সুবার্ব! শহরের ব্যাক্ওয়ার্ড এরিয়া। টুরিস্টদের সেসব জায়গা না-দেখানোই ভালো।

খানিক পরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি এত প্রফেশন থাকতে এ-প্রফেশন নিলে কেন?

চক্রবর্তী বললে—আমি চাকরি করতাম স্যার আগে, গভর্নমেন্ট অফিসে চাকরি করতাম, দেড় শো টাকা মাইনে পেতাম—তার পর আমার চাকরি গেল—

—কেন?

চক্রবর্তী বললে—একবার অফিসে স্ট্রাইক হলো, আমিও ধর্মঘট করেছিলাম, আমার টেম্পোরারী চাকরি ছিল, আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে। বললে আমি নাকি ডিস্টারবিং এলিমেন্ট। বললে—আমি নাকি কমিউনিস্ট—

চক্রবর্তীর মুখের দিকে চাইলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কমিউনিস্ট নাকি?

—না স্যার, আমি কমিউনিস্ট নই স্যার, আমি শপথ করে বলছি আপনাকে, আমি কমিউনিস্ট নই। আপ্অন্ গড্ বলছি। আমার ওপর রাগ ছিল আমার অফিসারের। আমি দেখতাম আমাদের অফিসাররা অফিসের স্টেশন-ওয়াগান্ নিয়ে পিক্নিক্ করতে যায়, অফিসের চাপরাশিদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাটনা বাটায়, জল তোলায়, রান্না করায়—তবু আমি কোনও দিন কিছু বলি নি! আমি জানতাম আমাদের ক্লার্ক হতেই জন্ম হয়েছে, আর বড়লোকের ছেলেদের, মিনিস্টারদের রিলেটিভদের অফিসার হবার জন্যে জন্ম! তা-ও আমি কিছু বলি নি। তবু আমি কিছু বলি নি। কারণ আমার তো টেম্পোরারি চাকরি, আমার বিধবা বুড়ী মা আছে সংসারে—ওআইফ্ আছে, দুটো মাইনর ছেলেমেয়ে আছে—আমার ও-সব কথা বলা তো ক্রাইম—

—তবু তোমার চাকরি গেল!

—হ্যাঁ স্যার, বিশ্বাস করুন, আমি সাত বছর চাকরি করার পরও টেম্পোরারী ছিলাম, তখনও আমার কনফার্মেশন হয় নি, তাই আমার চাকরি গেল। চাকরিও গেল, আর পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছিলাম স্ট্রাইক-ফাণ্ডে, তা-ও গেল—

বুঝলাম সমস্তই ছলনা! সমস্তই মিথ্যে কথা! সাত বছর চাকরি করার পর কেউ টেম্পোরারী থাকতে পারে? আর শুধু স্ট্রাইক করার অপরাধেও কারোর চাকরি খতম হতে পারে না। পাঁচ টাকা স্ট্রাইক-ফাণ্ডে চাঁদা দিলেও খতম হতে পারে না। তোমরা আমাদের আমেরিকাকে যত বড় ক্যাপিট্যালিস্টদের দেশই বলো, সেখানেও স্ট্রাইক করার জন্যে, ধর্মঘট করার জন্যে চাকরি যায় না। আমি মনে মনে বুঝলাম ছোকরা আমাকে ব্লাফ দিচ্ছে।

তবু মুখে কিছু বললাম না। জিজ্ঞেস করলাম—তার পর?

—তার পর স্যার অনেক দরখাস্ত করলাম অনেক জায়গায়। কোথাও চাকরি

পেলাম না। আর কতদিন না-খেয়ে থাকবো! কতদিন ধার করে চালাবো। ধারও কেউ দেয় না আর। বন্ধু-বান্ধবদের তো সকলেরই প্রায় আমার মত অবস্থা! শেষে আমার ওআইফ-এর সিরীয়াস অসুখ হলো। একদিন উপায় না দেখে ডাক্তার ডাকলাম। তখন রোগের খুব বাড়াবাড়ি। ডাক্তার দেখে বললেন—টি বি—

আবার ব্লাফ! বুঝলাম ছোকরা ফরেন টুরিস্ট পেয়ে আমার সহানুভূতি আদায় করবার চেষ্টা করছে! আমি এদের চিনি।

—তার পর?

—তার পর এই এজেন্সিটা পেলাম।

বললাম—এজেন্সি মানে?

চক্রবর্তী বললে—হাফ পার্সেন্ট আমি পাই কিনা। টোট্যাল ইনক্যামের ওপর আমি পাই হাফ পার্সেন্ট, বাকিটা জমা দিতে হয় অফিসে গিয়ে—

—তোমার অফিস আছে?

—হ্যাঁ স্যার, আমি তো মাত্র কমিশন এজেন্ট। মোটা প্রফিট্ তাদেরই—

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় তোমার অফিস? তারা কারা?

চক্রবর্তী হঠাৎ খুব বিনীত গলায় বললে—তাঁদের আমি নাম বলতে পারবো না স্যার, এক্সকিউজ্ মি—

—কেন?

—না স্যার, আমাকে মাফ করবেন, তাদের নাম-ঠিকানা আমি কিছুতেই বলতে পারবো না। আমাকে কেটে ফেললেও না। তাঁরা আমার বিপদের দিনে কাজ দিয়ে সাহায্য করেছেন, অনেক উপকার করছেন, নইলে এতদিনে আমি পথে বসতাম, তাঁদের নাম আমাকে বলতে বলবেন না স্যার, আমার অধর্ম হবে তা হলে—তাছাড়া আপনি তো চলে যাবেন, তার পর আমাকে কে বাঁচাবে?

ট্যাক্সি চলছিল হু হু করে। কোথায় চলেছি, কোন্ দিকে চলেছি কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। আমার গাইডবুকে এ-দিককার কোনও নির্দেশ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—আর কতদূর?

—আর বেশি দূর নয় স্যার, এসে গেছি—এবার বাঁয়ে চলো সর্দারজী।

তার পর একটু থেমে বললে—বাড়ি তো যাচ্ছি কিন্তু গিয়ে যে কি দেখবো বুঝতে পারছি না স্যার—

—কেন?

চক্রবর্তী বললে—সেই সকাল সাতটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি স্যার, দেখেছিলাম আমার ওআইফের তখন খুব জ্বর, আজ মা বলেছিল ডাক্তার ডেকে আনতে, বেরোবার সময় বলেছিলাম ডাক্তার ডেকে আনবো—তা সকাল থেকে যেখানে গেছি, সেখানেই শুধু হাতে ফিরে এসেছি। ভোর বেলায় মিস্টার আগরওয়ালার কাছে গিয়েছিলাম। গিয়ে বললাম—খুব ভাল আর্টিস্ট আছে, একবার দেখুন শুধ—তা কিছুতেই শুনলেন না। তিনি বললেন, তাঁর অন্য এনগেজমেন্ট আছে—

অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলো চক্রবর্তী। ক্যালকাটার সব বড় বড় লোক, বড় বড় মিলওনারস্, বড় বড় মার্চেন্টস্। সকলে চক্রবর্তীর ক্লায়েন্ট। সকলের কাছে গিয়েই হাজির হলো। সেই একই কথা, এক প্রস্তাব। ভাগ্য যেদিন খারাপ হয়, সেদিন ওই রকমই হয়। চক্রবর্তীর মনে হলো টাকার যেদিন তার সবচেয়ে বেশি দরকার সেইদিনই ভাগ্য যেন তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সবচেয়ে বেশি। শেষকালে

সারা ক্যালকাটা ঘুরেছে চক্রবর্তী, কোথাও কিছু কাজ মেলে নি। সব জায়গা থেকেই খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাকে। ভোর বেলা বেরিয়েছে, তার পর সারা দিন আর খাওয়া হলো না। সারা দিনটাই উপোস করে কেটে গেল চক্রবর্তীর।

চক্রবর্তী বললে---অথচ টাকা না হলে আমার চলবে না, শেষে হতাশ হয়ে যখন বাড়ি ফিরবো কি না ভাবছি, হঠাৎ মনে হলো আপনার হোটেলের ভেতরে গিয়ে একবার খবর নিয়ে দেখি কেউ ফরেন টুরিস্ট আছে কিনা। হুকুমালী বললে---আজ বিকেলেই একজন আমেরিকান টুরিস্ট এসেছে। তাকে একটা টাকার লোভ দেখিয়ে শেষে আপনার---

বললাম---ডোন্ট ট্রাই টু ব্লাফ মি, আমাকে ধাপ্পা দিতে চেষ্টা কোর না---আমি তোমাকে এখনও সাবধান করে দিচ্ছি---তোমার কান্না শুনে আমি ভুলবো না, আমি আমেরিকান---

চক্রবর্তী বললে---কেঁদে আপনাকে ভোলাতে চেষ্টা করছি না স্যার, কান্না শুনলে আজকাল ইণ্ডিয়ানরাও ভোলে না স্যার, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না, জেলে যেতে আমার একটুও আপত্তি নেই, কিন্তু আমি জেলে গেলে যে মা, বউ, ছেলেমেয়ে সব মারা যাবে স্যার---বিলিভ মি, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি---

বলতে বলতে চক্রবর্তী হঠাৎ ড্রাইভারকে বললে---থামো---

ট্যাক্সিটা থেমে গেল।

চক্রবর্তী বললে---নেমে আসুন স্যার, এখানটায় বড় কাদা, গাড়ি ভেতরে যাবে না, আর মিনিট পাঁচেক হাঁটতে হবে---

সে এক অদ্ভুত জায়গা। ক্যালকাটা সিটির মধ্যে যে অমন জায়গা আছে, তা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না, না দেখলে। চৌরঙ্গীর হোটেলের টেরাসে বসে সে জায়গার স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব।

চক্রবর্তী বললে---আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি নিজে সারটিফিকেটটা এনে দেখাচ্ছি---

কথাটা শুনে আমি চক্রবর্তীর কোটটা চেপে ধরলাম। আমার মনে হলো ছোকরা এবার সত্যিই পালিয়ে যাবার মতলব করছে। বললাম---নো নো আই ডোণ্ট বিলিভ ইউ---আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, আমি যাবো তোমার সঙ্গে---

---তা হলে আসুন---

বলে চক্রবর্তী আমার আগে আগে চলতে লাগলো। আর আমি তার পেছনে। অন্ধকার রাত। দু-একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো আমাদের দেখে। কয়েকটা গরু রাস্তায় ওপরে বসে বসে জাবর কাটছে। রিস্টওয়াচটার দিকে চেয়ে মনে হলো রাত বোধ হয় তখন দেড়টা---মিড-নাইট---

হঠাৎ চক্রবর্তী পিছন ফিরলে।

বললে---একটা কথা কিন্তু রাখতে হবে স্যার---

আবার ব্লাফ। আবার ধাপ্পা। ভাবলাম এই মিডল ক্লাস বেঙ্গলীজ আর ভেরি স্লাই---এদের মতন ধড়িবাজ জাত আর দুনিয়ায় দুটি নেই। কিন্তু আমিও অ্যাডামান্ট, আমিও নাছোড়বান্দা। ভাবলাম যা থাকে কপালে, আমি এর শেষ দেখবোই---

বললাম---কী কথা?

---দেখুন বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মাঁকে বলেছিলুম যে, আমি আফিস থেকে

আসবার সময় ডাক্তার নিয়ে আসবো। আমি আপনাকে দেখিয়ে বলবো—এই ডাক্তার এনেছি—

বাঙালীদের ধড়িবাজির কাছে হার মানবো না, এই প্রতিজ্ঞা করেই বললাম—ঠিক আছে চলো—

—আর একটা কথা!

চক্রবর্তী আবার থমকে দাঁড়াল।

বললে—আর একটা কথা, আপনি যেন বলে দেবেন না যে, আমি আরটিস্ট সাপ্লাই-এর কমিশন-এজেন্সি করি!

—কেন, তারা কেউ জানে না?

—না স্যার, কেউ জানে না! আমার মা জানে না, ওয়াইফ জানে না, ছেলে-মেয়েরা জানে না। এমন কি পাড়ার লোকেরাও জানে না—তারা জানে আমি ইন-সিওরেন্সের এজেন্সি করি—

বললাম—ঠিক আছে, তোমার কথাই রইলো—

আমি তখন যে-কোন অবস্থার জন্যেই তৈরি হয়ে রয়েছি। সুতরাং আমি আপত্তি করবো কেন?

চক্রবর্তী একটি বাড়ির সামনে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলো।—মা, মা—ওমা—

ভেতর থেকে একটি ফিমেল্-ভয়েস্ শোনা গেল।

—কে? খোকা? খোকা এলি?

আমি বাঙলা জানি না, তবু আন্দাজ করতে পারলাম।

দরজা খুলতেই দেখি একজন বুড়ী হাতে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখেই যেন বিব্রত হয়ে গেল। বুঝলাম—চক্রবর্তীর মাদার।

মা বললে—হাঁ রে, এত রাত্তির করতে হয়? আমি এদিকে ভেবে-ভেবে অস্থির, বৌমা ছটফট করছে—এই এখন একটু ঘুমলো—

চক্রবর্তী বললে—অফিসের কাজে একটু দেরি হয়ে গেল মা—

বলে চক্রবর্তী ভেতরে ঢুকলো। আমার দিকে চেয়ে বললে—আসুন স্যার—

তার পর মা'র দিকে চেয়ে বললে—এই ডাক্তারবাবুকে একেবারে ডেকে নিয়ে এলাম মা—

চক্রবর্তীর মা আমার দিকে চেয়ে দেখলে এবার ভালো করে। তার পর বললে—হ্যাঁ রে খোকা, তুই সাহেব ডাক্তার আবার নিয়ে এলি কেন, আমাদের পাড়ার ফণি ডাক্তারকে ডাকলেই হতো—হোমিও-প্যাথিতেও তো রোগ ভাল হচ্ছে আজকাল—

—তা হোক মা—

বলে আমাকে চক্রবর্তী ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। আমি ঘরের ভেতরের চেহারাটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ঘরের মেঝের ওপর ছোট্ট ছোট্ট দুটো বেবি শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। খালি গা, কম্প্লিটলি নেকেড। বুকের পাঁজরাগুলো গোনা যায়। আর তক্তপোশের ওপর বিছানায় ওয়াইফ শুয়ে আছে। চোখ দুটো আধ বোজা। বেশি বয়েস নয়—কিন্তু সমস্ত মুখখানা যেন রক্তহীন—ব্লাডলেস। কী প্যাথেটিক সিন। পৃথিবীতে এ-রকম দৃশ্য যে থাকতে পারে, তা আমেরিকানরা ভাবতেও পারে না—কল্পনা করতেও পারে না। একটা ঘরের মধ্যেই সমস্ত। সমস্ত সংসারটা যেন সেই একখানা ঘরের মধ্যেই শেষ। যেন নিশ্বাস, হাওয়া, প্রাণ, আনন্দ, যন্ত্রণা সব একটা ঘরের দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

চক্রবর্তী হঠাৎ বললে—মা ট্রাঙ্কের চাবিটা দাও তো—

মা চাবিটা দিয়ে বললে—ট্রাঙ্কের চাবিটা আবার কি করবি এখন?

—একটা জিনিস বার করবো।

বিছানার এক কোণে ওপর-ওপর ট্রাঙ্ক সাজানো ছিল দুটো। চক্রবর্তী বিছানার ওপরে উঠে চাবি দিয়ে ট্রাঙ্ক খুললে। তার পর ভেতর থেকে সব জিনিসপত্র বার করতে লাগলো একে একে। নানা বাজে জিনিসের স্তূপ। অনেক খুঁজে অনেক চেষ্টা করে বললে—এই যে পেয়েছি স্যার—পেয়েছি—

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বি-এ ডিগ্রীখানা গোল করে একটা কাগজে সযত্নে মোড়া ছিল। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলে চক্রবর্তী।

আমি সেটা হাতে নিয়ে কিন্তু আর খুলে দেখলাম না। আর খুলে দেখতে প্রবৃত্তিও হলো না। আমি যেন তখন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি। আমায় যেন কেউ আফিম খাইয়েছে! আমার যেন সেখানে থেকে আর নড়বার ক্ষমতাও নেই। অস্থি-চর্মসার একটা শরীর। প্রাণ তাতে আছে কি নেই বোঝা যায় না! শরীরটা কুঁচকে বেঁকে শুয়ে আছে। মনে হলো ও যেন চক্রবর্তীর ওয়াইফ নয়। ও যেন একজন টি-বি পেসেণ্ট নয়। একটা উদ্ধত নোট-অব-ইন্‌টারোগেশন! বিংশ শতাব্দীর মডার্ন সভ্যতার সামনে যেন একটা সুতীক্ষ্ণ নোট-অব-ইন্‌টারোগেশন ছাড়া কিছু নয়।

চক্রবর্তী আমার কাছে সরে এল এবার।

বললে—ওটা খুলে দেখুন স্যার—দেখবেন জেনুইন ডিগ্রী—ভাইস চান্সেলারের সই আছে নিচেয়—

আমি তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম ঘরের মধ্যে।

চক্রবর্তী চুপি চুপি বললে—আপনি একটা কিছু কথা বলুন স্যার, নইলে আমার মা'র সন্দেহ হবে।

হঠাৎ একটা বেবি কেঁদে উঠলো। চক্রবর্তীর মা গিয়ে কোলে নিয়ে ভুলোতে আরম্ভ করেছে। ততক্ষণে তার কান্না শুনে আর একটা কাঁদতে শুরু করলো। সেই কান্নায় যেন সমস্ত পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো সেই রাত দেড়টার সময়। ভুলে গেলাম আমি আমেরিকান। ভুলে গেলাম আমি টুরিস্ট, ভুলে গেলাম আমি ফরেনার। ভুলে গেলাম এ আমার প্রোগ্রামের বাইরে। ভুলে গেলাম আমার গাইড-বুকে এ জায়গায় নির্দেশ-সূত্র নেই। তবু সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম।

—স্যার!

চক্রবর্তীর গলার আওয়াজে আমি যেন আবার আমার সেন্স ফিরে পেলাম।

বললাম—এসো বাইরে এসো—

চক্রবর্তী বাইরে এল আমার পেছন-পেছন।

বললাম—তোমার ওআইফকে হসপিট্যালে পাঠাও না কেন? এ রোগীকে কি বাড়িতে রাখতে আছে! এক ঘরে ছেলেমেয়ে মা সবাই থাকা এটাও তো ডেঞ্জারাস—

চক্রবর্তী বললে—হসপিট্যালে আমার কারো সঙ্গে জানা-শোনা নেই স্যার—কোনও মিনিস্টার যদি একটু লিখে দেন, তাহলেই হয়ে যায় কিংবা কোনও এম-এল-এ—

আমি আর কী বলবো। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম—প্রায় সাত শো টাকা রয়েছে। তাড়াতাড়ি টাকাগুলো চক্রবর্তীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—এই টাকাগুলো নাও চক্রবর্তী। চক্রবর্তী, কিপ ইট্, তোমার ওআইফের চিকিৎসা কোর—

টাকাটা চক্রবর্তীর হাতে জোর করে গুঁজে দিলাম।

চক্রবর্তী কিছুতেই নেবে না। বললে—আমি এ নিতে পারবো না স্যার, এ আপনি কী করছেন—

শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে তাকে টাকাটা দিয়ে আমি আবার ফিরে এলাম ট্যাক্সিটার কাছে। ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছিলাম।

চক্রবর্তী আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। আমি বললাম—আচ্ছা তোমার ওয়াইফ ছেলেমেয়েদের খেতে দাও না কেন?

চক্রবর্তী হাসলো এতক্ষণে। বললে—ফ্রান্সের রাণীও একবার ওই কথা বলেছিল স্যার, বইতে পড়েছি—

আমি বললাম—না, আমি সে-কথা বলছি না—আমেরিকা থেকে আমরা লক্ষ লক্ষ টন গম, চাল, পাউডার মিল্ক পাঠাই ইণ্ডিয়াতে—সে সব তো তোমাদের জন্যেই পাঠাই, তা তোমরা খাও না কেন?

চক্রবর্তী একটু চুপ করে রইল। তার পর বললে—খবরের কাগজে পড়েছি আপনারা পাঠান—

বুঝলাম ঠিক জায়গায় পৌঁছোয় না সেগুলো।

বললাম—ঠিক আছে, কাল ছ'টার সময় আমি চলে যাচ্ছি ক্যালকাটা ছেড়ে, তুমি তিনটের সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো? পজিটিভলি ঠিক বিকেল তিনটের সময়? ইউ মাস্ট!

চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলে—কেন, কি জন্যে বলছেন?

—আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে চাই, আরো কিছু টাকা। যা ছিল কাছে তা তোমাকে দিয়ে গেলাম, কালকে হোটেলে তোমাকে আরো তিন শো দিতে পারি! আই ওয়ান্ট টু হেল্প ইউ—

চক্রবর্তী কিন্তু-কিন্তু করছিল, কিন্তু আমি তাকে রাজি করালাম জোর করে।

ট্যাক্সির ভেতরে আর একবার মনে করিয়ে দিলাম—ঠিক তিনটের সময় এসো কিন্তু, আমি ওয়েট করবো তোমার জন্যে—ঠিক তিনটে—

ঘড়িতে দেখলাম—রাত তখন হাফ-পাস্ট্ টু। আড়াইটে কাঁটায়-কাঁটায়।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙতে দেরি হলো। সকালে আর কোথাও বেরোলুম না। হুকুমালী সামনে আসতে একটু সঙ্কোচ করছিল। কিন্তু খানিক পরে সে-সঙ্কোচ কেটে গেল। যে সব জায়গা দেখবো বলে ঠিক করেছিলাম সে সব কিছুই দেখা হলো না। হুগলী-রিভার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, বোটানিক্যাল গার্ডেনস, লেকস্, রেস কোর্স, গান্‌চি-ঘাট কোথাও গেলাম না। রাত্রে যে-বিউটিফুল ক্যালকাটা দেখেছি, তার কাছে আর সব যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। শুধু টেরাসের ওপর দাঁড়িয়ে গভর্নরস্ হাউসটা দেখতে লাগলাম একদৃষ্টে। আর সামনে ময়দান। ফোর্ট উইলিয়াম, পলাশী গেট—

যথারীতি ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ খেয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম ঘরের মধ্যে! আমার গাইড এসে ফিরে গেল।

বললাম—আমি নিজেই সাইট্-সীয়িং করে এসেছি—

হুকুমালীও দু-একবার উঁকি মেরে দেখে গেল।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—তিনটে বাজে। চক্রবর্তী আসবে। বাকি তিন শো টাকা রেডি করে রেখে দিয়েছি পকেটে।

আর যেন দেরি সয় না। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম তিনটে বেজে গেছে। তিনটে পনেরো। তিনটে কুড়ি। থ্রি-থারটি!

আমি উঠলাম। আর দেরি করা যায় না। এয়ার পোরটের বাস আসবে। প্লেন ছাড়বে ছ'টায়। তার আগেই তৈরি হয়ে নিতে হবে।

হঠাৎ হুকুমালী এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম—কে চিঠি দিলে?

হুকুমালী বললে একজন বাবু এসে নিচে ম্যানেজারের কাছে চিঠিটা দিয়ে গেছে। চিঠিটা সিল করা। খাম ছিঁড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। ভেতরে আমার দেওয়া সেই সাত শো টাকা। সাতটা একশ টাকার নোট! আর সঙ্গে একটা চিঠি। লিখেছে এ সি চক্রবর্তী—আরটিস্ট সাপ্লায়ার।

লিখেছে—

ডিয়ার সার,

কালকে আপনার দেওয়া সাতশো টাকা ফেরত পাঠালাম পত্রবাহক মারফৎ। আজকে তিনটের সময় আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতিও রাখতে পারলাম না। কারণ কাল শেষ রাত্রের দিকে আমার স্ত্রী মারা গেছে। আপনাকে ধন্যবাদ। ইতি—

এই। এইটুকু শুধু। আর কিছু নয়।

আমি চিঠিখানা আর টাকাগুলো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম! কিছু ভাবতে পারলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার যেন জ্ঞান ফিরে এল। হঠাৎ খেয়াল হলো সাড়ে চারটে বেজেছে। হোটেলের সামনে এয়ারপোরটের বাস এসে পেঁছেছে। হুকুমালী আমার স্যুটকেস নিয়ে নেমে চলে গেল।

বললাম—তার পর?

মিস্টার রিচার্ড বললেন—তার পর এই তো যাচ্ছি—।

তার পর হঠাৎ যেন বড় এক্‌সাইটেড হয়ে উঠলেন মিস্টার রিচার্ড।

বললেন—কিন্তু আমি আজ আপনাকে বলে রাখছি—দিস্ ইজ্ রং, দিস্ ইজ্ ক্রিমিন্যাল—এ অন্যায়, এ সততা পাপ—এ অনেস্টির কোনও দাম নেই মডার্ণ পৃথিবীতে—দিস্ ইজ্ রং—দিস্ ইজ্ ক্রিমিন্যালি রং—

মিস্টার রিচার্ডের চিৎকারে আশেপাশের অন্য সিট থেকে সবাই আমাদের দিকে চেয়ে দেখলে। কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম। ষোল হাজার ফুট ওপরে উঠে মাটির পৃথিবীর মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবাও যেন বিলাসিতা বলে মনে হলে আমার কাছে। এই দামী ডিনার আর লেমন-স্কোয়াশ খেতে খেতে দেশের কথা নিয়ে তর্ক করাও যেন অপরাধ। চোখের জল ফেলাও ক্রাইম! আমি চুপ করে রইলাম তাই।

অনেকক্ষণ পরে মিস্টার রিচার্ড আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা একটা কথার জবাব দিন তো?

—কী?

—আমরা যে লক্ষ লক্ষ টন হুইট, রাইস আর পাউডার মিল্ক পাঠাই ইণ্ডিয়ার গরীব লোকদের জন্যে, সেগুলো কারা নেয়? সেগুলো গরীবদের হাতে পেঁছয় না কেন? কে তারা? হু আর দে?

এরই বা আমি কি জবাব দেব। প্লেনের ভেতরে আমরা সবাই তো ফরসা দামী

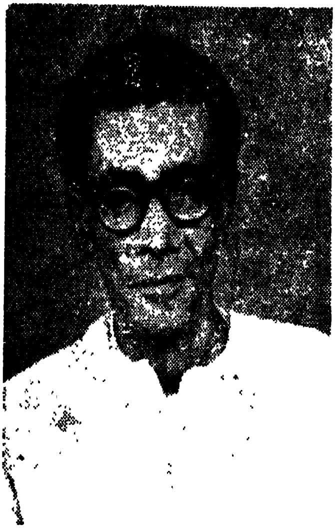
কোট-স্যুট-টাই-ট্রাউজার পরে বসে আছি। সবাই মোটা দাম দিয়ে টিকিট কিনেছি। কিনে লেমন-স্কোয়াশ খেয়েছি, উইস্কি খেয়েছি, ডিনার খেয়েছি। ডিনারের পর কফিও খেয়েছি। আমাদের কী অধিকার আছে এ-আলোচনা করবার। ভাবলাম বলি—সাহেব, তুমি একদিনের জন্যে কলকাতা দেখে গিয়েই তোমার এই অবস্থা, আর আমরা জন্ম কাটিয়েছি কলকাতায়, মনুষ্যত্বের এ অপমান আমরা প্রতি মুহূর্তে দেখছি। তাই আমাদের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে, আমাদের গায়ের চামড়া মোটা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ও-সব কথা থাক্, এসো অন্য কথা বলি—লেট আস্ টক্ শপ্—

কিন্তু সে-সব কথাও বললাম না।

সামনে আলো জ্বলে উঠলো—আলোর মধ্যে লেখা ফুটে উঠলো—ফ্যাসেন্ ইয়োর বেল্টস্—

আমরা যে-যার নিজের নিজের পেটে বেল্ট্ বেঁধে নিলাম।

বাইরে চেয়ে দেখলাম—বম্বে সিটির আলোগুলো হীরের টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। প্লেন নামতে শুরু করেছে। স্যান্টাক্রুজে পৌঁছে গেলাম এক-মুহূর্তের মধ্যে।



জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

জন্ম: ১৯১২ সাল। অধুনা-বাংলাদেশের তদানীন্তন কুমিল্লায়।
বহু দিন থেকে এই কলকাতায়। এক সময় চুটিয়ে করেছেন সাংবাদিকতা।
তারপর নির্জনবাসে দিন কাটান, প্রধানত লেখাতেই নিমগ্ন। খুবই
অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিছু দিন আগে। মেডিকেল কলেজের সিঁড়ি ভেঙে
উঠতে উঠতে সবাই আলোচনা করেছেন: এখন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কেমন আছেন।
এখন সুস্থ। ইনি সেই লেখক, যিনি 'বারো ঘর এক উঠোন' লিখে চমেকে
দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের। 'এই তার পুরস্কার'
উপন্যাসের রামানন্দ চরিত্রটিকে মনে পড়ে? কবিতা বিষয়ে দুরন্ত বাক্যাচার
আর আশ্চর্য জীবনযাপন? জ্যোতিরিন্দ্রের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে যেন অনেক
মিল আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। 'প্রেমের চেয়ে
বড়' 'রাবণ বধ' ইত্যাদি। অসামান্য সব গল্পের মধ্যে কয়েকটির নাম:
'শালিক কি চড়ুই', 'গিরগিটি', 'বুনো ওল' ইত্যাদি।
একটা আদিম, প্রাকৃতিক গন্ধ এই লেখকের লেখায় পাওয়া যায়। আনন্দ
পুরস্কার ছাড়াও লক্ষ পাঠকের অভিনন্দন
এই তাঁর পুরস্কার।

ছেলেবেলা থেকেই বনজংগল আমার মনকে বেশী টানে। শহরের একটা স্কাইস্ক্রেপারের দিকে তাকিয়ে আমি যতটা আনন্দ পাই—একটি সবুজ পল্লবিত বৃক্ষ তার চেয়ে আমাকে বেশী মুগ্ধ করে। একটা ট্রাম-গাড়ি দেখার চেয়ে একটা চড়ুই পাখি দেখে আমি বেশী আনন্দ পাই। হতে পারে বিশ-শতকের মানুষ হয়ে যতখানি যন্ত্র ও শিল্পপ্রীতি থাকা উচিত ছিল তা আমার হয়নি। এত শিল্প সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমারোহ নিয়েও নগরজীবনে আমি যেন কী একটা খুঁজে পাই না। এই মানসিক অভাববোধ থেকেই আমার 'বনের রাজা' গল্পের সৃষ্টি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
১০.৮.৭৮

বনের রাজা

'গাছ আমার সঙ্গে কথা বলে।'

'গাছের ডাল? পাতা?'

'ডাল পাতা ফুল কুঁড়ি ফল সব,—সবাই ফিসফিস্ করে আমার সঙ্গে কথা বলে।'

'আমার সঙ্গে বলবে?'

'হুঁ, বলবে না আবার!' নাতির হাত ধরে সারদা তাকে কাছে টেনে নেন। তার-পর ওর ছোট মাথাটা বাদাম গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়ে সারদা অল্প শব্দ করে হাসলেন: 'এই বেলা কানটা চেপে ধর, কথা শুনবি।'

মতি তাই করে। প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির দিকের মোটা বাকলে ঢাকা কাণ্ডের ওপর কান চেপে ধরে মতি স্থির হয়ে দাঁড়ায়। গ্রীষ্মের দুরন্ত এলোমেলো হাওয়া বইছে। সবুজ সতেজ বাদামপাতার সরসর শব্দ তুলে হাওয়া অন্যদিকে ছুটছে। মতির মাথার চুল নড়ছে, সারদার মাথায় টাক, চুল নেই, পাকা গোঁফটা হাওয়ায় একটু একটু কাঁপছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কাঁপছে সারদার ঠোঁট জোড়া। অবশ্য এটা হাওয়ার জন্য না, শব্দ না করে হাসিটা মুখের ভিতর গলার কাছে ধরে রাখছে বলে দাদুর ঠোঁট নড়ছে, দশ বছরের মতি টের পায়। এটা দাদুর দুষ্টামি। দাদুর বয়সের আর কোনো বুড়ো বা বুড়ী এমন দুষ্টামি করে কি না মতি মাঝে মাঝে চিন্তা করে।

'কি হল, শুনলি কিছু?'

'নাঃ।' মতি মুখ বেজার করে মাথা নাড়ল ও সঙ্গে সঙ্গে কানটা গাছ থেকে আলগা করে আনল। 'কিছুই শুনছি না।'

'ওয়াক থুঃ।' সারদা মুখ ঘুরিয়ে মাটির ঢিপির পাশের কচু জঙ্গলের ওপর থুথু ফেলেন। এবার আর হাসেন না। গোঁফের আড়ালে পুরু ঠোঁট জোড়া স্থির হয়ে আছে। অস্থির হাওয়ায় বাদাম গাছটা বেশি নড়ছে বলে হলদিবনা পাখিটা ডাল ছেড়ে অন্যদিকে উড়ে গেল। যেন হলদিবনার উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে সারদা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়েন। তারপর চোখ নামিয়ে নাতির মুখ দেখেন।

'কান নষ্ট হয়ে গেছে তোর,—শহরে থেকে থেকে এটি হয়েছে দাদু।'

'তাই কি?' দাদুর চোখের ধূসর বাদামী রঙের মণি দুটো দেখতে দেখতে কী যেন ভাবে ও, তারপর দুধ-সাদা দাঁতের সারি বার করে মতি হাসে, মাথা নাড়ে। 'কেন, আমাদের বীডন স্ট্রীটের বাসায় তো একটা পেয়ারা গাছ আছে,—রাস্তার ওপর কত বড় গোলমোহর ফুলের গাছ,—কৈ, সে দুটো গাছ তো কথা বলে না?'

'বীডন স্ট্রীটের গাছ!' গলার বিশ্রী শব্দ করে সারদা কথা বলেন, 'দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা গাড়ির ঘড়ঘড় ভেঁপু, রেডিওর চিৎকার শুনে সে-সব গাছের কিছু আছে নাকি। সব বোবা হয়ে গেছে, কথা বলবে কি, কোনোরকমে প্রাণটা টিঁকিয়ে রেখে ধুক্‌পুক্‌ করছে।' সারদা আর এক দলা থুথু ফেলেন। 'তোদের বীডন স্ট্রীটের পেয়ারা গোলমোহর গাছের পরমায়ু ক'দিন?'

মতি চুপ।

'এখানে গাছের কাছে গাছ ছাড়া আর আর, ঐ দ্যাখ্‌, এক-একটা গাছকে যেমন কিছুই নেই। গুঁড়ির কাছে কত ঘাস মাটি! আদর করে জড়িয়ে ধরেছে অপরাজিতা লতা, ঝুমকা লতা।'

মতি হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিকের গাছ, ঘন লতাঝোপ দেখে। সারদা আঙুল দিয়ে গাছের ডালপাতা দেখান।

'আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে ডালে ডালে রঙবেরঙের পাখিরা এসে উড়ে বসে, গান গায়, পাতার বোঁটায় ঠোঁট ঘষে, ফলে ঠোকর মারে, তাই না?'

দাদুর চোখের ধূসর বাদামী মণি দুটো উত্তেজনায় ঝিকিয়ে ওঠে। নাতি ঘাড় কাত করে অস্ফুট গলায় বলে, 'তাই।'

গোঁফের আড়ালে সারদার কালচে পুরু ঠোঁট দুটো হঠাৎ আবার বেঁকে যায়।

'আর তোদের বীডন স্ট্রীটের গাছের গুঁড়ির কাছে কি? পাথরের খোয়া, গরম পীচ, গাছকে জড়িয়ে থাকে ইলেক্‌ট্রিক তার, গাছের মাথা ডিঙিয়ে ওঠে চারতলা, দু'তলা দালান, কেমন?'

নাতি এবারও ঘাড় কাত করে অস্ফুট স্বরে দাদুর কথায় সায় দেয়। দিয়ে চুপ করে পায়ের নখ দিয়ে মাটির ঘাস খোঁটে।

'কাজেই শহরের গাছেরা কথা বলে না, পোড়া পেট্রলের ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে তাদের জিভ খসে পড়েছে, গাড়ির ঘড়ঘড় আর রেডিওর চেঁচামেচি শুনে শুনে তাদের কান ভোঁতা হয়ে গেছে।' কথা শেষ করে সারদা কচুজঙ্গলের গায়ে থুথু ছিটান।

'গাছের কান আছে দাদু?'

'আছে বৈকি। জিভ আছে, কান আছে। নাক আছে, চোখ আছে। দাদু গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়েন। 'আমাদের মতো ওরাও সব কিছু দেখতে পায়।'

কালো চক্‌চকে চোখ জোড়া বড় করে মতি এদিক-ওদিক দেখে। সারদা হাঁটেন। মতি হাঁটে। কচুজঙ্গল পিছনে রেখে দু'জন ঢালুজমিতে নামে। রাত্রে জোর বৃষ্টি হয়েছে। হাঁটুসমান জল দাঁড়িয়েছে সেখানে। দু'জন জলের ধারে গিয়েছে কি না গিয়েছে, জলে পা ডোবালো কি না ডোবালো যেন দু-তিনশ' ব্যাং লাফিয়ে ছিট্‌কে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জলে ঝাঁপ দিল। প্রথমটায় হঠাৎ ভয় পেলেও পরে মতি যেন খুব মজার জিনিস দেখল, দু' হাতে তালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল।

'তোর প্যান্টের পকেটে এক-আধ ডজন ঢুকিয়ে নে না।' গম্ভীর থেকে দাদু প্রস্তাব দেন। 'কেমন হলদে তেলতেলে চেহারা ওদের!'

'ধ্যেৎ কী হবে ব্যাং দিয়ে?' মতি নাক সিঁটকায়।

'খাবি ভেজে চচ্চড়ি করে?'

'ওয়াক থুঃ।' মতি থুথু ছিটায়। 'চীনারা ব্যাং খায়। আমরা খাব কেন?'

'হুঁ, তোমরা বরফচাপা পচা পচা মাছ খাবে। পচা বাসি মাছ খেয়েই তোর এমন হাড়গিলে চেহারা হয়েছে, বুকের সব ক'টা হাড় গোনা যায়।'

কথাটা সত্য। মতির শরীর খারাপ হয়ে গেছে। তাই না দাদুর চিঠি পেয়ে সামারের ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে এল। পাঁচ-সাত দিনেই শরীরটা ভাল বোধ করছে সে। পুকুরের টাটকা মাছ আর খাঁটি দুধ খেতে পারছে এখানে।

মাঠের জল পার হয়ে দু'জন তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যায়। একটা না, সাত-আটটা জাম গাছ। ডালপালা ছড়িয়ে জায়গাটা অন্ধকার করে রেখেছে। আর

থোকা থোকা কালো জাম ঝুলছে মাথার ওপর। যেন শ্রাবণ আকাশের অগুনতি ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ গাছের মাথায় এসে বাসা বেঁধেছে। মতি হাঁ করে তাকিয়ে দেখে। এক সঙ্গে এত পাকা জাম সে কোনোদিন দেখেনি। সব অবশ্য পাকেনি। কাঁচা কচি সবুজ রঙের,—আধপাকা লাল রঙের জামই বা গাছে কম কি। লাল সবুজ কালো। যেন এক-একটা গাছের ডালের মাথায় লাল সবুজ কালো পাথরের মালা ঝুলিয়ে রেখেছে কে?

'হাঁ করে দেখছিস কি?' দাদু ধমক লাগায়।

'দেখছি, ভারি সুন্দর লাগছে।'

'হুঁ!' সারদা হঠাৎ কি ভেবে হাসেন। 'সুন্দর লাগছে বলে গাছতলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ফলগুলো তোর মুখের ভিতরে লাফিয়ে এসে ঢুকবে, কেমন?'

'না, তা ঢুকবে কেন।' মতি মাথা নাড়ে।

'সুন্দর সুন্দর করেই তো তোরা মরলি।' সারদা কাধের গামছাটা কোমরে বেঁধে নেন।

মতির মতো তাঁর পরনেও হাফপ্যান্ট। খালি গা, খালি পা। বুড়ো হলে হবে কি, হাতের পায়ের মাংসের গোছার এখনও শক্ত পাথুরে চেহারা! দাদু গাঁয়ে থাকে বলেই শরীর এত ভাল। মতি ভাবে। অথচ তুলনায় মতির বাবা, হ্যাঁ এই সারদা রায়ের ছেলে সুকুমারবাবুর শরীর কেমন নরম ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। বাবার চেহারাটা মতির এখন মনে পড়ল। এখন বেলা এগারোটা। তার বাবা অফিসে চলে গেছেন। ডালহৌসী স্কোয়ারের একটা প্রকাণ্ড লাল বাড়িতে বাবার অফিস। একদিন তাদের চাকরের সঙ্গে গিয়ে মতি বাবার অফিস দেখে এসেছে। মতি চিন্তা করল, যদি তার বাবা গ্রামে চলে আসেন দাদুর মতো তাঁরও শরীরটা ভাল হবে, ভাল থাকবে। এবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে বাবাকে তাই পরামর্শ দেবে কিনা মতি তা-ও চিন্তা করল। কিন্তু তার বাবা আসতে চাইলেও মা আসবে না। মতি জানে। এখানে তার আসা নিয়ে মা ভীষণ আপত্তি তুলেছিল। সাপ ব্যাং জঙ্গল জল কাদা ছাড়া কিছু নেই এখানে। গাঁয়ে কোনো ভদ্দরলোক বাস করতে পারে নাকি। তাছাড়া, কেবল চাষাভুষো নিয়ে কারবার। হয়তো ওদের ছেলেপুলেরাই মতির সঙ্গী হবে। একটা ভাল কথা শুনবে না, লেখাপড়ার চর্চা থাকবে না, দিনরাত মাঠে জঙ্গলে ঘুরে পাখির ছানা চুরি আর গরু-ছাগল ঠেঙানো শিখে আসবে মতি। অবশ্য মা আপত্তি করলেও দাদুর চিঠি পেয়ে বাবা তাকে একজন লোক দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। এখানে এসে মতির ভাল লাগছে। চাষাভুষো সাপ ব্যাং জঙ্গল কাদা ছাড়াও এখানে এমন অনেক কিছু আছে যেগুলি সত্যিই ভাল, সত্যিই সুন্দর। মতির ইচ্ছা, কেবল সামারের ছুটি না, সব সময়ের জন্য এখানে থেকে যায়। তার বাবা-মাও এখানে চলে আসুক।

এই আশ্বিনে উনষাট পেরিয়ে ষাটে পা দিচ্ছেন সারদা। গাছের উঁচু ডালে চড়ে তিনি তাঁর দশ বছরের শহুরে নাতিকে অবাক করে দিতে পেরেছেন কিনা চিন্তা করার আগে হাত বাড়িয়ে কালোজামের ছড়া ছিঁড়ে কোমরের গামছায় গোরেন। চার-পাঁচটা জাম মুখে ফেলেন। দশ-বারোটা জাম ছড়া থেকে আলগা হয়ে ছিটকে নিচে পড়ে। মতি মহানন্দে সেগুলি কুড়াতে লেগে যায়। পুরুষ্ট পাকা জামের মধুর টক টক রসে-মাসে সারদার মুখগহ্বর যখন ভরে ওঠে তখন তাঁর চোখের মণি দুটো একটি ছোট ছেলের চোখের মণির মতো চক্‌চকে হয়ে ওঠে, ঘোলাটে বাদামী রং মিলিয়ে গিয়ে পাকা জামের বীচির মতো লাল টুকটুকে হয়ে ওঠে।

'দেখতে সুন্দর। সুন্দর সুন্দর করে তোরা মরবি।' গাছের মগডালে উঠতে চেষ্টা করেন সারদা। 'যা দেখতে ভাল তা খেতেও ভাল। কিন্তু খাওয়া জিনিসটা তোরা ভুলে গেছিস।' মগডালে চড়ে সারদা মনে মনে নাতির সঙ্গে কথা বলেন। তোদের বীডন স্ট্রীটের বাসায় সুন্দর সুন্দর সোফাসেট পর্দা, ফুলের টব আছে। রেডিও আছে, নিয়োন আলো আছে, ড্রেসিং টেবিল কাচের বাসন প্ল্যাস্টিকের খেলনা পুতুলে ঘর বোঝাই। তোর মা এ বেলার শাড়ি ও বেলা পরে না। সকালের সুন্দর শাড়ি ব্লাউজ ছেড়ে বিকেলে তার চেয়েও কোন্‌টা সুন্দর, কোন্‌টা বেশি মানাবে ভেবে দিশাহারা হয়। তোর বাবার সুন্দর টাই স্যুট জুতো গাড়ি কেতাদুরস্ত আর্দালি পিওন নিয়ে দিন কাটে। না, তোরা উপোস থাকিস বলব না। কাচ-ঘেরা বন্ধ অফিস-কামরার পাখার তলায় বসে সুকুমার পাউরুটি, টিনের মাখন, শিয়ালদার ঠাণ্ডাঘরে জিইয়ে রাখা দুটো আলু সিদ্ধ, মরিচগুঁড়ো, বাসি ডিম আর কিছু শুকনা আনাজ সিদ্ধ ও গুঁড়ো দুধ জমিয়ে তৈরি একটা বড় বরফি দিয়ে লাঞ্চ খায়। ব্যালান্সড্‌ ডায়েট? অস্বীকার করবে কে। রীতিমতো শহরের নামী ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সুকুমার অফিসে বসে খবর কাগজের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে প্রোটিন ফ্যাট্‌ কার্বোহাইড্রেট মিনারেল্‌স সহযোগে তার দুপুরের সুষম আহার সম্পন্ন করে। ঘরে সুকুমারের স্ত্রী ভেজাল তেল আর গুঁড়ো হলুদ লঙ্কায় রান্না করা মাছের ঝোল ও চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেয়ে উঠে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে চিন্তা করছে, শহরের কোন্‌ সিনেমা ঘরে ভাল ছবি এল, ম্যাটিনী শো দেখে আসা যাক। 'সিনেমা!' কথাটা মনে হতে সারদা মুখ বিকৃত করলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা ডবল সাইজের পাকা জাম মুখে পুরলেন। 'ফানুসের পরমায়ু নিয়ে তোরা শহরে বসে আছিস। কেবল বাইরের রংচং আর ঠাটঠমক। এদিকে ভেজাল খাদ্য আর বদ্ধ বাতাস যে তোদের আয়ুর বারোটা—'

নীচে থেকে মতি চেঁচাতে থাকে:

'দাদু অত উঁচোয় উঠছ কেন,—ডাল ভেঙে—?'

সারদা হাসেন। উঁচু ডালের ওপর বসে মাটির দিকে তাকান।

'ভাঙবার আগে ডাল জানান দেবে, মট্‌মট্‌ শব্দ হবে, তোদের বীডন স্ট্রীটের গাড়ি-ঘোড়া জানান না দিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে।'

মতি নীরব হয়ে যায়। এ গাছের শালিক বুলবুলির দল দাদুর তাড়া খেয়ে অন্য গাছে উড়ে গিয়ে জটলা করে, পাকা জামে ঠোকর লাগায়। কিন্তু বুড়ো দাদুই বা কম যায় কি! মতি চিন্তা করে। এই তো সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে চারটে পাকা আম দিয়ে এতবড় বাটির এক বাটি ক্ষীর মুড়ি খেয়ে এসেছে। এখন আবার গাছে উঠে প্রাণভরে পাকা জাম খাচ্ছে। শ দেড়শ এর মধ্যে খাওয়া হয়েছে ঠিক। মতি বেশি খেতে পারে না। 'পেট চিম্‌সি মেরে গেছে, শহুরে ছেলে, কী আর খাবি, কতটা খাবি!' সকালে দাদু তাকে ঠাট্টা করছিল। কেননা এত ভাল দুধ মেরে তার ঠাকুমা কাল রাত্তিরে ক্ষীর তৈরী করেছে, সেই ক্ষীর মতি কতটা খেতে পারল! ক্ষীরের গন্ধটা এখনও তার হাতে লেগে আছে। দুধের গন্ধ, ঘিয়ের গন্ধ, ক্ষীরের গন্ধ কী মতি এখানে এসে জানতে পারছে। 'খেতে খেতে খাওয়া বাড়বে'। দাদুর ঠাট্টা শুনে মতির ঠাকুমা বলছিল, 'খাওয়াটা অভ্যাসের কাছে,—কলকাতায় থাকতে তুমি কি আর বেশি খেতে পারতে,—এখন তো তোমার খাওয়া দেখে আমিই মাঝে মাঝে অবাক হই।' দাদু হাসছিল। 'অবাক হচ্ছ কি ভয় পাচ্ছ খাঁটি কথাটা বলে ফেল।' যেন দাদুর খোঁচা খেয়ে ঠাকুমা লজ্জা পেয়ে চুপ করে ছিল, কিন্তু দাদু চুপ ছিল না।

'হুঁ, ভুঁড়িটা বেজায় বড় হয়ে যাচ্ছে দেখে ভয় পাবারই কথা,—আয়ুর ফিতে লম্বা করতে হলে খাওয়াটা ঠিক রাখতে হবে বৈকি। নাকি ধরো ফিতেটা যদি ফটাস্ করে ছিঁড়ে যায়, থ্রম্বসিস, কি ঐরকম কিছুতে হুট্ করে মরে যাই তো তোমার সাহস বাড়বে?' শুনে ঠাকুমা রেগে গিয়ে বলেছিল: 'আহা, কথার কী ছিরি! কেন তোমার কি মরবার বয়স হয়েছে নাকি যে, এসব যা-তা বলছ?' আর কথা না বলে দাদু আম-ক্ষীর খাওয়ায় মনোযোগ দিয়েছে এবং ঠাকুমা আরো কিছুটা ক্ষীর দাদুর বাটিতে ঢেলে দিয়েছে। এক সঙ্গে দাদুর চোখ ও ঠাকুমার চোখ দেখে তখন মতি বুঝে ফেলেছে, খেতে পেয়ে বুড়ো যেমন খুশী, তেমনি খাইয়ে বুড়ী মহাখুশী।

আয়ুর ফিতা। কথাটা মনে পড়তে মতি তার বাবার কথা চিন্তা করল। না, তার বাবা মোটে খেতে পারে না। এই এতটুকুন ভাত, দু-তিনখানা লুচি কি এইটুকুন সুজি খাওয়ার পর দু'হাত তুলে বাবা মাকে আর কিছু দিতে নিষেধ করে। যেন আর একটা লুচি কি একমুঠো ভাত বেশি খেলে বাবার পেট ফেটে যাবে। এটা তো ভাল লক্ষণ না, মতি এখন দাদুকে দেখে, দাদুর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছে; তার বাবা হয়তো হুট্ করে একদিন—

'নে ধর্।'

মতি চমকে ওঠে। দাদু গাছ থেকে নেমে এসেছে। এই এত জাম কোমরের গামছায় বাঁধা। দরদর করে ঘামছেন সারদা। রোমশ ভুঁড়িটা ফলের রসে যেন আরো ফুলে উঠেছে।

'আমি আর খেতে পারছি না দাদু।' মতি ঘাড় নাড়ে।

'ঐ মাটিরটা কুড়িয়ে খেয়েই তোর পেট ভরে গেল! গাছেরটা খা, দুটো একটা খা।' হেসে সারদা এক খাবলা জাম নাতির হাতে তুলে দেন। মতি আর আপত্তি করে না, দুটো একটা জাম মুখে ফেলে দাদুর সঙ্গে হাঁটে।

'হুঁ, আমার জাম বাগান দেখলি, আম বাগান দেখলি,—এইবেলা তোকে জামরুল আর পেয়ারা বাগানটা দেখাব।'

মতি খুশী হয়ে পা চালায়। দাদুর আম বাগান কাল দেখা হয়ে গেছে, আজ জাম বাগান দেখল।

'সব গাছ তুমি লাগিয়েছ দাদু?'

সারদা থুথু ফেলেন। জামের রসে থুথুর রং গাঢ় নীল রং ধরেছে। 'জাম গাছ আগেই ছিল। এতগুলি জাম গাছ এক জায়গায় আছে দেখে তো এধারের জমিটাও কিনলাম।'

'আম,—সব আমের গাছ তোমার হাতের বলছিলে কাল।'

'হুঁ', সারদা আকাশের দিকে তাকান। 'আমি এসে একটাও আমগাছ পাইনি। হাজার টাকার আমের কলম কিনে আমাকে লাগাতে হয়েছিল। তাই না আজ অত বড় বাগান হয়েছে।'

'বেশ ভাল ভাল আম হয় তোমার বাগানে।'

'হিমসাগর আর মোহনভুলি ছাড়া কোনো আমের কলম লাগানো হয়নি, দাদু,—আমের বেলায় আমি বেজায় খুঁতখুঁতে। বাজে আম আমার দুচোখের বিষ।' সারদা আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে নাতির দিকে ঘাড় ফেরান। যেন ছেলেটা কি ভাবছে। ঘেমে মুখখানা লাল টুকটুকে হয়ে গেছে। দাদুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে মতি ফিক্ করে হাসল।

'হাসছিস যে।' সারদা ভুরু কুঁচকান। ভুরুতে একটা দুটো সাদা চুল এখনও রয়ে গেছে, বাকি চুল উঠে যাওয়ার দরুন কপালটা আগের চেয়ে চওড়া হয়েছে মনে হয়। কপালের দু-তিনটা গভীর রেখার খাঁজে খাঁজে ঘাম জমে রোদে চিকচিক করে। 'গত বছর পাঁচ শ টাকার সিঙ্গাপুরী কলা আর আনারসের চারা লাগিয়েছি।

'কলাবাগান দেখেছি,—আনারসের বাগান দেখা হয়নি।' মতি ঢোক গিলল।

'একে একে সবই দেখা হবে, এখানে এসে গেছিস যখন আনারস, পেয়ারা, কামরাঙা, জামরুল, সবেদা সব-কিছুর বাগান দেখতে পাবি।'

মতির চোখের তারা ঝিকিয়ে উঠল।

'সবেদা খেতে আমি খুব ভালবাসি।'

সারদা কথা বলেন না, হাঁটেন। মতি হাঁটে। একটা বড় দীঘির পাড় ঘুরে দু'জন আবার রাশি রাশি ডালপাতা ছড়ানো বিশাল ছায়ার জগতে এসে দাঁড়াল। মতি গুনে গুনে দেখল এক-এক সারিতে চারটে করে গাছ, তিন সারিতে একুনে বারোটা জামরুল গাছ। এক-একটা গাছে পাতার চেয়েও যেন ফল ফলেছে বেশি। ঘন, সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে নধর পুষ্ট দুধরং অসংখ্য জামরুল ঝুলে আছে। জামগাছের চেয়ে এখানে পাখির সংখ্যা বেশি। এখানে তারা বেশি চঞ্চল, বেশি কলমুখর। মতি বুঝতে পারল, টিয়া, বুলবুলি, শালিক, কাক কালো জামের চেয়ে দুধবরন জামরুল পছন্দ করে বেশি। আর কাঠবিড়াল। লেজ ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওরা এ-ডাল থেকে ও-ডালে ছুটে বেড়াচ্ছে।

'কেমন দেখছিস মতি?'

'ভারি সুন্দর,—মনে হয় গাছে গাছে তারা ফুটে আছে, রাতের আকাশে যেমন তারা ফোটে।'

'কাব্য!' সারদা মুখ বিকৃত করলেন, থুথু ফেললেন। তারপর হাত বাড়িয়ে ঝুলে পড়া একটা ডাল থেকে এক ছড়া জামরুল ছিঁড়ে নাতির হাতে তুলে দেন। 'খেয়ে দ্যাখ্, কেমন মিষ্টি রসালো ফল আমার গাছের।'

'খুব মিষ্টি।' মতি একটা ফলে কামড় বসায়। অবশ্য নাতির কথা শুনতে সারদা চুপ করে দাঁড়িয়ে নেই। হাত বাড়িয়ে আর এক ছড়া জামরুল পেড়ে টপাটপ্ মুখে ফেলেন, কচমচ করে চিবোন। ছোট ছেলের মতো জামরুলের রস ঠোঁটের কশ বেয়ে থুতনির আগায় এসে ঝুলতে থাকে সারদার। দেখে মতি মজা পায়। তার ষাট বছরের বুড়ো দাদু যে সত্যি একটি ছেলেমানুষ ছাড়া আর কিছু না, মতি এখানে এসে বুঝতে পারছে, দেখছে। একটা জামরুল সে খেয়ে শেষ করতে পারছে না। দাদু পাঁচটা সাবাড় করে দিচ্ছে। আয়ুর ফিতে লম্বা করছে দাদু। ভেবে মতি নিজের মনে হাসল।

'এইবেলা বুঝি আনারস ক্ষেত দেখতে যাব আমরা?'

'উহুঁ।' সারদা মাথা নেড়ে বলেন, 'আনারস ক্ষেতে যাবি কি, এখনো পাতার রং যায়নি, আর দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে তবে তো আনারস পাকতে আরম্ভ করবে। এখন সব কাঁচা রয়ে গেছে।'

কেবল ফলের বাগান দেখা না, দেখার সঙ্গে খাওয়ার একটা অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে, সারদা নাতিকে বার বার বোঝাতে চাইছেন। বুঝতে পেরে মতি আর আনারসের কথা তুলল না। কিন্তু কথা না বললেও ছেলেটা আবার কি ভেবে ভেবে মিটি-মিটি হাসে।'

'হাসছিস যে বড়ো?'

'আমার ইচ্ছা করে তোমার একটা নাম দিই দাদু।'

'কি নাম?' সারদা খুশীই হন। পিটপিট করে নাতির চকচকে চোখ দুটো দেখেন। 'বল্, বলে ফেল্।'

'ফলের রাজা।' মতি ফিক্ করে হাসল।

'হুঁ, তার চেয়ে বল্ গাছের রাজা, বাগানের রাজা।' সারদা হাতের শেষ জামরুলটা কচকচ করে চিবোন। 'ফল পিছে, গাছ আগে, বুঝলি।' কি ভেবে সারদা নিজের মনে হাসেন। 'তারপর গেল বার আমার একটাও আম খাওয়া হয়নি জানিস?'

মতি ফ্যালফ্যাল করে দাদুর মুখ দেখে।

'গেল বার ঝড়ে সব আমের বোল গুটি নষ্ট হয়ে যায়। এত বড় আমবাগানে একটা আম বড় হতে পারেনি, পাকেনি!'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, পাকা আম খাইনি তো খাইনি, তাই বলে কি আমি বাগানের গাছগুলির ওপর রাগ করেছিলাম, না গাছের যত্ন করিনি! বরং গত বছর আমি আমার নিষ্ফলা আম বাগানেই বেশি সময় কাটিয়েছি, ওদিকে জামের বাগানে জাম পেকে ঝরে ঝরে নিচে পড়েছে, ঘাসের ওপর হাঁটু-উঁচু কালো জাজিম তৈরী হয়েছে পাকা জামের, কিন্তু আমি একবার ওদিক মাড়াইনি। হুঁ, জামরুল পেকে পেকে সব ক'টা গাছ সাদা হয়ে গেছে, কাঠবিড়াল আর রাজ্যের পাখি পেট ভরে জামরুল খেয়েছে, আমি একবার এখানে চুঁপি দিতে আসিনি।'

'তবে তো তুমি ফলের চেয়ে গাছকেই বেশি ভালবাস।' মতি আমতা আমতা করে বলল।

'তবে?' সারদা নাক দিয়ে শব্দ বার করলেন। আমি আর ক'টা ফল মুখে দিই, নাকি একলা আমি খাব বলে এত এত গাছ লাগিয়েছি, বাগান করেছি। আমার গাছের ফল পাখিরা বেশি খায়, বাদুড় আর কাঠবিড়ালগুলি বেশি খায়, খাচ্ছে।'

'তাই দেখছি।' সারদার দশ বছরের শহুরে নাতি জামরুলের ডালে ডালে লেজমোটা কাঠবিড়ালগুলির ছুটোছুটি দেখতে দেখতে খুশী হয়ে ওঠে, উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বিডন স্ট্রীটের বাসায় সে তার গুল্তিটা ফেলে এসেছে। ওখানে কি আর কাঠবেড়াল আছে। কেবল ইলেকট্রিক তার, ট্রাম টেলিফোনের তার। তারের গায়ে গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মতি কাঠবিড়াল আর পাখি মারার সাধ মিটিয়েছে। তারের ঝন্ঝন্ শব্দটা এখনও তার কানে বাজছে। শহরের কথা মনে হতে সে দাদুর দিকে তাকায়।

'কিছু বলছিস্?'

মতি অল্প অল্প হাসে।

'তোমার একটা বড় গাড়ি ছিল, হল্দে রঙের গাড়ি?'

'হ্যাঁ', সারদা থুতনি নাড়েন। 'কার কাছে শুনলি?'

'মা বলছিল একদিন, গাড়িটা বেচে দিয়েছ?'

'বেচে দেব না তো সঙ্গে করে ওটা গাঁয়ে নিয়ে আসতাম নাকি।' সারদা থামেন, চারদিকে তাকান। 'ভাল রাস্তাঘাট নেই, এখানে আমি গাড়ি দিয়ে করতাম কি?'

তাও বটে। দাদুর মতো নাতিও ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক দেখে। মাঠ জঙ্গল ডোবা খানা আর এবড়ো-খেবড়ো মেঠো পথে দাদু কী করে গাড়ি চালাতো!

'বেচে দিয়ে ভাল করিনি?' সারদা নাতির চোখ দেখেন। মতি ঘাড় কাত করে।

সারদা হাসেন। 'না কি মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে আমি আম বাগানে জাম বাগানে এসে আম জাম খেতাম?'

'ধ্যেৎ!' ছবিটা মতিরও মনঃপূত হয় না। 'তাছাড়া, ঘাসের ওপর দেদার পাকা জাম জামরুল ছড়িয়ে থাকে। গাড়ি ছুটিয়ে এলে চাকার তলায় সব থেঁতলে যেত।'

সারদা শব্দ করে হাসেন।

'যা বলেছিস দাদু, তাছাড়া, একবার এখানে গাড়ির হর্ন শুনলে আমার গাছের সব পাখি কাঠবেড়াল ভয়ে ছুটে পালাতো। কেমন না?'

মতি ঘাড় কাত করল। কি একটু ভাবল। চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক দেখল। তারপর:

'আমার তো মনে হয় গাড়ির শব্দ শুনে ফড়িং প্রজাপতিগুলিও ভয়ে পালিয়ে যেত।'

'তাই, গাড়ি বাজে জিনিস। সাধে কি আর বেচে দিলাম।' সারদা নাতির ওপর সন্তুষ্ট হন।

'তবে কিনা—'

'আবার তবে কিনা কি!' সারদা রুখে ওঠেন। 'আর কি বলার আছে শুনি?'

ঘাড় গুঁজে মতি পায়ের নখ দিয়ে ঘাস খোঁটে। 'পায়ে যদি ধুলো না লাগল, নরম ঘাস না মাড়ালাম তো বেঁচে আছি বলে আমার মনে হয় না।' কথা শেষ করে সারদা গোড়ালি দুটো জোরে জোরে ঘাসের ওপর ঘষেন। তাই, মতি চিন্তা করল, দাদু সারাদিন খালি পায়ে থাকে, গাছের রাজা জুতো পরে না।

কিন্তু যে কথাটা তার জিভের ডগায় এসেছিল বলতে না পেরে মতি অস্বস্তি বোধ করে। দাদু হাঁটে, মতি হাঁটে। জামরুল বাগানের ঠাণ্ডা ছায়া মাথার ওপর থেকে সরে যায়। দুজন রৌদ্ররুক্ষ আকাশের নিচে চলে এল।

'বেজায় রোদ।' মতি আস্তে বলল।

'এটা জ্যৈষ্ঠ মাস।' চড়া গলায় দাদু বলল, 'শ্রেষ্ঠ ঋতুর শ্রেষ্ঠ মাস, রোদ তো চড়বেই; না হলে আম জাম কাঁঠাল কলা পাকবে কেন।'

'তাও বটে।' মতি বিড়বিড় করে দাদুর কথায় সায় দেয়, হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। তার কপালটা ঘামছিল বেশি।

'এক কাজ কর না।' সারদা নাতির দিকে ঘাড় ফেরান।

'কি?' মতি ঘাড় ফেরায়।

সারদা হাঁটা বন্ধ করে থমকে দাঁড়ান। মতি বুড়োর চোখ দেখে। বুড়োর চোখের বাদামী মণি দুটো রোদের তাপে লাল হতে শুরু করেছে কি?

'রোদটা তোর মাথায় বেশি লাগছে, কেমন?' সারদা অল্প হাসেন।

'হুঁ।'

'তা তো লাগছেই', সারদা আবার এক দলা থুথু ছিটান। মাঠের গরম বালি থুথুটাকে চোখের নিমেষে শুষে নিচ্ছে, যেন মতি তাই দেখতে আরম্ভ করেছিল। সারদা আঙুল দিয়ে মতির পরনের হাফপ্যান্ট দেখান। 'ওটা খুলে ফেল্—খুলে মাথায় জড়িয়ে নে, মাথাটা ঠাণ্ডা থাকবে।'

'ধ্যেৎ', মতি ফিক্ করে হাসল, 'তুমি যেন কী দাদু, মাঠের ওপর দিয়ে আমি লেংটা হয়ে হাঁটব নাকি!'

'আমি গরু, আমি ছাগল, আমি গাছের কাঠবিড়াল, জঙ্গলের শেয়াল' সারদা ভেংচি কেটে বড় একদলা থুথু ফেলেন। 'তোকে এখানে দেখছে কে, কতবড় একটা মানুষ

হয়ে গেছিস শুনি? লজ্জা করে!' একটু থেমে সারদা বললেন, 'এ তোমার বিডন স্ট্রীটের ছাদ দেয়াল ডিঙিয়ে আসা মরা হাজা রোদ্দুর না, এ হল গিয়ে মাঠ ফাটানো দীঘি শুকানো তেজী খাড়া রোদ; অভ্যাস নেই যখন তোমার মাথাটিও ফেটে চৌচির হতে পারে, তাই বলছিলাম দাদু—ওটা মাথায় জড়িয়ে নিতে।'

যেন দাদুকে খুশী করতে মতি পরনের প্যান্ট খুলে মাথায় জড়ায়। প্রথমটায় কেমন বাধো-বাধো ঠেকে তার, কানটা গালটা লাল হয়, তারপর অবশ্য মতি স্বাভাবিক হয়ে যায়; দাদুর সঙ্গে লম্বা পা ফেলে হাঁটে। সত্যি তো, কে আছে কে দেখছে তাকে এই রোদ্দুরে; কাক-শালিকটা পর্যন্ত ধারেকাছে নেই। 'বুঝলি', সারদা হাসেন, নাতির কাঁধে হাত রাখেন; নাতি তাঁর বাধ্য হয়েছে দেখে খুশী গলায় বলেন, 'আমি কিছু গ্রাহ্য করিনে। আম বাগানে কি জাম বাগানে থাকলে, যখন দেখি বেশি ঘাম দিচ্ছে শরীরে, গরম কমছে না, গায়ে কিছু থাকলে খুলে ফেলে স্রেফ লেংটা হয়ে ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ি।'

'খুব আরাম লাগে!'

'আলবত লাগতে হবে, হি হি।' ছোট ছেলের মতো শোনায় সারদার হাসি। 'নরম ঘাস তোমার শরীরকে আদর করছে, গাছের মিষ্টি ছায়া তোমার শরীর ঢেকে রাখছে, আরাম না লেগে পারে দাদু।'

'জামা কাপড় কিছু না।' যেন দাদুকে আর একটু খুশী করতে মতি বলল, 'আগে মানুষ যখন জঙ্গলে ছিল, বনে ছিল তখন তো শুনেছি ওরা জামা কাপড় চিনতই না।'

'তবে আর কি, জানিস তো সব!' সারদা আকাশের দিকে চোখ তোলেন। 'আগে মানুষ সুখে ছিল, এখন পোশাক-আশাক তার যন্ত্রণা বাড়িয়েছে।'

দাদুর মেজাজ ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে মতি কথাটা বলে ফেলল: 'মা বলে, এতবড় ইঞ্জিনীয়ার ছিল তোর দাদু, এখন একটা চাষাভুষো হয়ে গাঁয়ে আছে।'

'বলুক না, বলতে দে,—চাষা বলছে শুনলে আমি রাগ করিনে।'

'মা দুঃখ করছিল এলগিন রোডের এত বড় বাড়ি তুমি বেচে দিলে।'

'তোর মা তো দুঃখ করবেনই, তোর মা ইট কাঠ লোহা বালির স্বপ্ন দেখেন। আমার স্বপ্ন মাটি, আমার স্বপ্ন গাছ।'

'ঘাস ছায়া পাখি কাঠবিড়াল।' মতি যোগ করল।

'কাজেই শহরের বাড়ির বদলে এখানে আমি কী পেয়েছি তোর বাবা-মা জানবে না।' যেন বিরক্ত হয়ে সারদা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা শেষ করতে চাইলেন। 'শহরের পুরনো পচা আকাশের নিচে থেকে ওদের ইমারতের স্বপ্ন দেখতে দে, কল ইঞ্জিনের ধোঁয়া কালি গিলে গিলে আয়ুর ফিতা গুটিয়ে নিতে দে।' সারদা ভেংচি কাটার মতো চেহারা করে নাতির মুখ দেখেন।

'ওরা তোমার আগে মরে যাবে দাদু?' মতি প্রশ্ন না করে পারল না। 'আমার বাবা-মা?'

'সব, কলকাতা শহরটাই যে মরতে বসেছে।' দাদু নাকে হাসল। যেন মতি কি ভাবল, ভেবে প্রশ্ন করল, 'বাড়িগুলো? বাড়িগুলোর কী হবে, এত বড় বড় দালান?'

'ভেঙে পড়বে, ভেঙে মাটির সঙ্গে একদিন মিশে যাবে।'

'তারপর?'

'তারপর সেখানে ঘাস গজাবে, গাছ হবে। ফুল ফুটবে, ফল হবে।'

'খুব চমৎকার হয় তা হলে, না দাদু? কলকাতার এখানে-সেখানে পাখি ডাকছে, প্রজাপতি উড়ছে।'

'তাই তো হতে হবে, তা না হলে পৃথিবীর নিত্যনতুন চেহারা থাকবে না যে।'

কথা শুনতে শুনতে দাদুর সঙ্গে মতি একটা সুন্দর জায়গায় এসে পৌঁছল। এর আগে সে এদিকে আর একদিনও আসেনি। ভারি সুন্দর গোলমতন একটা প্রকাণ্ড পুকুর। আয়নার মতো ঝকঝক করছে জল। পুকুরের একদিকে শাপলা আর একদিকে পদ্মবন। থালার মতো সবুজ গোল পদ্মপাতাগুলো জলের ওপর চুপচাপ শুয়ে আছে। শাপলা-পাতাগুলো গোল না, অনেকটা পানের মতো দেখতে। টুকটুকে লাল দুটো শাপলা ফুল ফুটেছে। কাল আরো দু-চারটা ফুল ফুটবে, পরশু এক ডজন ফুটতে পারে, তার পরদিন আরো অনেক বেশি ফল ফুটবে। সবুজ ডাঁটার আগায় আগায় অসংখ্য কুঁড়ি কলি তৈরী হয়ে আছে। কলিগুলোর গা ছুঁয়ে এক ঝাঁক ফড়িং উড়ছে। 'পদ্মের কলি দেখছি না দাদু।' মতি বলছিল। দাদু হেসে উত্তর করল, 'এখন কি, বর্ষা পড়ুক—বর্ষার জলে কলি কুঁড়ি গজাবে আর শরৎকালে সব ফুটবে।' অবাক হয়ে মতি পদ্মবন দেখল আর চিন্তা করল কবে শরৎকাল আসবে আর রাশি রাশি পদ্ম ফুটবে। 'তুই কেবল জলের ওপরের ফুলের কথা ভাবছিস, আমার এই পুকুরের জলে কত বড় বড় মাছ আছে জানিস, তোর চেয়েও বড় এক-একটা রুই কাতলা এই পুকুরে আছে।'

ফুলের কথা ভুলে গিয়ে মতি জলের নিচের মাছের কথা চিন্তা করতে লাগল। বড় মাছ মানে অনেক দিনের পুরনো মাছ।

'পুরনো মাছ খেতে ভাল দাদু?'

হুট্ করে নাতির মুখে খাওয়ার কথা শুনে সারদা খুশী হল। 'ভাল না মানে?' সারদার চোখ দুটো ঝলসে উঠল। 'টাটকা হলে সব মাছই খেতে ভাল, নতুন পুরনো বুঝি নে।'

দাদু যে মাছের খুব ভক্ত মতি এখানে এসে জেনে গেছে।

তাও কি তাদের কলকাতার বাসার মতন একটুকরো-দেড়টুকরো মাছ দিয়ে ভাত খাওয়া! গাদাগাদা মাছ চাই সারদার। দুবেলা।

বাটি ভরে ভরে ঠাকুমা দাদুর পাতের সামনে মাছভাজা, মাছের ঝোল, মাছের চচ্চড়ি সাজিয়ে দেয়।

তাই বুঝি সারদা কাল দুপুরে খেতে বসে নাতিকে বলছিলেন। মাছ খাওয়ার জন্যে তিনটে দীঘি পুকুর কাটিয়েছেন তিনি। 'হুঁ, এমনভাবে মাছ খেতে হয় যেন কেবল হাতে-মুখে না, গা দিয়েও আঁষটে গন্ধ বেরোয়—তবে না মাছ খাওয়া।'

আর মতির তখন মনে পড়েছে, তার মাকে বাবাকে। হাতে একটু আঁষটে গন্ধ থাকবে বলে খেয়ে উঠে ভাল করে বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া। মা সাবান দিয়ে ধুয়ে পরে হাতে পাউডার মাখেন।

'বুঝলি, সর্দি-কাশির ধাত থাকলে তোদের কলকাতার ডাক্তাররা রুগীকে কডলিভার, ইমারসন, এ-ওষুধ সে-ওষুধ খেতে পরামর্শ দেয়। আমি খাই গরম গরম টাট্‌কা মাছের তেলভাজা। সর্দি-কাশি ধারেও ঘেঁষতে পারে না।'

সুতরাং এখন মাছের কথা উঠতে দাদুর চোখ চক্‌চকে হবে, জিভে জল গড়াবে স্বাভাবিক। জলের দিকে তাকিয়ে সারদা হাই তোলেন। বড্ড খিদে পেয়েছে রে নাতি, পেট চোঁ চোঁ করছে।'

মতি অবাক হবার ভান করল। হাসল।

'সকালে অনেক আম ক্ষীর খেয়েছ দাদু, তারপর এত এত জাম-জামরুল। এর মধ্যে তোমার—'

'আমারটা পেট না, পিপে, কিছুতে কি আর ভরতে চায়—তোর খিদে পায়নি?' সারদা ঘাড় ফেরাল।

মতি মাথা নাড়ল।

'একটুও না।'

'তোরটাও পেট না, হোমিওপ্যাথির শিশি।'

দাদুর কথা শুনে মতি শব্দ করে হাসল। সারদা এখন আর থুথু ফেলেন না, একটা বড় ঢোক গিললেন।

'সূর্যি এখন মাথার ওপর দেখছিস তো।' বলতে বলতে আকাশের দিকে তিনি চোখ রাখেন। 'আজ আমার উত্তরের পকুরে জেলেরা জাল ফেলেছে। এতক্ষণে বাড়িতে মাছ পেঁীছে গেছে জানা কথা। হুঁ, চেতল মাছ, বলে দিয়েছি। আমার তো মনে হয়, তোর ঠাকুমা এখন চেতলের পেটিগুলো দিয়ে কালিয়া রাঁধতে বসে গেছে।'

'তা হবে।' মতি খুক্‌ করে হেসে ফেলল। 'তাই তোমার পেট চোঁ চোঁ করছে।'

'তা হবে মানে?' সারদা রুখে ওঠেন। 'নির্ঘাত কালিয়া পাক করছে বুড়ী, আমি এখান থেকে গন্ধ পাচ্ছি।'

বুড়ো না, একটি শিশু। তেমনি লোভী, চঞ্চল। তা হতেই হবে, মতি চিন্তা করল। 'এই বয়সে আয়ুর ফিতে লম্বা করতে হলে এদিকের অনেকগুলি বছর কমিয়ে দিয়ে বাদুড়কে গাছের মগডালে উঠে জাম-জামরুল খেতে হবে, মাছের কালিয়ার নামে বেসামাল হয়ে পড়তে হবে।'

'তুমি তা হলে এখন বাড়ি ফিরছ দাদু?' নাতি শুধোয়।

'আলবত, ভাত খাব মনে পড়লে আমার অন্য কোথাও যেতে, আর কিছু করতে ইচ্ছা করে নাকি?'

'কিন্তু আনারসের বাগানটা দেখা হল না যে।' যেন দুষ্টুমি করে মতি বলল, 'ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে আর একটু বেড়াব, তোমার পেয়ারা বাগানটাও দেখব—'

'পেয়ারা এখন পাথরের গুটি হয়ে আছে, আষাঢ় মাস আসুক, দু-চারটা জলের ঝাপটা লাগুক, তবে তো পেয়ারা ডাঁসবে পাকবে, এখন বাদুড়েও পেয়ারা ছোঁয় না।'

কাজেই মতি নিবৃত্ত হয়।

জাম-জামরুল বাঁধা গামছাটা সারদা কোমর থেকে খুলে আলগা করে নেন। 'নে ধর—তোর ঠাকুমার জন্যে ক'টা তো নিয়ে যেতে হবে, আমি নিজের হাতে তুলে না দিলে একটা ফল বুড়ী মুখে দেবে নাকি?'

হাত বাড়িয়ে মতি ফলের পুঁটলিটা নেয়।

'ইচ্ছা হলে তুইও দুটো-একটা খা না, অনেক আছে হ্যাঁ, এই ছায়ায় বসে বসে খা।' সারদা কোমরের বেল্ট খুলতে ব্যস্ত।

তা অবশ্য ইচ্ছা হলে মতি একটা দুটো ফল মুখে দেবে। পুকুরপাড়ের এই ছায়াটাও চমৎকার। মাথার ওপর প্রকাণ্ড হরীতকী গাছ। পুকুরের চার পাড় ঘিরে ঘন বেত-জঙ্গল। কিন্তু তার দাদু এ কী করছে!

'দাদু তুমি কি—' মতির কথা আটকে গেল।

'হুঁ', একটানে সারদা বেল্ট খুলে ফেলেন, 'এখানেই একটা ডুব দিয়ে যাই, বাড়ি

গিয়ে আর চানটান হবে কি, গিয়েই খেতে বসে যাব, মাছের কালিয়া আর ভাত।' সারদা হাসলেন।

মতি অবাক হল কি, ভয় পেল কি! বুকের মধ্যে কেমন একটা ধাক্কা অনুভব করল সে। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

পরনের প্যান্ট ঘাসের ওপর রেখে দাদু পুকুরে নেমে গেল। না, যদি ওটা তাদের মানিকতলার মোড় কি শেয়ালদা হত; অনেক মানুষ, অনেক দোকান, গাড়ি ঘোড়া পুলিস ফেরিওয়ালা থাকত তো মতি মনে করতে পারত লোকটার মাথা খারাপ। এক-বার টালিগঞ্জ মাসির বাড়ি যেতে মতি ট্রাম থেকে এমন বুড়ো বয়সের একটা পাগলকে দেখেছিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। দেখে রাস্তার লোক হি-হি করে হাসছে।

কিন্তু এখন? এখানে?

মতি ঘাড় ফেরাল, একটা ঢোক গিলল, ভয়ে ভয়ে ঘাসের ওপর রাখা সারদার ছাড়া হাফ্‌প্যান্টটা দেখল, তারপর যেন একটু সাহস বাড়ল, চোখ তুলে সে পুকুরের জল দেখল। দাদু সাঁতার কাটছে। মতির সঙ্গে চোখাচোখি হতে সারদা হেসে ফেলে জলের নিচে মাথা ডুবিয়ে দেন। আর দেখা যায় না মানুষটাকে। এক দুই তিন--- যেন মনে মনে মতি গুনছে, দাদু কতক্ষণ জলের নিচে থাকতে পারে। দূরে জলের ধাক্কায় পদ্ম পাতাগুলি কাঁপছে, কলি কুঁড়ি নিয়ে শাপলার ডাঁটাগুলি নড়ছে। বুঝল মতি, দাদু ডবসাঁতার কেটে দূরে চলেছে। আর ঠিক তখন তার মাথার ওপর হাওয়া লেগে হরীতকী গাছের পাতার সরসর শব্দ হল, বেতজঙ্গলের কোন্ দিকে একটা ডাহুক ডাকে, কোথা থেকে একটা সাদা মেঘ উড়ে এসে আকাশের কিনারে ঝুলছে---একটা মাছরাঙা ক্রিক্ শব্দ করে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা রুপোর পাত ঠোঁটে করে আকাশে উড়ে যায়।

মতির খব ভাল লাগে। হাত বাড়িয়ে ঝুলি থেকে একটা কালো জাম তুলে সে মুখে পুরল। হুঁ, ঠাকুমার জন্যে দাদু জাম নিয়ে যাচ্ছে। বাবার কথা মনে পড়ল তার। মার কথা। কোনোদিন জাম-জামরুল না, আম আনারস না---অফিস থেকে বাবা যখন বাড়ি ফেরে, তার হাতে থাকে মার পাউডারের ডিবি, স্নো, ক্রিম। একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল মতি, তারপর উঠে দাঁড়াল।

মতির এখন খেয়াল হল, সে নিজেও লেংটা। সেই যে দাদুর কথায় প্যান্ট খুলে রোদ বাঁচাতে মাথায় দিয়েছিল, আর সেটা পরা হয়নি। কিন্তু তা হলেও মতির এখন একটুও ইচ্ছা করছিল না, ওটা পরে। কলেজ স্ট্রীট থেকে তার বাবা এটা কিনে দিয়েছিল। তা দিক। তার মনে হল, এটার আর দরকার নেই, বাজে জিনিস। ভীষণ ইচ্ছা করছিল তার এমনি এ অবস্থায় দাদুর মতো সে পুকুরের জলে নেমে যায়। ডুবসাঁতার কেটে শাপলা আর পদ্মবনের কাছে চলে যায়। কিন্তু ইচ্ছা হলে কী হবে, সে সাঁতার জানে না।

তা হলেও সে মন খারাপ করল না। কি একটা পাখি হরীতকীর ডালে এসে উড়ে বসে ভীষণ কিচিরমিচির শুরু করেছে। দাদুর মাথা একবার জলের ওপর ভেসে ওঠে, আবার ডুব দেয়। মতির মনে হয়, ডুব মেরে মেরে দাদু জলের নিচে পুরনো মাছগুলিকে দেখছে। মাছের ভক্ত, কে জানে একটা মাছ না হাত দিয়ে ধরে ফেলে ডাঙায় তুলে আনে।

ভেবে মতি নুয়ে হাত বাড়িয়ে ঠাকুমার জামের পুঁটলি থেকে আর একটা জাম তুলতে যাবে, চমকে উঠল।

হাসির শব্দ। তার পিছনে কে হাসছে। মতি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরায়। একটা মেয়ে। বেতঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে। হাতে একছড়া বেতফল। বেতফল খাচ্ছে আর মতির দিকে তাকিয়ে আছে। চকচক করছে চোখ দুটো। ছিপছিপে লম্বা গড়ন। এখানে এসে মতি কালো বাসক গাছ চিনেছে। রোগা লম্বা মেয়েটাকে দেখে তার সরু লিকলিকে বাসক ডাঁটার কথা মনে পড়ল। তেমনি কালো মিশমিশে গায়ের রং। হাসির ঠমকে নড়ছে, বাতাস লেগে বাসক ডাঁটা যেমন নড়ে, কাঁপে।

কিন্তু তার দিকে মেয়েটা এমন করে তাকাচ্ছে দেখে মতির দু-কান লাল হয়ে উঠল, গরম হয়ে উঠল। চালাক ছেলে, শহরের ছেলে। মেয়েটার এভাবে তাকানোর অর্থ বুঝতে মতির এক সেকেণ্ড দেরি হয় না—খপ্ করে সে ঘাসের ওপর থেকে হাফ-প্যান্টটা কুড়িয়ে নিয়ে পরে ফেলল। এই এক সেকেণ্ডেই সে বেজায় ঘামছে।

'কি চাই তোর, কি দেখছিস?' প্যান্ট পরে মতি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধমক লাগায়।

'কিস্সু না, এট্টা বেতফল খাচ্ছি।'

'একটা তো না, একছড়া।' মতি রাগে গসগস করে। কটমট করে মেয়েটাকে দেখে। গায়ের রং যেমন ময়লা তেমনি ময়লা কুটকুটে পরনের শাড়িটা। তার ওপর ছেঁড়া। কিন্তু দাঁতগুলি খুব ফরসা। বকের পাখার মতো সাদা ধবধবে দাঁতগুলি দেখে মতির তবু কিছুটা ভাল লাগল। ভাল লাগল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়ে তার বুকের ভিতর ঢিব করে উঠল। আড়চোখে সে ঘাসের ওপর ছেড়ে-রাখা বড় হাফপ্যান্টটা দেখল। দাদু এখন কী অবস্থায় জলে সাঁতার কাটছে, সে জানে। ঐ বুঝি দাদুর স্নান সারা হয়েছে; পাড়ের দিকে আসছে না?

'এই কোথায় যাচ্ছিস তুই!' মতি আগের চেয়েও জোরে ধমকে ওঠে, 'কোথায় চললি?'

'এট্টু জল খাব।' ওর সঙ্গে একটা চটের বস্তা। মতি এতক্ষণ এটা লক্ষ্য করেনি। বেতঝোপের ধার থেকে বস্তাটা টানতে টানতে হরীতকীর গাছের নিচে নিয়ে এল মেয়েটা, তারপর বুঝি জল খেতে পুকুরের দিকে পা বাড়ায়।

'না, এখন জল খেতে হবে না।' মতি রুখে দাঁড়ায়, 'তোর এই বস্তার মধ্যে কী?'

'শুকনা পাতা।'

'অ, তুই পাতাকুড়ুনী।' মতি নুয়ে বস্তার ভিতরটা দেখে। শুকনো পাতার সঙ্গে দুটো আনারস। বেশ তাজা। যেন এইমাত্র বাগান থেকে কেটে আনা হয়েছে। মতি সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

'কোথায় পেলি আনারস?'

প্রথমটায় একটু থতমত খায় মেয়েটা, তারপর হাসে, আঙুল দিয়ে পুকুর দেখায়।

'রাজাবাবুর ক্ষেতের, দুটি কেটে আনলুম নুন দিয়ে খেতে।'

তার মানে দাদুর বাগানের; পুকুরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দাদুকে রাজাবাবু বলছে ও, মতি বুঝল।

'তোর পিঠের ছাল তুলে ফেলবে রাজাবাবু। তুই কাঁচা আনারস কেটে আনলি।'

'কিছুটি বলবে না মুইকে, মুই কত ফলপাকুড় খাই রাজাবাবুর গাছের, বাগানের, কিচ্ছুটি বলে না।' বকের পাখার মতো সাদা ধবধবে দাঁত বের করে মেয়েটা হাসে, ঘাড় নাড়ে, ভুরু বেঁকায়; তারপর: 'যাই, রাজাবাবুর দীঘির মিঠা জল এখন পেটটি পুরে খাই। বলে কোমরে ক্ষিপ্র মোচড় তুলে ঘাসের ওপর দিয়ে তরতর করে ও পুকুরের ধারে চলে গেল, জলের কাছে।

মতি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এইমাত্র যে দুশ্চিন্তাটা তার মনে এসেছিল সেটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। মেয়েটা ঠিক জলের কিনারে চলে গেল তো। দাদু সাঁতার-জল ছেড়ে কোমর-জলে এসে দাঁড়ালো না। ইস্, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল মতি। মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার। তবে কি দাদু, এত বড় মেয়েটার সামনে জল থেকে ডাঙায় উঠবে। দাদু! যেন চিৎকার করে ডেকে বুড়োকে সাবধান করে দিতে চাইছিল সে,—গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না; ভয় বিস্ময় ঘৃণা আশঙ্কা বিতৃষ্ণা বিষণ্ণতার ছোট বড় নানা রকম তরঙ্গ তার বুকের মধ্যে খেলা করে গেল। এই একটু সময়ের মধ্যে। উন্মাদ না, শিশু না—মতি মনে মনে বলল, আমার দাদু, এক কালের বড় ইঞ্জিনীয়ার, এলগিন রোডের বাসিন্দা সারদা রায় একটা জন্তু, একটা দানো, একটা ভয়ঙ্কর কুৎসিত জীবে পরিণত হয়েছে।

হাসছে? মেয়েটা দাদুকে দেখে হাসছে? কিন্তু দাদু যে এখনো কোমর জলে দাঁড়িয়ে। নাভিটা পর্যন্ত দেখা যায় না। অণুবীক্ষণের মতো দৃষ্টিটাকে পুকুরের দিকে ধরে রেখে মতি একটা শুকনো ঢোক গিলল। হাওয়ার দোলায় মাথার ওপর হরীতকী গাছের মাথায় নতুন করে সরসর শব্দ জাগল। দূরের বেতঝোপের ভিতর ডাহুকীটা ডাকছে। আকাশের কিনারে সাদা মেঘের দলাটা আরো সাদা হয়ে তুলোর মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এসব কিছুই দেখতে শুনতে ভাল লাগছিল না মতির। তার চোখ তার মন তার সবটুকু চৈতন্য এখন জলের ধারে, জলের ওপর।

ও কি! দাদু হাসছে মেয়েটাকে দেখে? ঘাড় নাড়ছে? পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে মেয়েটা ঘাটের সিঁড়িতে বসে পড়ল যে! সাদা ধূসর লোমে ঢাকা দাদুর ভুঁড়িটা জলের ওপর জাগছে না? নাভিটা দেখা গেল না? মতির শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, নিশ্বাস ফেলছে না, ঢোক গিলতে পারছে না সে। অবশ্য তখনই মতি একটা হাল্কা নিশ্বাস ফেলল, বড় করে ঢোক গিলতে পারল। দাদু আবার গলাজলে সরে গেছে, সাঁতার-জলে। দাদু সাঁতার কাটছে। মেয়েটা হাত তুলে শাপলা বন দেখাচ্ছে। সবুজ ডাঁটা সমেত বড় শাপলা ফুলটা সারদা ছিঁড়ে আনেন। ফুল নিয়ে ডুব দেন। তারপর ভেসে ওঠেন পকুরের এধারে। আবার মতির বুকের ভিতর দুবদুব করে। কিন্তু না,—সারদা এবার ঘাটের ওপরের সিঁড়িতে পা রেখে আগের মতো কোমর-জলে কি বুক-জলেও দাঁড়ান না। গলার কাছে জল। জলের সঙ্গে সারদার থুতনি। সেখান থেকেই তিনি ডাঁটা সমেত লাল শাপলা ফুল ডাঙার দিকে ছুড়ে দেন। হাত বাড়িয়ে মেয়েটা তা লুফে নেয়। তারপর ডাঁটা থেকে ছিঁড়ে ফুলটা খোঁপায় গোঁজে। গলাজলে দাঁড়িয়ে দাদু হাসে, মেয়েটাও হাসে। খোঁপায় ফুল গোঁজা হয়ে যেতে মেয়েটা আঁজলা আঁজলা জল খেল ঘাড় নুইয়ে। চুলের লাল ফুলটা হাওয়ায় কাঁপছিল। জল খাওয়া সেরে ও সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তারপর এক ছুটে উঠে আসে তীরের সবুজ ঘাস আর হরীতকী গাছের গুঁড়ির কাছে। শুকনা পাতার বস্তাটা টেনে কাঁখে তোলে, তারপর কোমরের একটা ক্ষিপ্র মোচড় তুলে ওধারের বেতঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ে। যেন বেতজঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওর বেরোবার পথ।

হাঁ করে একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে মতি নিশ্চিন্ত হয়, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বাঁচা গেল, আপদ গেল। বিড়বিড় করে উঠল সে; আর তৎক্ষণাৎ দাদুকে দেখতে পুকুরের দিকে চোখ ফেরাল। 'দাদু তোমার স্নান হয়ে গেছে?' খুশী গলায় মতি ডাকল। ডাকতে পারল।

'হ্যাঁ রে দাদু, হয়েছে, হয়ে গেল।' সারদা জল ছেড়ে ডাঙায় ওঠেন। ডাহুকটা

ভীষণ জোরে ডাকছে। পেঁজা তুলোর মতো সাদা পাতলা মেঘগুলো এখন গায়ে গায়ে লেগে একটা বিশাল শ্বেতপদ্মের চেহারা ধরতে আরম্ভ করল না। আশ্চর্য এক মেঘের ফুল। খুশী হয়ে মতি দাদুকে দেখছিল। টপটপ জল ঝরছে কান থেকে, নাকের ডগা থেকে, থুতনি থেকে, হাতের আঙুলগুলি থেকে। দাদুর উলঙ্গ ভেজা শরীরটা দেখে মতির মনে হচ্ছিল একটা পুরনো গাছ। অনেকদিন জলের নিচে থাকার পর এখন উঠে এসেছে। গাছের রাজা তো গাছই হবে, মতি ভাবল। দাদুর গায়ের সাদা ধূসর লোমগুলি যেন গাছের গায়ের শ্যাওলা। শ্যাওলা থেকে টুপটাপ জল ঝরছে। হরীতকী গাছের সরসর শব্দটা মতি কান পেতে শুনল।

সারদা তাঁর হাফপ্যান্ট পরেন, কষে বেল্ট আঁটেন।

ঠাকুমার জামের পুঁটলিটা মতি হাতে তুলে নেয়।

'একটু দেরি করে ফেললাম, কেমন রে নাতি।'

মতি হাসে, কথা বলে না, দাদুর সঙ্গে হাঁটে।

'আমার এই পুকুরের জল চমৎকার ঠাণ্ডা, একবার নামলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না।'

'হুঁ।' মতি প্রথমটায় অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করে, তারপর কি ভেবে বলল, 'আমার তো মনে হয় ঠাকুমা অনেকক্ষণ কালিয়া রাঁধা শেষ করে বসে আছে।'

সারদা কথা বলেন না, হাঁটেন। মতি চুপ থেকে হাঁটে। দাদু কি কিছু ভাবছে? মতি ভাবে। দাদুর আগে আগে, মাথার সামনে, কপালের সামনে একটা লাল ফড়িং উড়ে উড়ে চলে।

'আচ্ছা দাদু?'

'কি বলছিস?' সারদা থুথু ফেলেন না, আড়চোখে নাতিকে দেখেন, নাতি তাঁর হাত ধরে হাঁটে।

'তোমার বাগান থেকে দুটো আনারস কেটে এনেছে মেয়েটা, শুকনো পাতার বস্তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।'

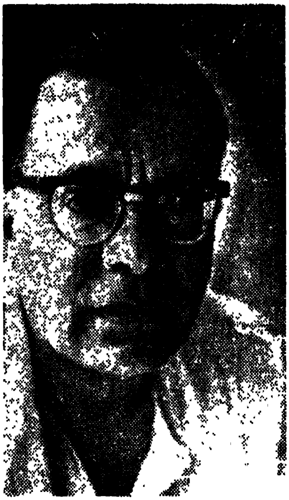
'হুঁ', মৃদু গলায় হাসেন সারদা। 'কাঁচা আনারস নুন লঙ্কা মেখে খাবে আর কি।' সারদা কপালের সামনে উড়ন্ত লাল ফড়িংটাকে লক্ষ্য করেন। 'তা আনুক না, কত আর খাবে, হাজারের ওপর আনারস হয়েছে এবার আমার ক্ষেতে।'

মতি একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল।

এবার নাতির কাঁধের ওপর হাত রেখে সারদা হাঁটেন।

'বাদুড় কাঠবিড়াল শালিক বুলবুলিতে কি কম ফল নষ্ট করে আমার! করুক। আমি একটুও রাগ করি না। আমার অনেক আছে বলেই তো ওরা খাচ্ছে।'

মতি নিরুত্তর। অনেক হেঁটে তার পা দুটো ধরে গেছে। কিন্তু হঠাৎ একটা জিনিস আবিষ্কার করে যেন সে কেমন চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার কাঁধের ওপর দাদুর হাত। দাদুর গায়ের গন্ধ চামড়ার গন্ধ তার নাকে লাগছে। মাছের গন্ধ না, আমের গন্ধ না, ক্ষীরের গন্ধ না, জাম জামরুলের গন্ধ না। জলের গন্ধ? শ্যাওলার গন্ধ? তা-ও না। কোমল মিষ্টি ঠাণ্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ এটা। মতি বুঝল। মতি বুঝল না আয়ুর ফিতে লম্বা করতে এই গন্ধও শরীরে ধরে রাখার দরকার আছে কিনা। বুঝতে না পেরে সে ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে লাগল। আর হাঁটতে লাগল।



আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ১৯২০ সাল। ঢাকা। দীর্ঘকাল সাংবাদিক এবং লেখক।
তাঁর লেখায় বিচিত্র চরিত্র বার বার এসেছে।
যাদুকর-বেশ্যা-দালাল-ভণ্ড-বিদূষক-শয়তান-প্রেমিক সব রকম চরিত্রই
তাঁর লেখায় এসেছে এবং টাইপ চরিত্র হিসেবে নয়,
এসেছে ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে। একজন তরুণ লেখক তাঁর
সম্পর্কে লিখেছিলেন একদা—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মূলত হৃদয়ের
কারবারী। মূল্যবোধের ছাপ তাঁর লেখায় স্পষ্ট। পাঠককে অভিভাবকের
মত হাল্কা রঙীন নানান লোভনীয় জিনিস তুলে দিতে ভোলেন না।
তাই পঞ্চতপায় দেখি এঞ্জিনীয়ার বাদল সরকারকেও খুঁটি উপড়ে যাওয়া
ধাবমান গাইগরুর দড়ি ধরে ছুটতে হয়। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : চলাচল,
যার যেথা ঘর, কাল তুমি আলেয়া, নগর পারে রূপনগর। অস্তিবাদী চিন্তার
আভাসও পাওয়া গেছে কিছু গল্পে যেমন ব্যক্তিত্ব। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য
গল্প যৌবন, কুমারী মাতা, মৃত্যু, দ্বীপ। বেশ কয়েকটি ছোট-বড় পুরস্কার ছাড়াও
জনচিত্তে স্থায়ী আসনে অভিষিক্ত হয়েছেন এই লেখক।

প্রকাশক আমার মতে আমার শ্রেষ্ঠ গল্পটি দাবি করেছিলেন। কিন্তু কোনো লেখক তাঁর লেখা বহু গল্পের মধ্যে কোনো একটিকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন কিনা জানি না। আমি অন্তত পারলাম না। একটা গল্প বলতে গেলে আরো দশটা গল্প চোখের সামনে ভিড় করে আসে। তবে কোনো কোনো গল্প লেখকের মনে এক-ধরনের বিশেষ ছাপ ফেলে, সেই সব গল্পের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব বা দুর্বলতা থেকেই যায়। সেই সব গল্প লেখকের প্রিয় হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ব্যক্তিত্ব সেই গোছের গল্পের একটি। কেন এটি প্রিয়, সঠিক বলতে পারব না। একটা 'আনকমন' বিষয়বস্তুকে গল্পে রসোত্তীর্ণ করে তোলা যায় কিনা, সেই চেষ্টার ফল এই 'ব্যক্তিত্ব'। লেখার পর নিজের ভালো লেগেছিল, পাঠকদের কাছ থেকেও সাড়া পেয়েছিলাম। সেই ভরসায় 'ব্যক্তিত্ব'কে এবার এই সংকলনের পাঠকদের কাছে উপস্থিত করলাম।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১০-৬-৭৮

ব্যক্তিত্ব

ভদ্রলোক উঠে চলে গেলেন। ডরোথির মনে হয়েছিল, তার চোখের সামনে একরাশ মৃত্যুর অন্ধকার ছড়িয়ে উঠে গেলেন ভদ্রলোক। একটু বাদে তাঁর গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ কানে এলো। ডরোথি নির্বাক, নিস্পন্দ, বোবার মতো বসে। তার পরনে তখনো শোকের বসন, বাহুতে শোকের চিহ্ন, চোখে মুখে শোকের ছাপ। হাতে একখানা চিঠি।

শোক মিথ্যে নয়। শোক হয়েছিল। বুকের ভেতরটা নিঃশেষে শূন্য হয়ে গেছল। পাহাড়ের মত এক পুরুষ একটানা ষোল বছর পরে তার জীবন থেকে বড় আচমকা বিদায় নিয়েছিল। চোখের সামনে শেষ ঘনাতে দেখেও এতবড় বিচ্ছেদ বিশ্বাস করতে পারে নি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার শোক বড় কি আর কিছু, ডরোথি জানে না।

বসেছিল চিত্রাপিতের মত। হঠাৎ সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। মনে হল কেউ তাকে দেখছে, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। বিশালকায় কালো লোমশ একটা অদৃশ্য অস্তিত্ব ছোট চোখ মেলে সকৌতুকে দেখছে তাকে আর হাসছে অল্প অল্প। সেই হাসির ফাঁকে তার পুরু ঠোঁটের ভিতর দিকের লালচে অংশটুকুও যেন দেখা যাচ্ছে। ডরোথি শিউরে উঠল। আবারও। দেহাতীত আত্মা কি আসে? দেখে? তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, ঘরের মধ্যে সে একা বসে নেই, আরো কেউ আছে, নিবিষ্ট কৌতুকে দেখছে তাকে, তার অনুভূতির এই সদ্য বিপর্যয়টুকুও বুঝি অগোচর নয় তার।

হঠাৎ শূন্য ঘরের চার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে অস্ফুট স্বরে ডরোথি বলে উঠল, টনি বানডোডকার? যতদিন ছিলে তুমি একদিনের জন্যেও আমাকে অসম্মান করোনি, কিন্তু আমার বুকের ভেতরটা গুঁড়িয়ে দিয়েও সব থেকে বড় সম্মান আজ দেখালে তুমি, তোমার ডোরা শপথ করছে, তোমার এই ইচ্ছের মর্যাদা সে রাখবে, তুমি যা চেয়েছ তাই হবে!

ডরোথির কাছে কোনোদিন কথার খেলাপ করেনি টনি বানডোডকার। কেবল একবার ছাড়া।

তার ফল শুভ হয়নি। ডরোথি জানে সেটা অঘটন একটা। সে প্রস্তুত ছিল না। এই অঘটন বরদাস্ত করতে তার বিক্ষিপ্ত স্নায়ু অনেক সময় নিয়েছে। বরদাস্ত ঠিকমত কোনদিনও করতে পারেনি হয়ত। কিন্তু স্থির বুদ্ধির মেয়ে সে। নিজের সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছিল। তাছাড়া, মানুষটাও তো সুস্থ ছিল না তখন। কেন যেন হঠাৎ এক বিষাদ রোগে পেয়ে বসেছিল তাকে। কথা খেলাপ করার সেই অবুঝ মত্ততা তারই বিপরীত প্রতিক্রিয়া। সেটা যে এ-ভাবে আসবে ডরোথি কল্পনা করেনি। টনিকে নিয়ে হিমসিম অবস্থা তার তখন। ডাক্তারদের একটা কমিটিই বসিয়ে দিয়েছিল সে। দরকার হলে বম্বে থেকে আরো বড় ডাক্তার নিয়ে আসতে বলেছিল সে। ডরোথি আরো ঘাবড়ে গেছল কারণ, আপদে-বিপদে যে অনুগত লোকটা মুখ বুজে

টনিকে সামলাতে পারত, ব্যবসায়ের কাজে সেই শিরাং কারমালিও তখন জাপানে।
.কেব্‌ল করে তাকে চলে আসতে বলবে কিনা সেই চিন্তাও করেছিল ডরোথি।

সে-অবকাশ মেলেনি। মাস দুয়েকের মধ্যে সেরে উঠেছে বানডোভকার। তার মাথা থেকে যেন একটা ভূত নেমে গেছে। কিন্তু তাকে সারিয়ে তোলার ব্যাপারে চিকিৎসকের থেকেও ডরোথি বানডোভকারের কৃতিত্ব কম নয়। সব থেকে বড় ঝড়টা বুঝি তার ওপর দিয়েই গেছে। তার দেহের ওপর দিয়ে, মনের ওপর দিয়ে—নিরুপায় হয়েই নিজেকে সমর্পণ করেছে সে, এক উদভ্রান্ত যৌবনের অশান্ত ক্ষুধার মুখে আত্মসমর্পণ করেছে। তার ফলে ডরোথির দু' দু'বারের সেই অটুট ব্যক্তিত্ব আর আত্মবিশ্বাস ধূলিসাৎ। সেই অতনু-নিভৃতে পুরুষের সর্বগ্রাসী অধিকারের অশান্ত ব্যক্তিত্বটাই যেন অনেক বড় হয়ে উঠেছিল।

আস্তে আস্তে তারপর টনি বানডোভকার ঠাণ্ডা হয়েছে, শান্ত হয়েছে। আগের থেকেও ভদ্র নম্র হয়েছে। ডোরার বিষণ্ণ উৎকণ্ঠার কারণ উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছে সে। কথার খেলাপের দরুন তার পরিতাপের শেষ নেই। শুকনো মুখে বার বার ডোরাকে বলেছে, নিজের ব্যক্তিত্ব আর ইচ্ছাশক্তি বড় করে তোলো—দু'দুবার ঈশ্বর দয়া করেছেন, এবারও করবেন না তোমাকে কে বলল?

তার মুখের দিকে চেয়ে ডরোথির মায়া হয়েছে। হেসেই জবাব দিয়েছে, আয়নায় নিজের মুখখানা চেয়ে দেখোগে যাও, কে বলেছে। এই নিয়ে উতলা হয়ে ফের যদি রোগ বাড়াও আর আমাকে কাছে পাবে না বলে দিলাম।

কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছে টনিও। ভিতরে একটা চাপা দুশ্চিন্তা তারও আছে বইকি। দু'জনেরই আছে। টনি বলেছে, ভালো মন্দ যা-ই হোক, কথার খেলাপের জন্য তুমি আমাকে ঘৃণা করবে না বলো?

ডরোথি আবারও না হেসে পারে নি।

টনি বানডোভকার কথা দিয়েছিল তার দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর। আঠারো ঘন্টা উদগ্রীব হয়ে নার্সিং হোমে বসে থাকার পর খবর পেয়েছিল, এবারেও ছেলে হয়েছে। উত্তেজনায় আরো যেন ঘাম দেখা দিয়েছে টনির সর্বাঙ্গে। ডোরা খানিকটা সুস্থ হবার পরেও তার কেবিনের দিকে পা বাড়াতে পারেনি। শিরাং কারমালিকে হুকুম করেছে, কেমন হয়েছে দেখে এসো তো।

চিরানুগত কারমালি মনিবের হুকুম পালন করে ফিরে এসেছে। বলেছে, ভালো স্যার।

—ভালো তো তুমি আমাকেও দেখো, কেমন ভালো? কেমন?

কারমালি হুকুম পালন করতে যত পটু, বাচনে তত নয়। জবাব দিল, বড্ড ছোট, ভালই মনে হল।

—আঃ! উত্তেজনার ফলে দ্বিগুণ বিরক্তি, গায়ের রং কেমন?

—লাল দেখলাম।

—তার মানে কালো—কেমন লাল? কালচে লাল?

ন্‌-না।

—আর নাক মুখ চোখ?

—তাও ভালই বোধহয়। মিসেস বানডোডকার আপনাকে কেবিনে যেতে বলেছেন স্যার।

উৎকণ্ঠা একেবারে কমেনি, তবু খানিকটা স্বস্তি নিয়ে কেবিনে ঢুকেছে টনি বানডোডকার। প্রথম শ্রেণীর মধ্যেও বাছাই-করা কেবিন। একদিকের শয্যায় ডরোথি শুয়ে। আর একধারের বেবি-বেডে নবজাতক। ভীরু পদক্ষেপে টনি বানডোডকার আগে সেদিকে এগিয়েছে। নির্নিমেষে দেখেছে খানিক দাঁড়িয়ে। মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া সরেছে একটু একটু করে।

ফিরে দেখে ডরোথি ডাগর চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, কিন্তু ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি হাসি। চোখোচোখি হতে বিশালবপু টনি বানডোডকারের কচি ছেলের মত লাজুক-লাজুক মুখ।

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ডরোথির দু'চোখ নড়েনি তার মুখের ওপর থেকে। আবারও হেসেছে মিষ্টি করে।—নিশ্চিন্ত?

আনন্দে টনির ওকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল একটু। নীচু হয়ে মুখের কাছে ঝুঁকেছে, তারপর মাথা ঝাকিয়েছে। অর্থাৎ খুব। তারপর খাপা উচ্ছ্বাসে বলে উঠেছে, এটাও কালোই হবে একটু, কিন্তু আমার মত আলকাতরার কালো নয়—নাক-মুখ-চোখ পার্ফেক্ট, জাস্ট লাইক ইউ, আমার মত হতভাগা মার্কা হবে না, হি উইল্ বি এ জেন্টল্‌ম্যান!

ডরোথি হেসে ফেলেছিল, বলেছিল, তোমার থেকে জেন্টলম্যান তামাম দুনিয়ায় নেই, আমার জিনিসের এ-ভাবে নিন্দে করলে রেগে যাব বলে দিচ্ছি।

এ নিয়ে আরো খানিক হাসাহাসির পর দু'জনেই চুপ। ডরোথি জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ?

মৃদু হেসে বানডোডকার জবাব দিয়েছে, ভাবছি তোমার ব্যক্তিত্বের কথা, আর রেভারেণ্ড ফার্নান্‌ডেজের কথা। হাউ লাকি আই অ্যাম্!

একটু বাদে অন্যমনস্কের মত ডরোথি ডাকল, টনি—

—ইয়েস্ মাই ডিয়ার?

—একটা কথা বলব?

—হোয়াই একটা, অনেকগুলো বলো।

—রাগ করবে না?

—রাগ? তোমার উপর? বিশেষ করে এই দিনে!

আশ্বাস পেয়েও ডরোথির বিড়ম্বিত মুখ। একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল, দু'দু'বার ঈশ্বর আমার মুখরক্ষা করেছেন টনি, এই দুটিই বেঁচে থাক, এরপর আর না---লাক্ তো বরাবর একরকম থাকে না, এরপর অন্যরকম ব্যাপার দাঁড়ালে তুমিই সব থেকে বেশি আঘাত পাবে টনি—তোমার জন্যেই আমার ভয়।

টনি বানডোডকারের খুশি মুখ। সেও সকৌতুকে চেয়ে আছে। তারপর হেসেই বিস্ময় প্রকাশ করেছে, তোমার পারসোন্যালিটির জোরে ঈশ্বরের বিধান উল্টে দিতে পারো তুমি, তোমারও ভয়! তুমি কি নিজেকে চেনো না ডোরা, নিজের শক্তি জানো না!

—ঠাট্টা নয় টনি, দু'বারে তোমার মুখরক্ষা করতে পেরেছি, এবারে আমার এখন থেকেই ভয় ধরেছে। তুমি কথা দাও।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, দাস ফার অ্যাণ্ড নো ফার্দার, বংশের দুর্নাম দু'দুবার

খশেছে, অ্যাম দা প্রাউডেস্ট ম্যান ইন দি ওয়ার্লড নাও—ঠিক আছে, তুমি ভয়-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দাও।

—কথা দিচ্ছ?

—সিওর, এ জেন্টল্‌ম্যানস ওয়ার্ড!

টনির ঠাকুরদা বলত, তার সময় থেকেই এই পরিবারের ওপর অভিশাপ লেগেছে। ওই অভিশাপের সে প্রথম দূত। নইলে ঠাকুরদার বাবা-মায়ের চেহারা নাকি তেমন খারাপ ছিল না। কিন্তু কোথা থেকে কেমন করে যে এলো সে, সেটাই বিস্ময় তার। টনির আবার সেই ঠাকুরদার মা বুড়ির ওপর সন্দেহ, কেমন ছিল সেই মা বুড়ির চরিত্র কে জানে!

ঠাকুরদাকে সে দেখেছে কিনা মনে নেই। তার ফোটো দেখেছে। পাহাড়ের মত দেহ, কালো কুৎসিত লোমশ আকৃতি। নাক থ্যাবড়া, ঠোঁট বিসদৃশ পুরু, চোখ ছোট। গোটা অস্তিত্বটাই যেন অশুভ। নিজেকে নিজে অভিসম্পাত করত তার ঠাকুরদা, তার বাবাও।

টাকার জোরে ঠাকুরদা সুশ্রী মেয়েই বিয়ে করেছিল। বংশগতভাবে টাকার পাহাড় জমেছে তাদের। লৌহ আকরের খনির মালিক তারা—আয়রন ওর চালান দেয় জাপান, বোম্বাইয়ে, বাংলাদেশেও।

ঠাকুরদার আশা ছিল ছেলেটা অন্তত মোটামুটি সুশ্রী হোক। কিন্তু টনির বাবারও সেই রকম চেহারা নিয়েই আবির্ভাব। তেমন বীভৎস কুৎসিত, অন্য ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলে ধারে কাছে ঘেঁষত না। আর টনি শুনেছে তার মা আত্মহত্যা করেছে তার জন্মের পর। আত্মহত্যার কারণ একটু বড় হয়ে সহজেই সে অনুমান করতে পেরেছে। আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেই পেরেছে।

ছেলে বড় হয়ে উঠতে টনির বাবা চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। ছেলেটার মতিগতি অন্যরকম। অল্প বয়সেই তার কুৎসিত চেহারার মধ্যে বাসনার যে আগুন জ্বলত, বাবা তা টের পেয়েছিল। সেই অল্প বয়সেই দুই একটা দুঃসাহসিক অঘটন ঘটিয়েছে। টাকার জোরে বাবা বিপদ সামলে উঠেছে। সমস্ত রমণী জাতটার ওপরেই যেন একটা জাতক্রোধ ছেলের।

অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ্ তার বাবাকে বলেছে, জন্ম থেকে মায়ের স্নেহ পায়নি বলেই এমন হয়েছে। মায়ের স্নেহ ভালবাসা পেলে এ রকম হত না। কিন্তু ঠিক এরকম রমণী টনির বাবা পাবে কোথায়? টাকা অনেক আছে, কিন্তু টাকা দিয়ে কি স্নেহ ভালবাসা কেনা যায়?

তবু ঈশ্বরের দয়ায় সেই রকম যোগাযোগই হল একটা। দেশে বিষম গোলযোগ চলেছে তখন। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই কানাঘুষো বেশ জোর শোনা যাচ্ছে ভারত এসে গোয়া দখল করবে। পর্তুগীজ আধিপত্যের অবসান হবে। দেশের মধ্যে একটা অরাজকতা চলেছে তখন। এমন দিনে সে সময়ের গীর্জার প্রধান ফাদার থরম্যান টনির বাবাকে বলল, একটি বিপন্ন মহিলা আর তার সতের আঠার বছরের একটি মেয়েকে রক্ষা করতে হবে।

ফাদার থরম্যান ভারী স্নেহ করে টনির বাবাকে, আর সে ভদ্রলোকও ফাদারের কথায় প্রাণ দিতে পারত।

১৯৫০ সালের কথা। এক প্রতিপত্তিশালী পর্তুগীজ গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছে একটি মেয়ে আর তার মা। মা'টি বাড়ির আয়া ছিল। দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে দেখে সেই গুণ্ডা মা মেয়েকে দেশে চালান দেবার ব্যবস্থা করছে। উদ্দেশ্য অসৎ।

তাদের দেশে সুশ্রী প্রাচ্য মেয়ের কদর খুব। মা-কে শাসিয়েছে কোনরকম গণ্ডগোল করলে তাকে গুলি করে মেরে শুধু মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে।

সেই মহিলা ফাদারকে গোপনে চিঠি লিখে বিপদ জানিয়েছে। মহিলারও বয়েস তখন ছত্তিরিশ সাঁইতিরিশ—রূপ যৌবন আছে।

টনির তখন একুশ বাইশ বছর বয়েস। বাপের মতই অসম সাহসী সে। না, তার থেকেও বেশি। নিজেদের বিপদ তুচ্ছ করে বন্দুকের মুখে সেই মা মেয়েকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছিল তারা। সেই মেয়ে ডরোথি। তারপর থেকে ডরোথির মা এ বাড়িতে গভর্ণেসের মত থাকলেও, সেই কর্ত্রী।

কিন্তু তাদের বাড়িতে আনার পর টনির সুপ্ত প্রবৃত্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ডরোথিকে ঘিরে বাসনা দানা বেঁধে উঠেছিল। বাবা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, ফাদারের গচ্ছিত অতিথির প্রতি এতটুকু অশালীন ব্যবহার করলে ছেলেকে গুলি করেই মারবে সে। বিপদ কেটে গেলে ওই মা মেয়ের অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থাও ঠিক করে রেখেছিল টনির বাবা।

কিন্তু তার আগেই বিপদের সূচনা দেখল ডরোথির মা। এক রাতে সোজা এসে টনির মাথায় হাত রাখল মহিলা। বলল, তুমি আমার ছেলে, ছেলে মাকে উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করে এনে এতবড় কলঙ্কের কাঁটা মাথায় নেবে বাবা? কি পাবে? আমি আর ডরোথি আত্মহত্যা করব। আমরা মুছে যাব, কিন্তু তোমাদের বীর বংশের এত বড় কলঙ্ক আর মুছবে কি?

সেই থেকে মাথায় যেন ধুলো পড়ল টনির। আর সেই থেকে ডরোথির মা টনিরও মা হয়ে বসল। মায়ের অধিকার নিয়ে ডরোথির সঙ্গে রীতিমত ছেলেমানুষি রেষারেষি চলত তার। আর মায়ের পক্ষপাতিত্ব টনির প্রতিই।

সব শুনে ফাদার থরম্যান হেসেছিল। রেভারেণ্ড ফার্নানডেজ তখন টনির থেকে বছর চারেকের বড় যুবক, কালো রঙ, সুশ্রী বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার সামনেই থরম্যান বলল, সব পারসোন্যালিটি ফ্যাকটর বুঝলে—ব্যক্তিত্ব দিয়ে অসাধ্যসাধন করা যায়। সে-রকম ব্যক্তিত্বশালী মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দিতে পারলে, তার ছেলে-পুলের চেহারা পর্যন্ত অন্যরকম হতে পারে, অফ কোর্স তোমার ছেলের থেকেও সেই মেয়ের ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি হওয়া চাই।

কথাগুলো টনির বাবার মনে ভারী ধরেছিল। ছেলের থেকেও বেশি একটি ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না মেয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছিল ভদ্রলোক। আর ফাদার থরম্যানের সেই উক্তি পরিহাসের ছলে টনিকে বলেছিল ফার্নানডেজ। চার বছরের ছোট বড় হলেও তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বাবা ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়ের খোঁজে আছে টনি জানত। কিন্তু সে-রকম মেয়ে যে তাদের ঘরেই আছে, বাবা শুধু সে-খবরটাই রাখত না। টনির চোখে ডরোথির শান্ত ব্যক্তিত্বটুকুই যেন আসল রূপ। ডরোথির মা কিছু বললেও প্রতিবাদ করা যায়, অমান্য করা যায়। কিন্তু ডরোথি কিছু বললে তা যেন পারাই যায় না। প্রতিবাদ করলে বা অমান্য করলে সে কিচ্ছু বলবে না, দু'বার অনুরোধ করবে না। শুধু মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে নিঃশব্দে চলে যাবে। ঠোঁটের ফাঁকে তার সামান্য একটু হাসির আভাস দেখা যাবে কি যাবে না। কিন্তু তারপর যেন অনুরোধ পালন না করে উপায় নেই তার। আর তারপরেও ডরোথি হাসতই শুধু। অর্থাৎ, সে যেন জানতই, যা চেয়েছে তাই হবে।

পরের তিনটে বছরের মধ্যে অনেক পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে গেল। টনির বাবা আর ডরোথির মা মরে গেল। ওদিকে চোখ বুজল ফাদার থরম্যানও। বাবার ব্যবস্থা-মত ডরোথিরা অবশ্য তার আগেই ভিন্ন ডেরায় উঠে গেল।

টনি এত বড় ব্যবসার মালিক। ডরোথি আপিসে আসে, ব্যবসা দেখে, টনিকে পরামর্শ দেয়। মোটা মাইনেও পায় সে, যোগ্যতার মর্যাদা হিসেবে টনি তাকে আরো বেশি দিতে চায়, কিন্তু ডরোথি নেবে না। যত দিন যায়, এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্না রমণী যেন টনি আর দুটি দেখে না।

মনের কথাটা একদিন খোলাখুলিভাবে রেভারেণ্ড ফার্নানডেজকে বললে সে। ডরোথিকে সে বিয়ে করতে চায়। তার ধারণা যে ব্যক্তিত্বের কথা ফাদার থরম্যান বলে গেছল সেই ব্যক্তিত্ব ডরোথির আছে—তার থেকে বেশিই আছে।

খুশি মুখে ফার্নানডেজ তার পিঠ চাপড়েছে। বলেছে, গো অ্যাহেড, দেখো ডরোথি রাজি হয় কিনা। আমারও বিশ্বাস, ফাদার থরম্যান ঠিকই বলেছিলেন, পারসোন্যালিটি ফ্যাক্‌টর ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পরট্যান্ট থিং।

রেভারেণ্ড ফার্নানডেজের কালো মুখখানা সেদিন অনির্বচনীয় মনে হয়েছিল টনির।

প্রস্তাবটা পরদিনই আপিসের পর ডরোথির কাছে পেশ করেছে সে। তার আগে ফাদার থরম্যানের পারসোন্যালিটি ফ্যাক্‌টরের মহিমার কথা বলেছে, তার বাবার ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়ের খোঁজের কথা বলেছে, আর রেভারেণ্ড ফার্নানডেজের বিশ্বাসের কথাও বলেছে। তবু, টনির মনে হয়েছিল, বিয়ের প্রসঙ্গ তোলার সঙ্গে সঙ্গে ডরোথি যেন চমকে উঠেছিল।

খানিক চুপ করে থেকে বিমর্ষ মুখে টনি বলেছে, থাক্—

ডরোথি তখুনি বুঝেছে, কেন বলল।

তবু জিজ্ঞাসা করেছে, কেন?

—তুমি ভয় পেয়েছ।

একটু চুপ করে থেকে ডরোথি জবাব দিয়েছে, আমার ভয় শুধু তোমার জন্যেই, নইলে তোমার মত এমন মানুষ হয় নাকি।

সাগ্রহে টনি বলেছে, আমার কিছু ভয় নেই, আমার স্থির বিশ্বাস তোমার ব্যক্তিত্ব দিয়েই তুমি আমাদের বংশের অভিশাপ মুছে দিতে পারবে—ফাদার থরম্যানের কথা মিথ্যে হবে না, ফার্নানডেজেরও বিশ্বাস মিথ্যে হবে না।

আবারও খানিক চুপ করে থেকে ডরোথি বলেছে, আচ্ছা তাই হবে। কাল আমরা একবার রেভারেণ্ডের কাছে যাই চলো, আগে তার সঙ্গে কথা বলে তার আশীর্বাদ নিয়ে আসি।

আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে টনি। তক্ষুনি বিসদৃশ কিছু করে বসতে যাচ্ছিল। তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে ডরোথি চোখ পাকালো, এই!

হাসতে হাসতে টনি আবার বসে পড়ে প্যাঁক্-প্যাঁক্ করে টেবিলের বেল টিপেছে। প্রাইভেট সেক্রেটারি শিরাং কারমালি হাজির।

—হ্যালো কারমালি, আমার বিয়ে।

—কংগ্র্যাচুলেশনস্ স্যার।

—আর ইউ হ্যাপি?

—ভেরি মাচ ইনভিড স্যার।

—কার সঙ্গে বিয়ে বুঝতে পেরেছ?

এবার ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে ডরোথির দিকে একবার না তাকিয়ে পারল না কারমালি। ডরোথির মুখ লাল। কারমালি মাথা নাড়ল, পেরেছে।

—দেন অ্যারেঞ্জ।

ঘটা করে বিয়ে হয়েছে।

আড়াই বছর পর পর দুটি সন্তান হয়েছে তাদের। কালো হলেও ছেলে দুটির চেহারা সুশ্রী, ভদ্র।

টনির দুর্বার বাসনা নিজের ব্যক্তিত্বের গুণেই সংযত করতে পেরেছে ডরোথি। তা বলে উপেক্ষা বা বঞ্চিত করেনি তাকে। তার মুখের দিকে তাকালে বাসনার তাপ বুঝতে পারে ডরোথি। তাই প্রস্তুত হবার অবকাশ পেয়েছে। গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেছে।

সন্তান-সম্ভবা হবার সময় থেকেই স্থির, সংযত, গম্ভীর সে। কিন্তু টনি তখন বেপরোয়া, মত্ত। তবু জিজ্ঞাসা করে, কি হল তোমার?

ডরোথি হেসেই জবাব দিয়েছে, চাষ করেছি।

সত্যি তখন এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব দেখেছে টনি তার।

দ্বিতীয় সন্তান হবার পর ডরোথি কথা আদায় করেছে টনির, আর নয়, এই শেষ।

সানন্দে কথা দিয়েছিল টনি বানডোডকার।

কিন্তু বছর তিনেক না যেতে এই কথারই খেলাপ করেছিল সে। ডরোথি তাকে বিশ্বাস করত। তাই অবাক হয়েছিল সে। ঘাবড়েও গেছল।

এই দুর্যোগ এত আচমকা এসেছে যে ডরোথি হতভম্ব। বিয়ের পরে আপিস দেখা ছেড়ে দিয়েছিল সে। ব্যবসায়ের কোন গণ্ডগোলের ফলে এরকম হল কিনা জানে না। জানবে কার কাছ থেকে, কারমালি তখন জাপানে। নিশ্চিন্ত আনন্দে কেটেছিল এই তিনটে বছর। বিজ্ঞানের যুগে নিরাপদে থাকতে চাইলে বিপদ এড়ানো সহজ। কিন্তু গোঁ ভরে এই বিপদের মধ্যেই যেন ঝাঁপ দিল মানুষটা। ক্ষণে ক্ষণে উদভ্রান্ত। উদ-ভ্রান্ত যখন, তখনই অবুঝ, বেপরোয়া সে। ডরোথি তখন প্রাণপণে তাকে সচেতন করতে চেষ্টা করেছে, কথার খেলাপের কথা বলেছে, বিপদের সম্ভাবনার কথা বলেছে। টনি বানডোডকার কানেও তোলেনি। উল্টে বিরক্ত হয়েছে। বিরক্তি বাড়লে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

পুরুষের এই গ্রাস থেকে ডরোথি নিজেকে উদ্ধার করতে পারেনি। তাকে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়েছে। তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ধূলিসাৎ যেন।

ঘন ঘন গীর্জায় গেছে এর পর। ফার্নানডেজের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। চিকিৎসার চালাও ব্যবস্থা করেছে। মানুষটাকে সুস্থ করে তোলা ছাড়া আর কিছু ভাবার অবকাশ নেই।

টনি বানডোডকার সুস্থ হল যখন, ডরোথি তখন অন্তঃসত্ত্বা।

সময় যত এগিয়ে এসেছে তত যেন শান্ত নির্জীব হয়ে পড়েছে টনি বানডোডকার। পরিতাপের শেষ নেই তার।

ডরোথিরও বিবর্ণ পাণ্ডুর মূর্তি। সে ভেবে পায় না হঠাৎ এ-রকম মানসিক রোগ-গ্রস্ত হয়ে পড়েছিল কেন লোকটা। ভালো যে হয়ে উঠেছে এটুকুই ভাগ্য, ভাবে সে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। এটিও ছেলে। কিন্তু আগের ছেলে দুটোর মত নয়। টনির

মত বীভৎস কুৎসিত নয় বটে, তবে কুৎসিতই। এই ছেলের বেলায় বংশের অভিশাপ ছ' আনা কেটেছে বলা যেতে পারে।

টনি বানডোডকার সদা বিষণ্ণ। না, ডরোথি কোন দিনও অনুযোগ করেনি তাকে, ভর্ৎসনা করেনি। ঈশ্বরের এই বিধান সে মেনে নিয়েছে। প্রয়োজনে টনিকে সান্ত্বনাও দিয়েছে।

কিন্তু সান্ত্বনা খুব পায়নি টনি। দিনের বেশির ভাগ সময় এক নীরব যাতনা ভোগ করেছে। পরিশ্রম দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ডরোথি আবার চিন্তিত হয়েছে।

ছোট ছেলে সনি দিনে দিনে বড় হচ্ছে। কিন্তু এই ছেলেটা যেন চক্ষুশূল টনির। কোনো সময় তাকে কাছে ডাকে না, আদর করে না। তার মায়া-মমতা সব বড় দুই ছেলের জন্য। ছোট ছেলে সনিকে খুব প্রীতির চোখে দেখে না ডরোথিও। কিন্তু বাপের এতটা এক চোখোমির প্রতিবাদ না করে পারে না এক এক সময়। বলে, কেন, তোমার বাপ-ঠাকুরদার মত অত কুৎসিত তো হয়নি। এর ছেলেপুলে দেখো, আরো ভালো হবে।

কিন্তু ওই ছেলেটার দিকে চেয়ে ডরোথির নিজেরই ভেতরটা আবার এক এক সময় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠত।

সাত আট বছর বয়সের সময় এই শিশু যেন বাবা-মায়ের ব্যবহারের তারতম্য বুঝতে পারত। এমনিতে নিরীহ, শান্ত, কিন্তু নির্বোধ যে নয়, তাও বোঝা যেত। দৈবাৎ মেজাজ বিগড়লে বাপের দ্বিতীয় সংস্করণ যেন। তখন সনিকে ঠাণ্ডা করা এক দুরূহ ব্যাপার।

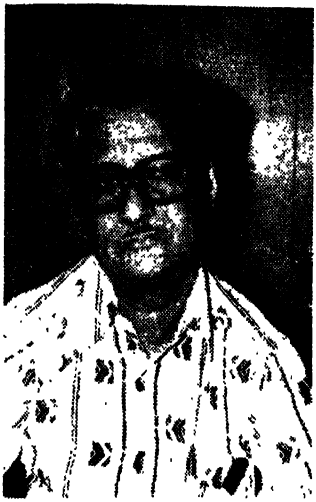
হঠাৎ ছোটখাট একটা স্ট্রোক হয়ে গেল টনি বানডোডকারের।

তার এক বছর বাদে দ্বিতীয় স্ট্রোকে তার শেষ। ডরোথি চেষ্টার ত্রুটি করেনি। শেষ সময়েও সে ভাবতে পারেনি টনি তাকে ছেড়ে যাবে।

একটু আগে যে ভদ্রলোক চলে গেল সে এই পরিবারের অ্যাটর্নি। সে শিল-মোহর করা একখানা চিঠি দিয়েছে ডরোথির হাতে, আর তাকে একটা উইল পড়ে শুনিয়ে গেছে। উইলে নির্দেশ আছে, ডরোথি বানডোডকার সম্মত হলে তবে এ উইল কার্যকর হবে, অন্যথায় এর কোন মূল্য নেই। উইলে লেখা, তার যাবতীয় বিষয়-আশয় এবং ব্যবসার একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে তার ছোট ছেলে সনি বানডোডকার। যতদিন না সে সাবালক হয়, ততদিন তার হয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করবে ডরোথি বানডোডকার এবং শিরাং কারমালি। এবং এই দায়িত্বভার বহনের জন্য অবশ্যই তারা তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক নেবে।

তড়িতাহতের মত খানিক বসে থেকে অ্যাটর্নির সামনেই ডরোথি হাতের শিলমোহর করা খামটা খুলেছে। রুদ্ধশ্বাসে পড়েছে। চিঠি নয়, ছোট বক্তব্য গোছের একটু কিছু। তার মর্ম :

এই উইলে ডরোথির আপত্তি থাকলে সেটা ছিঁড়ে ফেললেই হবে। ডরোথির ভালবাসা সম্পর্কে এতটুকু সংশয় নেই টনি বানডোডকারের। ডরোথির এই ভালবাসা আত্ম-ত্যাগের মতই দুর্লভ। তবু, উচিত বিবেচনায় এই নির্দেশ রেখে গেল সে। কারণ, বিবেকের তাড়না থেকে মুক্ত হবার জন্যেই প্রথম দুটি সন্তানের যাবতীয় দায়িত্ব ডরোথি এবং শিরাং কারমালির নেওয়া উচিত।



সন্তোষকুমার ঘোষ

জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২০। এখন যা বাংলাদেশ, তার ফরিদপুরের রাজবাড়িতে। কৈশোর থেকে কলকাতায়। শহরটাকে চিনেছেন দারুণভাবে। কলেজের শিক্ষাও এই শহরে। চাকুরি-জীবনের কিছুটা কাল বাদ দিলে এই কলকাতার সঙ্গেই জড়িত আষ্টে-পৃষ্ঠে। 'কিনু গোয়ালার গলি', 'সুধার শহর'-এ সেই ছাপ। সাংবাদিকতার স্তম্ভ হয়ে আছেন দীর্ঘকাল, বহুদিন ধরে আনন্দবাজার পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। জীবনযাপনে অসাধারণ একজন শিল্পী। নিজেই একক এক প্রতিষ্ঠান।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র একটি স্থান এই লেখকের জন্যে নির্দিষ্ট। লেখার বিষয় নয়, লেখার ভঙ্গি, ভাষা ইত্যাদিও যে পড়ার, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার জিনিস, এঁর লেখায় সেই পরিচয় সবচেয়ে বেশি। বুদ্ধিদীপ্ত, উপমাবহুল কাব্যময় এক নিজস্ব গদ্যরীতির স্রষ্টা। প্রথম উপন্যাস 'কিনু গোয়ালার গলি' দিয়ে চমকে দেন বাংলা সাহিত্যকে। 'মুখের রেখা' থেকে তাঁর রচনা অন্তর্মুখী। 'জল দাও' লেখকের নিজের মতে শ্রেষ্ঠ রচনা। 'শেষ নমস্কার', 'স্বয়ং নায়ক', 'নানা রঙের দিন', 'সময় আমার সময়', 'সমস্ত গল্প', 'রবীন্দ্র চিন্তা' লেখকের উল্লেখযোগ্য, বাংলা সাহিত্যেরও শ্রেষ্ঠ কয়েকটি বই। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে সমান খ্যাত এই সব্যসাচী লেখক রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসেবেও বিদগ্ধ মহলে সুপরিচিত। অজস্র ছোটগল্পে স্টাইল এবং আঙ্গিক-সচেতনতার দুর্দান্ত উদাহরণ হয়ে আছে। আনন্দ-পুরস্কার, আনন্দ-পুরস্কার (বিশেষ), সাহিত্য আকাদেমি---এই ত্রিবিধ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন এই লেখক।

'দুই রাত্রি' গল্পটা এই সংকলনের জন্যে দিলাম। আপনাদের মনে হতে পারে, এত গল্প থাকতে এটা কেন? এটা কি শ্রেষ্ঠ? অন্তত আমার ছোটখাটো, এখন প্রায়-বিলীন গল্পের পরিবারে এটাই কি আমার মতে সর্বোত্তম? হতে পারে। যে-মানুষটি প্রজননশক্তি হারিয়েছে, সে নিশ্চয়ই
তার প্রথম জীবনের সন্তানদের সেরা বলবে না। বেছে নেবে শেষের দিকের কয়েকটিকে বা একেবারে শেষটিকে।
'দুই রাত্রি' আমার শেষ গল্প নয়। তারপরেও, খুব সংযম আর বীর্যধারণ করেও, লিখেছি যা, তার সংখ্যাও মা-ষষ্ঠীর কৃপায় নেহাত কম নয়।
আর এ-লাইনে লেখা উচিত না। লাইনটা ছাড়ার আগে কোন্‌টাকে আমার পছন্দের চন্দন পরাব, এই কথা যখন ভাবছি, তখনই মনে পড়ল শেষ রাত্রি।
শিরোনামার দুটো শব্দের কোনোটাই গোলাপী নয়। একটা শেষ, আর একটা রাত্রি। তবু এটাকেই বাছলাম। এই জন্যে যে, এ হয়তো আমার মনের একটা মুহূর্তের কিছু কিছু কথা ধরে রেখেছে।
'দুই রাত্রি' নামটাও মিথ্যে। আসলে একটা রাত্রি। প্রথম রাত্তিরটা তো হোটেল-টোটেলে চাখাচাখি, মাখামাখি, সংক্রমণ আর বহির্গমনেই কেটেছে! লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের কাটে। তারা ভাবে পায়,
অথচ পায় না। অতএব তারা চলে আসে। আমার এই গল্পের চরিত্র দুটিও চলে এসেছিল।
তারা পাবে বলে চলেও গেল। দূরে, অনেক দূরে। সড়ক আর বন আর পাহাড় আর শ্মশান—অনেক চড়াই, অনেক বাঁক, অনেক উৎরাই।
কোথায় উতরোলো তারা? একটা শ্মশান, একটা ঝিল, একটা রেলগাড়ি—
কই তারা, কোনও কিছুর সন্নিহিত হতে পারল কি?
উত্তর: না, না, না। অথবা হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ।
হ্যাঁ, মানে ইয়েস এইখানে (ইয়েস্ স্যার, ইয়েস্ স্যার, থ্রি ব্যাগস্ ফুল)
হ্যাঁ এই কারণে যে, সহসা জ্যোৎস্নার বানভাসি ঘটে গেল। সহসা মনে হল সব ধুয়ে গেছে। সব যখন ধৌত, তখন কোনক্রমে একটি আমি কিংবা আর একটি তুমি টিঁকতে পারে। সুতরাং 'দুই রাত্রি' নয়, আসলে 'এক রাত্রি'।
যে-রাত্তিরটা কুহকিনীর মতো মাঝে মাঝে হাতছানি দিতেও পারে, না দিলেও ক্ষতি নেই। তবু ওরা থাকবে, ওরা বাঁচবে। এই মরে-যাওয়া কামনার ব্যাপারটা নিয়েই আমি বাঁচার একটা গল্প লিখতে চাই। চাওয়াটা পাওয়ার সঙ্গে কি মিলেছে? নাকি এই গল্পের দুটি চরিত্রের ক্ষেত্রে যা ঘটল, তা-ই? চাওয়া আছে, অথচ পাওয়াটা, হায় হায়, উবে যায়।
হেতু বা পরিবেশ এ সবই ঘটায়। আকস্মিকের চেয়ে এক-একটা মানুষ আর মেয়েকে পাটে আছড়ে ফেলার মতো ধোবা আর নেই।

সন্তোষকুমার ঘোষ
২২শে শ্রাবণ ১৩৮৫

দুই রাত্রি

এক রাত্রি

'তোমার শীত করছে সুধা?' স্টিয়ারিং এ হাত রেখে নিরুপম আড়চোখে তাকিয়ে বলল। বলেই তার মনে হল, এ কথা বললাম কেন। যদিও শেষ রাত তবু মাসটা তো অক্টোবর, এখন গাড়ি চলছে বলেই সুধার শীত করছে এ কথা ধারণা করার কারণ কী। আসলে পৌরসীমার শেষ চেক পোস্টটা পেরিয়ে যেতেই নিরুপমের মনে হয়েছিল চারদিক খুলে গেছে, সবুজ-সবুজ একটা গন্ধের ঝাপটা চোখে মুখে লাগছে। মনে হয়েছিল। দেখা যায় না, তবু সে যেন অনুভব করল রাস্তার দুপাশে রাশি রাশি জলজ তৃণ ছেয়ে আছে।

সে একা, এইরকম একটা আধিভৌতিক প্রতীতিওতাকে ভর করেছিল। সেই ছমছমে ভাবটা কাটাতে নিরুপম অহেতুক বলে উঠল, 'সুধা, তোমার শীত করছে?'

জানালা ঘেঁষে যে বসে, অস্পষ্ট, অপার্থিব, একটি অবয়বের আভাস মাত্র, তার দিক থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। 'সুধা!' নিরুপম একবার ডাকল নরম করে। 'সু-উ-ধা।'—দ্বিতীয়বার প্রায় চিৎকার করে। জানালায় পাশের মুখটা এদিকে ফিরল, তার চোখের পাতা কাঁপছে, ঠোঁট নড়ছে, সাড়া মাত্র ওইটুকু। কিংবা খুব ক্ষীণ 'কী?' অথবা অনুরূপ একটা ধ্বনি, ন্যূনতম, শোনা গেল।

'কিছু না। এমনি। ডাকলাম।'

'অতো জোরে! ওভাবে তো লোকে দূরের লোককে ডাকে।'

'তাই তো। হঠাৎ মনে হয়েছিল কিনা যে, আশে পাশে কেউ নেই। তুমি দূরে সরে গেছ।'

'পাগল,' সুধা বলল সংক্ষেপে, মুঠোভরা ধুলো ঝুরঝুর করে ছেড়ে দেওয়ার মতো স্বরে।

ড্যাশবোর্ডটা জ্বলছে ধূর্ত কোনও শৃগালের চোখ যেন, তার লাইটারে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিরুপম হাতঘড়িটায় সময় দেখে নিল। আকাশে লেশমাত্র মেঘ নেই, অসীম সৌভাগ্য, সেখানে এই শেষ প্রহরে রক্তাল্প একটা চাঁদ তখনও অবশিষ্ট। তাকে নিস্তেজ দেখে দু' চারটে তারা ইতস্তত ফুটি ফুটি করছে, নতুবা চরাচরে পরিব্যাপ্ত অন্ধকারই শুধু পরিদৃশ্য। হেডলাইটের খোঁচা খেয়ে চমকানো অন্ধকার কোথাও তড়াক করে লাফিয়ে উঠছে মগডালে, কোথাও আহত পশুর মতো নেমে পড়ছে নয়ানজুলিতে, ঘাসের সুবাসে মুখ ঘষে ঘষে বোবা ভাষায় গজরাচ্ছে।

তবু দমবন্ধ ওই গহ্বরটার বেড়াজাল থেকে যে বেরিয়ে আসা গেছে, এই ঢের। স্বভাবে শহরটা হিংস্র। গাড়ি নিয়ে অন্ধকারে কাউকে পাড়ি দিতে দেখলে বেশ খানিকটা পথ পর্যন্ত পিছু পিছু তাড়া করে আসে, গৃহস্থবাড়ির কুকুরের মতো। তারপর একসময় নিজেই থেমে যায়, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপায়, শ্বাস নেয় জোরে জোরে। অপলক চেয়ে থাকে, আক্রোশে নিষ্ফল ফোঁসে।

সুধা এসব কিছুই টের পায়নি! গাড়িতে উঠেই, ঘুম নয়, ঘুমের মতো। ঘুমের ভানটাই বেশি ভয়ানক, মৃত্যুর মতো।—'আমি যদি একটি শব বহন করে যেতাম, একাকী কোনও নিঃসঙ্গ অন্ধকার রাত্রে, সেই অনুভূতিও এইমতো হত,' নিরুপম স্বগত বলল, 'আশ্চর্য, শহরের রাস্তায় কতদিন দেখেছি, কিন্তু কোনও শব-শকটের চালকের মুখের দিকে কোনদিন তাকাইনি তো!'

শীত নেই, তবু ফিরে ফিরে সে শীতের কথাতেই চলে আসছিল।—'কাচ তুলে দাও সুধা, বুঝতে পারছি তোমার কষ্ট হচ্ছে।'

'না তো!'

তবে তুমি এত ঠাণ্ডা কেন। কথার পিঠে এই কথাটা মুখে এসে পড়ছিল, নিরুপম সামলে নিয়ে বলল, 'তোমার চুল এলোমেলো হয়ে যাবে।'

'এখন নেই বুঝি?' সুধা ফিরে তাকাল, একেবারে সোজাসুজি, চোখ দু'টি বিস্তারিত, ফলে তার সম্পূর্ণ মুখটাই অতিকৃত বৃহদাকার দেখাচ্ছিল, 'এখন নেই বুঝি' সামান্য জিজ্ঞাসা, কিন্তু তার অন্য কোনও অর্থ আছে। সুধা এই কথাই বলতে চাইছে কি 'আমার সবটাই তো এখন এলোমেলো অগোছালো,' গত রাত্রির একটি কুঞ্চিত স্মৃতিকে মেলে ধরতে চাইছে এই প্রাক্‌-সকালে?

'চুলের কাঁটা-টাটা সবই পড়ে আছে সেখানে, সেই হোটেলে, ঠিকঠাক হবার সময় পেলাম কই, চটিটা পায়ে গলিয়ে কোনরকমে—'

সুধা আস্তে আস্তে বলছিল, কিন্তু ততক্ষণে নিরুপমের ভিতরে একটা প্রতিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছে, বলতে চাইছে 'থামো' সেই সঙ্গে কাতর একটি অনুনয় 'দোহাই তোমার, ওই হোটেলের কথা টেনে এনো না।'

কিন্তু এতক্ষণ নির্জীব ছিল যে, সে সহসা নিষ্ঠুর নির্লজ্জ হয়ে গেছে, নিরুপম সুধাকে বলতে শুনল 'মনে পড়ছে?'

উত্তর দিল না নিরুপম। তার নত দৃষ্টি লহমার জন্যে তার বুকের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সুধা যখন উত্তর না পেয়ে বলল 'কী দেখছ,' নিরুপম শুকনো হাসল 'দেখছিলাম মন কোথায় থাকে।'

'মন তোমার আছে?' সুধার গলা ক্রমে শাণিত হয়ে উঠছিল। 'ছিল বলেই তো জানতাম,' নিরুপম হালকা গলায় বলল, অথবা, বলে হালকা হতে চেষ্টা করল। আমি কি ওকে হাসাতে চেষ্টা করছি, সে ভাবছিল, এই পাথরটাকে তাতাতে কিংবা মাতাতে? আমার ভূমিকা কি অবশেষে এই, একটা কাতুকুতু-দেওয়া ভাঁড়ের?

আত্মধিক্কারের ভাবটা ঝেড়ে ফেলতেই সে হঠাৎ জোরে বলে উঠল, 'সুধা, দ্যাখো, দ্যাখো।'

সুধা টেরচা চোখে চাইল, যেন কৃপা করে।—'কী দেখব, তোমার গাড়ি চালানো? সে তো অনেক দেখেছি।'

আর কিছু বলার নেই, বলে ফল হবে না। অথচ নিরুপম বলতে চেয়েছিল, দ্যাখো, দ্যাখো, একটু পরেই সকাল হবে, ভোরের প্রথম পাখিটা এক্ষুণি উড়বে, তাকিয়ে থাকো। বৃথা সুধা দেখবে না। চোখ সে মেলে আছে ঠিকই, সেই চোখ, যা কিছু দ্যাখে না।

এই চলবে, যতক্ষণ না সকাল হবে? মরীয়া হয়ে নিরুপম আরও তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে রাতটা পার হতে চাইছিল। ইঞ্জিনটা উত্তপ্ত, থরথর, সামনের একটা বাঁক ঘোড়ার নালের মতো বলে সে অতিকষ্টে টাল সামলে নিল।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' ফ্যাকাসে গলা, সুধা বলছে। সে-ই উদ্দিষ্ট বলে ধরে নিয়ে নিরুপম বলল,-'কোথাও না। শুধু যাচ্ছি।'

'তার মানে পালাচ্ছি,' সুধা বলল তিরস্কারের ঢঙে, কিন্তু কী আশ্চর্য, তাই মেনে নিয়ে নিরুপম কথাটার অবিকল প্রতিধ্বনি করে বলল, 'পালাচ্ছি! মণ্ডপে আগুন লাগলে লোকে ছুটোছুটি করে বেরোবার পথ খোঁজে, বেঁচে থাকা থেকে পরিত্রাণ পেতেও আমরা তেমনই যে যেদিকে পারি ছুটছি।'

'কাল রাত্তিরে ওই হোটেলে কি আগুন লেগেছিল?' সুধা জিজ্ঞাসা করল, নিরুত্তাপ কন্ঠ, 'আর তাই কি নিরুপম, আমরা ছুটে ছিটকে বেরিয়ে পড়েছি?'

'সুধা,' নিরুপম যেন প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, 'বারবার হোটেলটার কথা তুলো না, কালকের দুঃস্বপ্নকে আজকের দিনটাতে টেনে এনো না। সকাল হচ্ছে। টের পাচ্ছ না যে, সকালের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে?'

'সকালের একটা গন্ধ থাকে বুঝি? সুধা বলল আস্তে আস্তে 'গন্ধটা কিসের, ফোটা ফুলের?'

'সকালের নিজেরই একটা সৌরভ আছে তার জন্যে ফুল ফোটার দরকার হয় না।' নিরুপম বলল, প্রত্যয়ের সঙ্গে। গাড়িটাকে এক পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেন সেই সকালেরই অপেক্ষা করতে থাকল।

ঝিঁঝি ডাকছিল ঝোপে-ঝাড়ে। পাখির বাসায় সাড়া পড়ে যেতেই ঝিঁঝিরা থেমে গেল। ফরসা ফ্যাকাসে একটা দিন, আর একটা দিন চোখ মেলছে, কাছের দূরের দৃশ্যপট লুপ্ত কায়া ক্রমশ ফিরে পাচ্ছে। পাশ থেকে সুধার মুখের একাংশ দেখা যাচ্ছিল, সেই মুখও ফরসা, ফ্যাকাসে! শেষ রক্তবিন্দুও যেন কেউ শুষে নিয়েছে। শুধু নিরুপমের মনে হল, সুন্দর। ওই সৌন্দর্যকে অধিকার করার বাসনা তাকে অকস্মাৎ আন্দোলিত করতে শুরু করল।

হাতটা ছাড়িয়ে সুধা বলল, 'ছিঃ, এই বাসি মুখে?' নিরুপম শুনতে চাইল না। তখন ধমক দিয়ে সুধাকে বলতে হল 'ওরা দেখছে।'

'কেউ তো নেই। কারা?'

এক ফালি জমির ওধারে একটা কুঁড়েঘরের বাইরে দুটো মুরগি চরছিল, সুধা ইশারায় তাদের দেখিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু'জনে মিলে হাসল। মেঘ কেটে যাচ্ছে, ভারী হাওয়াটা হালকা হচ্ছে আবার। নিরুপম বলল, 'দেখেছ না। কারণ মোরগটা মুরগিটাকে নিয়েই এখন ব্যস্ত।'

'মুরগিটা খুঁটে খুঁটে ওকে কী যেন দিচ্ছে।'

নিরুপম সহসা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুমিও আমাকে কিছু দাও।'

প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকাল সুধা।—কী দেব। সবই তো নিয়েছ কাল, এই তো কয়েক ঘন্টা হল মোটে। নাওনি?'

'না না সুধা,' নিরুপম অধীর গলায় বলে উঠল 'নিইনি। নিতে পারিনি, অথবা পাইনি। তুমিও দাওনি।'

অচঞ্চল, স্তব্ধ সুধা কান পেতে শুনল। বর্ণহীন মুখে একটু একটু রঙ, রক্ত যেন ফিরে আসছে। নিরুপমের অস্থিরতাকে ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা দিয়ে স্পর্শ করে খুব নীচু স্বরে বলল—'ওর চেয়ে বেশি দেবার মেয়েদের আর কী থাকে?'

'আছে' নিরুপম পরিপূর্ণ কন্ঠে বলল, 'নিশ্চয় আরও আছে। পাওয়ার চরম চেহারাটা কি অতো অগভীর হতে পারে? আমরা বেরিয়ে পড়েছি তাই তো।'

'যেখানে যাচ্ছি, সেখানে বুঝি সব পাব?'

প্রবল বিশ্বাসে স্থির কন্ঠে নিরুপম বলল 'পাব।'

এর পর তখনকার মতো আর কথা ছিল না। এক ঝাঁক বক শাদা পাখা মেলে তখনই হাসিতে হলুদ একটা বাবলা গাছের তলায় বসল।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করেছিল, এবার অব্যস্ত গতিতে। পথের পাশের দূরত্ব-জ্ঞাপক প্রতিটি শিলালিপি পড়া যাচ্ছে। নিরুপম হেসে বলল, 'আমরা কালের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছি, কিন্তু এই মাইলের লেখাগুলো আমাদের স্থানের বাইরে যেতে দিচ্ছে না।'

'স্থান আর কাল', শুনে, সুধা বলল, 'এই নিয়েই তো সমাজ?'

'এবং সংস্কার। আমরা যা পার হতে পারছি না।'

সীটে হেলান দিয়ে সুধা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনল, তার চোখ আবার বুজে এসেছিল, পা দুটি যত দূর মেলে দেওয়া যায়, দিয়ে সে শরীরটাকে ছড়িয়ে দিল। চোখ বুজেই সুধা বলল, যেন অন্য কাউকে, 'নিরুপম, আমাকে ক্ষমা কোরো। কাল তোমাকে বোধহয় শুধু কষ্টই দিয়েছি।'

'সুধা, কষ্ট তুমিও তো পেয়েছ।'

'কিন্তু তোমার সমস্ত আয়োজনটা নষ্ট হল। আমি—' সুধা সসংকোচে উচ্চারণ করল, 'কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না নিরুপম যে, আমাদের সম্পর্কটা নিষিদ্ধ।'

কী উত্তর দেবে নিরুপম, কী দিতে পারে। সাজানো কোনও সংলাপ?—'নিষিদ্ধ বলে কিছু নেই সুধা। যা নিষিদ্ধ তাই প্রসিদ্ধ হতে পারে, তার প্রমাণ বৈষ্ণব কাব্য।' —কিন্তু বানানো কথা দিয়ে সুধার দ্বিধাকে অপমান করতে ইচ্ছা হল না। বরং দায় আর দোষ নিজের কাঁধে নেওয়াই বেশি পুরুষোচিত। বলল, 'ভুল আমারই হয়েছিল সুধা। ওখানে, ওই হোটেলটাতে তোমাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। তবু বিশ্বাস করো, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, যা চাই, ওখানে তা মিলবে।'

'কী চাই?' উদাস গলায় সুধা বলল, চোখ তেমনই নিমীলিত। —'তোমার দোষ নেই। আমরা আসলে সুখ আর আনন্দের তফাৎ বুঝি না।'

চুল অল্প অল্প উড়ছিল সুধার, একটি স্মৃতি ছোট ছোট কম্পন হয়ে একবার ওর সারা দেহে প্রবাহিত হয়ে গেল। সুধার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, কঠিন কয়েকটি পেশী, পরিস্ফুট কয়েকটি শিরা ওর ক্লিষ্ট মুখখানাকে মমতার যোগ্য করে তুলছিল। নিরুপমের লোভ হল, রুমাল বের করে তার মুক্ত হাতটি দিয়ে সন্তর্পণে সুধার কপালটা মুছিয়ে দেয়। ও কি ফিরে গেল গতরাত্রির ক্লিন্ন অন্ধকারে? নিরুপমের মনে হল সে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্যাঁতসেঁতে সুড়ঙ্গের ঠিক মুখটাতে, আর সুধা টলতে টলতে প্রাচীরে ধাক্কা খেতে খেতে প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভিতরে, নিরুপম চেঁচিয়ে ডাকছে 'সুধা আর যেও না, হারিয়ে যাবে, ফিরতে পারবে না,' কিন্তু তবু সুধা, সম্মোহিত, আচ্ছন্ন, যেতে থাকলই, কখন প্রকাণ্ড একটা কবাট ধস করে পড়ে গেল, আর দেখা যায় না, নিরুপমের নিজের গলাই প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল।

এখানে কী, এখানে কেন, সুধা প্রথমেই বলেছিল, বিস্মিত আড়ষ্ট, সন্দিগ্ধ। ওর সমস্ত ভঙ্গিটাই একটা প্রতিরোধ হয়ে গিয়েছিল। যখন বাচ্চা ছোকরাটা ওদের বারান্দার পর বারান্দা পার করে দিয়ে একটা কামরায় বসিয়ে দিয়ে গেল, যাবার সময়ে,

টেনে দিয়ে গেল দরজাটা। ছোকরার মুখে একটু মুচকি হাসি ছিল হয়ত, নিরুপম লক্ষ্য করেনি, কিন্তু সুধার চোখে সেটা পড়ে থাকবে, পলকে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল সুধার মুখ, যেন আঁতকে উঠে বলল, 'এখানে কী?'

'এখানে সন্ধ্যা, যেখানে আমরা এসেছি', নিরুপম থতমত খেয়ে এর চেয়ে সম্ভ্রান্ত কোনও উত্তর দিতে পারেনি।

'এ-খা-নে!' অত্যন্ত ক্লান্ত, আহত সুধা বলেছিল টেনে। দু'হাতে খানিকক্ষণ চোখ ঢেকে রেখেছিল।

কিন্তু সুধা তুমি এখনও কেন চোখ বুজে মাঝে মাঝে কাছে এসে দূরে চলে যাচ্ছ, এই লুকোচুরি এখন আর মানায় না, এখন, যখন চেয়ে দ্যাখো, গাড়ি ছুটছে, মসৃণ, সাবলীল, ইচ্ছে হলেই ওর গতি আমি বাড়াতে কমাতে পারি, একটু আগে চমৎকার রোদ ছিল, এখন হঠাৎ মেঘলা, সামনের কাচে ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছে, জমুক; টলটলে অশ্রুপ্রতিম, বেশ দেখাচ্ছে, ওয়াইপার চালাব না, সে-সময় এখনো আসেনি, কয়েকটা ফোঁটা তো মোটে, বাতাসে শুকিয়ে যাবে।—'এই এই।' নিরুপম সুধাকে ঠেলা দিয়ে ডাকল। সুধা তাকাতে বলল, 'চা খাবে?'

সুধা বলল, 'মন্দ হয় না, কিন্তু পাব কোথায়, ফ্লাস্ক তো আনিনি।'

'রাস্তার ধারে, কোনও একটা দোকানে। মাঝে মাঝে ছোটখাটো বাজার আছে, এতক্ষণ নিশ্চয় ওরা তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছে।'

দোকান থেকে দু'টি ভাঁড়ে ওরা চা নিল, কিন্তু গাড়িটা থামাল গঞ্জ ছাড়িয়ে। এখান থেকে রাস্তাটা হঠাৎ ঝাঁপ দিয়েছে। তার অনন্ত বনাতের আভাসটুকুও মেলে না।

ঠাণ্ডা খানিকটা জল নিরুপম ঢালল গাড়িতে, বাকীটায় সুধা চোখে জলের ঝাপটা দিল। ওর ভুরুতে, গালে, কানের কোণে জল চিকচিক করছে, একটা স্নিগ্ধ ভাব এসেছে। স্নিগ্ধতারও একটা সৌরভ আছে, নিরুপম মুগ্ধ হয়ে ভাবল।

'এই।' অবাক হয়ে সে শুনল সুধাও তাকে ডাকছে 'এই!' জলের ছোঁয়া ওর ভিতরেও লেগেছে। সুধা বলছে, 'এই, এ-পথে আমরা আগে কখনও এসেছি?'

'কেন? তোমার মনে নেই? সেবার—সেবার অবশ্য উৎপলও সঙ্গে ছিল।' অবশ্য, নিরুপম ইচ্ছা করেই অবশ্য শব্দটা ব্যবহার করল। (উৎপল তোমার স্বামী সুধা, সে তো অবশ্যই। বরাবর সে অবশ্যই ছিল)।

উৎপলের নাম সুধা শুনল কি শুনল না, অন্তত যেন শোনেনি এই রকম নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেবার বোধহয় রাস্তার দু'ধারে ফুল ছিল।'

'হ্যাঁ, পলাশ। সেটা মার্চ মাস ছিল যে।'

'এই ঋতুতে ফুল নেই?'

'আছে। অন্য ফুল। সেবার কিন্তু খুব গরম ছিল, একটু বেলা হতে না হতে সব তেতে উঠত, শুকনো হাওয়া আর ধুলো, টকটকে ফুলগুলোর চারপাশে বোলতা আর ভোমরা চক্রাকারে অবিরত ঘুরত।'

'তুমি আমাকে এক গুচ্ছ পেড়ে এনে দিয়েছিলে,' সুধা দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে বলল। —'মনে আছে। চুলে পরতে তুমি বলেছিলে, ঠিক সাঁওতালীদের মতো। শুনে উৎপল কী বলেছিল বলো তো?'

'মনে পড়ছে না।'

'রেগে উঠে বলেছিল আমার বউ বুঝি সাঁওতালদের মতো কালো?'

নিরুপম মনে মনে বলছিল, 'সুধা, উৎপলের কথা থাক।' কিন্তু মনে মনে বলা

বলেই সে-কথা সুধার কানে গেল না। সে আস্তে আস্তে বলল, 'উৎপল এই রকমই। চোখ নেই।'

হয়ত দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে, হয়ত শুধুই ওই কথাটা চাপা দিতে, নিরুপম আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

---সেই হোটেলে দুটি হাঁটুর মধ্যে ঘাড় গুঁজে অতক্ষণ বসে রইল, অথচ সুধা তো জানত। আমি ওর এই প্রতিক্রিয়ার, সত্যি বলতে কী, অর্থ বুঝিনি। মুহূর্ত-গুলো যেন কাতর তিতির পাখি, কোথাও বন্দুকের আওয়াজ হতেই ভয়ার্ত পালাচ্ছে। আস্তে আস্তে ঘরটাই যেন মুছে যাচ্ছে, সবই লুপ্ত হয়ে যাবে নাকি হে ঈশ্বর, অকৃতার্থ, অনির্দিষ্ট কোনও ধারায় অভিযুক্ত আমিও একটা চেয়ারের হাতল ধরে বসেছিলাম, ওই চেয়ারটাই কাঠগড়া আমার, হতভাগ্য এক আসামীর, যে নতশির বসে আছে, সে আর নিয়তি এক নারী, দু'জনকে মাঝখানে রেখে সময় আর পরিবেশ একটা দ' তৈরি করে ঘুরে যাচ্ছে।

অথচ সুধা তো জানত। কী একটা ইনটারভিউ পেয়ে সে দিল্লি যাচ্ছে, খবরটা উৎপল আমাকে উৎফুল্ল গলায় দিতেই সুধাই তো ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে প্রথম আমার দিকে তাকিয়েছিল। সেই চোখ দুটি তাদের পাতায় পাতায় তালি বাজিয়ে বলছিল, 'এত দিনে, এত দিনে।' উৎপল বলল 'যেতে আসতে সাতদিন। ওরা ফার্স্ট ক্লাস ভাড়া দিচ্ছে, খুব বড় একটা চান্স। দেখি, যদি আমার কপাল ফেরাতে পারি' ঘাড় কাৎ করে সুধা শুনছিল, খরগোস যেমন ঝোপ-ঝাড়ে কান পেতে শিকারী প্রাণীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে কিনা মন দিয়ে শোনে। সুধার দৃষ্টি দ্রুত আমার সঙ্গে বৈদ্যুতিক বার্তা বিনিময় করছিল। 'বোকা', সেই দৃষ্টি বলছিল 'বোকা, ও ভেবেছে বড় চাকরি পেলেই ওর বরাত ফিরবে, ও তোমার সমান হবে।' আরও একটা অনুনয় আমি ওই নিবিড় করে সুর্মা-টানা চাহনিতে পড়েছিলাম, অনুনয় অথবা অনু-মতি।---'এইবার', সেই চাহনি বলছিল 'এইবার। তুমি একটা ব্যবস্থা করো এই বাড়িটা ছাড়া অন্য কোথাও। যেখানে তৃতীয় কেউ নেই, শুধু আমরা। কানামাছি খেলা, চুরি করে ছুঁয়ে এসেই বুড়ি ছোঁয়া, আর সহ্য হয় না। কথাগুলো নিঃশব্দ বুদ্‌বুদের মতো ফাটছিল। আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

হাওড়া স্টেশনে উৎপলকে উঠিয়ে দিয়ে আসবার পর থেকেই সুধার মধ্যে পরিবর্ত-নের ভাব টের পেয়েছিলাম, সতেজ ধরনটা আর নেই। গাড়িতে ফিরে এসে ও চুপ করে ছিল। একবার বলল, 'সারাদিন ঘোরাঘুরি, ক্লান্ত লাগছে।' তার পরেই বলল, 'মনটা খারাপ লাগছে, জানো! উৎপলটা একা চলে গেল। ট্রেন ছাড়ার পর হাত বাড়িয়ে বলছিল 'ভাল থেকো, সাবধানে থেকো।' বারবার বলছিল। 'তুমি শোননি?' একটু পরেই আমরা হোটেলটার বাইরে এসে থামলাম।

সুধাও নামল। অনিশ্চয়তা ওর প্রতিবারের পা ফেলায়, অনুভব করছিলাম। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললাম 'কী হয়েছে সুধা, কী--কী?' সুধা বলেছিল 'কিছু না। হঠাৎ যেন একটা ছবি মনে পড়ে গেল---বিশ্রী। বোধহয় বিলিতি কোনও সিনেমায় দেখেছি। একটা বাচ্চাকে কবর দিয়ে আসার পর তার বাবা-মা শোবার ঘরে ঢুকছে। ঘরে আলো জ্বলেনি। দু'জনেই মুখ থুবড়ে ফাঁকা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। আরও অন্ধকার নামছে, দু'জনেরই পিঠ ফুলে উঠছে। শেষে সেই অন্ধকারে হঠাৎ দু'জন দু'জনকে, যেন ভয় পেয়ে

আঁকড়ে ধরল, তার পরেই কেটে গেল সেই দৃশ্য। ভাবতেও কাঁটা দেয়---আমি আর ছবিটা দেখতে পারিনি।'

শুকনো গলায় বলেছি 'তাই বুঝি। কিন্তু---কিন্তু সুধা, তার সঙ্গে আজকের মিল কী? উৎপল---আমরা তো শুধু ওকে বিদায় দিয়ে এসেছি।'

সুধা শান্ত স্বরে বলল, 'ঠিক। বিদায় দেওয়া আর কবর দেওয়া, দুটোকে ঠিক এক বলা যায় কি?'

একটা লোক-বোঝাই বাস এক দিকে, তার পাশ কাটিয়ে চলে আসছে ট্রাক, ভয়ংকর-গতি, দুটোর মাঝখান দিয়ে গাড়িটাকে অবলীলায় পার করে এনে নিরুপম একটু দম নিল। রাস্তার দু'ধার এমন নিষ্পাদপ, নিস্তৃণ। সুধাকে ঠেলে তুলে দেখিয়ে দিল।

দেখল সুধা, কিংবা দেখল না। একবার বলল 'কিছু তো নেই। ধু-ধু করছে তো শুধু।

নিরুপমের বলতে সাধ গেল 'সেইটাই তো দেখাচ্ছি। মাঠের পর মাঠ, দূরে দূরে কালো কালো বিন্দু। যত কাছে যাব, কালো ফোঁটাগুলো বড় হয়ে উঠবে। এক-একটা তালগাছ, এই সব প্রান্তরের নিঃস্বতার প্রহরী। প্রান্তরগুলো রিক্ত, নিজেদের জন্যে কিছু রাখেনি। রাখেনি বলেই ওরা আমাদের অনেক কিছু দেয়, দিতে পারে।' বলতে সাধ গেল, বলা হল না।

সুধা বলল, 'সেবার যেন একটা অভ্রক্ষেতও দেখেছিলাম, কুচি-কুচি রুপো ছড়ানো সারা মাঠে। সে কত দূরে?'

নিরুপম বলল, 'আরও বেশ কিছু গেলে। সবে আমরা পাহাড়ের একটা মহল পেরিয়ে এসেছি। মাঝে একটা লম্বা শালবন গেল, তার তলায় মাটিতে ছায়া আর রোদে মিলে জেব্রা আঁকা। তুমি চেয়েও দ্যাখোনি।'

'---এখানে কেন, এখানে কী', সুধা বলে উঠেছিল। সে আরও কতক্ষণ পরে? ছোকরা চাকরটা মুচকি হেসে দরজা টেনে দিয়ে গেল। সে ফিরেও এসেছিল। কতক্ষণ পরে? গরম দু' প্লেট পকোড়া আর চা রেখে গেল। চমকে উঠে সুধা বলল 'এ কী!' খানিকটা চা চলকে ফেলল। সব স্বপ্ন টুকরো হয়ে যাচ্ছে, আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, বিরক্ত গলায় বলে ফেললাম, 'সুধা, তুমি এমন ভাব করছ যেন কিছুই জানো না। যেন---' ফুস করে বেলুনের বাতাস বের করে দেওয়ার মতো ভঙ্গিতে যোগ করলাম 'কচি খুকি'।

সুধা তখন ওর সম্পূর্ণ মুখ-পূর্ণিমা আমার মুখে স্থাপিত করে বলল, 'না, জানি। আমি খুকি নই। আমি বত্রিশ। তোমার প্রেমিকা। কিন্তু রক্ষিতাও কি?'

চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'সুধা!' দেওয়ালের কান থাকলে সেই বিকট শব্দে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ত!

'তবে কেন', সুধা বলে চলেছিল 'তুমি এখানে আমাকে এনেছ?'

'সুধা, তুমিও তো বলেছিলে আলাদা কোনখানে, তুমি জানো না এর জন্যে আমার কত---'

'কত টাকা খরচ হয়েছে বলতে চাইছ তো?'

মরীয়া, ভাঙা গলায় বলতে থাকলাম, 'সুধা, তুমি বলেছিলে, আজ বাড়ি ফিরতে চাও না, আজকের সন্ধ্যেটা আমাকে দেবে। পরে তোমার দিদির বাড়ি যাবে—শ্বশুর-শাশুড়িকে সেই কথাই বলে এসেছ।'

'তাই বলে এখানে?'

আবার আমার মাথা বেঠিক হয়ে গেল, মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে 'যাদের যাবার জায়গা নেই, যারা নিরুপায়, তারা আর কোথায় যায়? কোথায় যাব ভেবেছিলে তুমি? মন্দিরে?'

'না', সুধা চেয়ে রইল একদৃষ্টে।—'আমারই ভুল হয়েছিল। এইখানেই তো, এই অপমানে। এই আধা-বেশ্যালয়ই আমার উপযুক্ত।'

তখনও থামেনি সুধা, নেশাগ্রস্ত বা ভূতাবিষ্ট, কোনও দম-দেওয়া পুতুলের মতো বলে গেছে, 'কিন্তু তা হলে? তা-হলে ওই বেয়ারাটা টীপট দিয়ে গেল কেন। ওকে ডাকো, গ্লাস-ট্লাস আরও কী-কী সব আনুক, এখানে রাখুক?'

তখন আমি হাত তুলে ভীষণ জোরে সেই দম-দেওয়া পুতুলটাকে চড় মারলাম।

সেই চড়ে কাজ হল, চড়টা যেন জাদুর কাজ করল। ওর গালে রক্ত জমাট, কিন্তু চোখের মণিতে আর সেই হিংস্র দ্যুতি ছিল না, অতর্কিত আঘাতে ফণিনী বশীভূত। ঠাণ্ডা স্বরে তাকে বলতে শুনলাম, 'একটু বোসো।' বলেই সে, খোলা দরজা দিয়ে সংলগ্ন স্নানের ঘর দেখা যাচ্ছিল, সেখানে ঢুকে গেল। জলের ঝাপটা, খস খস শব্দ, কিন্তু বোধহয় পাঁচ মিনিটও নয়, সুধা বেরিয়ে এল। সে এক ভীষণ বিস্ময়, আলগা করে শাড়ি-পরা, ওর হাতে কয়েকটা কাঁটা, চুল একেবারে খোলা, নগ্ন বাহুমূল আর কাঁধের উপর দিয়ে ঢালা, সুধা হাসছিল, কিন্তু অস্বাভাবিক সেই হাসি, হাসছিল, হাসতে হাসতেই বলল, একেবারে তৈরি হয়ে এসেছি।' কপালের টিপটা নেই, মুছে এসেছে, হাতের কাঁটাগুলো রাখল ড্রেসিং টেবিলে, 'দেখছ তো, যদিও কচি খুকি নই, রীতিমত বর্ষীয়সী, তবু আমার চুল পরচুলো নয়, দেখছ তো,' আমি বিকারের প্রলাপ শুনছি, নুয়ে পড়ে সুধা হাত ঘড়িটা খুলল, ওর পিঠের আঁচল সরে গিয়েছিল, দেখতে পেলাম অন্তর্বাস নেই, আঁচল সরে গিয়েছিল বলেই, ছোট জামাটা নেই দেখতে পেলাম, পিঠের কাছে পর পর দুটো বোতাম শুধু। পৃথিবীর সবচেয়ে সোজা অঙ্কের মতো, 'তৈরি হয়েই এসেছি, সে বলল আবার, চাপা গলায়, হিস্ হিস্ হিস্ হিস্, পিচ্ছিল সাপ জড়িয়ে ফেলছে আমায়, আলো নেই, আলোটা পুট করে নেবাল কে, টের পাচ্ছি। সেই গলা যেন আরও গলা নকল করে, কার গলা, কার—কার, বলছিল 'এই তো চেয়েছিলে তুমি, এই তো চাও?'

কী চাই আমি, কী নেব, কী দেব, চাওয়া-পাওয়া দেওয়া-নেওয়া সব অন্ধকারে কাঠ ঠোকরানো, অন্ধ আর্ত দু'টি কাঠঠোকরা পাখি, শরীর মানে কি এক খণ্ড কঠিন কাঠ, কঠিন সাড়াহীন, সাড়াহীন কিন্তু জ্বলছে, রচিত চিতায় বিকট ফটফট যেন, তবু বারবার তাকে ছুঁচ্ছি, যত ছুঁচ্ছি তত আমার সব কিছু ঝলসাচ্ছে। যখন আলো জ্বাললাম তখন আমার পাশে পোড়া কাঠ ছাড়া কিছু পড়ে ছিল না।

অন্য রাত্রি

এ-সব কথা গত রাত্রির, না কত জন্ম আগেকার? মনে হচ্ছে বহু, বহু, বৎসর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত যেন, শত শত মাইলের কালো পাথর, কাঁকর আর রুক্ষ মাটি,

মাড়িয়ে চলেছে তো চলেইছে, নিরুপম একবার মাথায় হাত দিল এই দীর্ঘ সময়ে ওর সব চুল সাদা হয়ে যায়নি তো! যদি গিয়ে থাকে, তবে সুধা কি তাকে চিনতে পারছে, ঘুম ভেঙে সকালে একবারও কি ভাবেনি, শীর্ণ শিরা-ওঠা এই মানুষটা আমার পাশে কোথা থেকে এল, এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছেই বা কেন?

না, ওই একটা গুণ সুধার, বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করে না। হোটেলে প্রথমেই যা চেঁচিয়ে উঠেছিল। তারপর চুপ, সেই থেকে চুপ। ওই কামরাটায় আলো জ্বলে ওঠার পর ঠিকঠাক হয়ে এসে বলেছে 'আর কী। এবার চলো।'

'তোমার দিদির ওখানে যাবে তো?'

'এত রাত্রে?' ঘড়িটা দেখে নিয়ে সুধা বলল, 'ওখানে আর যাওয়া যায় না।'

'তবে কি তোমাদের, মানে উৎপলদের বাড়ি?'

'সে তো আরও অসম্ভব। তোমার—তোমার কোনও জায়গা জানা নেই?'

নিরুপম বলেছে 'আছে।' তারপর গাড়ি যখন শহরতলির পথ নিল তখন—'সুধা, তোমার ভয় করছে?'

'ভেঙে গেছে।'

কোন কিছু পাবার আশা, তাও নেই কি? নিরুপমের একবার মনে হল যে জিজ্ঞাসা করে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবল যে, না দরকার নেই। সুধা যদি বলে 'ওই বিছানায় একটা শাঁখা পড়েছিল, দেখতে পাওনি? কখন পুট করে ভেঙে গেছে, আমার আশা-টাশা এখন ওই ভাঙা শাঁখাটার মতন। টুকরোগুলো কুড়িয়ে ওই ঘরেই একটা ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে এসেছি।' না, গত রাতের জের টেনে আর লাভ নেই। তার চেয়ে সুধা যেমন আছে, তেমনই থাকুক। শান্ত, সম্মত।

আশ্চর্য প্রতিটি মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে, অপঘাতের পরও। নতুবা সেই গন্ধময় অন্ধ রাত্রির পর আমি একটি সকালে প্রসারিত হতে পারতাম কি, নিরুপম ভাবছিল। কলকাতায় কত বেলা অবধি ঘুমিয়ে কাটাই। সকাল উষাকাল, কতকাল পরে প্রত্যক্ষ করলাম। কী অবাক ব্যাপার, সকালের তো বয়স বাড়েনি, সে অবিকল তেমনই আছে, তাকে আমার শিশুকালে যেমন দেখতাম। পাহাড় প্রান্তর, নদ-নদী, অরণ্য, নিসর্গের কোনও কিছুর বয়স বাড়ে না। বাড়ে শুধু নর আর নারীর।

ক্রমাগত চড়াই ভেঙে ভেঙে নিরুপম ক্লান্ত হয়ে উঠছিল। পর পর অনেকগুলো মাইলফলক ভাঙা বা লেখা মুছে-যাওয়া, কতদূর এলাম, গাড়ির মাইলোমিটার ঠিকমত কাজ করছে তো! ঠিক তখনই ঝেঁপে বৃষ্টি এল, দৃষ্টিহারা বৃষ্টি, বাঁকের পর বাঁক, পিছলে যদি যাই, কোথায় পড়ব। দু'পাশের ঘন পাতার ছাতায় টুপ-টাপ, টপর-টপর, একটানা এক-একটা উপত্যকা হাঁ করা, তারা বলে দিচ্ছে কোথায় পড়ব। কিন্তু পার্শ্ববর্তিনী নিথর-নিশ্চুপ হে রমণী, তুমি কিছু বলছ না কেন। নিরুপম ঈষৎ ভীত বলেই ক্রমশ রুষ্ট হয়ে উঠছিল, কামনা, লোভ, ক্রোধ সব পাশাপাশি থাকে। রিপুরা সব সহোদরা। আর তুমি অবুঝ সুধা, কিছু বুঝছ না। কাল যদি অন্যায় করে থাকি, দু'জনের জন্যেই করেছি। অথচ রত্নাকরের রমণী, তুমি এখন আলাদা হয়ে যেতে চাইছ। হতে পারে, স্থান হিসাবে ওই কামরাটা নির্বাচন—আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু সুধা তুমিও কি নিরালা একটি ঘর, একটু সঙ্গ, অন্তত একটি প্রহর কতবারই তো চেয়েছ, চাওনি? আমরা চুরি-করা ঘন্টার পর ঘন্টা জুড়ে গাড়িতে গাড়িতে শুধুই তেল পুড়িয়েছি, একবার তোমারই অস্থির নির্বোধ টানাটানিতে গেলাম তোমার এক বান্ধবীর ওখানে, সুবিধে হয়নি। কখনও হন্যে হয়ে ময়দানে, ছিঃ

ময়দানে! এই শহরটার ইতিহাস কোনও দিন যদি রচিত হয়, তাতে এই কথাও লেখা থাকবে যে, এখানে প্রণয়ী-যুগলের জন্যে সুচারু কোনও স্থান নেই, নির্দয় শহরটা শরণার্থী প্রেমের জন্যে কোনও আশ্রয় রাখেনি। তবে?

খানিক পরে বৃষ্টির শেষ, পাহাড়েরও শেষ পাওয়া গেল বলেই নিরুপম যেন একটু ধৈর্য ফিরে পেল নইলে তার উন্মত্ততা হয়ত বাড়তেই থাকত। দিগন্ত পরিষ্কার, রাস্তা এখান থেকে আবার ঢালু, কিন্তু এ কোন্ রাস্তা? পীচ কই, এতো লালমাটি। জলের ধারায় সব চিহ্ন যখন লুপ্ত, সে কোনমতে সামলে সামলে গাড়ি চালাতেই ব্যস্ত, তখন কি ভুল কোনও রাস্তা ধরেছিল? মনে তো পড়ে না। হাইওয়ে থেকে কতদূরে সরে এল? বোঝা যাচ্ছে না। তখন চার দিকে চেয়ে নিরুপম ব্যাকুল গলায় বলে উঠল 'সুধা, কিচ্ছু চিনতে পারছি না। আমি বোধ হয় ভুল পথে চলে এসেছি!'

একটুও বিচলিত হয়েছে, ভাব দেখে বোধ হল না সুধার, যেমন অচঞ্চল ছিল তেমন ভাবেই গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল। ঘুরে ওপাশে এসে হাত বাড়িয়ে বলল 'এসো।'

লম্বা ভিজে ঘাস, ওরা আস্তে আস্তে খানিকটা পথ উঠে গেল। পাহাড়ের গায়ে থাক-থাক কাটা, পাহাড়ীরা বোধহয় ওইভাবে পরিশ্রমী ফসল ফলায়, চাষ করে—সেই পথ ধরে আরও কিছুটা যেতে একটা বাঁধ, তার উপরে দাঁড়াতে দেখা গেল একটা ঝিল, পরিপূর্ণ। যেখানে দাঁড়িয়েছিল ওরা, সেখানে অনেকটা ঘাস পোড়া পোড়া, ফাঁকে ফাঁকে অর্ধগোলাকৃতি বেশ কিছু জমি, প্রাকৃতিক কোনও খেয়ালে গেরুয়া রঙের নয়, সাদা বালি-বালি!

'সুধা, আমরা কি কোনও শ্মশানে এলাম?' নিরুপম বলে উঠল ম্রিয়মাণ স্বরে।

'অন্য কিছুও হতে পারে। তুমিই তো বলেছ, পাহাড়ীরা নিজেরাই মাঝে মাঝে আগুন লাগিয়ে জঙ্গল সাফ করে।'

'এ তা নয়,' নিরুপম আঙুল দিয়ে মাটির হাঁড়ি, কিছু চেলা কাঠ আর গোটা দুই গর্ত দেখিয়ে দিল। সে একটা উঁচু মতন ঢিবি দেখে বসে পড়েছিল। সুধা এগিয়ে এল তার কাছে। ওর কাঁধে হাত রেখে বলল 'তুমি আচ্ছা মানুষ তো। এইটুকুতেই ঘাবড়ে গেছ? আমরা জলে পড়েছি নাকি!'

অনুতপ্ত কণ্ঠ, দৃষ্টি বিহ্বল, নিরুপম মাথা নেড়ে নেড়ে বলল 'সে-জন্যে নয়, সুধা সে-জন্যে নয়, নেহাত ঝোঁকের মাথায় এত দূর চলে এসেছি। কাল সব কিছু হিসেবের ভুল হল বলে মাথার ঠিক ছিল না আমার। রোখ চেপে গেল, যেভাবে পারি টেনে নিয়ে এলাম তোমাকে, ফাঁকিটা উশুল করব। জেদের বশে এত দূর করলাম। তোমাকে বলেছি একটা কোথাও যাচ্ছি কিন্তু কোনও বিশেষ জায়গা ঠিক করা ছিল না। সুধা, তোমাকে আমি মিথ্যে কথা বলেছি।'

সুধা ওর একটা হাত তুলে নিল—'আমাকে নয়, মিথ্যে বলেছ তোমাকে।'

নিরুপম বলল, 'সে তো ওই একই হল; কিন্তু আমরা আজ ফিরে যাব কিভাবে? আমার হাত-পা অবশ, এতখানি পথ ফের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া—আমার সাধ্যে কি কুলোবে?'

উত্তরে সুধা বলল, 'স্টিয়ারিং এখন তো আমার হাতে।' রহস্যপূর্ণ ভঙ্গি, অল্প-অল্প হাসি, নিরুপম কথাটার মানে বুঝল না। থতমত খেয়ে বলল 'সুধা, তুমি তো—'

'গাড়ি চালাতে জানি না, তাই বলছ তো? গাড়ি চালিয়ে যতটা আনা যায়, তুমি আজ চালিয়েছ। এখানে আজকের বাকীটা, নিরুপম, আমাকে চালাতে দাও।'

'এখানে, এই শ্মশানে?'

'এই শ্মশানে। নিশ্চয় কোনও নিয়তি আছে, নইলে এখানে আসব কেন। বলা যায় না, নিরুপম, লোকালয়ে যা মেলে না, আমরা এইখানে হয়ত তা পাব!'

'তুমি দেবে?' নিরুপম অবিশ্বাসী গলায় বলল।

উত্তরে সম্পূর্ণ দৃষ্টি সংস্থিত করে সুধা বলল, 'তুমি দেবে না?'

'এখানে, এখানে', কিছুক্ষণ পর নিরুপমের আশ্বস্ত মন আবার প্রজাপতির মতো প্রলুব্ধ নৃত্যপর হয়েছিল। শুকনো কাঠ ঠেকেছিল যাকে মাত্রই দশ-বারো ঘন্টা আগে, অলৌকিক জাদুতে সে কি পুনরায় সজীব, সতেজ? এ কি তার চোখের বিভ্রম, সে কি সত্যিই সেই কাঠখানি সবুজ পাতায় ছেয়ে যেতে দেখছে! এ-সুধা আলাদা, রূপান্তরিত, জন্মান্তরিত।

'তবু', নিরুপম বলল, 'সুধা তুমি কি ভেবে দেখেছ, আমরা থাকব কোথায়?'

ইঙ্গিতে সুধা ঘন বনের একটা দিক্ অঙ্গুলি সংকেত করল। সেখানে সুঠাম-শরীর কয়েকটা গাছের ফাঁকে একটা কাঠের বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে চড়াই ভেঙে ভেঙে ওরা সেখানে উঠে এল। চারদিকে তাকিয়ে সুধা বলল 'কেউ নেই। মনে হচ্ছে কেউ থাকে না। এটা তবে কী?'

'কাঠুরেদের কুটির' নিরুপম পর্যবেক্ষণ করে বলল—'কেউ হয়ত কোনও দিন কোনও কারণে এটা বানিয়েছিল।'

'তা-হলেই হবে,' সুধা লঘু গলায় বলে উঠল 'রাত্রে কোনও হিংস্র প্রাণীর পেটে যাওয়ার ভয় আমাদের রইল না। নিরুপম, তোমার গাড়ির ক্যারিয়ারে অন্তত কিছু ফল, রুটি, ডিম এসব আছে তো। খিদের চেয়ে হিংস্র প্রাণী কিছু নেই, মনে রেখো।'

সেই কথা শুনে নিরুপম বলল 'সুধা, সব হিংস্র প্রাণীর খবর কি তুমি রাখো। তোমার হিসেবের বাইরেও কোন জন্তু যদি, তুমি জানো না যদি—'

নির্বিকার গলায় সুধা বলল, 'সে দেখা যাবে।'

এতক্ষণে সময় হয়েছে, নিরুপম পেশ করল সেই কথাটা যেটা সারা সকাল থেকে এ-পর্যন্ত বলি-বলি করেও বলা হয়নি। বলল 'সুধা, এখন বলো তো, কাল রাত্রে তুমি ওখানে চমকে উঠেছিলে কেন। তুমি ভেবেছিলে উৎপল আশেপাশে কোথাও আছে, হঠাৎ এসে পড়তে পারে, তাই নয়?'

সুধা বলল, 'না। অন্য কথা মনে হচ্ছিল। বড্ড নোংরা মনে হচ্ছিল আমার, পায়ের নখ দিয়ে খুঁচিয়ে কার্পেটের ধুলো তুলছিলাম, তুমি দেখতে পাওনি? গা ঘিনঘিন করছিল। মনে হচ্ছিল এ সেই জায়গা যেখানে খালি আমি না, ভাবছিলাম, যার-যার স্বামী ট্যুরে কিংবা ইন্টারভিউ পেয়ে দূরে যায়, এমন কতজনকে তুমি নিয়ে আস। উৎপলের ভয় নয়, নিরুপম, তোমাকে ওখানে বড্ড বেশি স্মার্ট আর অভ্যস্ত মনে হচ্ছিল। যে স্মার্টনেস দেখে ভুলেছি, সেই স্মার্টনেসকেই ঘৃণা হচ্ছিল। খালি ভাবছিলাম, তুমি ওখানে আরও অনেক—অনেক বার এসেছ।'

'তাই কি সুধা বিম্ব হয়ে গেল?' ধরা গলায় বলল নিরুপম।

'সুধা বিম্ব হয়ে গেল', সুধা সংক্ষেপে বলল।

নিরুপম বলতে গেল 'কিন্তু সত্যি কথাটা এই—' হাত তুলে সুধা বলল 'থাক। সত্যি কথা এখানে এনে কাজ নেই। রোজ তো সত্যি নিয়েই আছি। যা সত্য তা খুব ছোট, পোস্টকার্ডের পিঠে লেখা চিঠির মতো। মিথ্যে যেহেতু কল্পনা, তাই তাকে পাতার পর পাতা জুড়ে ফেনিয়ে দিতে পারি। প্রেমপত্রের মতো।'

গাড়ির পিছন থেকে ওরা খাবার যা ছিল বার করে আনল। একটা শতরঞ্চিও ছিল সেটা পাতা হল দীর্ঘতমা ঋষিসম কোনও বৃক্ষের তলায়, যার শাখা-প্রশাখা অসংখ্য পাখির কলরবে মুখরিত হয়ে ছিল। অতল ঝিলটা ঠিক সামনেই, যেখানে ঘাস পোড়া সেই ফাঁকা জায়গাটা একটু দূরেই, পাশে।

'এই শ্মশানে', নিরুপম বলে উঠল আর তৎক্ষণাৎ, তার গলায় গলা মিলিয়ে সুধাও বলল 'এই শ্মশানে। আশ্চর্য।'

বিকালের হঠাৎ-হাওয়ায় বালি উড়ছিল, তার সব ঔদাস্য নিয়ে। বিকালের নরম রোদে সুধার কর্ণমূল, গ্রীবা, সব কমনীয় হয়ে উঠেছিল। একটা ঢিল তুলে নিরুপম ছুঁড়ল ঝিলের জলে যেখানে নানা অজানা উদ্ভিদ জটলা তৈরি করেছে। নিরুপম বলল 'রাত্রে এখানে বোধ হয় বিবিধ জন্তু জল খেতে আসে।'

শুনে সুধা ভয় পেল কি পেল না কিন্তু কাছে ঘেঁষে এল, মুখখানি এক দিকে কাত করে তুলে বলল, 'আমরা দেখতে পাব?'

সুধা কখন পা টিপে টিপে ঝিলের একেবারে ধারে চলে গেছে নিরুপম খেয়াল করেনি, তার একটু ঝিমুনি এসেছিল, দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ছুটে এল। সুধা ঠোঁটে আঙুল রেখে নিষেধ করল ওকে।— 'এখানে চিৎকার করতে নেই। সব কেমন চুপচাপ দেখছ না?'

নিরুপম দেখছিল। ঢালু জায়গায় একটু পিছনে যেখানে সে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে দুটি সুধাকে দেখা যায়: এক সুধা ঝুঁকে আছে জলের উপরে, অন্য সুধা জলের তলায়।—'মুখ দেখছ?' নিরুপম বলল, সুধা জবাব দিল 'হ্যাঁ, আয়নায়। চেহারাটার কী চেহারা হয়েছে অনেকক্ষণ দেখতে পাইনি কি না।' বলেই সুধা পায়ের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে দিল জলে, পরীক্ষামূলকভাবে। ওরা ছায়া ভেঙে ভেঙে, আরও ছড়িয়ে পড়ে, তবু জলের নিচেই কম্পিত হতে থাকল।

দু'হাতে শাড়ির দু'টি দিক আলগোছে তুলে ধরেছে, সুধা, ফলে শাড়িটা কতকটা ঘাঘরার ডৌল নিয়েছে, পায়ের গোছ অসংকোচে, নিষ্পাপত, উন্মুক্ত হয়ে গেছে, নিরুপমের পলক পড়ে না কিন্তু সুধার খেয়াল নেই, আরও নুয়ে পড়ে সে যেন কী তুলে আনতে চাইছিল, নিরুপম বলে উঠল 'সুধা, আর যেও না' কিন্তু সুধা শুনলে তো! তরল গলায় সে বলছিল 'আমি এইভাবে একটু তলিয়ে বিসর্জনের প্রতিমা হয়ে যাই, নিরুপম?'

নিরুপম তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল। সুধার মুঠোয় তবু উঠে এসেছিল কয়েকটা পাতা সমেত একটি লতা, তাতে লালচে ছোপ ধরা দু'তিনটে ফুল ফুটে ছিল। সুধা

ফুল ক'টিকে ওর নাকের কাছে ধরল।—'গন্ধও আছে, খুব মৃদু। আর পদ্মও আছে, ঝিলের মাঝখানে। পদ্মই তো, না? পদ্ম, না শালুক?'

'পদ্ম,' নিরুপম এমন স্বরে বলল, যেন ঘোষণা। 'যদি বলো, তুলে আনতে পারি। কাঁটা দেখেও ক্ষান্ত হব না।'

'ইস্।' সুধা অল্প হেসে বলল, একটা আঙুলে নিজেরই গাল ছুঁয়ে।—'তবে আমার নিজেরই কিন্তু ইচ্ছে করছে নেমে যাই। যদি সাঁতার জানতাম। দ্যাখো, দ্যাখো, পাড় দিয়ে ছোট ছোট গর্ত কত। আর মাটির উপর দিয়ে সরু সরু যেন লাইন টানা—'

'কাঁকড়ার। ওরা রেখা টেনে টেনে জল থেকে উঠে আসে।

'জল থেকে উঠে আসে,' সুধার মনে অন্য একটা ছবি মনে পড়ে গিয়ে সে ঈষৎ আনমনা হয়ে গেল।—'মেয়েরাও উঠে আসে, না? কলসী কাঁখে নিয়ে, গ্রামে, ছবিতে দেখেছি চমৎকার লাগে।'

নিরুপম হাসছিল।—'কলসী নিয়ে মেয়েরা কিন্তু—' সে কী বলবে যেন আন্দাজে ধরে নিয়েই সুধা বলল 'জানি মেয়েরা ডোবেও।'

উপরে তখন আসন্ন সন্ধ্যায় যেন রাজ-সভা বসে গিয়েছিল। যত বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি, তারা দ্বিপ্রহরে যদি-বা নিরাসক্ত নির্বাক থাকে, যত বেলা পড়ে ততই পর-স্পরের প্রগাঢ় সম্পর্কে লিপ্ত হয়। অনিশ্চিত কিছু পাখি আগে থেকেই ফিরে আসে বাসায়, অথবা কেউ হয়ত বেরই হয় না, সারাদিন ডালে ডালে পাতায় পাতায় বসে, ফল ঠুকরে খায়, চারদিকে ছড়ায়। যেখানে ওরা উঠে এল, সেখানে শালের মঞ্জরীও ছড়িয়ে ছিল। আর বহুবর্ণ একটি শব্দের বিমিশ্র বিচিত্র নকশা দৃশ্যপট হয়েছিল।

'এই, বলো তো এই বনটার নাম কী?'

কিছু না ভেবেই নিরুপম বলে দিল, 'নন্দনকানন'।

টিপ টিপ জল চুইয়ে পড়ছে সুধার শাড়ির পাড় থেকে। সুধা নিচু হয়ে বলল, 'চোখটা অন্য দিকে ঘোরাও দেখি। আমি জল নিংড়ে ফেলব।' ফলে দৃষ্টি আরও সকৌতুকে বিস্তারিত করে নিরুপম বলল, 'ইভা, নন্দনকাননে কিন্তু লজ্জা ছিল না।'

'এই নন্দনকাননে আছে কী?'

'বিশ্বাস', তদ্গত কন্ঠে উচ্চারণ করল নিরুপম।—'আর সাহস। সুধা, বোধহয় সমর্পণও।'

'এখনও লোভ?' সুধা ভ্রূকুটি করে বলল।

'এই ঝিলটা', একটু পরে সুধা বলছিল, নিজে-নিজেই। 'আশ্চর্য, এত ওপরে, এই পাহাড়ের গায়ে—'

'সে এমন কিছু অবাক ব্যাপার কি? কৈলাসেও তো আছে মানস সরোবর, শোন নি? কৈলাস তো আরও উঁচুতে। পৃথিবীর সর্বত্র সব কিছুর সংস্থান থাকে।'

'আর এই ঝরনা? কোথায় গিয়ে পড়েছে?' তিরতিরে একটা স্রোত দেখিয়ে সুধা বলল। আর পরম জ্ঞানীর মতো উত্তর দিল নিরুপম 'নিশ্চয়ই নিচে কোথাও। সমতলে।'

'আর ঝরনাটা ধরে ওপর দিকে যদি যাই? কোথায় গিয়ে পৌঁছব? হিমালয়ে?'

'বোকা মেয়ে', মৃদু তিরস্কার করে নিরুপম বলল, 'হিমালয় এখানে কোথায়?'

'আমি ভূগোল জানি না', সুধা বলল অম্লানবদনে। তার পরেই সহসা জোরে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'এই—এই!' সে কাকে ডাকছিল। সেই ডাকে বাঁধের উপর

দিয়ে দ্রুত পায়ে কে এগিয়ে এল। কাছে আসতেই দেখা গেল, একটি বালক। খালি গা, সে মাটিতে আস্তে আস্তে একটা ঝুড়ি নামিয়ে রাখল। তালশাঁস।

'এখানে এখনও শাঁস আছে? সব পেকে তাল হয়ে যায় নি?'

ছেলেটা কথা বলল না। সুধার চোখের ইশারায় অনুমতি পেয়ে খোলস ছাড়িয়ে এক-একটা শাঁস সে তুলে দিচ্ছিল পদ্ম পাতায়। সবুজের তলাতেই অবারিত শুভ্র হৃদয়, ফেটে ফেটে ফিনকি দিয়ে কোন-কোনটা সুধার করতল ভিজিয়ে দিল। নিরুপম বলল, 'সাবধানে দাঁত বসাতে হয়।'

এতক্ষণে, অনেক নিচে সমতল দিয়ে প্রসারিত দুটি লৌহরেখা ওরা লক্ষ্য করতে পেরেছিল। ছেলেটাকে পয়সা দিয়ে নিরুপম জিজ্ঞাসা করল, 'ওই রেল লাইনটা কোথায় গেছে?' মাথা নেড়ে ছেলেটা বলল, জানে না।

'জানতে ইচ্ছে হয় না? কোনদিন রেলে চড়ে বসিসনি তুই? কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না?'

'যাব কেন।' বিস্মিত, তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন একটি উত্তর—'যাব কেন?'

'বা-রে ছেলে', অস্থির নাগরিক নিরুপম বলল, 'দুনিয়ার কোথায় কী আছে, দেখতে ইচ্ছে হয় না?'

'যাব কেন', ছেলেটা বলল আবার, ওর হিন্দী-বাংলা মেশানো এক ভাষায় 'এখানেই তো সব দেখি।' এক কথায় প্রশ্নটাকে খারিজ করে দিয়ে সে পয়সাটা কোমরে গুঁজে ধীরে ধীরে অপসৃত হল।

'আমিও জানি না,' নিরুপম আস্তে আস্তে বলল খানিক পরে, 'ওই রেল রাস্তাটা গেছে কোথায়।'

'জান না বলেই তো ভাল লাগছে বেশি। উধাও লাইনটাকে রহস্যময় ঠেকছে।' সুধা বলল, 'জানা থাকলে সবটাই জানা হয়ে যেত।' সায় দিয়ে নিরুপম বলল, 'ঠিক। আমি নিশ্চিত যে, এই লাইনে সব চেয়ে কাছের যে স্টেশন, তার নাম কোনও টাইম-টেবলে লেখা নেই।' সুধা আরও একবার বলল, 'আমি ভূগোল জানি না।'

ঠক্ঠক্. ঠক্ঠক্ অনেকক্ষণ ধরে শব্দ হচ্ছিল বনের গভীরে, নিয়মিত যতিতে আর লয়ে, যতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল, ততক্ষণ ওরা শুনতে পায়নি, থেমে যেতেই ঐকতানের মধ্যে কী একটার অভাব ঘটছে, অনুভব করতে পারল। খানিকটা কান পেতে থেকে নিরুপম বলল, 'কাঠুরেরা কাঠ কাটছিল বোধ হয়। চলে গেল।'

সুধা তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঘাসে ঘাসে। একটা কাঠি উঁচু করে ধরে কোথা থেকে পেড়ে আনল একগুচ্ছ ফুল, পরল চুলে। 'মানিয়েছে? কী ফুল বলো তো?'

নিরুপম চট করে বলে দিল, 'নাগকেশর। কিন্তু এখানে জবা ফুল পরলেও মানিয়ে যেত। এই পরিবেশে সবই মানিয়ে যায়।' এবার সুধা ছিঁড়ে আনল কয়েকটা লতা।—'কী লতা?'

ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরছিল সে, কী ফুল, কী পাখি, কী গাছ, কী লতা, প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তুলছিল নিরুপমকে। শেষে ছায়া যখন ঘনিয়ে এল, তখন নিরুপম আর পারল না, আত্মসমর্পণের মতো আর্ত, বলল, 'সুধা আমি কিছুই জানি না। কোন্ লতার নাম কী, কোন্ ঝরনা কোথায় গেছে, কিচ্ছু জানা নেই আমার। এত জেনে কাজই বা কী।'

যখন ছোট ছিলাম, সে ভাবছিল, তখন কেবলই হাত দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, এটা কী, ওটা কী। সব শিশুই করে। শিশু তো, ভাবে এই উপায়ে জগতের সব কিছু জেনে ফেলা যাবে। বড় হয়ে আর কথায় কথায় কৌতূহল প্রকাশ করে না। কারণ, ততদিনে বুঝে ফেলে, যতই জানুক, তার পরিমাণ না-জানা অংশের সামান্য ভগ্নাংশও না। 'আমিও তাই', নিরুপম নিজেকে বলছিল, 'আজ প্রশ্নকে নিরস্ত রাখি! ফুল, লতা, পাতা, পাখি---শুধু দেখি। সে-পাওয়াও অপর্যাপ্ত পাওয়া।'

প্রথম হিম পড়তে ওরা সেই কাঠের কুটিরের বারান্দায় উঠে এল। একটাই তারা উঠেছিল---আকাশের মল্লিকা বনে প্রথম ফোটা কলি---সেই তারাটিকে ওরা প্রথমে কিন্তু আকাশে নয়---দেখতে পেল ঝিলের জলে।

ঘরের ভিতরটা সুধা একবার দেখে এসেছিল। ফিরে এসে বলল, 'কেউ নেই। মনে হল কেউ থাকে না। তবে কোনও কালে হয়ত কেউ থাকত। মাঝে মাঝে কেউ কেউ আসে। অল্প-স্বল্প আসবাব---ব্যবহারের চিহ্ন আছে। একটা চারপায়াও দেখতে পেলাম।'

অন্ধকার কখনও কখনও কালো কালো ফুলকির মতো নামে, কালো অথচ তপ্ত, অজস্র, অজস্র, সেই অন্ধকারে নিরুপম বুঝতে পারল না, সুধার চোখের মণি জ্বলছে কি না। নিজের বুকে হাত দিয়ে টের পেল, হৃৎস্পন্দ দ্রুততর। আরও একটা পরীক্ষার সম্ভাবনা সে প্রত্যক্ষ করল। কী ঘটবে, এই রাত্রি কী দেবে, প্রাপ্তি কিংবা পুনরপি বঞ্চনা, নিরুপম যন্ত্রণায় মাথায় হাত দিল, সে আর ভাবতে পারছে না। বিকৃত, ভাঙা গলায় বলে উঠল নিরুপম, 'সুধা, তোমার ভয় করছে?'

পা ঝুলিয়ে সুধা বসেছিল নিচের একটা ধাপে, দাঁতে শিকড়-টিকড় কিছু একটা কাটছিল, মুখ থেকে ফেলে দিয়ে সমতল গলায় বলল, 'কই, না তো।' যেন নীড়ের পাখিদের ন্যায় ও নির্ভয় হয়ে ছিল।

বিশ্বাস, সমর্পণ, নিরুপম আরও একবার তাদের চাক্ষুষ রূপ প্রত্যক্ষ করল। অতঃপর কী, রোমাঞ্চিত হয়ে সে কল্পনা করতে চেষ্টা করছিল: সমাপ্তি আর উদ্‌যাপন? একটু ভালো হত সুধার মুখটায় কোন্ ভাবের খেলা চলছে দেখতে পেলে। নিরুপমের তখন মনে পড়ল একটা ছোট্ট টর্চ তার পকেটেই আছে।

আর ঠিক তখনই কোটালের বানের মতো জ্যোৎস্না এল।

সেই জ্যোৎস্নায় তলিয়ে যাওয়া ঝিলটা আবার অপরূপ একটি সরোবরের রূপ নিয়ে উঠল ভেসে। নিরুপম অনুভব করছিল, তার চারপাশেই এমন কিছু ঘটছে, কোনও আলোড়ন, কোনও বিপুল উন্মোচন যার ব্যাপ্তি, ব্যাস, বেধ আর পরিধি ধরাতলের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর আবৃত করেছে, শুধু দৃষ্টি দিয়ে যার কূল মেলে না।

আর আছে কী? রাত জাগা অগোচর কোনও পাখি। এই মুহূর্তে তার সহচর লতা গুল্ম বৃক্ষ ইত্যাদি। আর? নিশ্চয়ই কোনও রমণীও, কিন্তু সে শরীরিণী কিনা, সে-বিষয়ে এই মুহূর্তে তার কোনও চেতনা ছিল না। শাখা-প্রশাখা বোধের অতীত কোনও আনন্দে নিঃশব্দে আন্দোলিত হচ্ছিল!

'কী ভাবছ?' কানের কাছে কেউ বলল ফিসফিস স্বরে।

হাত বাড়িয়ে নিরুপম একটি লতা স্পর্শ করল, দাওয়া ঘেঁষে, একটা সমর্থ থাম জড়িয়ে, যেটা বিস্তারিত হয়ে ছিল।---'এই লতাটার কথা।'

'আশ্চর্য', সেই ফিসফিস স্বর বলল, 'আমিও তাই। অবাক হয়ে ভাবছিলাম ওরা মাটির কাছ থেকে সব কিছু শুষে নেয়, রস ইত্যাদি যা কিছু: অথচ নিজেকে খুলে দেয়, মেলে ধরে আকাশের কাছে। প্রতিটি লতা আর গাছ কি তবে প্রকৃতিগতভাবে অসৎ—অসতী?'

'মেঘের আচরণেও তাই', নিরুপম বলল, 'দ্যাখো, একই রীতি। মেঘ আকাশে ভাসে, কিন্তু চেয়ে থাকে মাটির দিকে। সব ঢেলেও দেয়, এমন কী নিজেকে ভেঙে-চুরে নিঃশেষ করে।'

'কিন্তু আমরা এসব কথা বলছি কেন', অতিপ্রাকৃত সেই সুরেলা গলা বলল, 'এ সবের কী অর্থ?'

'কিচ্ছু নেই,' নিরুপম বলল, 'তবু আমরা বলছি। যেহেতু আমরা এখানে বসে আছি, শুধু বসে আছি।'

'ভিতরে যাবে না?' প্রতীক্ষিত সেই প্রশ্ন এসেছে এতক্ষণে, নিরুপম সটান হয়ে বসল। সতর্ক গলায় বলল, 'যাব। সুধা, তোমার ঘুম পেয়েছে?'

'পেয়েছে—হয়ত। কিন্তু আর একটু বসি?'

'বোসো। কিংবা চলো আমরা ওই ঝিলটাকে আরও একবার ঘুরে আসি।'

'না, এখানেই।'

যেখানে পোড়া ঘাস, সেখানে অল্প অল্প বাতাসে বালি উড়ছিল। সোজা হয়ে বসে সুধা বলল, 'নিরুপম, ওটা তো শ্মশান! ওখানে, ধরো, আজ রাত্রেই কেউ যদি শব নিয়ে আসে?'

'ভয় নেই। যেই আসুক, জীবিত দুটি প্রাণীকে দেখবে জাগ্রত। তারা সরে যাবে।'

পা আরও ছড়িয়ে দিয়েছে সুধা, অলস, এলায়িত দেহের শেষ প্রান্ত মাটি ছুঁয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় কতগুলো পাতা কাঁপছিল, শালের, সেগুনের বা অন্য কোনও বন্য বৃক্ষের। সেদিকে ক্লান্ত চোখে চেয়ে সুধা বলল, 'ওগুলো কি ছায়া!'

'না। ওদেরও শরীর আছে।'

'অথচ' হাই তুলে সুধা বলল, 'মনে হচ্ছিল যেন ছায়া-ছায়া।'

'এই জ্যোৎস্নায়, সুধা, সবই তাই মনে হয়।'

তার পরেই গুরু গুরু শব্দে সেই কুটির, ছায়া, জ্যোৎস্না, সব যেন প্রকম্পিত হতে লাগল।

'মেঘ?' নিজেকে গুছিয়ে সুধা উঠে বসল। খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে নিরুপম বলল, 'না ট্রেন। রাতের রেলগাড়ি। দ্যাখো, চলন্ত একটা আলোর তীর ছুটে যাচ্ছে, চেয়ে দ্যাখো।'

'ওই নিচ দিয়ে, না? নিরুপম, আমরা কতটা ওপরে আছি?'

'বেশ কিছুটা। এখানে হাওয়া হালকা, দেখছ না ধুলো নেই, কিছু না?' নিরুপম নিজের কথার সমর্থনে বুক ভরে নিশ্বাস নিল।

'এভারেস্টে যারা ওঠে, তারা আর কতদূর ওঠে?'

'আরও ঢের ঢের ওপরে।'

'ওই ঝিলের কাছে যেতে বলেছিলে। যদি যাই নিরুপম, যদি স্নান করি, উঠে এলে আমাকে কি জলকন্যার মতো লাগবে?'

নিরুপম বলতে চেয়েছিল, তারও দরকার নেই। এই উঠোনে নেমে একবার দাঁড়াও, তা হলেই স্নান হয়ে যাবে। কিংবা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে সুধা, তোমার হাতে

এখন একটা গ্লাস যদি দিই, তুমি এখন ছুটে বাইরে গিয়ে এক গ্লাস জ্যোৎস্না ভরে নিয়ে আসতে পারবে?

তার একটু পরেই প্রগাঢ় শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। পরিতৃপ্ত, প্রশান্ত। ওর কোলের কাছে মাথা এলানো, সুধা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝুঁকে পড়ে নিরুপম ডাকল, 'সুধা, সুধা!' সুধা একবার মাত্র সাড়া দিল 'উঁ!' সাড়া দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

সে একা, এই বোধটা তীব্র বেগে বিদ্ধ হল সত্য, তবু, কই কোনও বেদনা তো সে অনুভব করছে না! কোথাও একটা আশ্বাস অকৃপণ বৃষ্টিধারার মতো ঝরছে, নিরুপম সামনে চেয়ে দেখল জ্যোৎস্না! ত্রয়োদশী? চতুর্দশী? অথবা আজ কি পূর্ণিমা? যে শহরে বাস করি সেখানে সব একাকার, শুক্ল অথবা কৃষ্ণ কোন্ তিথি কবে, আমরা মনেও রাখি না। সেখানে নষ্টচন্দ্র প্রত্যহ, সর্ব অর্থে।

আর এখানে? বাইরে, যতদূর চাওয়া যায়, ধু-ধু জ্যোৎস্না শুধু। সব সত্যকে আবৃত করে দিয়ে সেই জ্যোৎস্না এক স্নেহক্ষীরা জননী-প্রতিমা।

মনিবন্ধে ঘড়িটা অবিরাম টিকটিক করে যদিও বলে চলছিল, 'আর কখন, আর কখন?' তবু কই কোনও তাগিদ সে তো টের পাচ্ছে না। এখানে শুধু বসে থাকা, নত হয়ে মাঝে মাঝে একটি করুণ-কমনীয় মুখচ্ছবি দেখা, এ-ছাড়া সব অদরকারী ঠেকছে। সুধার মুখ অল্প একটু খুলে গেছে, শরীরের বাঁধন শিথিল, আলগা, বর্তুলতা, উত্তুঙ্গতা, মসৃণতা সব চোখে পড়ে—সব ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে। একবার যেন কেঁপে উঠল সুধা, ঘুমের ঘোরে অস্ফুট কী বলল। ওর কি শীত করছে? একটা চাদর নেই হাতের কাছে কোথাও? নিরুপম অসহায় বোধ করছিল। শেষে নিরুপায় সুধাকেই সন্তর্পণে পাশ ফেরাতে চেষ্টা করল। সুধা অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'কী?'

নিরুপম—'ঘুমোও। তোমার গায়ের আঁচলটা একটু টেনে নিচ্ছি তোমারই গা ভালো করে ঢেকে দিতে। সুধা, অন্য কিছু না।'

আরও প্রহর খানেক। নিরুপমেরও চোখ জড়িয়ে এসেছে, হঠাৎ ঝিলের জলে ঝুপ করে শব্দ হতেই সে চমকে উঠল। হাওয়া উতলা হয়েছিল হয়ত, শুকনো একটা ডাল পড়ে থাকবে জলে, তার অনুমান হল। একদৃষ্টে তবু বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে স্থির করল, শুকনো ডালই। কোনও জন্তু ঝিলের ধারে জল খেতে আসে নি, সে নিশ্চিত জেনেছে, কোনও জন্তু আজ রাতে আসবে না।

সকালে ওরা আবার ফিরছিল। খানিকটা যেতেই রাঙা ধুলোর ভুল রাস্তা কাটিয়ে হাইওয়ে পাওয়া গেল। নিরুপম বলল, 'সুধা, একটা কথা বিশ্বাস করবে? কাল ইচ্ছে করে কিন্তু রাস্তা ভুল করিনি।'

'জানি।'

'তাহলে এ-ও শোন। ইচ্ছে হলে কালই শিগ্গির ফিরতে পারতাম। আমার ক্লান্তি আধ ঘন্টার মধ্যেই কেটে গিয়েছিল।'

'আমি জানতাম।'

'কিন্তু—আরও শোন—আমার লোভ হয়েছিল।'

'আমি বুঝেছিলাম।'

'পাওয়ার রেশ আমাকে পাগল করেছিল।'

'পাওনি?' দৃষ্টি আয়ত করে সুধা স্নিগ্ধ গলায় বলল।

নিরুপম বলল, 'পেয়েছি। আশারও বেশি। তুমি জানো না।'

'তা-ও জানি।'

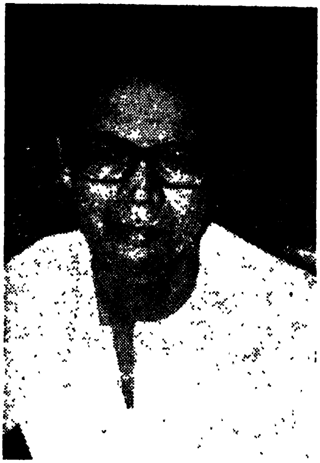
'পাওয়ার চেহারাটাই বদলে গেল। অথচ সব আমাদের নাগালের মধ্যেই ছিল। ছিল, কিন্তু ইচ্ছে হল না। আমরা পাহাড়ে উঠে গেলাম যে! অনেক ওপরে, যেখানে বাতাস পালকের চেয়েও নির্ভার। সুধা, তুমি কাল একবার এভারেস্টের কথা জিজ্ঞেস করেছিলে, না? মূলে একই ব্যাপার। প্রথমবার যারা ওখানে উঠেছিল সেই লঘু বায়ু, অকলঙ্ক শুভ্র, শূন্যতা। একটা অশেষ কিছু দ্বারা তারা আক্রান্ত হল, সব হঠাৎ অদরকারী, জানো, তাদের কেউ কেউ একটা সিগারেট পর্যন্ত মুখে দিতে পারল না। ইচ্ছেই হল না।'

অনেক পরে সুধা বলল, 'এখন আমরা ফিরছি তো? কখন পৌঁছব?'

'বিকেলের মধ্যেই। কিংবা তারও আগে।'

একটা লোকালয় এসে পড়ায় একাগ্রভাবে চালাতে হচ্ছিল, তাই বাকীটা বলা হল না। নইলে নিরুপমের আরও কিছু বলার ছিল। কাল শেষ রাতে শিহরিত সেই স্বপ্নের কথাটা। কোনও মারণাস্ত্রে পৃথিবীটা ধুলো ধুলো হয়ে গেছে, কিন্তু আশ্চর্য তখনও জ্যোৎস্না আছে, আর সেই আলোয় ভালোবাসাও পরিব্যাপ্ত, ভাসছে। প্রলয়ের পরে প্রেম থাকবে, কোনও স্নেহ ক্ষরিত হবে অবিরত, এই দৃপ্ত সত্য নিয়েই সে চাঁদের বন থেকে ফিরছে। বলা হল না।

কিন্তু এই ঘিঞ্জি বাজারের সংকীর্ণ সড়কে আর একটা সত্যও দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। সুধাকে সেটা হয়ত বলা যাবে। বারবার এখানে আসা যাবে না, কলকাতায় ফিরছি। ফিরবইতো। হয়তো—এই সত্যটা একটু স্থূল—কখনও আবার কোনও হোটেলেও যাব। হঠাৎ তেষ্টা পেয়ে বসলে তাকে অসম্পূর্ণভাবে মেটাতে, হোটেলে। কিন্তু পরিপূর্ণ স্নানের জন্যে, এখানে। এখানেও ফিরতে হবে, মাঝে মাঝে ফিরবই, ফিরব।



বিমল কর

জন্ম : ৩রা আশ্বিন ১৩২৮, ইংরেজি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২১। মাতুলালয়,
টাকির কাছে এক গ্রাম, শাঁখচূড়ায়। জীবনের নানা সময় নানান সব চাকরি-সূত্রে
ঘুরেছেন বিভিন্ন জায়গায়। তার মধ্যে লেখকের
অন্তর্গত পরিচয়ের সঙ্গে সবচেয়ে মিলে গেছে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল।
এখন দেশ পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক।
'গভীরতম'—যে জন-কয়েক লেখকের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা চলে,
বিমল কর সেই মুষ্টিমেয় লেখকদের এক জন। 'ঝড় ও শিশির', 'বরফ সাহেবের
মেয়ে', 'কাঁচঘর' ইত্যাদির যুগ থেকেই তিনি চিহ্নিত। 'যদুবংশ', 'দেওয়াল',
'দংশন'—প্রতিটিই বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনা। আবার
এই লেখকই লিখেছেন 'খড়কুটো' কিংবা 'বালিকাবধূ'। 'পূর্ণ অপূর্ণ'—মহৎ
এই গ্রন্থখানির স্রষ্টার নামও বিমল কর। তাঁর অন্য এক স্মরণীয় কৃতির নাম
'অসময়'। 'পূর্ণ অপূর্ণ'-র সুরেশ্বর এবং 'অসময়'-এর অবিন,
এই দুই বৈপরীত্যের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এই লেখকের লেখক-সত্তা। তাঁর প্রতিটি
লেখাতেই ছড়ানো থাকে সূক্ষ্ম কিছু বোধ, প্রচ্ছন্ন কিছু বিষণ্ণতা,
জীবনের প্রথম এবং শেষ অঙ্কের, গ্রহণ বা বর্জনের, দ্বীপের মতো একাকী
কোনও মানুষের অসুস্থতা বা ব্যর্থতার কিছু মর্মভেদী কষ্ট।
বাংলা ছোটগল্পের বিশাল এক স্তম্ভের নামও বিমল কর। আজ গল্পের জন্য
পৃথিবীতে যে—স্বর্ণময় আসনটি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, তাতে এঁর অবদান
অশেষ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম : আত্মজা, নিষাদ,
মানবপুত্র, জানোয়ার, সোপান, উদ্ভিদ, পলাশ, মৃত ও জীবিত,
শোকসভার পরে, বৃদ্ধস্য ভার্যা।
দীর্ঘকায় সুদর্শন এই লেখকের স্নেহচ্ছায়া পল্লবিত হতে দিয়েছে
বর্তমান সাহিত্যের অনেকগুলি অঙ্কুর। এক কথায় বাংলা গল্পের অভিভাবক
বলা যায় তাঁকে। আনন্দ পুরস্কার ছাড়া অন্য যে বড় পুরস্কার পেয়েছেন,
তার নাম : সাহিত্য আকাদেমি।

কোনো লেখকই নিজের লেখার বিচারক নন। মনে মনে তাঁর নিজের একটা
বিচার থাকতে পারে হয়ত, থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা বলার অধিকার
বোধ হয় তাঁর নেই। কিন্তু কেউ যদি লেখককে প্রশ্ন করেন, আপনার প্রিয়
লেখা কোনটি, তবে? আমার মনে হয়, লেখক সেখানে কিছু বলতে
পারেন, বললে দোষ হয় না। এখানে অবশ্য আমি প্রিয় অর্থে বোঝাতে চাইছি,
সেই লেখাটির কথা—যা লেখকের নানা কারণেই লিখতে ভাল লেগেছিল
এবং লিখে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন। প্রিয় জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কটা
হৃদয়ের ভাল লাগাটাই বড় কথা।
লেখকের প্রিয় লেখা পাঠক কিংবা সমালোচকের কাছে অপ্রিয় হতেও পারে।
করার কিছু নেই। 'জননী' আমার অন্যতম প্রিয় গল্প।
কেন প্রিয়, তার কৈফিয়ত দেওয়া মুশকিল।
সামান্য কয়েকটি কথায় এইমাত্র বলতে পারি যে, আমার মনের কিছু বেদনা
এই গল্পটিতে আমি যথাসাধ্য প্রকাশের চেষ্টা করেছি। পেরিছি কিনা
সেটা অন্য প্রশ্ন। কম বয়েসে যখন বিহারের দিকে থাকতাম, তখন সেখানকার গাঁ-গ্রামে
আমি কোনো সাঁওতাল পল্লীতে একটা ছবি দেখেছিলাম। মাটির ঘর,
বাইরের দেওয়ালে একটা বাচ্চা ছেলের ছবি আঁকা, গাধা কিংবা ঘোড়ার পিঠে
বসে রয়েছে, হাতের লাঠিটা কাঁধে, লাঠির দু প্রান্তে দুটি জিনিস ঝুলছে,
একদিকে ঘটি, অন্য দিকে একটা পুঁটলি। সেই গ্রাম্য ছবির অর্থ শুনে আমি
স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম, ওই বাড়ির একটি বালক মারা গেছে
কিছুদিন আগে। বাড়ির লোকে বাইরের দেওয়ালে ছবিটি এঁকে রেখেছে
তাদের সংস্কার অনুযায়ী। ওদের সংস্কার বলে: মৃত্যুর পর স্বর্গলোক যাবার
পথ দীর্ঘ, এবং এই দীর্ঘ পথ যাবার জন্যে মৃত মানুষটিকে কিছু পাথেয় দিয়ে দিতে হয়।
এই ছবিটি দীর্ঘকাল আমার মনের মধ্যে ছিল। ছবিটির কথা মনে পড়লেই
কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়তাম, মুগ্ধ হতাম ছবিটির অন্তর্নিহিত
কল্পনার চমৎকারিত্বে। অনেক কাল পরে এই ছবির মূল ভাবটিকেই যেন
আমি মনের মতন করে 'জননী' গল্পে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম।
আমাদের ইহলোক আছে, পরলোক আছে কিনা জানি না। যদি থাকত,
তবে তার পাথেয় হিসেবে কী দেওয়া যেত—সেই ভাবনা থেকেই এই গল্প।
'জননী' নিশ্চয় বাস্তব নয়, অন্য কিছু। প্রতীক বলেই ধরে নেওয়া ভাল।
'জননী' গল্পটি আমার প্রিয় এ-কথা বলতে আমার সঙ্কোচ নেই।
তবু স্বীকার করে রাখি, যে-কারণে 'জননী' আমার প্রিয়
পাঠকের কাছে তা প্রিয় না হতেও পারে।

বিমল কর
৭-৬-৭৮

জননী

আমরা ভাইবোন মিলে মা-র পাঁচটি সন্তান। বাবা বলত, মার হাতের পাঁচটি আঙুল। সবার বড় ছিল বড়দা, মা-র উনিশ বছর বয়সের ফল। প্রথম বলে বড়দা মা-র সেই বয়সের রূপ যতটা পেরেছিল পুঁটলি বেঁধে নিয়ে জগতে এসেছিল। শুনেছি, ঠাকুরমা বলত, অত রঙ অমন চোখ নিয়ে যদি এলি, তবে দাদু, মেয়ে হয়ে এলি না কেন?

ঠাকুরমার ক্ষোভ বছর দুয়েক পরে মা মিটিয়ে দিল। এবার এল বড়দি। বড়দা পুরুষমানুষ বলে ওপর-ওপর থেকে মা-র রূপ চুরি করেছিল, বড়দি মেয়ে বলে আমাদের মা-র অন্তর থেকে সব যেন শুষে নিয়ে ঠাকুরমার কোলে এসে পড়ল।

নয়নের মণির মতন করে ঠাকুরমাবুড়ি বড়দিকে তিনটি বছর আগলে রেখে, লালন-পালন করে, ঝুলন পূর্ণিমাতে মারা গেল। বুড়ি মারা যাবার সময় আমাদের তিন বছরের বড়দিকে মরণের ঘোরে রাধাকৃষ্ণর গল্প শোনাচ্ছিল। শোনাতে শোনাতেই স্বর থেমে গেল।

আমরা এ-সব গল্প মা-বাবার কাছে শুনেছি। বাবাই বেশী বলত। বাবারই অতীত-মোহ অতিরিক্ত ছিল।

বড়দির পর আমাদের মেজদা। মেজদা বাবার মতন। অবিকল বাবার মুখের আদল তার। সেই রকম লম্বা লম্বা হাত। গায়ের রঙ একটু তামাটে।

ছোট আর আমি মাত্র দেড় বছরের এদিক ওদিকে জন্মেছি। ছোটকে আমি দিদি বলি নি কোনোকালে, আজও বলি না। ছোট আমাকে ছেলেবেলায় 'কড়ে' বলত, মানে কনিষ্ঠ; তার খেপানো ডাক থেকেই আমার ডাকনাম কড়ি হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের সংসারে প্রথম শোক এল বড়দির বিয়ের পর। তার স্বামী খারাপ রোগে ভুগছিল। বড়দির প্রথম ছেলেটা হল নাক-ভাঙা, বিকলাঙ্গ। মরে গেল। পরে আরও একটা পেটে নষ্ট হয়ে গেল। স্বামীর রক্তে কোন্ রোগের পোকা বংশবৃদ্ধি করেছে, ততদিনে বুঝতে পেরে গিয়েছে বড়দি। নিজেও ভুগছিল। একদিন স্বামীকে ঘরের মধ্যে পুরে বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়ে বড়দি চলে এল, আর স্বামীগৃহে যায় নি।

বড়দির পর দ্বিতীয় শোক, মেজদার অন্ধ হওয়া। মেজদা দানাপুর যাচ্ছিল কাজে। ট্রেনে বড় ভিড়। যাত্রীরা ঢোকার দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। মেজদা পান কেনার জন্য জানলা খুলে পানঅলাকে ডাকছিল। এক দঙ্গল বেহারীকে আসতে দেখে গোলমালের ভয়ে কাচের জানালা নামিয়ে চুপ করে বসে থাকল। তারা প্রথমে দরজার কাছে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করল, পরে জানালার কাছে এসে ক্ষিপ্তভাবে কী বলছিল। কামরার লোক মেজদাকে জানলা খুলতে বারণ করল। তখন খুব আচমকা বাইরে থেকে একটা লোক তার টিনের সুটকেশ জানালায় ছুঁড়ে মারল। কাঁচ ভেঙে তার ধারালো ফলা মেজদার চোখে মুখে ঢুকে গেল, রক্তে সর্বাঙ্গ লাল হল। হাসপাতালে একটানা ছ'মাস কাটিয়ে বেচারা মেজদা ফিরে এল বাড়িতে, তার দু'চোখ সেই নির্বোধ সুটকেসঅলা অন্ধ করে দিয়ে ভিড়েই মিশে থাকল।

আমাদের তৃতীয় শোক, বাবার মৃত্যু। বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গেল। মা-র কাছে বাবা স্নান করছিল। অল্প অল্প জ্বর ছিল গায়ে। মা ঈষদুষ্ণ জলে বাবার গা ধুইয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিচ্ছিল; বাবা মা-র কোলের ওপর হঠাৎ শুয়ে পড়ে কী বলতে গেল, পারল না; মৃত্যু এসে বাবার মুখে হাত চাপা দিয়ে কথা থামিয়ে দিল। বাবা তৈরী ছিল, চলে গেল।

বাবার মৃত্যুর বছর দুই পরে আমাদের চতুর্থ শোকও এল। ছোট বড় জেদী। চিরকালই সে যখন যা ঝোঁক ধরেছে, করতে গেছে। আমি তাকে কত বলেছি, ওভাবে জেদ ধরে কাজ করতে যাস না। তুই সব পারবি এমন কোনো কথা নেই।---আমার কথা ছোট গ্রাহ্য করত না। তার ধারণা ছিল, সে চেষ্টা করলে সব পারে। ছোট এ-সব বুঝত না। বুঝতে চাইত না। অকারণে সে মেতে থাকত। তার কাজের অন্ত ছিল না, খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের বালাই ছিল না। সকালে মিশনারীদের অনাথ-আলয়ে গৃহিণীপনা করত, দুপুরে বড়দির সঙ্গে শখের চাকরি করতে যেত স্কুলে, বিকেল আর সন্ধ্যেবেলায় ফুলবাজারের সেই ঝুপসি ঘরটায় লন্ঠনের টিমটিমে বাতির আলোয় বসে ওর দলের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে রাজনীতির কাজ করত।---একদিন ছোট বুঝতে পারল, তার বয়সে যতখানি জীবনীশক্তি স্বাভাবিক, তার অনেক বেশী সে অত্যন্ত হঠকারির মতন ব্যয় করেছে। এখন তার জীবনের কলসি প্রায় ফাঁকা! ডাক্তারবাবু স্পষ্টই বলে দিল, আর ওঠা-চলা নয়, বেশী কথা বলাও না। বিছানায় শুয়ে থাকা। ইনজেকশান ওষুধ, ভাল ভাল খাওয়া আর চুপ করে পড়ে থাকা। ছোট বলল তাহলে আমি মরে যাব। জবাবে ডাক্তারবাবু বলল, দেখা যাক---।

সেই থেকে ছোট বিছানায়। বছর পুরো হয়ে গেছে। আরও কিছুদিন থাকতে হবে।

আমাদের সংসারে পঞ্চম শোক এসেছে সদ্য। মা মারা যাবার পর। এই ফাল্গুনের গোড়ায় মা চলে গেল। মার মাথার চুল সাদা হয়েছিল, গালের চামড়া দুধের জুড়ানো সরের মত কুঁচকে এসেছিল। কপালভরা দাগ আর আধপাকা ছানি চোখ নিয়ে মা বিদায় নিল। যাবার সময় দেখে গেল তার হাতের পাঁচটি আঙুলই একে অন্যের পাশে রয়েছে।

তখনও সকালে হিম পড়ে। আমাদের দোতলার বড় বারান্দা শিশিরে ভিজে রয়েছে। সূর্য ওঠেনি, রঙ ধরেছে সবে। মার বিছানার চারপাশে আমরা পাঁচজনে দাঁড়িয়ে, মা চলে গেল।

বড়দা আগেই বলেছিল, আমরা বারোয়ারী শ্মশানে মাকে নিয়ে যাব না, আমাদের বাড়ির বাগানে দাহ করব, পরে সেখানে একটা বেদী করে রাখব।

বিঘে খানেকের ওপর জমি নিয়ে আমাদের দোতলা বাড়ি। পাঁচ বিঘের বাগান। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

উত্তরের দিকে, যেখানে করবীর ঝোপ, স্থলপদ্মর রাশিকৃত গাছ, ঘাসের জঙ্গল—সেই দিকটা মাকে দাহ করার জন্যে আমরা বেছে নিয়েছিলাম। ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করে কদমগাছটাকে মাথার কাছে রেখে মা-র চিতা তৈরী হল, পাশে বুড়ো কাঠচাঁপা দাঁড়িয়ে থাকল—আমাদের বাবার মতন দেখাচ্ছিল তাকে। তারপর মা-র দাহ হল।

যখন আগুন তার অকলুষ শিখা বিস্তার করে মার শরীর আগলে রেখেছিল, তখন আমি আমাদের পাঁচজনকে দেখছিলাম। বড়দা খানিক রোদ খানিক ছায়ায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চিতার দিকে তাকিয়েছিল। মাঝে মাঝে কী বলছিল; বড়দি কদমতলায় মাটিতে গালে হাত দিয়ে বসেছিল; মেজদা বড়দির পাশে আসন-পা করে বসে, দু'হাত

বুকের কাছে—তার অন্ধ চোখ চিতার দিকে; কাঠচাঁপার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ছোট ফোলা-ফোলা মুখ করে বসে; আমি ছোটর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ছোট এক সময় বলল, 'এখন কি জল খেতে আছে রে, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

আমি কিছু জানতুম না। বললাম, 'এখন না। আর খানিকটা পরে খাস।'

এখন চৈত্র মাস। চৈত্রের শুরু সবে। মার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেছে। যে জায়গায় আমরা আমাদের মাকে দাহ করেছিলাম, সেই জায়গা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। চারপাশটা যেন নিকোনো। শ্রাদ্ধর পর-পরই আমরা ওখানে সুন্দর করে বেদী করেছি। কাশীর সাদা পাথর দিয়ে বেদীটা মোড়া। এখনও যেন কাঁচা গন্ধ লেগে আছে ওর গায়ে। হাত রাখলে মনে হয় ঠাণ্ডা লাগছে; নরম মসৃণ স্পর্শ।

মাসান্তে আমরা এই বেদীতে বসেছিলাম। বেদীর মাথার দিকে ছোট কুলুঙ্গির মতন, বড়দি সেখানে প্রদীপ এবং ধূপ জেলে দিয়েছিল। বাতাসে ঝাপটা লাগছিল না বলে দীপের শিখাটি জ্বলছিল, অগুরুচন্দনের ধূপ পুড়ে খুব ফিকে একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছিল। আর শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা বলে চাঁদের আলোয় সাদা বেদীটা ধবধব করছিল।

আমরা পাঁচজনে বেদীর ওপর বসে।

বড়দা বলল 'আমরা যতদিন বেঁচে আছি, মাসের এই দিনটিতে সবাই একসঙ্গে এখানে এসে বসব।' বলে একটু থামল বড়দা, বড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল আবার, 'এই পরিবারের নিয়ম হল। কি বলিস অনু।'

অনু বড়দির ডাক নাম। পুরো করে অনুপমা। ছোটর নাম নিরুপমা, বড়দির সঙ্গে মিল করে রাখা। বড়দি মাথা নেড়ে বড়দার কথায় সায় দিল; বলল, 'বাবার বেদীটাও যদি আমরা করে রাখতাম!' বড়দির গলায় আক্ষেপের সুর।

বড়দির আক্ষেপ খুবই সঙ্গত। কিন্তু তখন তো আমাদের মাথায় এ-বুদ্ধি আসে নি। মাও কিছু বলে নি।

বড়দা কয়েক দণ্ড আকাশের দিকে চেয়ে থাকল, তারপর নিশ্বাস ফেলল মুখ নামিয়ে। বলল, 'খুবই ভাল হতো। তবে মা রাজী হত কিনা কে জানে!'

'রাজী হত না! বড়দি বেশ অবাক হয়েছিল যেন, 'কেন? মা কেন রাজী হত না?'

'হত না হয়তো।' বড়দা সন্দেহের গলায় বলল। 'সবাই এসব পছন্দ করে না। সংস্কার। আমরা বোধ হয় অনেক কিছু পুরোপুরি অগোচরে রাখতে চাই।'

মেজদা হঠাৎ কথা বলল। আমরা তাকালাম। তার অন্ধ চোখ একদিকে স্থির রেখে মেজদা বলল, 'শ্মশানে পুড়িয়ে আসার সময় আমরা কি ভাবি জান, দিদি?'

'কি?'

'অনেকের মধ্যে দিয়ে এলাম। যেন সঙ্গীসাথীর মধ্যে।'

'মরার পর আবার সঙ্গীসাথী কী?' ছোট বলল।

'কিছু না। মানুষ তবু ভাবে।' মেজদা উদাস গলায় বলল। 'তুই জানিস না ছোট, কত মানুষ মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থানে তীর্থ-যাত্রা কল্পনা করে নেয়।'

আমরা সকলে মেজদার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। মেজদার গলার স্বর গোল ও নিটোল। বাঁশের আড়-বাঁশির মতন মোটা। এই স্বর শুনলে অনুভব করা যায়, মেজদার গলার সবটুকু অন্তর থেকে এসেছে। মেজদার কথাবার্তাও অন্যরকম। আমরা মনে মনে অহরহ কথা বলি, মুখে নয়। মনের সেই শব্দহীন বাক্যস্রোত যদি শব্দময় হয়ে ওঠে এই রকম শোনাবে হয়ত, মেজদার কথার মতন।

বড়দি বলল, 'তুই স্বর্গের কথা বলছিস, দীনু!'

মেজদার নাম দীনেন্দ্র, ছোট করে দীনু। বড়দির কথায় মেজদা আলগা করে মাথা নাড়ল। বলল, 'না দিদি স্বর্গ তো শেষ কল্পনা। আমি এই মর্ত্যের পর স্বর্গের আগে যে-পথ তার কথা বলছি।'

'সেটা আবার কি?' ছোট বলল অবাক হয়ে, 'মাঝপথের কথাও মানুষ ভাবে?'

'ভাবে। যত ভাল করে ভেবে নিতে পারা যায় ততই ভাল রে, ছোট।---আমি রাঁচির দিকে মুণ্ডা না মুণ্ডরীদের গ্রামে এক বাড়িতে ছবি দেখেছিলাম একটা।'

'ওদের কথা বাদ দাও।' ছোট বলল।

'বাদ কেন, শোন না।' মেজদা যেন অন্ধ চোখে জ্যোৎস্না মেখে সামান্য মুখ ফেরাল। বলল, 'মাটির বাড়ি, বাইরের দেওয়ালে রঙ গুলে একটা বাচ্চা ছেলের ছবি আঁকা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাচ্চাটা চলেছে, এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে লাগাম; কাঁধে খাবারের পুঁটলি, মাথায় তেষ্টা মেটাবার জন্যে জলের ঘটি রাখা।---ওই ছবির মানে বলে দিল ফরেস্টবাবু। ও-বাড়ির ছেলে মারা গেছে, তাই ওই ছবি।'

'আ-হা--' বড়দি দুঃখ পেল।

মেজদা বলল, 'মানেটা তুমি শোন দিদি। বড় অদ্ভুত লাগে, ভাবতো এরা বিশ্বাস করে নিয়েছে মৃত্যুর পর তাদের ছোট ছেলেটিকে একা একা অনেক দূর যেতে হবে। তাই তাকে বসিয়ে দিয়েছে ঘোড়ায়, হাতে দিয়েছে লাঠি, পুঁটলিতে বোধ হয় চিঁড়ে গুড়, আর মাথায় তেষ্টা মেটাবার জল।'

স্নেহ মমতা, ইহলোকের মায়া ও দুঃখ, পরলোকের দুর্ভাবনা--সব যেন এই ছবিতে মহৎ ও সুন্দর হয়ে কল্পিত ছিল। আমি অভিভূত হলাম। জ্যোৎস্নার ধারার মতন আমার কল্পনা সেই ছবির গায়ে আলো বর্ষণ করছিল।

অনেকক্ষণ বুঝি কেউ কোনো কথা বলল না আর। চৈত্রের চঞ্চল বাতাস বাগানের তৃণ এনে আমাদের গায়ে মাথায় ফেলে দিচ্ছিল। বেদীতে আমাদের পাঁচজনের ছায়া; পরস্পরকে স্পর্শ করে যেন ছায়ার একটি আশ্চর্য রকম জাফরি তৈরী হয়েছে। চাঁদটা সমুদ্রের জলের মতনই নীল অনেকটা। পর্যাপ্ত জ্যোৎস্না। মা-র বেদীর মাথার কাছে সেই বৃন্দাবনের কদম্বগাছ। যার পাশে বুড়ো কাঠচাঁপা।

কদম্বগাছটার বয়স আমার সমান। বৃন্দাবন থেকে এনেছিল বাবা। এখনও বর্ষায় ফুল ফোটে।

বড়দি প্রথমে নিশ্বাস ফেলল। বড়দার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমার হাতটা একটু দেখ তো, দাদা।'

'কেন রে, কি হল?' বড়দা উদ্বেগের গলায় বলল, 'আমায় যদি কেউ মা-র হাতে কিছু দিতে বলে কি দেব রে!' বড়দি আমাদের প্রত্যেকের মুখে একে একে তাকাল, তারপর কেমন করে যেন মাথা নাড়ল, বলল, 'জানি না কী দেব মা-র হাতে কে জানে!'

কথাটা আমাদের কানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ যেন ঘুরে দাঁড়াল। আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। সহসা অনুভব করলাম বিহ্বল হয়েছি।

'মা-র হাতে কী দেব--' এই প্রশ্ন আচমকা বড়দি আমাদের সামনে যবনিকার মতন নিক্ষেপ করল। আমরা অসংবিত ও বিমূঢ় হয়ে বসে থাকলাম। তারপর ক্রমশ বড়দির কথার পরিপূর্ণ মর্ম আমাদের হৃদয়ে অনুভব করতে পারলাম।

সমূলে সচকিত হবার মতন আমরা শিহরিত ও কম্পিত হয়ে দেখলাম, এই প্রশ্ন যেন আমাদের সমস্ত বোধ অধিকার করেছে। আমরা কী দেব, কী দিতে পারি

মাকে?---মনে হল, এই অদ্ভুত প্রশ্নে আমরা, আমাদের সম্মিলিত বোধ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছি। যেন কোনো ভয়ঙ্কর পর্বতচূড়ায় এনে কেউ আমাদের পরস্পরের দেহের সঙ্গে বাঁধা দড়ি কেটে দিয়েছে, আমরা সবাই চূড়ার অন্তিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি।

স্তব্ধ নিঃসাড় হয়ে আমরা বসে থাকলাম। চাঁদের আলো কদমগাছের ছায়াটিকে বেদীর সামনে শুইয়ে রেখেছে। করবীঝোপে বাতাস যেন ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে কেটে যাচ্ছিল, শব্দ হচ্ছিল পাতার। আমরা আমাদের ছায়ার নক্শা থেকে চোখ তুলে কখন যে শূন্য দৃষ্টি রেখেছি কেউ জানি না।

বড়দাই প্রথমে কথা বলল। মা-র কোলে বড়দাই প্রথম এসেছিল, বড়দাকে দিয়েই মা-র মাতৃত্ব শুরু, হয়তো তাই বড়দা এই নীরবতা এবং অপেক্ষা প্রথমে ভাঙল, যেমন করে মা-র সন্তান-কামনার অপেক্ষা ভেঙেছিল।

'অনু কিন্তু কথাটা মন্দ বলে নি।' বড়দা ধীরে সুস্থে নরম গলায় থেমে থেমে বলতে লাগল, 'আমরা কেউ মৃত্যুর পরটর বিশ্বাস করি না, তবু ভাবতে ভাল লাগছে, আমাদের মা দীনুর গল্পের মতন দীর্ঘ পথ হেঁটে যাবে। আমরা মা-র জন্যে কে কী দিতে পারি?'

আমরা প্রকৃতপক্ষে ওই একই চিন্তা করছিলাম। মা-র সেই দীর্ঘ অন্তহীন পথ-যাত্রায় আমরা মাকে কী সম্পদ দিতে পারি?

বড়দা দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেলল, কদমছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক দণ্ড, তারপর মুখ তুলে বলল, 'কি যে দেব, আমিও ভেবে পাচ্ছি না।' বড়দার গলার স্বর বিষণ্ন উদাস। বড়দিকে দেখল বড়দা, কাঠচাঁপার বুড়ো গাছটাকে অন্যমনস্ক ভাবে লক্ষ্য করল। 'মা-র অনেক দুঃখ ছিল, অনেক। আমি সব দুঃখের কথা জানি না। একটা দুঃখ জানি, আমায় নিয়ে।'

আমার মনে হল, বড়দা ঠিক আমার মতন করেই ভাবছে। এ-সংসারে মা কী পায় নি, কী অভাব তার ছিল, কী পেলে মা-র সে অভাব থাকত না, আমরা এখন তাই ভাবছিলাম। মা-র এই পরবর্তী যাত্রায় আমরা বোধ হয় মাকে সেই জিনিস দিতে চাইছিলাম যা এখানে দিতে পারি নি।

'সে রকম দুঃখ তো আমার জন্যেও মা-র ছিল।' ছোট বলল বড়দাকে লক্ষ্য করে।

'আমাদের সবায়ের জন্যই ছিল।' বড়দা জবাব দিল।

'তাহলে কি আমরা মা-র হাতে সেই দুঃখগুলো আর দিতে চাই না?' ছোট অস-হায়ের মতন শুধালো।

'তা ছাড়া আমরা আর কী দিতে পারি!---' বড়দা ছোটর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাল কলা জল আমাদের মা-র দরকার নেই। মাকে যদি আমরা সেই মনের জিনিস-গুলো দিতে পারি, এখানে যা পারি নি—মা-র কাজে লাগবে।' 'কাজ' শব্দটা বড়দা টেনে বড় করে উচ্চারণ করল।

আমি মনে মনে বড়দার কথায় সায় দিলাম। মাকে আমরা অন্য কিছু দিতে পারি না।

'তুই তো জানিস অনু—' বড়দা বড়দিকে লক্ষ্য করে কথা শুরু করল, 'আমি বিয়ে করি নি বলে মা-র মনে বড় দুঃখ ছিল। অভিমানও। মা-র কি সাধ ছিল আমি জানি। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল না।---আমার জন্যে মা মেয়ে পছন্দ করে রেখেছিল, বাবা সেই মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যাবে বলে ঠিক করেছিল, আমি অমত করায় আর ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গড়ায় নি।'

'তুমি অমত করলে কেন?' আমি বড়দার ওপর যেন অপ্রসন্ন হয়ে বললাম।

'কেন করলাম—!' বড়দা আমার দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল। পলক ফেলল না। তারপর অতিশয় স্নিগ্ধ হয়ে বলল, 'আমার বন্ধু অবনীর সঙ্গে সেই মেয়েটির ভাব ছিল।'

'তা হলে সন্দেহ?' ছোট যেন বিরক্ত হল।

'না রে সন্দেহ নয়। মেয়েটিকে অবনী ভালবাসত।' বড়দা শান্ত গলায় বলল, 'মাকে আমি বলেছিলাম। মা বলেছিল, কিন্তু কনক যে অপরূপ সুন্দরী। এ মেয়ে এলে আমার বংশধররা কত সুন্দর হবে ভেবে দেখ।' কয়েক দণ্ড থেমে বড়দা যেন মা-র সঙ্গে তার সেই কথোপকথন স্মরণ করল, তারপর বলল, আমি সৌন্দর্য ভালবাসি, কিন্তু ভালবাসা আরও বেশী ভালবাসি।' অনেকক্ষণ আর কথা বলল না। বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। 'মা এই কথাটা কেন যে বুঝল না!' বড়দা আক্ষেপের গলায় বলল, মনে হচ্ছিল তার কোনো পুরনো প্রদাহ সে আজ অত্যন্ত ব্যথার সঙ্গে আবার অনুভব করছে। অনেকটা সময় চুপ করে থেকে বড়দা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল, মৃদু গলায় টেনে টেনে বলল, 'আমি মাকে আমার সেই ভালবাসার মন দিতে পারি।'

বড়দা নীরব হলে সাদা বেদীটার গায়ে চাঁদের আলো ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে মলিন হল সামান্য।

আমরা নির্বাক বসে থাকলাম। চৈত্রের বাতাস করবীঝোপের তলা থেকে ধুলোর গুঁড়ো এনে মাখিয়ে গেল। রাস্তা দিয়ে একটা টাঙা যাচ্ছে, টাঙাঅলার পায়ে-টেপা ঘন্টি বাজছিল। কদমগাছের ছায়া একটু যেন হেলে গেছে।

'তা হলে আমিও বলি—' বড়দি বলল। বড়দার পর বড়দিরই বলার কথা। আগে বড়দি দিশেহারা হয়ে বলেছিল, সে কি দেবে জানে না; এখন বড়দার কথার পর বড়দি মন স্থির করতে পেরেছে।

বড়দি কি দেয় শোনার জন্যে আমরা সকলে মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম। জ্যোৎস্না আবার স্পষ্ট হয়েছে। চন্দ্রকিরণে বড়দিকে রেশমের মতন নরম মসৃণ দেখাচ্ছিল। হাঁটু ভেঙে একপাশে হেলে বসেছিল বড়দি, তার হাতে সরু দুগাছা করে সোনার চুড়ি। সাদা হাতে মিনের কাজের মতন চুড়ি দুটো চকচক করছিল।

অল্প সময় ইতস্তত করে বড়দি বলল, 'আমি অমন করে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি বলে মা কোনো দিন খুশি হয় নি। তুই তো জানিস দাদা, মা তোকে কতবার সেই লোকটার কাছে যেতে বলেছে কেন বল তো! বলত যাতে তুই তাকে ভুলিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনতে পারিস।' সোজা হয়ে বসে নিল বড়দি, বাঁ-হাত গলার কাছে নিয়ে গিয়ে তার মটর-হারে আঙুল রাখল। বাবাকেও মা বুঝিয়েছিল, আমি ওখান থেকে চলে এসে ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। বরং চেপে বসে থাকলে তাদের জামাইকে শুধরে নিতে পারতাম। - - -মা আমায় বলত, এই তেজ দেখিয়ে তুমি তোমার ক্ষতি করলে। সারা জীবন পুড়বে।'

'তুমি ত আজও মাঝে মাঝে কাঁদ, বড়দি।' ছোট আচমকা বলল।

বড়দি ছোটর দিকে তাকাল। ভাবল যেন। বলল, 'কাঁদি—' আস্তে মাথা নাড়ল বড়দি, 'কাঁদি, মা কেন আমায় আবার বিয়ে করতে বলল না।'

'তোমার কি আবার বিয়ে করার সাধ ছিল?' আমি অবাক হয়ে বড়দিকে দেখছিলাম।

'হ্যাঁ, মা-বাবা যদি বলত, আমি আবার বিয়ে করতাম।- - -চামড়ার ব্যবসাদার

সেই লোকটাকে ত্যাগ করে এসে আমি শুধু নিজেকে বাঁচিয়েছিলাম, কিন্তু আমার দরকারটুকু তো পাই নি।'

'তোমার আবার বিয়ে করা খুব সহজ ছিল না, বড়দি।' ছোট বলল।

'না হয় কঠিনই ছিল। তাতে কি!---' বড়দি যেন দ্বিধাবোধ করে থামল, তারপর বলল, 'সংসারে এমন মানুষ ছিল যে আমায় বিয়ে করত।---মা-র সাহস হল না।---একদিন আমি মাকে বলেছিলাম, রোগ, নোঙরামি, কষ্ট সব সহ্য করি তাতে তোমার আপত্তি নেই; আপত্তি, সুখ পাবার ব্যবস্থা করতে। মা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল, বলেছিল—এ বাড়ির মর্যাদা নষ্ট হোক এমন কিছু করতে আমি দেব না। ---মা মর্যাদা চাইত, আমি সাহস চাইতাম। বড়দি সামান্য থামল, তার সমস্ত শরীর রেশম দিয়ে মোড়া সাজানো পুতুলের মতন দেখাচ্ছিল, ভাঙা হাঁটু, মাটির ওপর ভর-করা হাত: নিশ্বাস ফেলে বড়দি বলল, 'মাকে আমি মানুষের উচিত সাহস দিতে পারি নি। মা যেন সেই সাহস পায়।'

কথা শেষ করে বড়দি আকাশের দিকে চোখ তুলল। আমরা স্তব্ধ। চৈত্রের বাতাস এসে কদমের কয়েকটি শুকনো পাতা ফেলে গেল, চাঁদের আলোর একটা কাঠবেড়ালি কাঠচাঁপার ডাল বেয়ে এগিয়ে এসে আবার ছুটে পালাল।

বেদীর কুলুঙ্গীর মধ্যে প্রদীপটা অকম্পিত জ্বলছে। ধূপধুনো ফুরিয়ে গেছে আমরা আর গন্ধ পাচ্ছিলাম না।

এবার মেজদার পালা। আমরা মেজদার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মেজদা কিছু বলছিল না।

ছোট মেজদার গায়ে হাত দিল। 'মেজদা—তুমি?'

মেজদা মাথা নাড়ল। 'এখনও কিছু ভেবে পাই নি। তোরা বল। তুই বল, ছোট।'

ছোটর স্বভাবই আলাদা। তার অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবনা নেই। ছোট একবার প্রদীপের দিকে তাকাল, এবার আকাশের দিকে। খুক্ খুক্ করে কাশল কবার; তারপর বলল, 'এত অল্প বয়সে আমার এমন একটা বিশ্রী অসুখ করল বলে মা বেচারী বড় কষ্ট পেয়েছিল। ভাবত, আমি আর বাঁচব না। আমিও প্রথম প্রথম সেই রকম ভেবেছি। মা বলত, তুই নিজে ইচ্ছে করে এই অসুখ বাধালি। কী বোকার মতন কথা বলত বড়দি। অসুখ কি কেউ ইচ্ছে করে বাধায়—! না অসুখে সুখ আছে—! এক দমকে কথা বলছিল ছোট, বলতে বলতে থামল। মনে হল, সে কোন কিছু না ভেবেই কথা শুরু করেছিল, তারপর খেই হারিয়ে ফেলেছে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। আমরা চুপ করে থাকলাম। ছোট একটু যেন অপ্রস্তুত হল। মাথার বেণী বুকের কাছে টেনে আঙুলে জড়িয়ে দুচার বার দোলাল। ছোটর গায়ে হালকা রঙের একটা শাড়ি, গায়ে অর্ধেকহাত জামা। ছোটর কপাল ছোট; দুপাশের চুল তার প্রায় সবটুকু কপালই ঢেকে ফেলেছে। নাকটি লম্বা; চোখ দুটি খুব কালো, ছোটর হঠাৎ থেমে যাওয়া, হঠাৎ অপ্রস্তুত বোধ করা এবং এই আপাতত চাঞ্চল্য থেকে মনে হল ছোট যেন খেই খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে।

আরও একটু সময় নিল ছোট। সে তার কথা খুঁজে পেল। বলল, 'অসুখ কেউ ইচ্ছে করে বাধায় না, অসুখে সুখ নেই—তাও ঠিক। তবু আমি এই অসুখে পড়ে একটা সুখ পাচ্ছিলাম।---তুমি তো জান বড়দি, অসুখের সময় আমার বন্ধুটন্ধুরা খোঁজ-খবর নিতে আসত। বেশী আসত সুশান্ত, প্রায় রোজই। অনেকক্ষণ থাকত। আমায় ভোলাবার চেষ্টা করত, বলত, এ অসুখ কিছুই না।---মা কেন জানি এটা

পছন্দ করত না, একেবারেই নয়।' ছোট তার দীর্ঘ বেণী কাঁধের ডান পাশে রাখল, আকাশের দিকে তাকাল আবার, তাকিয়ে থাকল, বলল, 'একদিন মা আমার সামনে সুশান্তকে বলল, তুমি ত ডাক্তার নও; কেন অযথা ও-সব কথা বল। ওকে বকিয়ো না, বিরক্ত করো না।---সুশান্ত তারপর থেকে আর আসত না। আমি মাকে বলেছিলাম, অকারণে তুমি ওকে অপদস্থ করলে। মা বলেছিল, 'ওরা আমার অনেক করেছে, তোমায় মাতিয়ে এই অসুখ দিয়েছে। তা দিক, আর আমার সুখ দরকার নেই।' ছোট আকাশ থেকে চোখ নামাল, তার গলা পাতলা, কাঁপছিল চোখ, যেন একটু চিকচিক করছে। ও বলল, 'মা আমার অসুখটাই দেখেছিল, সুখ দেখেনি। মা জানত না, জগতে সব রোগ কেবল ডাক্তার দিয়ে সারানো যায় না। আশা পাওয়া অনেক; ভরসা পাওয়ার কত শক্তি---' ছোট আমার দিকে তাকাল, 'আমি মাকে আর কিছু দিতে পারি না, মন ছাড়া, আশা ছাড়া, ভরসা ছাড়া। মা যেন তার মনে ভরসা পায়।'

ছোট নীরব হল। মার বেদীতে কদম-ছায়া উঠে এসেছে। বড়দার পাশ দিয়ে ছায়াটা বড়দির কোলে গিয়ে বসেছে। বাতাবিলেবুর গাছটা অনেক দূরে। তার মাথার ওপর দিয়ে ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে রেললাইনের বাতি চোখে পড়েছিল আমার। দশরথ ধোপার কুঠিতে ওরা গান গাইছে। গত সপ্তাহে দশরথের ছেলের বিয়ে হয়েছে, আজও থেকে থেকে সেই আনন্দের লহরী তোলে তারা।

খুব যেন ক্লান্ত হয়ে ছোট তার মাথা আমার কাঁধে রাখল। বলল 'কড়ি, এবার তোর পালা—'

বড়দা, বড়দি আমার দিকে তাকাল। মেজদা তার অন্ধ চোখ অনুমানে আমার দিকে ফিরিয়ে রাখল। সহসা অনুভব করলাম, ওরা আমার হৃদয়ে লুকানো মার ছবি দেখার জন্যে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে আছে। আমার ভয় করছিল। কাঠগোড়ায় দাঁড়ানো কোনো সাক্ষীর বোধ হয় জবানবন্দী দেবার সময় এই রকম ভয় হয়।

এই মুহূর্তে সকলই স্তব্ধ। চৈত্রের বাতাসও শান্ত হয়ে আছে। দুধের ফেনার মতন জ্যোৎস্নায় আমার চারটি উৎকর্ণ আত্মীয় নিষ্পলকে আমায় দেখছে। বড়দার দিকে তাকিয়ে আমি কথা বলার আয়োজন করছিলাম। বড়দার পাশ দিয়ে বেদীর কুলুঙ্গিতে প্রদীপ চোখে পড়ছিল। শিখাটি স্থির। মার চোখের মতন শিখাটি যেন আমায় লক্ষ্য করছিল।

'ভেবে পাচ্ছি না—' আমি বললাম। আমার মন স্থির নয়, নিঃসংশয় নয়। দ্বিধার গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে আমি বললাম, 'কখনও মনে হচ্ছে অনেক কিছু যেন দেবার আছে, আবার মনে হচ্ছে কিছু নেই। আমি সব চেয়ে ছোট বলেই মা আমায় তার শেষ গচ্ছিত ধনের মতন করে সরিয়ে রেখেছিল। মানুষ যেমন করে সিন্দুকে অবশিষ্ট অলঙ্কার তুলে রাখে অনেকটা সেই রকম। ব্যবহার করত না, দেখত না।' কথা বলার সময় ক্রমশ আমার মনে হচ্ছিল আমি ভয় কাটিয়ে উঠতে পারছি। গলা কাঁপছিল তখনও, তবু আমার স্বর স্পষ্ট হয়ে এসেছে অনেকটা। 'তোমরা মাকে যত পেয়েছ, যেমন করে পেয়েছ, আমি তা পাই নি। আমায় মা আমাদের সংসারকে তেমন করে বুঝতে দেয় নি। ভাবত, আমার এ-সবে দরকার নেই।---কিন্তু আমি মাকে দেখেছি। ---একবার মার সঙ্গে আমায় কাশী যেতে হয়েছিল। তোর মনে আছে ছোট, বাবা মারা যাবার পর মা একবার আমায় নিয়ে কাশী গিয়েছিল পনেরো বিশ দিনের জন্যে। তোরা ভেবেছিলি মার মন ভাল নয়, বাবার অভাবে মন বড় কাতর—তাই মা কটা

দিন তীর্থের জায়গায় মন জুড়িয়ে আসতে গেছে। হয়ত খানিকটা সেই উদ্দেশ্যেই মা গিয়েছিল, কিন্তু সবটা নয়।---'আমার গলা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আমি আর ভীত হচ্ছিলাম না; আমার মনের সামনে সব স্থির হয়ে গিয়েছিল, যা খোঁজার আমি যেন তা পেয়ে গিয়েছিলাম। প্রদীপ শিখাটি শেষ বারের মতন দেখে আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মেজদাকে দেখছিলাম। 'কাশীতে বাবার এক বন্ধু থাকত। আমি কখনও তার নাম শুনি নি—'

'শচীন-জ্যেঠামশাই!' বড়দা বলল অবাক হয়ে।

'হ্যাঁ। তুমি তাহলে জান?'

'জানি বই কি। শচীজ্যেঠাকে আমি কতবার দেখেছি। তুইও দেখেছিস, অনু।'

'দেখেছি।' বড়দি মাথা নাড়ল।

'বাবার সঙ্গেই ব্যবসা করত। তারপর কি হয়, আলাদা হয়ে গেল। পরে আর আমি শচীজ্যেঠার কথা শুনি নি।'

'নানা জায়গায় ঘুরে শেষে তিনি কাশীতে গিয়েই শেষ জীবন কাটাচ্ছিলেন।' আমি বললাম। বলার সময় শচীন-জ্যেঠামশাইয়ের কাশীর সংসার আমার চোখে ভাসছিল, স্পষ্ট অনাবৃত। 'বাঙালীটোলার অন্ধকার গলিতে নরকের মতন ছোট ছোট খুপরি ঘরে ওঁরা থাকেন; উনি স্থবির হয়ে পড়েছেন, স্ত্রী শ্বাসরোগে শয্যাশায়ী, বড় ছেলে হোটেলের গাইডগিরি করে, দুটি মেয়ে—একটি পা খোঁড়া হয়ে গেছে টাঙা থেকে পড়ে, অন্যটি কোন বাড়িতে যেন রান্নাবান্নার কাজ করে দেয়। ছেলের বউ মারা গেছে দুটি বাচ্চা-কাচ্চা রেখে।---কাশীর সেই অন্ধকার সরু নোংরা পাতকুয়োয় একটি অসহায় পরিবার গলা পর্যন্ত ডুবে। মা গিয়েছিল সেখানে বাবার পুরানো কোন ব্যবসায় শচীন-জ্যেঠা কবে কাগজপত্রে বাবার অংশীদার ছিল সেটা নাকচ করিয়ে আনতে। উনি সে-কথা মনেও রাখেন নি, মনে রাখার কথাও নয়। তবু মা আইনের ফাঁক রাখতে রাজী নয়। কে জানে কবে এই গর্ত খুঁড়ে সাপ বেরুবে না। একশো টাকার দু'খানা মাত্র নোট মা শচীন-জ্যেঠার হাতে দিয়ে সেই পুরানো অংশীদারী বাতিল করিয়ে নিল। ---আমি মাকে বলেছিলাম, তুমি ত অনেক আগেই এটা ওঁদের ছেড়ে দিতে পারতে মা। বাবাও ত কাঠের ব্যবসাটা আর করত না।---জবাবে মা বলেছিল, তুমি ছেলেমানুষ, বিষয়-আশয়ের কিছু বোঝ না। ওই ব্যবসা অন্যের তদারকিতে দেওয়া আছে, বছরে হাজার দুয়েক টাকা বাড়িতে আসে। টাকাটা আমি অকারণে খোওয়াব! অত স্বার্থত্যাগ আমি শিখি নি।' আমার গলার শিরা যেন কেউ আঙুলে জড়িয়ে জড়িয়ে টানছিল, সেই যন্ত্রণায় আমি কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারলাম না; আমার সামনে শচীন-জ্যেঠার পিচুঁটিভরা চোখ দুটি ভাসছিল। কী দুর্গতি তাঁর! 'মা স্বার্থ-ত্যাগ জানত না।' আমি চাপা গলায় বললাম, 'মা দীন ছিল, আর মন কৃপণ ছিল। ---আমায় যদি কিছু দিতে হয় আমি মাকে স্বার্থত্যাগ দেব। আর কিছু না।'

আমি নীরব হলে বৃন্দাবনের কদমগাছ তার ছায়া আরও দীর্ঘ করল। বড়দির বুকে সেই ছায়া দেখলাম। কয়েকটি খড়কুটো এল দমকা বাতাসে। দশরথ ধোপাদের বস্তিতে গানের সুর থেমে গেছে। একটি রাত্রিগামী ট্রেন সাঁকোর ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে হুইসল্ দিচ্ছে পথের জন্যে। ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এখানে ভেসে আসছিল।

মেজদা কিছু বলে নি। এবার বলবে। মেজদার পালা ফুরোলে আমাদের পাঁচটি আঙুলই গুটিয়ে যাবে।

আমরা কেউ কোনো কথা না বলে মেজদার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মেজদা কিছু বলছিল না। মেজদা শূন্যপানে মুখ তুলে রেখেছিল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম। অধীর উৎকণ্ঠিত সেই অপেক্ষা দীর্ঘ মনে হচ্ছিল।

'দীনু—' বড়দা মেজদাকে ডাকল।

মেজদা স্থির, শান্ত। যেন আকাশের দিকে তার অন্ধ চোখ মেলে সে হৃদয় দিয়ে মাকে দেখছে।

'দীনু—' এবার বড়দি হাত বাড়িয়ে মেজদার গা স্পর্শ করল।

মেজদা তবু পাথরের মতন বসে। তার নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না বোঝা যাচ্ছিল না।

ছোট ডাকল, 'মেজদা।'

হাত দিয়ে মেজদাকে স্পর্শ করে বললাম, 'মেজদা, এবার তোমার পালা।'

মেজদা সামান্য নড়ল। আকাশের দিকেই তার মুখটি তোলা, অমল জ্যোৎস্না তার সমস্ত মুখ লেপে রেখেছে, তার দুই অন্ধ নয়ন নিবিড় করে সেই আলো মাখছিল।

মেজদা তার সাদামাটা মেঠো সুরেলা গলায় বলল, 'সৎকার শেষ হয়ে গেলে মানুষ আর কি দিতে পারে! তোমরা মার সৎকার শেষ করেছ। আমার কিছু দেওয়ার নেই। কয়েক দণ্ড থামল মেজদা, তারপর বলল, 'আমাকে যেমন একটা নির্বোধ সুটকেসঅলা অন্ধ করে দিয়ে গেল, তেমনি মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল। মা যে কত অন্ধ আমি জানতাম।---এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে ইচ্ছে করে না। মা আমার হৃদয়ের চক্ষু পাক।'

মেজদা আর কিছু বলল না। কাশীর সাদা পাথরে বাঁধানো মার বেদীর ওপর আমরা পাঁচটি সন্তান বসে থাকলাম। শব্দহীন সেই চরাচরে বসে অনুভব করলাম, আমাদের মা-র সৎকার যেন এইমাত্র সমাধা হল।

সর্বগ্রাসী এই দুঃখেও আমরা মা-র নির্বিঘ্ন যাত্রা কামনা করছিলাম। আমাদের যা দেবার সাধ্যমত দিয়েছি। মা সেই অন্তহীন পথ অতিক্রম করুক।



চাণক্য সেন

জন্ম: ১৯২২। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে, গ্রামের নাম কার্তিকপুর। এই গ্রামেই কাটে ভবানী সেনগুপ্তের ছেলেবেলা। হ্যাঁ, এটাই এই লেখকের আসল নাম। কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়-জীবন কলকাতায়। কর্মজীবনে কী না করেছেন ভবানীবাবু। সাংবাদিকতা দিয়ে শুরু করেছেন সেই কবে থেকে। পরে ভারত সরকারের বেতার ও তথ্যবিভাগে, নিউইয়র্কের কলমবিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং বর্তমানে, আবার কলকাতায়, 'পারস্পেকটিভ', পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কর্মরত। তীক্ষ্ণ মেধা এবং গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তিতে বুদ্ধিজীবী-মহলে দারুণভাবে আদৃত। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সাম্যবাদ, সোভিয়েট—তৃতীয় বিশ্বসম্পর্ক—এই তিনটি বিষয় নিয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলেছে উপন্যাস-কৃতি। ১৯৬০-এ 'রাজপথ জনপথ' যে-পথ খুলে দিয়েছিল, সেই পথ আজ আরও অনেক প্রশস্ত হয়েছে। 'মুখ্যমন্ত্রী', 'তিন তরঙ্গ', 'সে নহি, সে নহি', 'সমুদ্র-শিহর', 'অশোক উদ্ভিদমাত্র'—তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মাত্র কয়েকটি। 'তুমি, মালিনী চৌধুরী', তাঁর আর একটি চমৎকার উপন্যাসের নাম।

রাশভারী এই মননশীল লেখককে পাওয়াই বড়ো কঠিন। পুরু লেনসের চশমার আড়ালে অন্তর্ভেদী দু' চোখের দিকে তাকালে অস্বস্তি হয়।

পুরস্কার? না, বাইরের সব পুরস্কারে ওঁর আস্থা নেই।

বুদ্ধিদীপ্ত এই লেখক খুশী হন, যদি সত্যিকারের কোনও পাঠক তাঁর রচনার ভিতরে যান। সেই তাঁর পুরস্কার।

ছোট গল্প আমি বিশেষ লিখি নে। আর লিখিনে বলেই সত্যকারের ভাল ছোট গল্প লিখতে পারি কিনা এ বিষয় আমার সন্দেহ। দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনুরোধে বর্তমান সংকলনের জন্যে আমার 'শ্রেষ্ঠ' গল্প নির্বাচন করা ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজ হল এ-কারণে যে আমার প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা মাত্র বাইশটি (অপ্রকাশিত গল্পের সংখ্যা, শূন্য)। যে গল্পটি আপনাদের হাতে তুলে দিলাম তার মধ্যে একটি জীবন্ত মানুষের স্বাদ পাবেন, যে বদলতি সমাজের চতুঃস্রোতে বিভ্রান্ত ও আহত হয়েও, মনুষ্যত্বের উত্তাপ একেবারে ঝেড়ে ফেলে নি। এ গল্পটি যাকে নিয়ে লিখিত সে পেশায় ড্রাইভার, এবং আমার আঠার বছরের বন্ধু। অনেক তথাকথিত 'বড়' মানুষের চেয়ে একে আমি বড়মানুষ মনে করি।

চাণক্য সেন
৬-৮-৭৮

পিতা

দিল্লীর একত্রিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে হরনাম সিংকে ক'জনেই বা চেনে, কিন্তু আমার সঙ্গে তার পরিচয় অনেকদিনের, এবং গভীর। সে আমার গাড়ি চালায়, অতএব, তার দ্বারা প্রতিদিন আমি চালিত হয়ে থাকি। ড্রাইভার এবং গাড়ির মালিকদের মধ্যে এক ধরনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গ'ড়ে ওঠে, অনেকে জানেন। তা ছাড়া মানুষ হিসেবে হরনাম সিংকে আমি শ্রদ্ধা করি। প্রথমত, তার ছ' ফুট দু'ইঞ্চি মেদহীন দেহের সোজা তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব; দ্বিতীয়ত, তার মুখে অবিরাম হাসি, প্রায়ই যা সরব এবং শিশুর মতো সরল; তৃতীয়ত, তার স্বাভাবের আকর্ষণীয় সততা, এবং প্রধানত, তার জীবন-চেতনার বলিষ্ঠ আশা প্রবণতা। হয়তো একটু বাড়িয়েই বলছি, কারণ হরনাম সিংকে আমি অনেকাংশে এক অসাধারণ মানুষ বলে মনে করি।

কারণ আছে। লোকটির আনুগত্যে ফাঁক নেই। প্রয়োজনে, বিপদে সর্বদা এক পায়ে খাড়া। চুরি কারচুপির ধার ধারে না। টাকার চেঞ্জ বেশির ভাগ সময়ে ফেরত দেয়। লোভ-লালচ কম। পাংচুয়াল। গাড়িটাকে সত্যিকারের ভালোবাসে, যত্ন করে। ভালো চালায়, সাবধানে, গা বাঁচিয়ে। আপনার যদি ড্রাইভার থাকে, হয়তো আপনি ইতিমধ্যেই হিংসে করছেন। হ্যাঁ, হরনাম সিংকে ভালোবাসার কারণ আছে।

ওকে নিয়ে যে গল্প লেখা যায়, কখনও ভাবি নি। হঠাৎ দেখা গেল হরনাম সিং সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ ওর জীবনবেদে এমন কিছু ধরা পড়ল, যা যুগপৎ ভাস্বর ও ব্যথা-ম্লান। মধ্যাহ্নের সূর্যের ওপর হঠাৎ বর্ষার মেঘ নেমে আসে, দেখে থাকবেন। তেমনি।

"ছেলেটা চলে গেল," গাড়ি চালাতে চালাতে বলল হরনাম সিং। "ছেলেটা চলে গেল।" বলে উঁচু পর্দায় হেসে উঠল। চোখ দুটো জলে ভরে এল।

"যেতে দাও," বিজ্ঞের উপদেশ দিলাম আমি। "তুমি তো অনেক করেছ। এবার দেখুক জীবনটা এমন সহজ নয়। দেখুক কত ধানে কত চাল।"

চোখেমুখে হেসে উঠল আবার হরনাম সিং। বলল, "চলে গেল, দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু এই হুজুর, লেখাপড়া করল না। ড্রাইভারের ছেলেই রয়ে গেল। ভদ্রলোক হল না। আদমি হল না।"

পাতিয়ালা রাজ্যের যে গ্রামে হরনাম সিংএর জন্ম হয়েছিল তেতাল্লিশ বছর আগে, সেখান থেকে চার ক্রোশ দূরে ছিল মিড্‌ল্ স্কুল, যেখানে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বাল্যকালে ও পড়েছিল। বাপও গরজ করে নি, নিজেরও মন ছিল না, তাই সেদিন স্কুল যাওয়া বন্ধ ক'রে বাপের পেছন পেছন মাঠে গিয়ে হাজির হল, কেউ অবাক হয় নি, তিরস্কার করে নি, দুঃখ পায় নি। মাঠের কাজেও মন বসল না হরনাম সিংএর, তাই ষোলো বছর বয়সে একদিন হাজির হল পাতিয়ালা শহরে, কাজ পেয়ে গেল এক মোটর মেরামতের গ্যারেজে। তখন সবেমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে।

গ্যারেজে কাজ করতে করতে শিখে নিল গাড়ি-চালনা। বছর খানেক পরে ভর্তি হল মিলিটারীতে। ট্রাক-ড্রাইভার। পাঁচ বছর ধরে অনবরত অসংখ্য গাড়ি চালাল হরনাম সিং—ভারী লরী, জীপ, এমনি গাড়ি, ভারতবর্ষে, বর্মায়, সিংহলে। যুদ্ধের পরও বছর দুই মিলিটারীতে কাজ করার পর, দেশ যখন ভাঙল এবং স্বাধীন হল, হরনাম সিং ছাড়া পেয়ে চলে এল দিল্লীতে, কাজ পেল ভারত সরকারের এমন এক বিভাগে যেখানে দিনে শ' দুই মাইল তাকে গাড়ি চালাতে হয়, কখনও রাত্রি আটটা থেকে ভোর চারটে, কখনও ভোর চারটা থেকে বেলা বারোটা, কখনও বারোটা থেকে রাত আটটা। অর্থাৎ সিফ্‌ট ডিউটি। এরই মধ্যে পার্ট-টাইম কারুর না কারুর ড্রাইভারীও সে ক'রে এসেছে। এখন বছর পাঁচেক ধরে লেগে আছে আমার সঙ্গে।

চমৎকার ইংরেজী বলে। ভাষাটা যেহেতু কষ্ট ক'রে শিখেছে, যুদ্ধের সময় গোরা সৈন্যদের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটিয়ে, তাই চর্চা রাখবার চেষ্টা প্রচুর, যাতে অব্যবহারে বিদ্যা হারিয়ে না যায়। অতএব, আমার ও আমাদের সঙ্গে বেশীর ভাগ কথা বলে ইংরেজীতে। অথবা হয়তো বুঝে নিয়েছে আমার হিন্দীজ্ঞান ওর, ইংরেজীর চেয়ে এমন কিছু প্রখর নয়। আমি যদি হিন্দী বলতে পারি, হরনাম সিং-ই বা কেন ইংরেজী বলবে না?

সুতরাং: "হোয়াই গো বিগ গ্যারেজ! অল চোরস্। আই নো ম্যান ইরউইন রোড। গুড মেকানিক। নো লেগ।"

"পায়ের মে কেয়া হুয়া?"

"হী হ্যাস ভেরী ব্যাড্ অ্যাকসিডেন্ট। ট্যাক্সি হিট। ভেরী ব্যাড ট্যাক্সিম্যান। হী নো কনসাস। ট্যাক্সিম্যান কিপ হিম অন রেললাইন। ওয়ান লেগ গন। কাম রেলগাড়ি, সেকেণ্ড অ্যাকসিডেন্ট, টু লেগ গন। বাট ম্যান অ্যালাইভ। টুক্ টু হসপিটাল। গেট ওয়েল। নাউ, বোথ আইরন লেগ। হী গুড মেকানিক অন ইরউইন রোড।"

"কাম করতা পারতা হ্যায়।"

"হোয়াট ডু? গড্ ক্রুয়েল, ম্যান মাস্ট লিভ। নো ম্যারেজ নো বোথ লেগ, হোয়াট ম্যারেজ?"

"উসকো কোন শাদী করেগা?"

"দ্যাট আই সে। নো গার্ল ম্যারী ম্যান ট্যু লেগ গন। গুড মেকানিক।"

গরীবের জন্যে হরনাম সিংহের প্রাণ সর্বদা দুর্বল। বড়ো কারখানায় গাড়ি মেরামতে ভীষণ আপত্তি। যদি বলি, কারখানায় কাজ ভালো, তা ছাড়া, ওদের দায়িত্ব থাকে, নুক্স হলে আবার গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়, হরনাম সিং জবাব দেয়:

"দে রীচ। মোর রীচ মোর থীভ্। পুওর ম্যান মেক ট্যু পাইস।"

বলেইছি তো, লোকটা ভালো। হৃদয়বান। দরদ আছে।

সরল, সহজ। বাড়িতে ঢুকে সোজা শোবার ঘরে চলে আসে চাবির জন্যে। গিন্নী রাগ করেন। আমার কিছু বলতে সরম লাগে। হরনাম সিং-এর কুছ-পরোয়া নেই। খিদে পেলে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে পাচকের কাছে খাবার চেয়ে নেয়। অনুমতির অপেক্ষা না করে, টেলিফোন ব্যবহার করে। বাজার করতে দিলে উল্টো-পাল্টা করে আনে। বলেইছি তো, লোকটা সহজ, সরল। বাড়ি এসে প্রথমে খবরের কাগজ। কাগজখানা নিয়ে লাউঞ্জে বেতের চেয়ারে বসবে। পকেট থেকে বার করবে চশমা। এটা আমাকেই কিনে দিতে হয়েছে। ইচ্ছে ছিল, যে ডাক্তার কুড়ি টাকা ফী নিয়ে আমার চোখ দেখে তার কাছে যাওয়ার। পাঠিয়েছিলাম সফদরজং হাসপাতালে।

"হসপিতাল ডক্‌টর নো গুড।" আপত্তি করেছিল হরনাম সিং।

'বহুত গুড্‌ হ্যায়।" বলেছিলাম আমি।

"ডক্‌টর শেঠী ভেরী গুড।"

"বিশ রূপায়া লেতা হ্যায়।"

"হোয়াট, ট্যুএন্টি রূপি ফর আই?"

অর্থাৎ কুড়ি টাকা বড়ো, না আমার চোখ?

কিন্তু হসপিটালেই যেতে হয়েছিল। চশমার প্রেসক্রিপশন নিয়ে হাজির হল আমাদের জানাচেনা দোকানে। বিল দেখে অবাক্‌ হয়েছিলাম। বাইশ টাকা!

"আরে এতনা রূপায়াকা চশমা লিয়া?"

"অনলি ট্যুএন্টিটু রূপি।"

সেই বাইশ টাকার চশমা চোখে লাগিয়ে হরনাম সিং কাগজ পড়ে। বেশ বড়ো গলায়। বানান ক'রে ক'রে। এবং টীকার সঙ্গে।

"দি প্রাইম মিনিস্টার টু ডে টোল্ড পার্লিয়ামেন্ট দ্যাট প্রাইসেস অব এ-এ-সে-স-ন-সিয়াল কমো-কমা-ডি-আই-টি-ই-এস উইল বি ক-ন্‌ট্রো-ল-ড। হোয়াট সে! প্রাইস গো আপ মর্নিং ইভিনিং, পটাটো এইটি পয়সা কিলো, পুওর পিপল হাংরি, হোয়াট প্রাইম মিনিস্টার! সী টোল্ড দি লোক—সভা- - -।"

নেতাজী নগরে হরনাম সিং-এর সরকারী ফ্ল্যাট। একতলায়, দুখানা ঘর। পরিবার ছোট, স্ত্রী, দুটি ছেলে। সহজ সরল জীবন, তাই দু'ঘরের এক-খানাই যথেষ্ট; অন্য-খানা হরনাম সিং ভাড়া দিয়েছে, যেমন অনেকে দিয়ে থাকে, যদিও আইন-কানুনে বাধে। চাপ দিলে যত টাকা ভাড়া পেতে পারত তার চেয়ে বেশি নেয় নি, কারণ তার লোভ-লালসা কম। সুখী পরিবার। হরনাম সিং দিন রাত্রির তিন ভাগ সময় বাইরে, সংসার চলে স্ত্রীর পরিশ্রমে, গোলগাল মেয়েমানুষটি মুখরা নয়, শ্রম কাতর নয়, অপ্রয়োজনে অর্থব্যয়ে অরুচি। ছোট ছেলে সৎনাম মার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, স্কুলে যায়, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলে। বড় ছেলে নানক।

উনিশ বছরে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। বাপের মতোই দীর্ঘ, বড়শির-ছিপ, মুখে কিন্তু হরনামী হাসি নেই, কেমন একটা কঠোর কাঠিন্য; তবে চোখ দুটি জলের মতো তরল। নতুন দাড়ি-গোঁফে হঠাৎ একটু বেশী-বয়স দেখায়, ভালো ক'রে তাকালে অবশ্যি বোঝা যায় ওটা বাইরের।

ছেলেকে নিয়েই হরনাম সিং-এর যা কিছু সমস্যা। ছেলে নিয়ে সমস্যা নেই এমন বাপ কজন আছেন ভারতবর্ষে? অতএব, হরনাম সিং-এর পুত্র-প্রব্লেম এমন কিছু গল্পের উপাদান নয়। উপাদান এ জন্যে যে হরনাম সিং তার সন্তান, প্রথম সন্তান এবং পুত্র, নানক সিংকে চেনে না।

"সাব্‌", একদিন হরনাম সিং বলেছিল আমায়, বছর দুই আগে "সাব্‌, একটা আর্জি আছে।"

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে, যোগ দিয়েছিল, "মাই সন।"

"কি ব্যাপার?"

"ডিফিকাল্ট বয় মাই সন।"

"সব 'সনই' ডিফিকল্ট।"

"হী গুড বয়। বাট নো রীড।"

"কোন ক্লাসে পড়ে?"

"ক্লাস এইট। একজামিন অল্ পাস। বাট নো ওয়ার্ক।"

"না পড়েই পাস করে? তাহলে তো বুদ্ধি আছে।"

"ওয়ার্ক অন্লি হোয়েন একজামিন নিয়ার।"

"সবাই তো তাই করে দেখি আজকাল।"

"নট অল সাব্। বাপীসাব (আমার ছেলে) অলওয়েজ ওয়ার্ক। রীড মেনি বুক।"

"স্কুলটা পাস করিয়ে দাও, তারপর একটা চাকরি—"

"নো সাব্", হঠাৎ অসম্ভব জোর দিয়ে বলে উঠেছিল হরনাম সিং। "আই ভেরী পুওর ম্যান। নো এডুকেশন, অন্লি ক্লাস ফাইভ। মাই অল রিস্তেদার নো এডুকেশন। আই ওয়ান্ট মাই সন গুড এডুকেশন। আপ টু বি.এ.।"

সেদিন আমি হঠাৎ নতুন চেহারা দেখতে পেলাম হরনাম সিং-এর। লোকটা দিনরাত গাড়ি চালায়, পরিশ্রমের শেষ নেই। সবসুদ্ধ, মাইনে, বাড়ি ভাড়া, বাড়তি রোজগার নিয়ে, শ' দুই টাকা মাসিক উপার্জন। ছেলেকে বি. এ. পাস করানো ওর একমাত্র দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা। পাঞ্জাবী সর্দারের স্বপ্ন।

হরনাম সিং বলেছিল, "আই ভেরী পুওর ম্যান, সাব্। বাট ভেরী হ্যাপী। মাই ফ্যামিলি অল পীস। আই নো বরো মানি এনিবডি। সিম্প্ল্ লাইফ। খানা পরনা অল সিম্প্ল্। অন্লি বয় ভেরী ডিফিকাল্ট।"

"ডিফিকল্ট কিসে?"

"হী নো রীড; গুড বয়। বাট নো ওয়ার্ক। অলওয়েজ সিনেমা। অলওয়েজ নিড মানি। হোয়েয়ার আই গেট মানি?"

"ঠিক তো। চাইলেই ছেলেকে পয়সা দিতে হবে?"

"হোয়াট ডু সাব? নো গিভ্ মানি, মাচ্ ট্রাব্ল্। হী নো ঈট, গো এওয়ে ফ্রম হোম, ফাইট উইথ মাদার।"

"তুমি শাসন করতে পারো না?"

"আই টেল হিম সাব। নো হীয়র। ভেরী ডিফিকাল্ট।"

একদিন যা কখনও ঘটে না তাই ঘটল। হরনাম সিং এল আধ ঘন্টা লেট ক'রে। প্রচুর মাপ চেয়ে যা বলল তার মানে হ'ল: রেডিয়ো কিনতে চাঁদনীচক গিয়েছিল। এক সর্দার কমিশনে মারফি রেডিয়ো দেবে বলেছিল, তাই যেতে হ'ল চাঁদনীতে।

"রেডিয়ো কিনলে কেন হঠাৎ?"

"হোয়াট ডু সাব। বয় ওয়ান্ট রেডিয়ো। নো রেডিয়ো, নো রীড। নো গো স্কুল।"

রেডিয়ো না কিনে দিলে ছেলে স্কুলে যাবে না। তাই তিনশ' বারো টাকা দিয়ে হরনাম সিংকে রেডিয়ো কিনতে হ'ল।

"রেডিয়ো তো ভালো জিনিস। গান শুনবে, ভালো ভালো বক্তৃতা শুনবে।"

"হোয়াট গুড্ সাব? আই ভেরী পুওর ম্যান। নো লাইক রেডিয়ো। বাট বয় ওয়ান্ট। নো রেডিয়ো, নট গো স্কুল।"

এমনি ক'রে নানক সিং একদিন একজোড়া টেরিলিন শার্ট আদায় করল। পায়ের সঙ্গে কামড়ে লেগে থাকা ট্রাউজারও। "নো টেরিলিন শার্ট নো গো স্কুল।"

বাপকে স্কুলে না যাবার ভয় দেখিয়ে ছেলেটা দিব্যি সব কিছু বাগিয়ে নিচ্ছে। এ এক নতুন ধরনের ব্ল্যাক-মেল। একদিন বলতে হ'ল:

"ও যা চায় তাই যদি দাও, পড়াশোনা মাথায় উঠবে।"

"হোয়াট ডু সাব?"

"দেবে না।"

"দেন হী নট গো স্কুল।"

"বেশ তো, না পড়তে চায়, স্কুল ছাড়িয়ে দাও। তাগড়া জোয়ান ছেলে, কাজকর্ম শিখে রোজগার করুক।"

"নো সাব। ইন মাই ভিলেজ, নো গ্রাজুয়েট। নো রিস্তিদার এনি এডুকেশন। হী মাস্ট পাস বি. এ.।"

"এমনি ক'রে ক'দিন সামলাবে?"

"বয় ভেরী গুড, সাব। আফ্‌টার রেডিয়ো, হী রীড। গুড রেজাল্ট ইন ইনতিহান।"

"কি ক'রে জানলে? ছেলে বলেছে?"

"আই গো টু প্রিন্সিপাল। হী সে বয় গুড। বাট নো ওয়ার্ক।"

তারপর শুনলাম ছেলের জন্যে হরনাম সিং এক মাস্টার ঠিক করেছে, মাইনে মাসে ত্রিশ টাকা। অঙ্কে কাঁচা। প্রথম চেয়েছিল আমার ছেলের কাছে এসে অঙ্ক শিখুক। নানক রাজী হয় নি। অগত্যা গৃহশিক্ষক।

নানক এখন ক্লাস টেনে পড়ছে। প্রায়ই হরনাম সিং বলে, আর একটা বছর পরেই সে কলেজে যাবে। কোন কলেজে পাঠাবে জিজ্ঞেস করে। আমার ছেলে সেণ্ট স্টিফেন্‌স্‌-এ যায়। নানক কি পড়তে পারবে ঐ কলেজে? অবশ্য যদি ভালো রেজাল্ট করে? খরচ কি অনেক বেশি? বেয়াদপি মাপ ক'রে কতো খরচ হয় আমি কি বলবো? মাসে একশ' টাকা? মাই গড, অত টাকা কোথায় পাবে হরনাথ সিং? রামজাস কলেজে কতো খরচ? বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কখনও আমার ছেলেকে নিয়ে যায়, হরনাম সিং এক একটা কলেজে ঘুরে বেড়ায়। ভেতরে গিয়ে ক্লাসরুমের বাইরে একটুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের দিকে প্রলুব্ধ বিস্ময়ে তাকায়। তাদের মধ্যে বোধ করি দেখতে পায় নিজের ছেলেকেও।

"সাব, অল কলেজ বয় স্মোক। ভেরী ব্যাড।"

আমাকে নীরব দেখে, "বয় অ্যাণ্ড গার্ল অল-ওয়েজ একাঠঠা। ভেরী ব্যাড।"

"একসঙ্গে পড়ে যে।"

"বাট্‌ হোয়াই ওয়াক একাঠঠা অন রীজ?"

আমি হেসে ফেললাম।

"নো লাফ্‌ সাব। বাপীসাব অলসো উইথ মেনি গার্ল।"

আমি আরও জোরে হেসে উঠলাম।

"বাট্‌ বাপীসাব ভেরী গুড। পহলে পহলে হী স্মোক। আই নট টেল ইউ, বাট ইন দি কার হী স্মোক।"

"জানি।"

"আই আস্ক হিম, হোয়াই স্মোক। সাব নট লাইক ইউ স্মোক। বাপীসাব সে আই টেল্‌ মাই ফাদার। হী নট অবজেক্ট।"

"ঠিক।"

"বাট নাউ হী নট স্মোক। নেভার। আই আস্ক, হোয়াই নট স্মোক। হী সে ফাদার নট লাইক সো আই নট স্মোক। উইথ মানি আই বাই বুক।"

"তোমার ছেলে তো স্মোক করবে না।"

"উই শিখ নো স্মোক। বাট হী গো উইথ গার্ল।"

"ভালোই তো। নিজে বি.এ. পাস করবে, বি.এ. পাস একটি মেয়েকে বিয়ে করবে।"

হরনাম সিং-এর মুখে এক গাল হাসি। যা বলল তার মানে হ'ল, সাহেব, দেশটা বদলে গেছে। কতো নতুন নতুন বাঁধ, কলকারখানা, স্কুল কলেজ তৈরি হচ্ছে। আমি চাই নানক নতুন আদমি হোক। নতুন জমানার নতুন আদমি। "আই নো এডুকেশন। বাট্ আই ভেরী হ্যাপী। আই ওয়ান্ট নাথিং ফ্রম বয়। হী লিভ্ আপনা লাইফ। আই টেল, ইউ ডু নাথিং ফর মি। বাট্ বি গুড্ আদমি। নো এডুকেশন, নো আদমি। নো আদমি অব নিউ ইণ্ডিয়া।"

"তুমি তো এতোসব বলছ। তোমার ছেলে কি ভাবছে খবর রাখো?"

হরনাম সিং কথার মানে বুঝতে পারল না।

"ছেলেকে জিজ্ঞেস করো সে কি করতে চায়।"

"নো সাব। আই নট টক টু হিম।"

"সে কি? ছেলের সঙ্গে কথা বলো না?"

কি ক'রে বলবে? হরনাম সিং দিনরাতের তিনভাগ বাইরে। বাড়িতে কতোটুকু সময়ই বা কাটায়? ছেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎই বা কতোটুকু! তাছাড়া ছেলে প্রায়ই বলে হরনাম সিং কিচ্ছু বোঝে না।

"আই অন্‌লি ফিফ্‌থ ক্লাস, হী টেন ক্লাস। আই নো নাথিং হী সে। হাউ টক?"

সমস্যা কঠিন বটে।

"ছেলে বলে না কি করতে চায়?"

"কখনও বলে, ড্রাইভারী শিখাও, চাকরি করবো। কখনও বলে ছবি আঁকবো।"

"ছবি আঁকবে?"

"হী গুড পিকচার মেক, সাব।"

একদিন নিয়ে এল ছেলের আঁকা একগুচ্ছ ছবি। অনেকগুলি পেন্সিল স্কেচ, কাঁচা-হাত হলেও লাইনের সূক্ষ্মতা আছে, এখানে-ওখানে এক আধটু মৌলিকতার চিহ্নও বর্তমান। বাকীগুলি রং-এর নকশা। নানারকম শাড়ির পাড়ের, কার্পেটের ডিজাইন। রং চেনে ছোকরা।

"এসব কখন করে?"

"হী ডু দিস মেনি টাইম। নো রীড, অন্‌লি দিস।"

"কাজ তো ভালই করে। আর্ট স্কুলে ভরতি ক'রে দাও না কেন?"

"হোয়াট পিকচার ব্রিং মানি সাব! হী গো টু আর্ট স্কুল, হী মেক সিনেমা স্টার পিকচার। নো গ্রাজুয়েট।"

স্কেচগুলির মধ্যে হঠাৎ একখানার উপর চোখ পড়ল। একটি মেয়ে, ক্ষীণাঙ্গী, মুখখানা রুক্ষ হলেও চিবুকে ও ওষ্ঠাধরে লাবণ্য লেগে রয়েছে। চোখ দুটি ড্যাবডেবে বাঁ গালে মস্ত এক তিল। সালোয়ার কামিজ পরনে, উড়নি বুকের ওপর নয়, গলায় মোড় খেয়ে পিঠে ঝুলছে।

"এটা কার ছবি?"

"ডোন্ট নো সাব। ফ্রম হিজ মাইণ্ড।"

মিথ্যা কথা বলতে পারে না হরনাম সিং। অস্বস্তি বোধ করে।

নড়ে চড়ে বসল।

"ওয়ান আর্জি, সাব।"

"বলো।"

"ইউ স্পিক টু মাই বয়।"

"কি বলবো ?"
"হী পেইন্ট বাট্ নো রীড। হী বি বি. এ."
"আমি বললেই হবে ?"
"ইয়েস সাব।"
"আচ্ছা বলবো একদিন। নিয়ে এস আমার কাছে।"
"হী নট কাম, সাব। ইউ প্লীজ কাম মাই হোম।"
"আচ্ছা যাবো একদিন।"

যুদ্ধকালে টমীদের সঙ্গে থেকে থেকে হরনাম সিং কয়েকটি বিশেষ শব্দ রপ্ত করেছে। একটা হ'ল, 'ক্যারী অন, জনি'। এটা রাস্তায় চলতে চলতে সে প্রায়ই ব্যবহার করে। অন্য কোনও গাড়িকে রাস্তা দেবার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে, 'ক্যারী অন, জনি।' আর একটা হ'ল, কয়েকটি ইংরেজী গানের কলি। যেমন, 'আই লাভ ইউ মাই ইংলণ্ড।' 'ইংলণ্ড' শব্দটি সম্ভবত হরনাম সিং-এর নিজের সংযোগ। 'আই লাভ ইউ মাই লাভ' বলতে সরম হয়। তাই, 'ইংলণ্ড'। এ গানটা সে প্রায়ই করে, যখন বিশেষ ক'রে সপরিবারে আমরা দূরে কোথাও বেড়াতে যাই। আর একটা গানও মাঝে মধ্যে গেয়ে ওঠে। 'হোয়েন দি ফাওয়ার্স ব্লু', কথাটা নিশ্চয় 'ব্লুম,' কিন্তু 'ম' অনেকদিন ফুল থেকে ঝরে গেছে, ফুল এখন নীল।

আলোয়ারের রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। গাড়ি চালাতে চালাতে হরনাম সিং বার বার পেছন থেকে হর্ন বাজানো ড্রাইভারদের লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে উঠছিল, 'ক্যারী অন, জনি।' এক সময় গানও ধরেছিল: 'আই লাভ ইউ মাই ইংলণ্ড।'

টুটুল, আমার মেয়ে, প্রশ্ন ক'রে বসল, "হরনাম সিং, তুমি ইংলণ্ডকে ভালোবাসো ?"
"ভেরী মাচ লাভ আই ইংলণ্ড।"
"চলে যাও না কেন ?"
"হাউ গো, পুওর ম্যান।"
বাপী বলল, "অনেক পাঞ্জাবী তো চলে গেছে ও যাচ্ছে।"
"সামটাইম আই অলসো থিংক আই গো।"
"যাও না কেন ?"
"টাইম কাম, আই গো।"
"কবে।"
"হোয়েন বয় পাস বি. এ. আই গো।"
"বৌ আর ছোট ছেলে ?"
"দে গো ভিলেজ।"
"খাবে কি ?"
"আই হ্যাভ ল্যাণ্ড দেয়ার। দে নো হাংগার।"
"গিয়ে কি করবে ?"
"বিগ সাহেব মোটরকার ড্রাইভ। রোল্স্‌রয়েস।"
"ফিরে আসবে না ?"
"নো কাম ব্যাক। আই লাভ সী মেনি কানট্রি। ইয়োরোপ ভেরী গুড। ইণ্ডিয়া ভেরী ব্যাড। ভেরী পুওর। হিয়ার অল চোরস্।"

সেদিন আবার হরনাম সিংকে তাকিয়ে দেখলাম। "আই লাভ সী মেনি কানট্রি।"

মাস খানেক পর, একদিন সন্ধ্যায়, বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ হরনাম সিং বলে বসল: "সাব, বয় এগেন মাচ ট্রাবল্।"

"কি হ'ল অবার?"

হঠাৎ জাবাব দিল না হরনাম সিং। আমারও উৎসাহ ছিল না একটুও।

একটু পরে বলে উঠল, "হী গো আফটার গার্ল।"

চমকে উঠলাম।

"হী গো আফটার গার্ল।"

"বয়স কতো?"

"উনিশ।"

"তবে ও মেয়েদের পেছনে ঘুরবে নাকি তুমি ঘুরবে?"

হো হো ক'রে হেসে উঠল হরনাম সিং।

"দেন নো ফিয়ার, সাব?"

"মেয়েটি কে?"

পড়শী কারুর মেয়ে।

"কতো বড়ো?"

"নট স্মল। গ্রো আপ গার্ল।"

"ছেলে কি করে?"

"গো আফটার শী।"

"বারণ ক'রে দিও।"

"নট হীয়র হোয়াট আই সে।"

"উনিশ বছরের ছেলে, একটু আধটু তো মেয়েদের সঙ্গে মিশবেই। বাড়াবাড়ি কিছু না করলেই হ'ল।"

"নো সাব, নট দ্যাট থিং। বাট গো আউট হী অ্যাণ্ড শী।"

"বন্ধ ক'রে দিও। মেয়ের বাপকে বোলো।"

এর পরে ঘটনা ঘূর্ণিরূপ ধারণ করল। হঠাৎ এমন তেজে ঘুরল, না হরনাম সিং না আমি তার সঙ্গে তাল রাখতে পারলাম।

দিন দশেক পর একদিন হরনাম সিং দপ্তরে এসে হাজির। চোখে মুখে আর্ত ভয়ের চিহ্ন। লোকটা কেমন যেন দিশেহারা মনে হ'ল।

"কি ব্যাপার?"

"ডেনজার, সাব।"

"কি হয়েছে।"

"লড়কি কাম মাই হোম।"

কেমন যেন মেজাজ গরম হয়ে গেল আমার।

"ইংরেজী রাখো। বুঝিয়ে বলো। লড়কি? কোন লড়কি?"

যা বলল তা যেমন নাটকীয়, তেমন সংকট-সংকুল। ছেলেটা অনেকদিন হ'ল সেই পড়শী মেয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে এসেছে। স্কুল যাবার নাম ক'রে দুজনে সারা দিন ঘুরে বেড়িয়েছে। সিনেমায় গেছে। পাড়ার সবাই এ নিয়ে অনেকদিন ধরে নানা রকম বলছে। হরনাম সিং-এর বৌ নালিশ করেছে কিন্তু সে বড় একটা কান দেয় নি। এখন, আজ, সেই মেয়ে এসে হাজির হয়েছে হরনাম সিং-এর বাড়ি। নিজের ঘরে সে যাবে না। ওখানেই থাকবে।

এমন ঘটনা সচরাচর আমাদের সমাজে ঘটে না। হঠাৎ যেন বড় অসম্ভব, বড় গল্পেটে মনে হ'ল।

কিন্তু গল্প তো নয়। একেবারে বাস্তব ও সত্যি।

"হোয়াট ডু সাব?"

"তোমার ছেলে কি বলে?"

"হী ব্রিংগ গার্ল হোম—"

"হিন্দীতে বলো।"

বলল, "ছেলে মেয়েটাকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। মাকে বলেছে, ও এখানেই থাকবে।"

"মেয়ের বাপ-মা কি বলে?"

"কিছু না। মেয়ের বাপের সাতটা বাচ্চা। নিজের বাড়িতে থাকতে চায় না মেয়েটা। যেতেও রাজী নয়। তারাও ডাকতে আসে নি।"

"খবর দিয়েছিলে?"

হরনাম সিং উত্তেজিত হয়ে হিন্দী ছেড়ে ইংরেজী ধরল: "আই গো মাইসেল্ফ্ সাব। টু গার্লস ফাদার। টেল, টেক ইওর ডটার মাই হোম; হী সাইলেণ্ট। নট সে এনিথিং।"

"এখন তুমি কি করবে?"

"কি করবো সাব তাইতো ভাবছি। আমার জীবনটা এমন সুখের ছিল। সব শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। ছেলেটা সত্যনাশ ক'রে দিল।"

একটু পরেই: "এভরিথিং চেঞ্জ, সাব। হোয়াট ওয়ার্লড! বয় ব্রিং গার্ল হোম। আই গেট হিয়ার, শী সে। নট গো টু মাই হোম। ও মাই গড, হোয়াট ওয়ার্লড!"

হেসে উঠল হরনাম সিং।

পরের দিন আটটা বাজতে না বাজতে বাড়িতে এসে হাজির।

"কি ব্যাপার?"

"সাব, গাড়িটা একটু পেতে পারি?"

এমন আর্জি এর আগে কখনও করে নি।

"গাড়ি? গাড়ি কেন?"

"সাব, এভরিবডি সে গিভ দেম ম্যারেজ।"

"বল কি? বিয়ে দিয়ে দেবে?"

"হোয়াট ডু সাব? অল বডি সে গিভ দেম ম্যারেজ।"

"তুমি রাজী হয়ে গেলে?"

"হোয়াট ডু সাব? মাচ ট্রাব্‌ল। ভেরী ব্যাড।"

"ছেলে কি বলে?"

"বয় সে গিভ ম্যারেজ।"

"তোমার বৌ?"

"ওয়াইফ ভেরী সিম্‌প্‌ল। শী অন্‌লি ক্রাই।"

"তাহলে বিয়েই দিচ্ছ?"

"হোয়াট ডু সাব?"

"কবে?"

"নাউ, সাব। অল গো টু গুরুদ্বারা।"

"ছেলের লেখাপড়া কিন্তু উঠল।"

"নো সাব। বয় সে গিভ্ ম্যারেজ, আই গো স্কুল, পাস বি. এ.। নো ম্যারেজ, আই লীভ হোম।"

"তাই তুমি রাজী হলে?"

"হোয়াট ডু সাব?"

একটু পরে: "কার টেক সাব ওয়ান আওয়ার?"

"না। ট্যাক্সী ক'রে বিয়ে দিতে যাও। গাড়ি দিতে পারব না।"

গুরুদ্বারায় নানক সিং-এর বিয়ে হ'ল। হরনাম সিং-এর খরচ হ'ল কুড়ি টাকা। মেয়ের বাপের এক টাকা পঁচিশ পয়সা। গুরুদ্বারার পুরোহিতের দক্ষিণা। হরনাম সিং দশজন আত্মীয় বন্ধুদের ডেকে খাওয়াল। ট্যাক্সীতে খরচ করল আট টাকা। বৌ-এর জন্যে নতুন শাড়ি কিনে আনল। মেয়ের বাপ ব্যয় করল না এক পয়সা। পার্টি দিল না। মেয়েকে একখানা শাড়ি-গয়না পর্যন্ত না। সম্পর্ক রাখল না।

সাতদিন পর হরনাম সিং-এর ধর্মপত্নী পুত্রবধূকে নিয়ে হাজির হ'ল করোলবাগের এক লেডী ডাক্তারের কাছে।

এ খবরটা পেলাম মাস খানেক পরে।

হরনাম সিং বলল, "বয় এগেন ডিফিকাল্ট, সাব। নট গো স্কুল।"

"স্কুল এবার ছাড়ো। একটা কাজকর্মে ঢুকিয়ে দাও।"

"হোয়াট ওয়ার্ক হী ডু?"

"কোনও কারখানায়—"

"আই নট ডু দ্যাট সাব। আই হোপ হী পাস বি. এ.। ইফ নট, হী গো টু হেল।"

"ছেলে বিগড়ে গেল কেন?"

"ব্যাড লাক, সাব। হী অ্যাণ্ড গার্ল গো আউট অল ডে। কাম ব্যাক ইভিনিং।"

"তোমার ভাড়াটেকে তুলে দিয়েছ?"

"নট সাব।"

"সবাই এক ঘরে শোও?"

হরনাম সিং প্রশ্নটা বুঝল। বিষণ্ণ হেসে বলল, "হোয়াট ডু সাব? আই পুওর ম্যান। হোএয়ার গেট থার্টি রুপী?"

"কিন্তু—"

"নো, সাব। আই টেল ইউ অল থিং। গার্ল পেগ্‌নেন্ট। ওয়াইফ টেক হার করোলবাগ ফর ওয়াশ। নো বাচ্চা সো স্যুন। বয় নট রীড।"

তিন সপ্তাহ পরে নানক সিং নববধূকে নিয়ে ঘর ছাড়া হ'ল। ছোট্ট একটি পরচি রেখে গেল বাপের জন্যে: "তোমার সঙ্গে আর থাকব না। নিজে কাজ ক'রে খাব। পড়ব না। স্কুলে বলে দিও।"

গল্পটা দিন দশেক আগে শুরু করেছিলাম। এই দশদিনে নতুন এক ঘটনা ঘটেছে। হরনাম সিং আর আমার গাড়ি চালায় না।

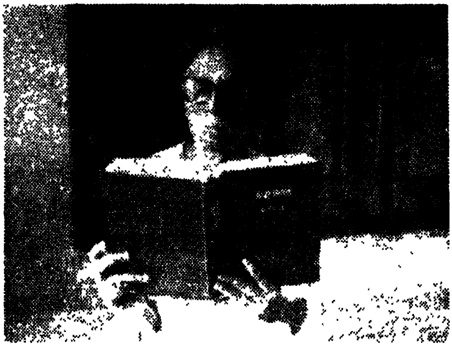
হরনাম সিং এখন জেলে।

সহকর্মী ড্রাইভার অনন্ত সিং তার নতুন বি. এ. পাস-করা ছেলেকে নিয়ে এসেছিল দপ্তরে সবাইকে দেখাতে। হঠাৎ হরনাম সিং-এর সঙ্গে তার ঝগড়া বেধে গেল।

মাটি থেকে গাড়ি স্টার্ট দেবার ডাণ্ডা তুলে হরনাম সিং তাকে মারতে গিয়েছিল।

অনন্ত সিং-এর বদলে 'ডাণ্ডা' পড়েছিল তার ছেলের মাথায়।

হরনাম সিং-এর একমাস জেল হয়েছে।



রমাপদ চৌধুরী

জন্ম : ১৯২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর। খড়্গপুর রেলকলোনিতে।
কম বয়স থেকেই কলকাতায়। পড়াশুনো প্রেসিডেন্সি কলেজে।
অধুনা আনন্দবাজার পত্রিকা এবং দেশ পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক। গত কুড়ি
বছর ধরে রবিবাসরীয় সম্পাদনা করে আসছেন। তাঁর সামনে যেতে
যে-কোনও তরুণ লেখকেরই বুক কাঁপে। ভিতরের পরিচয় পেতে যথেষ্ট
সময় লাগে। ধুস—বলে পৃথিবীর যাবতীয় সিরিয়াস ব্যাপারকে উড়িয়ে
দিতে ওঁর জুড়ি নেই। অথচ গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় নিয়ে
পড়াশুনো করেন, চিন্তা করেন হাজারটা ব্যাপার নিয়ে, সাহিত্য সমাজ ছাড়া
এই কলকাতা, তার বাবু কালচার, তার আড্ডা—এই সব তার অন্তর্ভুক্ত।
লেখার প্রথম প্রহর থেকেই নিজের জন্যে একটা আসন সংরক্ষণ করে বসে
আছেন। 'লালবাঈ'-এর মতো উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল।
'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ', 'বনপলাশির পদাবলী',
'এই পৃথিবী পান্থনিবাস', 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' যেমন নাম, তেমনই আশ্চর্য
এই সব উপন্যাস। 'এখনই' আজকের যুব-মানস নিয়ে লেখা মহাকাব্য-বিশেষ।
এমন নরম মিষ্টি হাতের লেখা খুব কম আছে এই ভাষায়।
রাতারাতি বদলে ফেললেন নিজেকে এবং বাংলা সাহিত্যকেও—তাঁর
খারিজ-লজ্জা-হৃদয় ট্রিলজিতে। পরবর্তী উপন্যাস 'বীজ' চিন্তাশীলদেরও বিস্মিত
করেছে। এখন তিনি বছরে একটিমাত্র উপন্যাস লেখেন। সেটিই
বছরের উল্লেখযোগ্য রচনা হয়ে যায়।
বাংলা ছোটগল্পে তাঁর অবদান উপন্যাসের কীর্তিকেও ম্লান করে দেয়।
চিরকালের কয়েকটা গল্প বলতে বোঝায় একদিকে তাঁর দরবারী,
রেবেকা সরেনের কবর, আমি—আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া, আবার
অন্য দিকে একটি হাসপাতালের জন্ম ও মৃত্যু, বা বড়বাজার।
পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত রুচির চলচ্চিত্রে তাঁর বহু কাহিনী মুগ্ধ করেছে বাঙালী
দর্শককে। নানাভাবে পুরস্কৃত এই লেখক আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন
১৯৬৩-তে, আর রবীন্দ্র পুরস্কার ১৯৭১ সালে।

আমার প্রথম গল্প নেহাৎই খেয়ালের বশে লেখা, দুই সহপাঠী সাহিত্যিক বন্ধুর চাপে পড়ে। তখন রেলকুঠী থেকে আগত বালকটি প্রেসিডেন্সী কলেজে সদ্য ভর্তি হয়েছে, থাকে ইডেন হিন্দু হস্টেলের ওয়ার্ড ফোরের একটি একক কক্ষে। কোলকাতায় এসেই তাই বন্ধুত্ব হয়েছিল এমন দুই সমবয়সীর সঙ্গে যারা তখনই সাহিত্যযশপ্রার্থী। তাদেরই উপরোধে কলেজের রেলিং ডিঙোনো ওয়াই. এম. সি-এর নীচের তলার রেস্টুরেন্টের চলমান আড্ডার মাঝখানেই একটি কেবিনে বসে আমার প্রথম গল্প লেখা। সে গল্পের নাম 'ট্র্যাজেডি', যার কপি কতকাল আগেই হারিয়ে গেছে। কল্পনা আর অভিজ্ঞতা মিলেমিশে লেখা হয়েছে: দরবারী, তিতিরকান্নার মাঠ, রেবেকা সরেনের কবর, তিন তারা। তা হ'লে কোন গল্পকে শ্রেষ্ঠ বলবো? সাহিত্যে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই বলেই আমার বিশ্বাস। না বিষয়বস্তুতে, না ভাষাপ্রকরণে, না আঙ্গিকে। আমি কখনো কোন নিয়ম মেনে চলি নি। বিষয় নির্বাচনে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে আমার যাতায়াত। কখনো উজ্জ্বল ভাষার মোহে আবিষ্ট হয়েছি, কখনো নতুন নতুন শব্দ চয়ন করেছি, আবার কখনো একেবারে নিরলঙ্কার সহজ নিরহঙ্কার ভাষায় বিচিত্র কিংবা সাধারণ চরিত্রের মানুষ এঁকেছি— তালাক কিংবা নতুন চশমা কিংবা ঈর্ষা গল্পে। রায় বা মানুষ অমানুষের গল্পে গ্রামজীবনের কথাও এসেছে। রেলকুঠী, কয়লাখনি, সাঁওতাল মুণ্ডা ওঁরাওদের জীবন, বাংলার গ্রাম, আসামের অয়েল টাউন, পুরীর সমুদ্র, হাজারিবাগ, রাঁচী, পালামৌ, শৈলশহর দার্জিলিং—কোথায় যাইনি? বাঁদরমারাদের নিয়ে যদি লিখেছি কিংবা উল্কি আঁকা নিয়ে, তো আজকের ছেলেমেয়েদের প্রেম আর বন্ধুত্ব নিয়ে 'দিনকাল' গল্প। 'চাবি' কিংবা সদ্য লেখা 'বড়বাজার' বা 'আপ ট্রেন' জাতীয় অ্যাবস্ট্রাক্ট গল্প যদি লেখা যায় তা হ'লে ফ্রীজ কিংবা জাল, ডাইনিং টেবল বা গর্ব লিখলে কি পাপ হয় শাস্ত্রে লেখা থাকলেও স্বীকার করতে রাজি নই। এসব গল্পের কোনোটায় বক্তব্য আছে, কোনোটায় নেই। তাতে কি সত্যি কিছু আসে যায়? 'লেখকের মৃত্যু' আমার কাছে যতখানি সত্য, 'বসবার ঘর' তার চেয়ে কম নয়। ঈশ্বরের পৃথিবীতে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি? ব্রহ্মাণ্ড না পরমাণু, প্রাণ না মানুষ, না মানুষের মগজ, কিংবা প্রজাপতি বা শালুক বা লজ্জাবতী লতা? আমরাও তো ছোটখাটো কারিগর, সব লেখার প্রতি সমান মমতা। সঙ্কলনের 'ভারতবর্ষ' গল্পের প্রতিও কম নয়। সত্যিই কোন্ গল্প ভাল সে কথা বলবেন পাঠক, কোনো গল্প স্থায়িত্ব পাবে কিনা, সে কথা বলবে ভবিষ্যৎ। সে-সব নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। দিনকয়েক পরেই যে-গল্প লিখতে বসবো আমার কাছে সেটাই শ্রেষ্ঠগল্প।'

রমাপদ চৌধুরী
১২-৮-৭৮

ভারতবর্ষ

ফৌজী সংকেতে নাম ছিলো বি এফ থ্রি থার্টি টু। BF 332। সেটা আদপে কোনো স্টেশনই ছিলো না, না প্ল্যাটফর্ম, না টিকিটঘর। শুধু একদিন দেখা গেল ঝকঝকে নতুন কাঁটাতার দিয়ে রেল-লাইনের ধারটুকু ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ব্যস্, ঐটুকুই। সারা দিনে আপ-ডাউনের একটা ট্রেনও থামতো না। থামতো শুধু একটি বিশেষ ট্রেন। হঠাৎ এক-একদিন সকালবেলায় এসে থামতো। কবে কখন সেটা থামবে, তা শুধু আমরাই আগে থেকে জানতে পেতাম, বেহারী কুক ভগোতীলালকে নিয়ে আমরা পাঁচজন।

স্টেশন ছিলো না, ট্রেন থামতো না, তবু রেলের লোকদের মুখে মুখে একটা নতুন নাম চালু হয়ে গিয়েছিলো। তা থেকে আমরাও বলতাম 'আন্ডা হল্ট'।

আন্ডা মানে ডিম। আন্ডা হল্টের কাছ ঘেঁষে দুটো বেঁটেখাটো পাহাড়ী টিলার পায়ের নীচে একটা মাহাতোদের গ্রাম ছিলো, গ্রামে-ঘরে মুর্গি চরে বেড়াতো। দূরে, অনেক দূরে ভুরকুণ্ডার শনিচারী হাটে সেই মুর্গি কিংবা মুর্গির ডিম বেচতেও যেতো মাহাতোরা। কখনো সাধের মোরগ বগলে চেপে মোরগ-লড়াই খেলতে যেতো। কিন্তু সেজন্য বি এফ থ্রি থার্টি টু-র নাম আণ্ডা হল্ট হয়ে যায়নি।

আসলে মাহাতো-গাঁয়ের ডিমের ওপর আমাদের কোনো লোভই ছিলো না।

আমাদের ঠিকাদারের সঙ্গে রেলওয়ের ব্যবস্থা ছিলো, একটা ঠেলা-ট্রলিও ছিলো তার, লাল শালু উড়িয়ে সেটা রেলের ওপর দিয়ে গড়গড়িয়ে এসে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে যেতো। নামিয়ে দিয়ে যেতো রাশি রাশি ডিম। বেহারী কুক ভগোতীলাল আগের রাত্রে সেগুলো সেদ্ধ করে রাখতো।

কিন্তু সেজন্যেও নাম আণ্ডা হল্ট হয়নি। হয়েছিলো ফুল-বয়েল্ড ডিমের খোসা কাঁটাতারের ওপারে ক্রমশ স্তূপীকৃত হয়ে জমছিলো বলে। ডিমের খোসা দিনে দিনে পাহাড় হচ্ছিলো বলে।

ফৌজী ভাষায় বি এফ থ্রি থার্টি টু-র প্রথমেই যে দুটো অ্যালফাবেট, আমাদের ধারণা ছিলো তা কোনো সংকেত নয়, ব্রেকফাস্ট কথাটার সংক্ষিপ্ত রূপ।

রামগড়ে তখন পি ও ডবলু ক্যাম্প, ইটালীয়ান যুদ্ধবন্দীরা সেখানে বেয়নেটে আর কাঁটাতারে ঘেরা। তাদেরই মাঝে মাঝে একটা ট্রেনে বোঝাই করে এ পথ দিয়ে কোথায় যেন চালান করে দিতো। কেন এবং কোথায়, আমরা কেউ জানতাম না।

শুধু আমরা খবর পেতাম ভোরবেলায় একটা ট্রেন এসে থামবে।

ঠিকাদারের চিঠি পড়ে আগের দিন ডিমের ঝুড়িগুলো দেখিয়ে কুক ভগোতীলালকে বলতাম, তিন শো তিশ ব্রেকফাস্ট।

ভগোতীলাল গুনে গুনে ছ'শো ষাট আর গোটা পঁচিশ ফাউ বের করে নিতো। যদি পচা বের হয়। তারপর সেগুলো জলে ফুটিয়ে শক্ত ইট হয়ে গেলে তিনটে সার্ভার কুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে খোসা ছাড়াতো।

কাঁটাতারের ওপারে সেগুলোই দিনে দিনে স্তূপীকৃত হতো।

সন্ধ্যাবেলায় ট্রেন এসে থামতো, আর সঙ্গে সঙ্গে কামরা থেকে ট্রেনের দু পাশে ঝুপঝাপ নেমে পড়তো মিলিটারী গার্ড। সঙ্গিন উঁচু করা রাইফেল নিয়ে তারা যুদ্ধ-বন্দীদের পাহারা দিতো।

ডোরা-কাটা পোশাকের বিদেশী বন্দীরা একে একে কামরা থেকে নেমে আসতো বড়সড় মগ আর এনামেলের থালা হাতে।

দুটো বড় বড় ড্রাম উলটে রেখে সে দুটোকেই টেবিল বানিয়ে সার্ভার কুলি তিনজন দাঁড়াতো। আর ওরা লাইন দিয়ে একে একে এগিয়ে এসে ব্রেকফাস্ট নিতো। একজন কফি ঢেলে দিতো মগে, একজন দু পিস করে পাঁউরুটি দিতো, আরেকজন দিতো দুটো করে ডিম। বাস্, তারপর ওরা গিয়ে গাড়িতে উঠতো। কাঁধে আই ই, খাকী বুশ-শার্ট পরা গার্ড হুইস্‌ল্ দিতো, ফ্ল্যাগ নাড়তো, ট্রেন চলে যেতো।

মাহাতোরা কেউ কাছে আসতো না, দূরে দূরে ক্ষেতিতে জনারের বীজ রুইতে রুইতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে দেখতো।

ট্রেন চলে যাওয়ার পরে ভগোতীলালের জিম্মায় টেন্ট রেখে আমরা কোনো কোনো দিন মাহাতোদের গ্রামের দিকে চলে যেতাম সবজির খোঁজে। পাহাড়ের ঢালুতে পাথুরে জমিতে ওরা সর্ষে বুনতো, বেগুন আর ঝিঙেও।

আণ্ডা হল্ট একদিন হল্ট-স্টেশন হয়ে গেল রাতারাতি। মোরম ফেলে লাইনের ধারে কাঁটাতারে ঘেরা জায়গাটুকু উঁচু করা হলো প্ল্যাটফর্মের মতো।

তখন আর শুধু পি ও ডবল্ নয়, মাঝে মাঝে মিলিটারী স্পেশালও এসে দাঁড়াতো। গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট পরা হিপ পকেটে টাকার ব্যাগ গোঁজা আমেরিকান সৈনিকদের স্পেশাল। মিলিটারী পুলিস ট্রেন থেকে নেমে পায়চারি করতো, দু-একটা ঠাট্টাও ছুঁড়তো, আর সৈনিকের দল তেমনি সারি দিয়ে মগ আর থালা হাতে একে একে এসে রুটি নিতো, ডিম নিতো, মগভরতি কফি। তারপর যে যার কামরায় গিয়ে আবার উঠতো, খাকী বুশ-শার্টের গার্ড হুইস্‌ল্ বাজিয়ে ফ্ল্যাগ নাড়তো, আমি ছুটে গিয়ে সাপ্লাই ফর্মে মেজরকে দিয়ে ও. কে. করাতাম।

ট্রেন চলে যেতো, কোথায় কোন্ দিকে আমরা কেউ জানতে পারতাম না।

সেদিনও এমনি আমেরিকান সোল্‌জারদের ট্রেন এসে দাঁড়ালো। সার্ভার কুলি তিনটে ডিম রুটি কফি সার্ভ করছিলো। ভগোতীলাল নজর রাখছিলো কেউ ডিম পচা কিংবা রুটি স্লাইস-এগু বলে ছুঁড়ে দেয় কি না।

ঠিক সেই সময় আমার হঠাৎ চোখ গেল কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে।

কাঁটাতার থেকে আরো খানিক দূরে মাহাতোদের একটা নেংটি-পরা ছেলে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে দেখছে। কোমরের ঘুনসিতে লোহার টুকরো বাঁধা ছেলেটাকে একটা বাচ্চা মোষের পিঠে বসে যেতে দেখেছি একদিন।

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলো ট্রেনটা। কিংবা রাঙা-মুখ আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিলো।

একজন সৈনিক তাকে দেখতে পেয়ে 'হে-ই' বলে চিৎকার করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে নেংটি-পরা ছেলেটা পাঁইপাঁই করে ছুটে পালালো মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে। কয়েকটা আমেরিকান সৈনিক তখন হা-হা করে হাসছে।

ভেবেছিলাম ছেলেটা আর কোনো দিন আসবে না।

মাহাতোরা কেউ আসতো না, কেউ না। ক্ষেতিতে কাজ করতে করতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা শুধু অবাক-অবাক চোখ মেলে দূর থেকে দেখতো।

কিন্তু তারপর আবার যেদিন ট্রেন এলো, ট্রেন থামলো, সেদিন আবার দেখি কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা কাঁটাতারের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে আরেকটা ছেলে, তার চেয়ে আরকটু বেশী বয়েস। গলায় লাল সুতোয় ঝুলোনো দস্তার তাবিজ, ভুরকুণ্ডার হাটে একদিন গিয়েছিলাম, রাশি রাশি বিক্রি হয় মাচিতে ঢেলে, রাশি রাশি সিঁদুর, তাবিজ, তামার পিতলের দস্তার, বাঁশে ঝোলানো থাকে রঙিন সুতলি, পুঁতির মালা। একটা ফেরিওলাকে দেখেছি কখনো কখনো এক হাঁটু ধুলো নিয়ে, কাঁধে অগুন্তি পুঁতির ছড়, দূর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে যায়।

ছেলে দুটো অবাক-অবাক চোখ মেলে কাঁটাতারের ওপারে দাঁড়িয়ে আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিলো। প্রথম দিনের বাচ্চাটার চোখে একটু ভয়, হাঁটু তৈরী কেউ চোখে একটু ধমক মাখালেই সে চট করে হরিণ হয়ে যাবে।

আমি হাতে ফর্ম নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলাম, সুযোগ পেলে হেসে হেসে মেজরকে তোয়াজ করছিলাম। একজন সৈনিক তার কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কফির মগে চুমুক দিতে দিতে ছেলে দুটোকে দেখে পাশের জি আই-কে বললে, অফুল!

আমার এত দিন মনে হয়নি। ওরা তো দিব্যি ক্ষেত-খামারে কাজ করে, গুলতি নয়তো তীরধনুক নিয়ে খাটাশ মারে, নাটুয়া গান শোনে, হাঁড়িয়া খায়, ধনুকের ছিলার মতো কখনো টান-টান হয়ে রুখে দাঁড়ায়। নেংটি-পরা সরু শরীর, কালো, রুক্ষ। কিন্তু ব্যাটা জি আই-এর 'অফুল' কথাটা যেন আমাকে খোঁচা দিলো। ছেলে দুটোর ওপর আমার খুব রাগ হলো।

সৈনিকদের কে একজন গলা ছেড়ে এক কলি গান গাইলো, দু-একজন হা-হা করে হাসছিলো, একজন চপপট কফির মগে চুমুক দিয়ে সার্ভার কুলিটাকে চোখ মেরে আবার ভরতি করে দিতে বললে। গার্ড এগিয়ে দেখতে এলো আর কত দেরি। পাঞ্জাবী গার্ড কিন্তু দিব্যি চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে কথা বললে মেজরের সঙ্গে।

তারপর হুইস্‌ল্‌ বাজলো, ফ্ল্যাগ নড়লো, সবাই চটপট উঠে পড়লো ট্রেনে, হাতে চওড়া লাল ফিতে বাঁধা মিলিটারী পুলিসরাও।

ট্রেন চলে গেলে আবার সেই শূন্যতা, ধু-ধু বালির মধ্যে ফণিমনসার গাছের মতো শুধু সেই কাঁটাতারের বেড়া।

দিন কয়েক পরেই আবার একটা ট্রেন এলো। এবার পি ও ডবলু গাড়ি, ইটালীয়ান যুদ্ধ-বন্দীরা রামগড় থেকে আবার কোথাও চালান হচ্ছে। কোথায় আমরা জানতাম না, জানতে চাইতাম না।

ওদের পরনে স্ট্রাইপ-দেওয়া অন্য পোশাক, মুখে হাসি নেই, রাইফেল উঁচিয়ে সারাক্ষণ ওদের ট্রেনটা চারিদিক থেকে গার্ড দেওয়া হতো। আমাদেরও একটু ভয়-ভয় করতো। ভুরকুণ্ডায় গল্প শুনে এসেছিলাম, একজন নাকি ধুতিপাঞ্জাবি পরে পালাবার চেষ্টা করেছিলো, পারেনি। বাঙালী বলেই আমার আরো ভয়-ভয় করতো।

ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর লক্ষ করলাম, কাঁটাতারের ওপারে শুধু সেই বাচ্চা ছেলে দুটো নয়, খাটো কাপড়ের একটা বছর পনরোর মেয়ে, দুটো পুরুষ ক্ষেতের কাজ ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো। ট্রেন চলে যাওয়ার পর ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করলো, হাসলো, কলকল করতে করতে ঝরনার জলের মতো মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে চলে গেল।

একজন, দুজন, পাঁচজন—সেদিন দেখি জন দশেক মাহাতো-গাঁয়ের লোক ট্রেন আসতে দেখেই মাঠ থেকে দৌড়তে শুরু করেছে। ট্রেনের জানালায় জানালায় খাকী

রঙ দেখেই বোধ হয় ওরা বুঝতে পারতো। দিনে দুখানা প্যাসেঞ্জার মেল ট্রেনের মতো হুস্ করে বেরিয়ে যেতো, দু-একখানা গুড্স্ ট্রেন ঠুংঠুং করতে করতে। তখন তো কই থামবে ভেবে মাহাতোগাঁয়ের লোক আসতো না ভিড় করে!

একদিন গিয়ে বলেছিলাম মাহাতো বুড়োকে, লোক পাঠিয়ে আমাদের আগুা হল্টের তাঁবুতে বেচে আসতে সবজি আর চিংড়ি, সরপুঁটি, মৌরলা।

বুড়ো হেসে বলেছিলো—ক্ষেতির কাজ ছেড়ে যাবো নাই।

তাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কালো কালো নেংটি-পরা লোকগুলোকে, খাটো শাড়ির মেয়েগুলোকে। শুধু খালি-পা মাহাতো বুড়োর পায়ে একটা টাঙি-জুতো, গেঁয়ো মুধার কাছে বানানো টাঙি-জুতো, এসে সারি দিয়ে ওরা কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে দাঁড়ালো।

ট্রেন ততক্ষণে এসে গেছে। ঝুপঝাপ নেমে পড়ে আমেরিকান সৈনিকের দল সারি দিয়ে চলেছে মগ আর থালি হাতে।

দু শো আঠারো ব্রেকফাস্ট তখন রেডি বি এফ থ্রি থার্টি টু-তে। বি এফ থ্রি থার্টি টু মানে আগুা হল্ট।

তখন একটু শীত-শীত পড়তে শুরু করেছে। দূরের পাহাড়ে কুয়াশার মাফলার জড়ানো। গাছগাছালি শিশির-ধোয়া সবুজ।

একজন সৈনিক ইয়াঙ্কি গলায় মুগ্ধতা প্রকাশ করলো।

আরেকজন কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁটাতারের ওপারের রিক্ততার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো। হঠাৎ কফির মগটা ট্রেনের পা-দানিতে রেখে সে হিপ পকেটে হাত দিলো। ব্যাগ থেকে একটা চকচকে আধুলি বের করে ছুঁড়ে দিলো মাহাতোদের দিকে।

ওরা অবাক হয়ে সৈনিকটার দিকে তাকালো, কাঁটাতারের ভিতরে মোরামের ওপর পড়ে থাকা চকচকে আধুলিটার দিকে তাকালো, নিজেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো, তারপর অবাক হয়ে শুধু তাকিয়েই রইলো।

ট্রেনটা চলে যাবার পর ওরা নিঃশব্দে ফিরে চলে যাচ্ছিলো দেখে আমি বললাম, সাহেব বখশিশ দিয়েছে, বখশিশ, তুলে নে।

সবাই সকলের মুখের দিকে তাকালো, কেউ এগিয়ে এলো না।

আমি আধুলিটা তুলে মাহাতো বুড়োর হাতে দিলাম। সে বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর সবাই নিঃশব্দে চলে গেল। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

আমার এই ঠিকাদারের তাঁবেদারি একটুও ভালো লাগতো না। জনমনুষ্য নেই, একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়ায় না, তাঁবুতে ভগোতীলাল আর তিনটে কুলি। নির্জন, নির্জন। মাটি রুক্ষ, দুপুরের আকাশ রুক্ষ, রুক্ষ আমার মন।

মাহাতো-গাঁয়ের লোকরাও কাছে ঘেঁষতো না। মাঝে মাঝে গিয়ে সবজি কিংবা চুনো মাছ কিনে আনতাম। ওরা বেচতে আসতো না, কিন্তু ভুরকুণ্ডার হাটে যেতো তিন ক্রোশ পথ হেঁটে।

দিন কয়েক কোনো ট্রেনের খবর ছিলো না। চুপচাপ, চুপচাপ।

হঠাৎ সেই কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা একদিন এসে জিগ্যেস করলো, টিরেন আসবে না বাবু?

হেসে ফেলে বললাম, আসবে, আসবে।

ছেলেটার আর দোষ কি, বেঁটে বেঁটে পাহাড়, রুক্ষ জমি, একটা দেহাতী ভিড়ের

বাস দেখতে হলেও দু ক্রোশ হেঁটে যেতে হয় খয়েরগাছের ঝোপের মধ্যে দিয়ে। সকালে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন একটুও স্পীড না কমিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে যেতো, বিকেলের ডাউন ট্রেনটাও থামতো না, তবু কয়েক মুহূর্ত জানালায় জানালায় ঝাপসা মুখ দেখার জন্যে আমরা তাঁবুর ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতাম। মানুষ না দেখে আমরা হাঁপিয়ে উঠতাম।

তাই আমেরিকান সৈনিকদের স্পেশাল ট্রেন আসছে শুনলে যেমন বিব্রত বোধ করতাম তেমনি আবার স্বস্তিও ছিলো।

দিন কয়েক পরেই প্রথমে এলো খবর, তার পরদিন মিলিটারী স্পেশাল। ঝুপঝাপ করে জি. আই-রা নামলো, সারি দিয়ে সব ডিম রুটি মগ-ভরতি কফি নিলো।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে মাহাতো-গাঁয়ের ভিড় ভেঙে পড়েছে। বিশ হতে পারে, তিরিশ হতে পারে, হাঁটু-সমান বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কত কে জানে। খাটো শাড়ির মেয়েগুলোও বোকা-বোকা চোখ মেলে তাকিয়ে ছিলো। ওদের দেখে আমার কেমন ভয়-ভয় করলো। ভগোতীলাল কিংবা সার্ভার কুলি তিনটে মাহাতো-গাঁয়ের দিকে যেতে চাইলে আমার বড় ভয়-ভয় করতো।

প্ল্যাটফর্ম তো ছিলো না, শুধু উঠতে নামতে সুবিধের জন্যে লাইনের ধারটুকু মোরম ফেলে উঁচু করা হয়েছিলো। আমেরিকান সৈনিকরা কফির মগে চুমুক দিতে দিতে পায়চারি করছিলো। দু-একজন স্থির দৃষ্টিতে মাহাতো-গাঁয়ের কালো কালো মানুষগুলোকে দেখছিলো।

হঠাৎ একজন ভগোতীলালের দিকে এগিয়ে গিয়ে হিপ পকেট থেকে ব্যাগ বের করলো, ব্যাগ থেকে একখানা দু টাকার নোট, তারপর জিগ্যেস করলে, কয়েন্স্ আছে? নোটভাঙানো খুচরো সৈনিকরা কেউ রাখতেই চাইতো না, পয়সা ফেরত না নিয়ে দোকানী কিংবা ফেরিওয়ালা কিংবা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলতো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। রাঁচিতে গিয়ে কয়েকবার দেখেছি।

এক-আনি, দু-আনি আর সিকি মিলিয়ে ভগোতীলাল ভাঙিয়ে দিচ্ছিলো, হঠাৎ দেখি কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে ভিড়ের ভিতর থেকে কোমরের ঘুনসিতে লোহার টুকরো বাঁধা সেই ছেলেটা হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে কি চাইছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভগোতীলালের কাছ থেকে সেই খুচরো আনি দু-আনিগুলো মুঠোর মধ্যে নিয়ে সেই আমেরিকান সৈনিক মাহাতোদের দিকে ছুঁড়ে দিলো।

আমার তখন সাপ্লাই ফর্ম ও. কে. করানো হয়ে গেছে, গার্ড হুইস্ল্ দিয়েছে।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে, অমনি মাহাতোদের দিকে ফিরে তাকালাম।

ওরা তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো, তাকিয়ে ছিলো। তারপর হঠাৎ, লাল মোরমের ওপর, ছড়ানো পয়সাগুলোর ওপর কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা, আর গলায় লাল সুতলিতে দস্তার তাবিজ বাঁধা ছেলেটা।

সেই মুহূর্তে টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো ধমক দিয়ে বলে উঠলো, খবরদার! এমন জোরে চিৎকার করলো যে আমি নিজেও চমকে উঠেছিলাম।

কিন্তু বাচ্চা দুটো ওর কথা শুনলো না। তারা দুজনে তখন যে যত পেরেছে আনি দু-আনি কুড়িয়ে নিয়েছে। মুখ খোসা-ছাড়ানো কচি ভুটার মতো হাসছে। মেয়ে-পুরুষের সমস্ত ভিড় হাসছে।

টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো রেগে গিয়ে তাদের ভাষায় অনর্গল কি সব বলে গেল। মেয়েপুরুষের ভিড় হাসলো।

মাহাতো বুড়ো রাগে গজগজ করতে করতে গাঁয়ের দিকে চলে গেল একাই। মাহাতো-গাঁয়ের লোকগুলোও চলে গেল কলকল কথা বলতে বলতে, খলখল হাসতে হাসতে।

ওরা চলে যেতেই আণ্ডা হল্ট আবার নির্জন নিস্তব্ধ শূন্যতা। আমার এক-একসময় ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেতো। দূরে দূরে পাহাড়, মহুয়ার বন, খয়েরের ঝোপ পার হয়ে একটা ছোট্ট জলচোঁয়ানো ঝরণা, মাহাতো-গাঁয়ের সবুজ ক্ষেত। চোখ জড়িয়ে যায়, চোখ জুড়িয়ে যায়। তার মধ্যে কালো কালো নেংটি-পরা মানুষ।

এদিকে মাঝে মাঝেই আমেরিকান সোল্‌জারদের ট্রেন আসে, থামে, ডিম রুটি মগ-ভরতি কফি খেয়ে চলে যায়। মাহাতো-গাঁয়ের লোক ভিড় করে আসে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে সারি দিয়ে দাঁড়ায়।

—সাব বখশিশ, সাব বখশিশ!

একসঙ্গে অনেকগুলো দেহাতী গলা চিৎকার করে উঠলো।

মেজরের কাছে ফর্ম ও. কে. করাতে গিয়ে আমি চমকে ফিরে তাকালাম।

দেখলাম, শুধু বাচ্চা ছেলে দুটো নয়, কয়েকটা জোয়ান পুরুষও হাত বাড়িয়েছে। খাটো শাড়ির একটা তুখোড় শরীরের মেয়েও।

একদিন সবজি কিনতে গিয়েছিলাম, ঐ মেয়েটা হেসে হেসে জিগ্যেস করেছিলো, টিরেন কবে আসবে।

এক-একদিন অকারণেই ওরা দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো, অপেক্ষা করে করে চলে যেতো।

কাঁধে-স্ট্রাইপ তিন-চারটে আমেরিকান ততক্ষণে হিপ পকেট থেকে মুঠো মুঠো আনি দু-আনি বের করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষা করেনি, ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো পয়সাগুলোর ওপর। হুড়োহুড়িতে কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে হাত-পা ছড়ে গেল কারও, কারও বা নেংটির কাপড় ফেঁসে গেল।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম ওদের। মনে হলো মাহাতো গাঁয়ের আধখানাই এসে জড় হয়েছে। সবারই মুখে ফূর্তির হাসি, সবাই কিছু-না-কিছু পেয়েছে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও সেই টাঙি-জুতোর মাহাতো বুড়োকে দেখতে পেলাম না। মাহাতো বুড়ো আসেনি। সেদিন ওর আপত্তি, ওর ধমক শুনেও পয়সা-গুলো ফেলে দেয়নি ছেলে দুটো। তাই বোধ হয় রেগে গিয়ে আর আসেনি!

আমার ভাবতে ভালো লাগলো বুড়োটা ক্ষেতে দাঁড়িয়ে একা-একা মাটি কোপাচ্ছে।

আমাদের দিন, কুক ভগোতীলালকে নিয়ে আমাদের পাঁচজনের দিন আণ্ডা হল্টের তাঁবুর মধ্যে কোনোরকমে কেটে যাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে এক-একদিন সৈনিক-বোঝাই ট্রেন আসছিলো, থামছিলো, চলে যাচ্ছিলো। মাহাতো-গাঁয়ের লোক ভিড় করে এসে কাঁটাতারের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়াতো, হাত বাড়িয়ে সবাই 'সাব বখশিশ, সাব বখশিশ' চেঁচাতো।

হঠাৎ এক-একদিন মাহাতো বুড়োকে দেখতে পেতাম। কোনো দিন ক্ষেতের কাজ ফেলে দু হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হনহন করে এগিয়ে আসতো, রেগে গিয়ে ধমক দিতো সকলকে। ওর কথা শুনছে না বলে কখনো বা অসহায় প্রতিবাদের চোখে গাঁয়ের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতো।

কিন্তু ওর দিকে কেউ ফিরেও তাকাতো না। সৈনিকরা হিপ পকেটে হাত দিয়ে হা-হা করে হাসতে হাসতে মুঠো-ভরতি পয়সা ছুঁড়ে দিতো। মাহাতো-গাঁয়ের লোক

হুমড়ি খেয়ে পড়তো সেই পয়সাগুলোর ওপর, নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ঝগড়া বাধাতো। তা দেখে সৈনিকরা হা-হা করে হাসতো।

শেষে পর পর কয়েক দিনই লক্ষ করলাম টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো আর আসে না। মাহাতো বুড়ো ওদের দেখে রেগে যেতো বলে, মাহাতো বুড়ো আর আসতো না বলে আমার এক ধরনের গর্ব হতো। কারণ, এক-একসময় ঐ লোকগুলোর ব্যবহারে আমরা—আমি আর ভগোতীলাল খুব বিরক্তি বোধ করতাম। ভিতরে ভিতরে লজ্জা পেতাম। ওদের কালো-কুলো দীন-দরিদ্র বেশ দেখে সৈনিকের দল নিশ্চয় ওদের ভিখিরী ভাবতো। ভাবতো বলেই আমার খুব খারাপ লাগতো।

সেদিন কাঁটাতারের ওপার থেকে ওরা বখশিশ বখশিশ বলে চিৎকার করছে, কাঁধে আই ই খাকী বুশ-শার্টের গার্ড জানকীনাথের সঙ্গে আমি গল্প করছি, আমাদের পাশ দিয়ে একজন অফিসার মচমচ করে যেতে যেতে চিৎকার শুনে থুতু ফেলার মতো গলায় বলে উঠলো, ব্লাডি বেগার্স।

আমি আর জানকীনাথ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমাদের মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল। মাথা তুলে তাকাতে পারলাম না। শুধু অক্ষম রাগে ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠলাম।

ব্লাডি বেগার্স, ব্লাডি বেগার্স।

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো মাহাতোদের ওপর। ট্রেন চলে যেতেই আমি ভগোতীলালকে সঙ্গে নিয়ে ওদের তাড়া করে গেলাম। ওরা কুড়োনো পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে হাসতে হাসতে পালালো।

তবু ওদের জন্যে সমস্ত লজ্জা আমি একটা অহঙ্কারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে সেই অহঙ্কারটা আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো মাহাতো বুড়োর চেহারা নিয়ে।

কিন্তু সেদিন আমার বুকের মধ্যের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

ভুরকুণ্ডার ঠিকাদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই খবর পেয়েছিলাম।

সার্ভার দুজন কুলি তখন টেবিল বানানো ড্রাম দুটোকে পায়ে ঠেলে ঠেলে আগুা হল্টের কাঁটাতারের ওপারে সরিয়ে দিচ্ছিলো। তাঁবুর দড়ি খুলছিলো আরেকজন। ভগোতীলাল ড্রামটার গায়ে একটা জোর লাথি মেরে বললে, খেল খতম, খেল খতম।

হঠাৎ হইহল্লা শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি মাহাতো-গাঁয়ের লোক ছুটতে ছুটতে আসছে।

আমরা অবাক হয়ে তাকালাম তাদের দিকে। ভগোতীলাল কি জানি কেন হেসে উঠলো।

ততক্ষণে কাঁটাতারের ওপারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেছে ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে একটা হুইস্‌ল্‌ শুনতে পেলাম, ট্রেনের শব্দ কানে এলো।

ফিরে তাকিয়ে দেখি ট্রেনটা বাঁক নিয়ে আগুা হল্টের দিকেই আসছে, জানালায় জানালায় খাকী পোশাক।

আমরা বিব্রত বোধ করলাম, আমরা অবাক হলাম। তা হলে কি খবর পাঠাতেই ভুলে গেছে ভুরকুণ্ডার আপিস? না, যে খবর শুনে এসেছি সেটাই ভুল?

ট্রেনটা যত এগিয়ে আসছে ততই একটা অদ্ভুত গমগম আওয়াজ আসছে। আওয়াজ নয়, গান। একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল সমস্ত ট্রেন, ট্রেন-ভরতি সৈনিকের দল পরস্পরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছে।

বিভ্রান্তের মতো আমি একবার ট্রেনটার দিকে তাকালাম, একবার কাঁটাতারের ভিড়ের দিকে। আর সেই মুহূর্তে চোখ পড়লো সেই মাহাতো বুড়োর দিকে। সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতো বুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে, সাব বখশিশ, সাব বখশিশ!

উন্মাদের মতো, ভিক্ষুকের মতো তারা চিৎকার করছে। তারা এবং সেই মাহাতো বুড়ো।

কিন্তু আমেরিকান সৈনিকদের সেই ট্রেনটা অন্য দিনের মতো এবারে আর আগুা হল্টে এসে থামলো না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোর মতোই আগুা হল্টকে উপেক্ষা করে হুস্‌ করে চলে গেল।

আমরা জানতাম ট্রেন আর থামবে না। ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতো-গাঁয়ের সবাই ভিখিরী হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব—সব ভিখিরী হয়ে গেল।



সমরেশ বসু

জন্ম: ১৩৩১ সালের অগ্রহায়ণ, ইংরেজি ১৯২৪। পূর্ববঙ্গের ঢাকায়।
ছোটবেলা থেকে তাঁর জীবনযাত্রা এক কথায় অদ্ভুত। রাজনীতি করেছেন প্রত্যক্ষভাবে তাঁর প্রথম যৌবনে। নানা ধরনের চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছেন কয়েকবার। এখন তাঁর জীবন বা জীবিকা সব ওই সর্বক্ষণের সাহিত্য।
বাংলা সাহিত্যে কিংবদন্তীর নায়ক হলেন সমরেশ বসু। লেখার সেই প্রথম যুগেই দেখিয়ে দেন, তাঁর মতো লেখক-শিল্পী খুব কম জন্ম দিয়েছে এই দেশের সাহিত্য। 'গঙ্গা', 'বি টি রোডের ধারে', 'জগদ্দল', 'শ্রীমতী কাফে'—প্রতিটি রচনা বাঙালী জীবনের ভিতকে নাড়িয়ে দেয়।
বিবর-প্রজাপতি-পাতক—এই উপন্যাস-ত্রয়ীতে তাঁর রচনার পালাবদল ঘটে।
বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকে পরিণত হন, হ্যা বিতর্কিত লেখকেও।
সম্প্রতি কালে আবার আলোড়ন তোলে তাঁর 'যুগ যুগ জিয়ে' এবং 'মহাকালের রথের ঘোড়া'।
'কালকূট' ছদ্মনামে এই লেখক আবার দ্বিতীয় একজন। সেখানে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাব তারে', 'মন চল বনে', 'অমৃত বিষের পাত্রে' প্রভৃতি মহৎ রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের রত্নবিশেষ। সাম্প্রতিক 'শাম্ব' সেই সেই তালিকায় আর একটি উল্লেখ্য সংযোজন।
তাঁর স্মরণীয় ছোটগল্পগুলির তালিকা করা সহজ নয়। আমরা এখানে কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি মাত্র। স্বীকারোক্তি, উত্তাপ, আবাদ, মাসের প্রথম রবিবার, ছেঁড়া তমসুক, অকাল বসন্ত, মানুষ রতন, ধর্ষিতা, নিমাইয়ের দেশত্যাগ ইত্যাদি।
সমরেশ বসুর কাহিনী নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্র মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেছে বাঙালী তথা ভারতীয় দর্শক। বহু মানুষের দ্বিধাহীন অভিনন্দন, ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কয়েকটি পুরস্কারও। যেমন সিগনেট, যেমন আনন্দ সাধারণ এবং বিশেষ—দুইই।

'পাড়ি' আমার শ্রেষ্ঠ গল্প কেন, কিংবা আদৌ শ্রেষ্ঠ গল্প কী না, তা ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব না। পৌরসভার ধর্মঘটী শ্রমিক দম্পতিকে নিয়ে গল্পটি দুই দশকেরও আগে লিখেছিলাম, এবং নিজের চোখেই দেখেছিলাম, তারা দুজনে একপাল শুয়োরকে কী ভাবে গঙ্গার ওপারে নিয়ে গিয়েছিল। রাত্রে ঘুমোতে পারি নি, সকালে উঠেই গল্পটি লিখতে বসেছিলাম। তাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, একাধিক দিন তারা উপবাসী ছিল। হয়তো এক দিনের বা একবেলার খাদ্যের বিনিময়ে, তাদের সেই সাহসিকতা, বীরত্বপূর্ণ কাজই শুধু আমাকে আকর্ষণ করেনি। আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম, যে-পশুগুলোকে তারা নদীর ওপারে নিয়ে গিয়েছিল, সেই পশুদের প্রতি তাদের গভীর মমত্ববোধ দেখে। জীবন সংগ্রাম, শ্রমের মহত্ত্ব, মানবিক সম্পর্কের অপ্রতিরোধ্য আবেগই গল্পটির মূল বিষয়, যা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সমরেশ বসু
২২-৬-৭৮

পাড়ি

কাজ নেই তাই বসে ছিল দুটিতে। সেই সময়ে পুবের উঁচু থেকে জানোয়ারগুলি নেমে এল হুড়মুড় করে। ধুলো উড়িয়ে, বনজঙ্গল মাড়িয়ে, একরাশ কালো মেঘের মতো নেমে এল জানোয়ারের পাল ঘোঁৎঘোঁৎ করে।

বসে ছিল দুটিতে। বেঁটে ঝাড়ালো এক বটের তলায় একজন গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ছিল। শুয়েছিল আর একজন। একজন পুরুষ, আর একজন মেয়ে।

আসশেওড়া আর কালকাসুন্দের অবাধ বিস্তার চারিদিকে। মাঝে মাঝে বট অশ্বথ-পিটুলি-সজনে, সব আপনি-গজানো গাছ দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। যেন নিচের কচি-কাঁচা ঝোপ-ঝাড়গুলিকে খবরদারি করছে উঁচু মাথায়।

বন-ঝোপ নিয়ে, হামা দিয়ে দিয়ে জমি উঁচুতে উঠেছে পুবে। একটু উত্তরে, উঁচুতে দেখা যায় একটি কারখানাবাড়ি। বাদবাকি হারিয়ে গেছে গাছের আড়ালে। আর পশ্চিমে মাটি নেমেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। নামতে নামতে তলিয়ে গেছে গঙ্গার জলে।

আষাঢ়ের গঙ্গা। অম্বুবাচীর পর রক্ত ঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে গঙ্গা মা হয়েছে। ভারী হয়েছে, বাড় লেগেছে, টান বেড়েছে, দুলছে, নাচছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ফুলছে, ফাঁপছে, যেন আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। বোঝা যাচ্ছে আরো বাড়বে। স্রোত সর্পিল হচ্ছে। বেঁকেছে হঠাৎ। তারপর লাটিমঘুরির মতো বোঁ করে পাক খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের গায়ে ওগুলি ছোট ছোট ঘূর্ণি। মানুষের ভয় নেই, মরণ নেই ওতে পশুর। শুকনো পাতা পড়ে, কুটো পড়ে। অমনি গিলে নেয় টপাস্ করে! বড় ঘূর্ণি হলে মানুষ গিলত। এই ঘূর্ণি-ঘূর্ণি খেলা। যেন তীব্র স্রোত ছুটে এসে একবার দাঁড়াচ্ছে। আবার ছুটছে তরতর্ করে।

দুটিতে দেখছিল। মেঘ জমছে মেঘের পরে। বড় বড় মেঘের চাংড়া নেমে এসেছে স্রোতের ঠোঁটে, ব্যাকুল ঢেউয়ের বুকে। নেমে এসেছে গাছের মাথায়। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে আসছে আসশেওড়া কালকাসুন্দের কলকে ডগা। বাতাসের ঘায়ে মেঘ দোমড়াচ্ছে, দলা পাকাচ্ছে। আবার ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসছে নেমে।

কাজ নেই, তাই দুটিতে বসে ছিল। বেকার বসে বসে দেখছিল। সেই সময়ে জানোয়ারগুলি আসতে চমকে উঠল।

এদিকে গঙ্গার ধারটা ফাঁকা ফাঁকা। লোকজনের যাতায়াত তেমন নেই। বাইরে থেকে মনে হয়, উত্তরের কারখানাটা ঝিমুচ্ছে এই মেঘলা দুপুরে। গঙ্গা এখানে বেশ চওড়া। ওপারে ধু-ধু করছে ইঁট পোড়াবার কারখানা। আষাঢ় এসেছে, ইঁট পোড়াবার মরশুম শেষ। ওখানেও ফাঁকা। জেলেনৌকারও তেমন ভিড় হয়নি এখনো। তার মাঝে এ দুজন বসেছিল। এই আষাঢ় ঢলকানো গৈরিক গঙ্গা, এই জনশূন্য বনঝোপ, ওই মেঘভরা আকাশ, তার তলায় ওই দুটি। সহসা মনে হয়, পৃথিবীর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মেয়ে আর পুরুষ বসে আছে ঝোপ-জঙ্গলের অসহায় আশ্রয়ে।

কালো কুচকুচে পুরুষ। গামছাটি পাতা শিয়রে। আঁটসাঁট করে কাপড় পরা। গোঁফজোড়া বড় হয়েছে। কিন্তু এখনো নরম রোঁয়াটে ভাব যায়নি। মুখটি এর মধ্যেই

চোয়াড়ে, খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। শুয়ে পড়েছে। পা চালিয়ে দিয়েছে মেয়েটির উরুতের ওপর দিয়ে।

মেয়েও কালো। চুলে পড়েছে জট। কপালে কয়েকদিন আগের গোলা মেটে সিঁদুরের টিপের আভাস মাত্র। ছোট একটি কাপড় কোমরে জড়িয়ে বাকিটুকু টেনে দিয়েছে বুকে। তাতে মন মেনেছে, শরীর মানেনি। নতুন বয়সের বাড়। বন-কালকাসুন্দের মতো পুষ্ট বেআব্রু হয়ে পড়েছে। হাহা করছে কান আর নাকের ফুটোগুলি। উকুন মারছিল মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে পুরুষটির গায়ে বুক চেপে এলিয়ে পড়ছিল।

সেই সকাল থেকে দুটিতে এমনি গায়ে গায়ে বসে ছিল। কাজ নেই, খাওয়াও নেই, তাই এইখানে বসে ছিল।

এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে হাত পা। কালি পড়েছে চোখের কোলে। মুখে চেপে বসেছে ক্ষুধা-ক্লিন্নতা।

পরশু রাতে শেষবার খেয়েছে। কাজ করেছে আগের সপ্তাহ পর্যন্ত। তারপর 'মিসিপালটীর' দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কাজ নেই!

গাঁয়ের মানুষ নন্কু। এখানে এখন ঝাড়ুদারদের সর্দার। দু'মাস আগে তাকে কাজ দেবে বলে নিয়ে এসেছিল। বাবুসাহেব নাগিন প্রসাদের শুয়োর আর ভেড়া চরিয়ে পেটভাতায় ছিল দুটিতে গাঁয়ে। নন্কু গোঁফ মুচড়ে, বুক ফুলিয়ে বলেছিল, সঙ্গে চল্। মাস গেলে দুটিতে রোজগার করবি ষাট টাকা।

আরে বাপ্‌রে বাপ। ষাট টাকা। সবে তখন বিয়ে হয়েছে ছমাস। একলা মানুষ নয়, যে মনের রাশ নেই, শরীরের উপর বিশ্বাস নেই। ওদের গাঁয়ের মানুষ কথায় বলে, নট জাতের মাগী-মদ্দা এক হলে, হেন কর্ম নেই যে করতে পারে না। তা ঠিক। তখন ওদের মনে নেমেছে ঢল। ওরা নটের ঘরের দুই জোয়ান মাগী-মদ্দা। ওরা একত্র হলেই যে-কোন অভিযানে নামতে পারে। নাগিন প্রসাদকে কিছু না বলে চলে এসেছিল দুটিতে নন্কুর সঙ্গে।

কিন্তু কোথায় ষাট টাকা! দুজনে মিলে বত্রিশ টাকা রোজগার করেছে মাসে।

দেড় মাস পর বাড়তি হয়ে গেছে দুটিতে। কাজ নেই। কেবল থাকতে পাওয়া যাবে ধাঙড় বস্তিতে।

কিন্তু কাজ নেই তো খাওয়া নেই। নন্কুকে বলল, কেন কাজ নেই?

নন্কু বলল, ওট হয়ে গেল তাই। ওটের আগে কাজ দেখাতে হয়, তাই বাড়তি নেওয়া হয়। মিটে গেল, বসিয়ে দিল।

ওরা বলল, তবে কি হবে?

কি হবে! নন্কু বোধহয় প্রথমে ভেবেছিল চেঁচিয়ে ধমকে উঠবে। কিন্তু সে চেঁচিয়ে ভেউভেউ করে কেঁদে উঠেছিল, হায় রাম রাম রাম। আমি পাপ করেছি। আমি শুয়োরের বাচ্চা, গীদ্ধরের বাচ্চা, আমি পাপী।

সবাই এসে সান্ত্বনা দিতে লাগল নন্কুর কান্নায়, রোহ, তু তু তু, রহো সর্দার, নারো। তুমি ভালো মানুষ। ওদের একটা কিছু হয়ে যাবে।

একা দুটিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে গেছল? নন্কু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেছিল, হবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে।

সাতদিন কোনোরকমে খাইয়েছিল কেউ কেউ দুটিকে। পরশু রাতে শেষবার খাওয়া পাওয়া গেছে। আর নয়।

গতকাল সারাদিন কেটেছে এখানে। আজো এসে দুটিতে এলিয়ে পড়েছিল। শহরের মধ্যে থাকা যায় না। পুবের উঁচু পাড়ের খানিকটা গেলেই ধাওড় বস্তি। সেখানেও থাকা যায় না। ক্ষুধার্ত, জিভ-বেরিয়ে পড়া কুকুরের মতো হাঁপাতে হয় সেখানে। খিদে পায় কাউকে খেতে দেখলে। এখানে এই নির্জনে এসে তবু পড়ে থাকা যায়।

যায়, কিন্তু যাচ্ছিল না আর। দুজনের হৃৎপিণ্ড দুটি পেটে নেমে এসে দম নিচ্ছিল। আর গায়ে গা রেখে দুটিতে জীইয়ে রাখছিল রক্তপ্রবাহ। গায়ে গা ঠেকিয়ে যেন রক্তে রক্তে সাহস সঞ্চয় করছিল। গা শুঁকে, চটকে, চেটে, বিকট ভয়কে মুখে থাবড়ি দিয়ে রাখছিল সরিয়ে। যে-ভয়টা গা বেয়ে উঠে ওদের একেবারে শেষ করে দিতে চাইছিল। যেন ওদের ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেই আকাশ কালো হয়ে নেমে আসছিল। জল আরো লাল হয়ে উঠছিল, পাক দিয়ে দিয়ে খলখলিয়ে উঠছিল। দক্ষিণের বাতাস একটু পুবে বাঁক নিয়ে খ্যাপা হ্যাঁচকা দিচ্ছিল! ভেজা মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে উঠছিল দলা দলা কেঁচো। ওদের চারপাশ ঘিরে, বটতলায় পিঁপড়েরা আসছিল তেড়ে।

এসেছিল একটা জোয়ারের শুরুতে। একটা পুরো জোয়ারের উজান গেছে। তারপর নেমেছে দীর্ঘ সময় ধরে একটা ভাঁটার ঢল। আবার লেগেছে জোয়ার।

এমন সময় এল সেই জানোয়ারগুলি পুবের উঁচু থেকে। মেঘের বুকে আর এক পোঁচ গাঢ় কালিমার মতো নেমে এল কালো কুঁত্‌কুঁতে চোখো, ছুঁচলোমুখো, মাদী-মদ্দা পশুর দল!

ওরাও মাদী-মদ্দা দুটিতে উঠে বসল গায়ে গায়ে।

শুয়োরের দল একবার থমকে দাঁড়ালো জঙ্গলে একজোড়া মানুষ দেখে। তারপর আবার ঘোঁৎঘোঁৎ করে ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশে।

পেছনে দেখা গেল দুটি লোক। একজন বেশ নাদুসনুদুস, সোনার মাকড়ি কানে। দুটি সামনের দাঁত পুরো সোনার। শুয়োরগুলি কিনেছে এ অঞ্চলের যাবৎ ধাওড়-তল্লাট ঘুরে ঘুরে। নিয়ে যাবে ওপারে। সঙ্গে আর একটি লোক। সামনের বস্তির ময়লা টানা গাড়ির গাড়োয়ান।

এই দুটিকে দেখে সোনার মাকড়িকে বলল, মহাশয়জী, এ দুটোকে দিয়ে আপনার কাজ হতে পারে?

সোনার মাকড়ি এগিয়ে এল। দেখল দুটিকে একবার। মেয়েটি টানতে লাগল বুকের কাপড়। পুরুষটি সংশয়ে দেখতে লাগল দুজনকে।

গাড়োয়ান বলল সোনার মাকড়িকে, সে এদের চেনে। বেকার বসে আছে। রাজী হয়ে যেতে পারে।

সোনার মাকড়ি কাছে এসে দুটিকে দেখল আরো খানিকক্ষণ। আর শুয়োরের দল, বনপালা উপড়ে, কচি শিকড়ের শাঁসের সন্ধানে তছনছ করতে লাগল ঢালু জমি।

সোনার মাকড়ি দেখতে দেখতে একবার হেসে দিল আপন মনে। আর ওরা দুটিতে এখান থেকে সরে যাবে কিনা ভাবছে।

তারপর বলল সোনার মাকড়ি, কাজ করবি?

কাজ। কাজ মানে খাওয়া! ওদের এলানো শরীর একটু শক্ত হল, পুরুষটি বলল, কি কাজ?

সোনার মাকড়ি বলল, শুয়োরগুলি নিয়ে যেতে হবে দরিয়ার ওপারে।

আরে বাপ্‌। ভরা দরিয়া, আরো বাড়ছে। ফুলছে, নাচছে আর ঠেলে ঠেলে উঠছে

উজানে! ওরা মেয়ে-মরদ চোখাচোখি করল দুজনে। দুজনেরই ক্ষুধিত চোখে আশা ফুটল।

পুরুষটি বলল, একটা খবরদারি লাও চাই যে?

অর্থাৎ একটি খালি নৌকা চাই শুয়োরগুলির পাশে পাশে। ওটিই নিয়ম। কিন্তু সোনার মাকড়ি সেদিকে চু-চু। নৌকার পয়সা খরচ করতে পারবে না।

ওরা দুটিতে দমে গেল খানিকটা। ফিরে তাকাল দরিয়ার জলে। তারপর শুয়োর-গুলির দিকে। কালো কিম্ভূত দলা দলা ছড়ানো। মাদীই বেশি। চোখগুলি ট্যারা। চাউনি বোঝা যায় না। কিন্তু লক্ষ্য আছে ঠিক মানুষের দিকে।

ওরা পরস্পর চোখাচোখি করল আবার। আর সেই মুহূর্তেই মনে মনে রাজী হয়ে গেল দুজনে। সেই মুহূর্তে ওদের নটরক্ত উঠল তোলপাড় করে। আঁকুপাঁকু করে উঠল অভুক্ত পেটের মধ্যে। পড়ে থাকাটা মনে হল মরে থাকার মতো। দুটিতে কাপড়ে কষুনি দিল।

তবু মেয়েটি মেয়েমানুষ। বলল, কিন্তু বিনা লাও, পারব তো?

পুরুষটি বলল, সামলাতে হবে।

সোনার মাকড়ি বলল, উই যে ওপারে উত্তরে দেখা যায় শিউমন্দির, তুলতে হবে ওখানে। উনত্রিশ জানোয়ারের জন্য উনত্রিশ আনা দুজনের মজুরি। আর উপরি পাওয়া যাবে কিছু কেড়ুয়া তেল, দরিয়ার থেকে উঠে গায়ে মাখার জন্যে। একটি খোয়া গেলে ছমাস হাজত।

বলে তার হাতের লম্বা লাঠি বাড়িয়ে দিল পুরুষটির দিকে। মেয়েটি পাতা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ভেঙে নিল কালকাসুন্দের ছপটি।

সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ান, দুজনেই চোখাচোখি করল হতবাক হয়ে। রাজী হয়ে গেল দুটোতেই? শেষে জানোয়ারগুলি মেরে দুটোতে মরবে না তো। কিন্তু ওদের দুজনকে শুয়োরগুলিকে ঘিরে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে সে তরর্ হয়ে গেল।

ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে গেল দুদিকে। মেয়েটি তার সরু মিষ্টি গলায় টান দিল একটানা, উ-র্ র্-র্-র্-র্-আ---

আর পুরুষটি ডাক দিল দোআঁশলা গলায়, আ---হুঃ! আ---হুঃ! যেন মেয়েটির টানা সুরে পুরুষ দিল তাল। শব্দগুলি বেরুচ্ছিল ওদের ক্ষুধিত পেটের ভেতর থেকে। কেমন ক্লান্ত আর গম্ভীর সেই সুর। হঠাৎ যেন এক বিচিত্র গানের মায়া ছড়িয়ে দিল এই ঢালু বনভূমিতে। ঘোলা লাল জলের তরঙ্গে তরঙ্গে লাগল সেই সুর। বাতাসে বাতাসে সে সুর লাগল গিয়ে মেঘে মেঘে।

জানোয়ারগুলি ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল সোহাগী সংশয়ের সুরে। মাথা তুলল একে একে ঝুপসি ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে। ছুঁচলো মুখ তুলে যেন গন্ধ শুঁকে দেখল ডাকের ভাব। চক্‌চক্ করে উঠল কুঁত্‌কুঁতে গোল চোখগুলি। ঘেঁষাঘেঁষি করে এল সবাই গায়ে গায়ে। গায়ে গায়ে সবাই ঠিক জড়ো হতে লাগল ওদের মাঝখানে।

উ-র্-র্-র্-র্-আ-উ-র্-র্-র্-আ---

আ---হুঃ! আ---হুঃ!

সোনার মাকড়ির সোনার দাঁত উঠল চক্‌চকিয়ে। গাড়োয়ানটা ঠিক জানোয়ার-গুলির মতো গোল গোল চোখে তারিফ করতে লাগল মনে মনে, হ্যাঁ, ঠিক যেন শুয়োরের আদত বাপ-মা দুটি।

আর ওদের উপোসে মরণের ভয়টা যেন হারিয়ে গেল ওই সুরের মধ্যে। অন্তর

পেটের ক্ষুধার যন্ত্রণাটা এক নতুন সংযমী ক্ষুধার রসে উঠল ভরে। খেতে পাওয়া যাবে, সেই আশায় শক্ত হল হৃৎপিণ্ড। কাজ পাওয়া গেছে, কাজ করতে হবে আগে। কঠিন কাজ।

কাজ কঠিন, কিন্তু পশুগুলি চেনা। সেই থেকে পড়ে থেকেছে ওদের সঙ্গে। পেলেছে ওদের চিরদিন গাঁয়ে। ওদের চেনে, জানে তাগ্ বাগ। চেনে না শুধু দরিয়াটাকে। লাল দরিয়া চলেছে তর্‌তর্ করে। জোয়ার লেগেছে, ঢেউ নেই। কিন্তু টান খুব। দরিয়াও গহিন। ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাড়ছে। কালো মেঘ নামছে পুঞ্জ পুঞ্জ।

জানোয়ারগুলি জড়ো হচ্ছে গায়ে গায়ে। দূর থেকে মনে হয়, একজায়গায় থুক-থুকিয়ে উঠেছে কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল। আর শোনা যাচ্ছে সোহাগী শুয়োর-গলার চাপা ডাক।

ওরা যত জড়ো হয়, ওরা দুটিতে তত ঘনিয়ে এল কাছাকাছি। মেয়েটি আড়চোখে ফিরে তাকাল একবার সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ানের দিকে। তারপরে গঙ্গার দিকে। চাপা গলায় বলল, লাও নেই, কিছু নেই। বহুৎ বড় দরিয়া।---

মেয়েটা মেয়েমানুষ। এটুকু ওর ভয়ে পেছন-টানা নয়। সাহস আর ক্ষমতার মাপ বুঝে হাত দিতে চায় কাজে!

পুরুষটা পুরুষমানুষ। গোঁফ মুচড়ে তীক্ষ্ণ চোখে মাপে দরিয়া। তারপর বলে খালি, হাঁ, বহুৎ বড়!

কথাটার মানে হল, বড় কিন্তু পার হতে হবে।

মেয়েটি আবার বলল, উনতিশ আনা কত? পুরা রূপয়ার বেশি না কম?

বউটা ছোট, তবে মেয়েমানুষ। হিসাব না খতালে মন সাফ হয় না।

মরদটা পুরুষ! সব মেনে গেলে বেহিসাবী হয়ে পড়ে। বলে, তিন আনা কম পুরা দু রূপয়া।

আচ্ছা। নতুন ক্ষুধার একটা অদ্ভুত মিষ্টি স্বাদ লাগছে যেন। কাজেরও তাড়া লাগছে মনে মনে, আর শরীরে। জোয়ারে জোয়ারে যেতে হবে। ওপারের উত্তরের দূর শিবমন্দিরের কাছে যেতে হবে।

মেয়েটা আবার বলল, দরিয়ায় এখন জল বেশি। এরা এখন পার করছে কেন?

পুরুষটি বলল, ওরা কারবারী। জানোয়ারের তখ্‌লিফ পরোয়া করে না।

ওরা ডাকছে সুরে সুর মিলিয়ে আর কথা বলছে। কথা বলতে বলতে শুনছে। দুটো মদ্দা, বাকি সব মাদী! হ্যাঁ, কিন্তু একটা গাভিন যে! গাভিন শুয়োরী। পেটে ওদের সোনা ফলে। কোনটা পাঁচটা দেয়, কোনোটা ছটা। তেমন ফলবতী হলে সাতটাও। দরিয়া পার পাবে তো!

পাবে। নয়া গাভিন। এখনো হালকা আছে।

ডাকের সুরটা কিছু রকমফেরে। তাড়া খাওয়ার সুর। তাড়া দিতে গিয়ে থমকে গেল পুরুষটি। ব্যস্ত হয়ে ফিরল সোনার মাকড়ির দিকে। উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, হুজুর এদের খানাপিনা ভরপেট আছে তো?

সোনার মাকড়ি বলল, হাঁ হাঁ।

হাঁ বাবা! এতবড় দরিয়া, যুঝবে কি করে নইলে পশুগুলি। ওদের দুটির পেটে না থাক খানা। খানার জন্যই ওরা যুঝতে যাচ্ছে। জানোয়ারগুলি কেন যুঝবে, তা ওরা জানে না।

পরমুহূর্তেই পুরুষটি লাঠি তুলে ওর শূন্য নাভিস্থল থেকে একটা তীক্ষ্ণ বিলম্বিত হাঁক দিল, হাঁ-ই—ই—হা- - -

মেয়েটা টান দিল, উ-র্-র্-র্—আ,—উ-র্-র্-র্-আ- - -

জানোয়ারগুলি হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল এই রূঢ় অথচ নতুন ইঙ্গিতের সুরে। গোল গোল ট্যারা পাকানো চোখে সংশয় দেখা দিল। হাঁক শুনে সব সামনের দিকে একবার ঠেলে আসতে গেল। কিন্তু দোলায়মান লাঠি আর ছপটি দেখে, থমকে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। ভাবখানা এ সবের মানে কি? গায়ে গায়ে ঘষার একটা খস্‌খস্ শব্দ উঠল। গায়ের শুকনো কাদা উড়তে লাগল ধুলোর মতো।

তারপর লাঠি-ছপটির নিশানা আর হাঁকের ইশারায়, এক জায়গাতে ঘেঁষাঘেঁষি করে ফিরল নদীর দিকে। পরমুহূর্তেই কোনো খবরদারি না দিয়ে পুরুষটির হাতের লাঠি আলতোভাবে গিয়ে পড়ল জানোয়ারের ভিড়ে। আচমকা ভয় পেয়ে, মাটিতে অদ্ভুত শব্দ করে দলটা নামতে লাগল ঢালুতে। দুজনের লাঠি-ছপটি হাতের ঘেরাওয়ে উনত্রিশটি জানোয়ার। বড় জাতের জানোয়ার।

ততক্ষণে আষাঢ়ের জোয়ারের গঙ্গা এগিয়ে এসেছে কল্‌কল্ করে। বাড়ছে। আরো বাড়বে।

কালো-কালো খোঁচা-খোঁচা লোমওয়ালা পিঠের ঢেউ থমকে থমকে পড়ছে। শুয়োর জল চায়। টানের দরিয়ায় পড়তে চায় না সহজে। চোখে তাদের টানা ঘোলা স্রোতের শঙ্কা। গলায় অদ্ভুত সন্দিগ্ধ বিক্ষুব্ধ শব্দ। যেন জিজ্ঞেস করছে, কি হবে? কোথায় যেতে হবে?

পুরুষটি রূঢ় হাঁকের ফাঁকে ফাঁকে তোয়াজের সুর দিচ্ছে, আহ্ আহ্ আহ্, উতারো, উতারো। তোদের দরিয়া পার করি তারপর। হোই- - -হা হা- - -

উ-র্-র্-র্—আ উ-র্-র্-র্-আ- - -

মেয়েটি কেবল দেখছে, দরিয়া বাড়ছে। যত কাছে আসছে, ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে। ততই ফুলছে, স্রোতের টান বেঁকে বেঁকে হিল্‌হিল্ করে যাচ্ছে। দেখছে আর ফিরছে পুরুষের দিকে। পুরুষটিও দেখছে আর শক্ত হচ্ছে মুখটা। এসে গেছে, এসে গেছে জলের কিনারায়। ল্যাজ গুটিয়ে এগুচ্ছে জানোয়ারেরা। এ ওকে গুঁতিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে পেছিয়ে আসছে নিজে। এমনি করে অনিচ্ছায় এগুচ্ছে।

হঠাৎ একটি জানোয়ার তীব্র চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেল। সেই গাভিন শুয়োরীটি। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ছুটছে। যেন তীব্র প্রতিবাদ করে বলছে, যাব না, কখ্‌খনো যাব না।

যাবে না। ভয় পেয়েছে। হারামজাদীর পেটে বাচ্চা আছে কিনা!

কিন্তু মেয়েটি হুতাশে পেছন তাড়া করতে গিয়ে, জলের ধারের কাদায় হুমড়ি খেয়ে আবার উঠে ছুটতে যাবে পুরুষটি হাঁক দিল, ছুট্ মত্।

কাদা মেখে প্রায় খালি গায়ে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। শক্ত নিটোল বুকে কাদা লেগে গেছে। কাদা লেগেছে চুলে। অনেকখানি যেন মিশে গেল শুয়োরের দলের সঙ্গে। পুরুষটি বলল, ডাক, ডাক দে, এগুলিকে নিয়ে আগে বাড়তে হবে।

জলে নামাল না শুয়োরের দলকে। ডাঙার উপর দিয়ে চলল নরম সুর ছাড়তে ছাড়তে। উররর-আ, উররর-আ, আ-হুই! আ-হুই।

শুয়োরীটা অনেক দূর গেছে চলে। থেমেছে, কিন্তু বিকট গলায় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে আবার মুখ নামিয়ে কি সব খাচ্ছে খুঁটে-খুঁটে।

এরা দুটিতে জলের ধার দিয়ে দলটাকে নিয়ে চলেছে এগিয়ে। শুয়োরীটা দেখছে, খাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। তারপরে হঠাৎ তেমনি চেঁচাতে চেঁচাতেই পিল্‌পিল্‌ করে ছুটে এল দলের মধ্যে। কিন্তু চেঁচাতে লাগল তেমনি। ঘাড় গোঁজ করে আড়চোখে তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল, জেনে-শুনে মারতে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে! শয়তান মানুষ!

মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ দুটি চোখাচোখি করল একবার। সময় হয়েছে। এইবার, এইবার। পায়ের পাতায় জল ঠেকছে। ঠেকছে আবার সরে যাচ্ছে। আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনেকখানি।

শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি। আর পুরুষটি যেন তার সব কথাই বুঝতে পারছে, এমনিভাবে বলছে, হঁ হঁ! কোনো ডর নাই। হঁ হঁ। আ-হুই! বলতে বলতে সে আবার গঙ্গার দিকে তাকাল। গঙ্গা। গঙ্গামায়ী! যেন খিলখিল করে হাসছে, কল্‌কল্‌ করে কি সব বলছে। আর যেন ঠিক চেয়ে আছে ওদের দিকে। কি যে বলছে, ঠিক বুঝতে পারছে না ওরা দুটিতে। খালি মনে হচ্ছে, যেন জিজ্ঞেস করছে ভগবতী দরিয়া, আসছিস? আসবি? তোরা ভুখা রয়েছিস আর আমি কত বড় হয়েছি। এই বলছে আর হাসছে। হাসছে আর মাতাল রহস্যময়ী চোখে দুলে দুলে চলছে। লাল হয়ে গেছে খুশিতে।

পুরুষ আর মেয়ে ওদের দুজনের চোখেই অপার অনুসন্ধিৎসা। দুজনেই যেন দরিয়ার তলা পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে। কি রহস্য আছে সেখানে। কি ভয় আছে, কত ফাঁদ পাতা আছে মরণের।

এইবার বোঝা যাচ্ছে, ওরা দুটি যেন শিশুর মতো সরল। শিশুর মতো নির্ভীক ও সাহসী। মেয়েটা আঁটছে কোমরে। গা-টা একেবারেই খোলা। ঝড়, জল ও বজ্রপাতেও দুর্জয় গিরিশৃঙ্গের মতো নির্ভীক বলিষ্ঠ বুক।

পুরুষটি গোঁফ পাকাচ্ছে। রোঁয়াটে গোঁফ আর এবড়ো-খেবড়ো পাথরের চাংড়া শরীর।

ওরা দুজনেই যেন মনে মনে বলছে ভগবতী দরিয়াকে, হাঁ, আমরা ভুখা। সেইজন্যে আমাদের পার হতে দাও। সোনার মাকড়িটা কারবারী। ও আষাঢ় মাসে জানোয়ার পার করাচ্ছে বিনা নৌকায়। উনত্রিশটা জানোয়ার, আরে বাপ! দুটো মানুষ! হাই বাপ্‌! জানোয়ারগুলোর কোনো দোষ নেই! হেই মায়ী! দুদিন ধরে দেখছ, আমাদেরও কোনো দোষ নেই।

ওরা বলছে আর দরিয়া যেন যোগেড়ী নাচওয়ালীর মতো কল্‌কল্‌ ঝুম্‌ঝুম্‌ করে এগিয়ে আসছে দুর্জয় কটাক্ষ করে। জল বাড়ছে, ওরা কেবলি সরে সরে উঠে আসছে। তৈরি হচ্ছে।

জানোয়ারগুলি সংশয়োদ্দীপ্ত চোখে তাকাচ্ছে মানুষদুটোর দিকে। কান পাতছে বাতাসে আর জলে। বাতাস আর জলের কথা বুঝতে চাইছে যেন ওরা। ঘোঁৎঘোঁৎ করছে সবাই। শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে।

এইবার। এইবার। পুরুষটি জানোয়ার পটানো শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বলল মেয়েটিকে, থোড়া উপরে ওঠ।

হাঁ, ঠিক আছে। একটু এগিয়ে যা, হাঁ, ঠিক খাড়া হয়ে যা।

দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। জানোয়ারগুলিকে মুখ ফেরাতে হল জলের দিকে। এইবার তাড়া দিতে হবে। একবার জলে পড়লেই স্রোতের টান। তখন আর কিছু ভাববার অবসর থাকবে না।

শেষবার দুজনে তাকাল জলের দিকে, ওপারে মাটির সীমানায়। জানোয়ারগুলির জিজ্ঞাসু গোঙানি বাড়ছে।

একমুহূর্ত পরেই ওদের দুজনের গলাতেই শোনা গেল একটি তীব্র চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ছপটি মুহুর্মুহুঃ এসে পড়তে লাগল জানোয়ারগুলির গায়ে।

পরমুহূর্তেই দেখা গেল জানোয়ারগুলিকে দরিয়া খানিকটা টেনে নিয়ে গেছে। ওরা দুটিতেও ঝাঁপ দিল জলে।

কিন্তু ওদের দুটিকে পেছনে রেখে, জানোয়ারগুলি দ্রুত উত্তর দিকে চলল ভেসে। এখন থেকেই এরকম উত্তর দিকে গেলে, এ জন্মে আর পার হওয়া যাবে না। শুয়োরগুলিকে ওপারের দিকে মুখ করাতে হবে। নৌকা থাকলে এ অসুবিধে হত না।

পুরুষটি চিৎকার করে উঠল, ডাঙায় ওঠ্, জলদি।

তখনো বুকজল। দুজনে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাঙায় উঠল।

জানোয়ারগুলিও ডাঙায় ওঠবার তালে আছে। জলে একটা অদ্ভুত খলবল শব্দ তুলছে শুয়োরেরা আর চাপা গলায়, ছুঁচলো মুখে মুখ ঠেকিয়ে কিসব বলাবলি করছে। গাভিন শুয়োরীর গলাটাও চেপে গেছে অনেকখানি।

ওরা দুজনে উঠেই ডাঙার উপর দিয়ে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির সামনে। উনত্রিশটা জানোয়ার যেন একটি বিকটাকার জানোয়ারের মতো ভাসছে। পুরুষটি ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঠিক সামনের মুখে। মেয়েটি পড়ল মাঝামাঝি।

পুরুষটি জলে পড়েই লাঠি তুলে দলটার মুখ ফিরিয়ে দিল পশ্চিমে, গঙ্গার ওপারের দিকে। মেয়েটি পেছন থেকে ছপটি মারল ছপছপ করে। শুধু দক্ষিণ দিকটা ফাঁকা রইল। জোয়ারের ধাক্কা আসছে ওদিক থেকে। শুয়োরগুলি ওদিকে ফিরতে পারবে না কোনোমতে। আর খোলা আছে পশ্চিম দিক। ওদিকেই তাড়াতে হবে।

পুরুষটি লাঠি তুলে চিৎকার করতে লাগল, হা--ই! হা--ই! পেছন থেকে মেয়েটি হুম্‌হুম্ শব্দ করছে আর বলছে, খবরদার, এদিকে মুখ করবিনে।

শুয়োরগুলি তখনো ঠেলাঠেলি করছে পরস্পরের মধ্যে আর ঘোঁৎঘোঁৎ করছে। এখনো বোধ হয় পেছন ফেরার আশা করছে। এর পরে ঠেলাঠেলি করে নিজেরাই এগিয়ে যেতে চাইবে। এখন ভয়ে ও শঙ্কায় ঠেলে বেরুচ্ছে চোখগুলি। সামনে ওই বিশাল জলরাশি আর তার তীব্র টান। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে অ্যাঁ? মরতে হবে? কি চায় এরা!

ওপারে নিয়ে যেতে চায়!

পুরুষটি কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারছে না শুয়োরগুলির উত্তর মুখে। ভয়ংকর টান। টানটাও একরোখা নয়। থেকে থেকে বেঁকে যাচ্ছে।

মেয়েটি তো কিছুতেই জানোয়ারগুলির পেছনে থাকতে পারছে না। তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আরো উত্তরে, পুরুষটির দিকে।

পুরুষটি চিৎকার করে বলল, ঠেলে থাক্। জোরে ঠেলে থাক্। খবরদার ইধারে আসিস্‌নে।

ঠেলে থাকছে মেয়েটা। কিন্তু তীব্র স্রোতে হাত-পাগুলিকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধাক্কা মারছে এসে বুকে।

এখন আর মানুষ দেখা যায় না। সব শুয়োর হয়ে গেছে। সাতাশের জায়গায় আটাশটা মাদী, আর দুটোর জায়গায় তিটে মদ্দা হয়েছে।

ডাঙা সরে গেছে বেশ খানিকটা। দক্ষিণে বাতাস ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে জলে। যেখানে

পড়ছে, সেখানে এক অদ্ভুত উল্লাসের কাঁপুনি লেগে যাচ্ছে। জোয়ার না হলে, এই বাতাসে ধাক্কা লেগে গঙ্গা উত্তাল হয়ে উঠত। ঢেউ উঠত বড় বড়। তাহলে জানোয়ার-গুলি মরত নির্ঘাত।

পুবের হ্যাঁচকা থেকে থেকে ঢেউয়ের আভাস দিচ্ছে, সেইটাই ভয়ের! মেঘগুলি দলা পাকিয়ে পাকিয়ে কোথাও কোথাও নেমে আসছে হুহু করে। কোথাও উঠে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দুপাশে। সেই ফাঁকের মাঝে দেখা দিচ্ছে অদ্ভুত আলোর রেখা। যেন এক রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এখুনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঢেকে যাচ্ছে গম্ভীর কালিমায়। ভাবভঙ্গি ভালো নয়। মেঘ তাতে আরো জমাট হচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে।

ওরা দুজনে দৃষ্টিতে দেখছে আকাশের দিকে আর প্রচণ্ডভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে জলের মধ্যে। মাঝে মাঝে উঠছে লাঠি আর ছপটি। জলের ধাক্কায় কাবু হচ্ছে একটু একটু করে। কিন্তু এখনো সেটুকু ভাববার, অনুভব করার অবসর পাচ্ছে না। মুখে শব্দ করছে হা—হা—! মেয়েটি নীরব হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে তীব্র চিৎকার করে উঠছে এক-একটা জানোয়ার। আর ওরা দুজনে চমকে জলের দিকে তাকাচ্ছে। কি হয়েছে! কে তোকে কি করেছে। ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে কি কেউ জলের তলায়।

ভাবছেই, জলের তলায় ভয়াবহ আতঙ্কটাকে ওরা ওদের দেহের প্রচণ্ড আলোড়নে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চাইছে। কিছু নয়। কিছু নেই। কোনো ভয় নেই।

হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল। পুরুষটা শুশুকের মতো লাফিয়ে উঠল জলে। কি হল?

তিনটে শুয়োরী বেমালুম পিছন ফিরে পোঁ-পাঁ করে পালাচ্ছে উত্তর-পুবে। যাবে না, কিছুতেই আর যাবে না। স্রোত বাড়ছে, জল ফুলছে। মারবার ফন্দি খালি।

পুরুষটি একমুহূর্ত আড়ষ্ট রইল। তারপর লাঠি নামিয়ে তিন শুয়োরীর পেছন ধাওয়া করল। কাছাকাছি গিয়ে, মুখোমুখি হল। লাঠি তুলে জলে মারল ছপাস্ করে। ছুঁচলো মুখ আবার ফিরল। সেই গাভিনটা। আর দুটো উঠতি বয়সের। সময় হয়েছে গাভিন হওয়ার। এখনো মানুষ চিনতে শেখেনি, বিশ্বাস আসেনি মনে।

পুরুষটার রাগ হল, আবার মায়াও হল। খালি বলল, জানোয়ার। একদম জানো-য়ার। হাই—হাই!

হলদে দাঁত বের করে চেঁচাতে চেঁচাতে দলের দিকে ছুটল তিনটিতে। লাঠিটা উঠে রইল আকাশে।

ইতিমধ্যে বাকি জানোয়ারগুলিকে নিয়ে মেয়েটা চলে গেছে অনেকখানি।

পুরুষটা তাড়া দিল। জলে ডুবে ডুবে তারও চোখগুলি দেখাচ্ছে শুয়োরের মতো। বলছে, আমি আছি না, হ্যাঁ? হারামজাদী!

নিদারুণ সব খিস্তি করতে লাগল রাগে ও সোহাগে।

কাছাকাছি এসে মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হল। দুজনের চোখই শুয়োরের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখে কেমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

দুজনেই বুঝল, স্রোত বাড়ছে। ভয়ংকর বাড়ছে। দরিয়া আকুল। আরো বাড়ছে। ফুলছে। এক-একটা জায়গায় জল যেন নিচের থেকে ফুলে ফুলে উঠছে। উঠছে আর ছুটছে তীব্র বেগে। আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে এক-এক জায়গায়। ওখানে রাগ আছে বুঝতে হবে। কপট রাগ। তালাও স্রোতের কৃত্রিম ঘূর্ণি।

শুয়োরগুলি চাক বেঁধেছে। মুখের পাশ দিয়ে ফ্যাঁস্‌ফ্যাঁস্‌ করছে জলের মধ্যে। গোঁগোঁ করে কিসব বলাবলি করছে। জলের গভীরতা, তার ভয়ংকরী রূপটা যেন ওরাও চিনতে পেরেছে, তাই একজোট হয়ে, নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে চলেছে। মিছিল করে নিয়েছে, লড়াই জলের সঙ্গে। তবু দেখছে লাঠি আর ছুপটি। তবু ওরই মধ্যে যত ময়লা ভেসে যাচ্ছে মুখের সামনে দিয়ে, সব মুখে পুরে নিচ্ছে।

আর ওরা দেখছে, দরিয়াটা ক্রমে সরে যাচ্ছে। গহিন দরিয়া। এখনো মাঝামাঝিও আসা যায়নি। জলের ধাক্কায় ধাক্কায় ওদের হাতে, পায়ে, মাথায় শিরাগুলি টানটান হয়ে উঠেছে। জল ঠাণ্ডা কিন্তু ওদের পা থেকে গরম বেরুচ্ছে। ঘাম ঝরছে। মেশামিশি হয়ে যাচ্ছে ঘামে জলে।

জল হাসছে কল্‌কল্‌ করে, বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে সোজা স্রোত। বেঁকে ফুলে উঠে এক-একটা করে চুবানি দিচ্ছে ওদের আর বলছে, এসেছিস? আয়, আরো আয়।

বলছে আর সমুদ্র উজাড় করে খল্‌খল্‌ করে আসছে।

হ্যাঁ, যেতে হবে। হেই মায়ী! মায়ী দরিয়া, যেতে হবে। অনেক লাঠি আর ঘা পড়ছে তোর গায়ে। জানোয়ারগুলিকে ভয় দেখাবার জন্যে। তোর কত সহ্য মায়ী। আমাদের কোন দোষ নেই, কোনো স্পর্ধা নেই। দরিয়ার উপর দিয়ে চিরকাল মানুষকে পার হতে হয়।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। জোয়ারের দরিয়া কেবলই বাড়ছে আর ওর চোখে বাড়ছে একটা অশুভ ইঙ্গিত। ঠেলছে, কিন্তু পারছে না। দূরে সরে যাচ্ছে কেবলই। হাত আর উত্তোলিত নেই। নেমে গেছে।

পুরুষটা কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে, কিন্তু ভয়ে পারছে না। যদি বলে, নাই শক্‌তি! আর পারছিনে। বিদায় দাও। বাবুসাহাব নাগিন প্রসাদ ওদের বিয়েতে দুটো শুয়োর মেরেছিল, এক মণ চাল দিয়েছিল। আর দিয়েছিল চার জালা তাড়ি।

আকাশ আরো নামছে। নামছে। হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে একটা বিদ্যুৎঝলক ওদের মাথার উপর এসে হারিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই কড়কড় বুম করে শব্দ হল।

অমনি জানোয়ারগুলি মিছিল ভেঙ্গে ফেলল। এলোমেলো হয়ে গেল।

আঁ আঁ শব্দে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটা।

মেয়েটাও লাফ দিল মস্তবড় কাতলা মাছের মতো। ছুপটি উঠেছে আবার হাতে। পুরুষটা লাঠি তুলে হাঁক দিল, খবরদার! কিছু ডর নেই, চল্‌। যত জলদি পারিস্‌ চল্‌।

যা দু-একটা জেলেনৌকা ছিল আশেপাশে, তারা সব পার ঘেঁষছে।

যত পশ্চিম, ততই স্রোত। পশ্চিমে বাঁকা। জল ওখানে তলে তলে লুপলুপ করে মাটি খাচ্ছে। মন্দির কোথায়? শিউমন্দির? ওই, ওই যে। অনেক দূরে। এখনো অর্ধেক। ওই বাঁকের মুখে, স্রোত যেখানে পাগলের মতো ছটফটিয়ে উঠেছে।

ওরা সরে যাচ্ছে ক্রমে শুয়োরগুলির কাছ থেকে। শুয়োরগুলি চাক বাঁধা। সেজন্যে ওদের গতির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা, সংযম আছে। ওরা দুটিতে ছিটকে যাচ্ছে কুটোর মতো।

জানোয়ারগুলির বিশ্বাস ফিরে এসেছে মানুষদুটোর উপর। ওদের সরে যেতে দেখে ভয় পাচ্ছে। তাই ভীত সন্দিগ্ধ স্বরে ডাকছে বারবার।

আর ওরা স্রোত ঠেলে কাছে থাকতে চাইছে, পারছে না। ওরা যতই ঠেলছে, ততই অবশ হয়ে পড়ছে। কাঁধে আর হাঁটুতে টান পড়েছে।

ওরা দুজনে কাছে কাছে। মেয়েটি মুখ তুলল। জলে ভেজা মুখ। চোখ লাল। বলল, আচ্ছা, আমরা ফিরে আসব কি করে? খেয়া পারের পয়সা দেবে তো?

মেয়েটা মেয়েমানুষ। ও এখন ফিরে আসার ভাবনায় পড়েছে। পুরুষটা বলল, জানিনে।

হঠাৎ আবার নতুন স্রোত। এখানে জলটা ইস্পাতের মতো রেখাহীন অথচ ভয়ংকর বিক্ষুব্ধ। টানে না, যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এক লহমায় মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার ভাসল। সারা মুখ ঢেকে গেছে খোলা চুলে।

কোথায় গেলি?

এই যে!

না, ডোবেনি। পুরুষটি গোঁফের ফাঁকে হাসবার চেষ্টা করল এতক্ষণে। এতক্ষণে মেয়েটাকে হারাবার ভয় হয়েছে। বলল, কি, তখলিফ হচ্ছে?

তখলিফ! এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয়। কিন্তু মেয়েটি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল, না।

মনে হচ্ছে, রাত্রি নামছে। অন্ধকার হচ্ছে। আবার সগিন বিদ্যুৎ চিক্‌চিক্ করে উঠল। একদিক থেকে নয়, চারদিক থেকে। যেন ছপটি মেরে যাচ্ছে জানোয়ারগুলির জলে ভেজা চকচকে পিঠে, ওদের মাথায়। সোজা ওদেরই মাথার উপর যেন বজ্রপাত হচ্ছে। আকাশের শব্দ যেমনি থামছে জলের শব্দ সেই মুহূর্তেই দ্বিগুণ হচ্ছে। চিৎকার করছে ভীত পশুর দল।

এবার পুরুষটির লাঠিও নেমে গেছে। ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে দুজনেই। অনেকক্ষণ ভুলে গেছে। পার হতে হবে শুয়োরগুলিকে নিয়ে, সেইটেই একমাত্র কথা, একমাত্র ভাবনা।

আবার গতি বাড়ল জানোয়ারগুলির। অর্থাৎ স্রোত আরো বাড়ছে। জল ছুঁতে চাইছে আকাশকে, আকাশ জলকে। জল ঝাপটা দিচ্ছে তলে। তলে তলে, ঠ্যাঙে, পেটে, বুকে। স্রোতের চরিত্র আবার বদলেছে।

ওরা দুটিতে আবার কাছাকাছি হয়েছে। কাছাকাছি হয়েছে জানোয়ারগুলিও।

মেয়েটা কি যেন টেনে টেনে তুলছে। কাপড় তুলছে। খুলে যাচ্ছে কাপড়, তাই। দুজনেরই হাতের চেটোগুলি নতুন চালের আসকে পিটের মতো ফুলো ফুলো হয়ে কুঁকড়ে গেছে। মেয়েটার চোখের দিকে চোখ রাখতে পারছে না পুরুষটা। মেয়েটা ডুবছে বারবার, আর এই ঘোলা জলের মতো ঘোলা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

ওদের বিয়েতে কী বাঁশিটাই বাজিয়েছিল রামুয়া। আর আজকে এই সর্বনাশী দরিয়ায়—

চিক্‌চিক্ দ্যাম! চিৎকারের চোটে জানোয়ারগুলির বীভৎস হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

পুরুষটি ঢোকে ঢোকে জল খেল কয়েকবার। ডাকল, আছিস?

হাঁ। আছি।

আবার বলল মেয়েটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে থেমে থেমে, উনত্রিশ আনাতে ঠকা হয়ে গেছে, না?

হ্যাঁ।

গঙ্গা বুক বাড়িয়ে ঠেলে ঠেলে, দুলে দুলে যেন হেসে উঠেছে ওদের কথায়।

আবার: আচ্ছা, রাত হয়ে গেলে আমরা থাকব কোথায়?

পুরুষটি নীরব। সভয়ে তাকিয়ে দেখল উত্তরগামী স্রোত অদূরেই বাঁক ফিরে হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়েছে। ভাঁটা পড়ে গেল নাকি। সর্বনাশ! মন্দিরের কাছাকাছি এসে আবার উল্টোদিকে ভাসতে হবে! একটা নৌকা নেই। আর দুটো মানুষের হাতে উনত্রিশটা জানোয়ার।

পরমুহূর্তে সে চিৎকার করে উঠল, ঘূর্ণি। ঘূর্ণি।

জানোয়ারগুলিও সে চিৎকারের মধ্যে আসন্ন বিপদের সঙ্কেত পেল। ওরা পুরুষটির দিকেই এগুতে লাগল।

পশ্চিমপাড়টা মাটি খাচ্ছে অদৃশ্যে। দ' পড়ে গেছে। আওড় হয়েছে তাই।

উত্তরগামী জল তাই হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়ে বড় ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে।

বড় ঘূর্ণি। মানুষ জানোয়ার, সব খেয়ে ফেলবে। আরে বাপ! হেই মায়ী।

আবার জোর ফিরে এল দুজনেরই গায়ে। পুরুষটি লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির দক্ষিণে। খবরদার। খবরদার।

সে ঘূর্ণির কাছাকাছি চলে গেল জানোয়ারগুলিকে বাঁচাবার জন্য। মেয়েটা পুরুষের জীবন-সংশয় দেখে কাছে আসতে চাইছে। পারছে না। পরমুহূর্তেই মনে হল, কি একটা ভার নেমে গেল তার শরীর থেকে। কি গেল। কাপড়। দরিয়া কাপড় ছিনিয়ে নিল।

পুরুষটা প্রাণপণ চিৎকার করছে জানোয়ারগুলির দক্ষিণ ঘেঁষে। যাতে ভয় পেয়ে সবাই হুড়মড় করে উত্তরে ছোটে।

কিন্তু একটা জানোয়ার পড়ে গেল দক্ষিণের টানে। পুরুষটা চিৎকার করে উঠল, গেল, গেল হারামজাদী। সেই গাভিন শুয়োরীটাই। যার সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেশি, সে এমনি যায়। এখন উপায়।

শুয়োরীটা দলছাড়া হয়ে চিৎকার করছে। কয়েক হাত মাত্র দূরে। কয়েকটি রেখার বাইরে। কিন্তু সেটুকু ঠেলে আসতে পারছে না। পুরুষটিও যেতে পারছে না কাছে। তাকেও ওইরকম ঠেলাঠেলি করতে হবে। তারপর মরতে হবে ওর সঙ্গে। কিন্তু উপায়।

মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, চলে এস। ওকে মরতে দাও।

মরতে দেব। মরবে শুয়োরীটা। এতগুলি বাচ্চা পেটে নিয়ে মরবে।

বিদ্যুৎ চমকাল। বৃষ্টি এল খাপছাড়া বড় বড় ফোঁটায়। এল শেষপর্যন্ত। হেই আশমান, তোর দরদ নেই।

হঠাৎ পুরুষটি ঝাপটা দিয়ে মাথা তুলল। তার চেহারা শুয়োরের চেয়েও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। একটু একটু করে এগুতে লাগল ঘূর্ণিরেখার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে মেপে নিল শুয়োরীটার দূরত্ব। তারপর হাতের লাঠি বাড়িয়ে ধরল শুয়োরীটার মুখের কাছে, নে, পারিস তো ধর কামড়ে।

কিন্তু শুয়োরীটা ক্রমে পেছিয়ে যাচ্ছে। পুরুষটি আর একটু বাড়ল। শেষ বাড়া। শুয়োরীটা ঠেলছে। ঠেলতে ঠেলতে চকিতে কামড়ে ধরল লাঠি। ধরেছে। যেন বাঁচবার জন্যে শুয়োরীর মগজেও ঘটেছে বুদ্ধির বিকাশ। নিচের পাটিতে কয়েকটা হলদে দাঁত দেখা যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে নাসারন্ধ্র, আর ছুঁচলো ঠোঁট। খাড়া হয়ে উঠছে ঘাড়ের শক্ত লোম। পুরুষটি প্রাণপণে টান দিল। বলল, ধর, ভালো করে ধর। না পারলে ছেড়ে দেব।

পুরুষটি টানতে লাগল, শুয়োরীটা চাড় দিতে লাগল। তারপর হঠাৎ লাঠিটা গেল

ফসকে। দেখা গেল শুয়োরীটা পুরুষটির মাথার কাছে। দুজনেই ভাসছে উত্তর দিকে। লাঠিটা উত্তরে গিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে দক্ষিণের দহে চলে গেল।

মেয়েটা ততক্ষণে বাকি পশুগুলির সঙ্গে ভেসে গেছে অনেকদূর। দাঁড়াবার উপায় নেই জোয়ারের ধাক্কায়।

শুয়োরীটা আরো জোরে চেঁচাচ্ছে। জলের জন্য টানা চেঁচাতে পারছে না। কিন্তু চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। যেন বলছে, বলেছিলাম, আমাকে তোরা একটা বিপদে ফেলবি। আমি এখুনি মরতাম, এখুনি।

আর পুরুষটি ভীষণ খিস্তি করে বলছে, চুপ্, চুপ্, কমিনে জানোয়ার। তুই আমার পোষ্য হলে, ডাঙায় উঠে আজ তোকে ঠেঙিয়ে আধমরা করতাম।

দূর থেকে মেয়েটির গলা ভেসে এল, কী হ—ল?

পুরুষটি জবাব দিল, বেঁচে গেছে।

বৃষ্টিটা চেপে আসছে না। গর্জন বাড়ছে মেঘের, ঝলকাচ্ছে ঘনঘন। গঙ্গা পর্যন্ত বেড়েছে, টাবুটুবু হয়ে গেছে তবু টানছে ভয়ংকর, এই একই রকম।

মন্দিরটার সামনেই নিচের ভিত অনেকখানি ডুবে গেছে জোয়ারের ভরায়। কিন্তু মেয়েটা শুয়োরগুলি নিয়ে ভেসে যাচ্ছে মন্দিরটা ছাড়িয়ে। শুয়োরীটাকে ছেড়ে পুরুষটা ভেসে গেল সেইদিকে।

কাছে এসে দেখল মেয়েটা বারবার ডুবছে! আর শুয়োরগুলি ভেসে যাচ্ছে ওর পাশ কাটিয়ে। ডাঙা থেকে চেঁচাচ্ছে সোনার মাকড়ি, এখানে এই জায়গায় তুলতে হবে।

কিন্তু মেয়েটা তখন ডুবছে। পুরুষটা কাছে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে, টান দিল। কিন্তু আশ্চর্য। পায়ে যে মাটি ঠেকছে। তবে মেয়েটা ডুবছে কেন।

মেয়েটার তখন শীত ধরেছে আর ভেজা মুখখানিতে ভরে উঠেছে ব্যথার লজ্জা ও নিদারুণ ক্লান্তি। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ডুবে থাকতে হবে আমাকে। একদম নাঙ্গা হয়ে গেছি।

ও, কাপড়টা দরিয়া টেনে নিয়ে গেছে। পুরুষটা বলল, তবে এইখানে দাঁড়া! আমি জানোয়ারগুলিকে তুলি আগে।

তুলে দিল জানোয়ারগুলি। তারপর কোমরের গামছা খুলে সেটা পরল। নিজের ছোট কাপড়টা ছুঁড়ে দিল জলে।

সোনার মাকড়ি দুটি লোক নিয়ে এসেছিল। তারা হাসতে লাগল সবাই। সোনার মাকড়িও। বলল, দরিয়ায় দিল্লেগী।

এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। বৃষ্টিও এল জোরে। কাছেই সোনার মাকড়ির বস্তি। শুয়োরগুলিকে ঘিরে নিয়ে সবাই এল সেখানে।

অনেক রাত হয়েছে। গঙ্গার ধারেই সোনার মাকড়ির বস্তির শুয়োর খাঁচার পাশে একটা চালায় রাত কাটাচ্ছে ওরা দুটিতে। মজুরি দিয়ে আটা আর ভাজি কিনে এনেছে। রুটি করেছে। এখন খাচ্ছে। দুটিতে বসে বসে। উনুনে একটি কাঠ জ্বলছে আপন শিখা তুলে। সেই আলোয় খাচ্ছে।

দরিয়াটা তখন ভীষণ ঢেউয়ে নাচানাচি করছে। অন্ধকারে মেশামেশি হয়ে গেছে সব। বর্ষণ হচ্ছে অবিরত। আর পুবে হ্যাঁচকা বাতাস যেন চাপা গলায় শাসাচ্ছে। জানোয়ারগুলি ঘোঁৎঘোঁৎ করছে আশেপাশে।

পরশু রাতের পর এই আবার খাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখ ফেটে জল

এসে পড়ছে। ছোট্ট কাপড়টা কোমর পেরিয়ে বুকটা ঢাকতে পারেনি। খাচ্ছে আর চোখের জল মুছছে। পুরুষটা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, ন রো! কাঁদিস্ নে।

খাওয়ার পরে মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল পুরুষটা। এখন সেই তরুণদিনের রাত্রের মতো ওদের দুজনের রক্তেই ভাঁটা ছেড়ে জোয়ার এল। জ্বলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।

শুধু কাছে ও দূরে কয়েকটি বিজলীবাতি বিচিত্র ঠেকতে লাগল এই প্রাগৈতিহাসিক আবহাওয়ায়।

তারও অনেকক্ষণ পর পুরুষটা গুন্‌গুন্ করতে লাগল।

যুগ যুগ পর আয়ীলবনি পবন-সুত মহাবীর—হই রামো!

তার তার রামা সুখে ঘুমোচ্ছে। নিকষ অন্ধকারে ঝরছে বাতাস ও বৃষ্টি।



মহাশ্বেতা দেবী

জন্ম : ১৯২৬, ঢাকায়। পেশা অধ্যাপনা। লেখায় মহাশ্বেতা দেবী সময়কে দলিলীকরণে বিশ্বাসী। একমাত্র সেভাবেই তাঁর নিজস্ব মতে উত্তরণ সম্ভব বৃহত্তর, আরো মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ কোন আকাশে। 'অমৃত সঞ্চয়' বইয়ের ভবানীশঙ্করে সেই উত্তরণ ঘটে, 'আঁধারমাণিক' বইয়ের এক সমগ্রসমাজ অষ্টাদশ শতকের অন্ধকার থেকে আলোকিত উনবিংশ শতকের সম্ভাবনায় নব জন্ম নেয়। 'কবিবন্দ্যঘটী' গ্রন্থের কবি মৃত্যুবরণে বাধ্য হয়ে বুঝিয়ে দেয় এ মৃত্যু মিথ্যা। কেননা সেই ছিল ভবিষ্যৎ। তাঁর আর একটি আলোড়ন তোলা বই 'হাজার চুরাশির মা'-তে সুজাতা একান্ত অরাজনীতিক। তবু সত্তরের দশকে নিহত পুত্রের মৃত্যুর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে তারও সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে ধিক্কার দিতে হয় এবং সমাজের দিকে তাকিয়ে তিনি এ হত্যার কোন ন্যায়সঙ্গতা খুঁজে পাননা। এই বিষয়বস্তু সমাজের বহু স্তরের মানুষের পরিপ্রেক্ষি'ত তাঁর বহু গল্পে ফিরে ফিরে এসেছে। 'কানাই বৈরাগীর মা' 'জলসত্র' 'জল' পিণ্ডদান প্রভৃতি গল্পের নাম করা যায়। ইদানীংকালের সাড়াজাগানো লেখা, অরণ্যের অধিকার, অপারেশান : বসাইটুডু, দ্রৌপদী। লীলা পুরস্কার এবং অমৃত পুরস্কারের সম্মান এই লেখিকাকে স্পর্শ করেছে বেশ কিছুকাল আগেই।

একজন লেখকের পক্ষে নিজের গল্পের বিচার বিবেচনা, বা শ্রেষ্ঠত্বের মাননির্ণয় কেবল দুরূহ কর্মই নয়, সর্বক্ষেত্রেই অসম্ভব। তদুপরি যে-লেখক অদ্যাবধি লিখন-কর্মে জীবিত এবং সৃষ্টির উত্তরণে চলমান, তাঁর পক্ষে কোন সময়সীমা নির্ধারণ করেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ নৈতিকতার বিচারেও অন্যায়, কারণ তখনও সেই লেখক পাঠক-জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ কারণেই সৎ ও বিবেকবান পাঠক-জনসাধারণের নির্বাচনের ওপরই শ্রেষ্ঠত্বের মাননির্ণয় কাম্য। এবম্প্রকার আলোচনা এবং বিচারের ওপর নির্ভর করেই এবারের শারদীয় (১৩৮৪) সংখ্যাগুলিতে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে থেকে বর্তমান গল্পটি আমার নির্বাচন।

এতদসত্ত্বেও লেখকের কিছু কৈফিয়ৎ দেবার দায় থেকেই যায়। 'স্তনদায়িনী' গল্পে যে পারিবারিক অবক্ষয়ের চিত্রণ, তা একই সঙ্গে সমগ্র দেশ ও কালের পক্ষে প্রযোজ্য। সমকালীন অর্থনীতিক অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতন আজ দেশকে যে ভাঙনের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে, তা যশোদার, একটি পরিবারের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠা এবং তাকে অক্ষমতার অসহায়তার মধ্যে বিসর্জন দেবার মধ্যে সম্ভবত প্রতীকায়িত হয় এবং যে ক্যানসার আজ সমগ্র স্বদেশে ক্রমশ বিস্তারমান, তার উদ্দেশ্যেও একই সঙ্গে ধ্বনিত হয় হয় ধিক্কারবাক্য। যশোদাই আমার দেশ, যে সম্বন্ধে বহুল ব্যবহৃত আর রিক্ততায় নিগৃহীত, এবং একজন বিবেকী লেখক তো তারই স্বার্থে তাঁর কলম তুলে ধরবেন, এটাই প্রাথিত।

মহাশ্বেতা দেবী
১২-৮-৭৮

স্তনদায়িনী

মাসিপিসি বনগাঁ-বাসী বনের মধ্যে ঘর
কখনো মাসি বলল না যে, খই মোয়াটা ধর।

যশোদার মাসি কখনো আদর করত, না অনাদর, তা যশোদার মনে পড়ে না। জন্ম থেকেই সে যেন কাঙালীচরণের বউ, হাতে গুণে জেয়ন্তে-মরন্তে কুড়িটা ছেলে-মেয়ের মা। মনেই পড়ে না যশোদার, কবে তার গর্ভে সন্তান ছিল না, মাথা ঘুরত না সকালে, কাঙালীর শরীর কুপি-জ্বলা আঁধারে তার শরীরকে ভূ-তাত্ত্বিকের মতো ড্রিল করত না। মাতৃত্ব সে সইতে পারে, কি পারে না, সে-হিসেব কোনোদিন খতিয়ে দেখতে সময় পায় নি যশোদা। নিরন্তর মাতৃত্বই ছিল তার বাঁচবার ও অসংখ্য জীবের সংসারকে বাঁচাবার উপায়। যশোদা পেশায় জননী, প্রফেশ্যনাল মাদার। বাবুদের বাড়ির বউ-ঝির মতো এমেচার মা ছিল না যশোদা। এ জীবন পেশাদারদের একচেটিয়া। এমেচার ভিখিরি-পকেটমার-গণিকা এ শহরে পাত পায় না, এ রাজ্যে। এমন কি ফুটপাথ ও পথের নেড়িকুত্তা, ডাস্টবিন-লোভী কাক—তারাও নবাগত এমেচারদের ঠাঁই দেয় না। যশোদা মাতৃত্বকে পেশা হিসেবে নিয়েছিল।

সে জন্যে দায়ী হালদারবাবুদের নতুন জামাইয়ের স্টুডিবেকার গাড়ি এবং বাবু-বাড়ির ছোট ছেলের ভরদুপুরে চালক হবার আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাটি ছেলেটির মনে হঠাৎ জেগেছিল। হঠাৎ-হঠাৎ ছেলেটির মনে ও শরীরে যেসব বাতিক চাগাত, তা তৎক্ষণাৎ পরিতৃপ্ত করতে না পারলে ছেলেটি ক্ষান্ত হতো না। হঠাৎ-হঠাৎ বাতিক-গুলি ওর দুপুরের নৈঃসঙ্গ্যেই চাগাত এবং বোগদাদের খলিফার মতো ওকে বান্দা খাটাত। এ পর্যন্ত সেকারণে সে যা-যা করেছে, তাতে ক'রে যশোদাকে মাতৃত্বের পেশা নিতে হয় নি।

এক দুপুরে হঠাৎ কামের তাড়নায় ছেলেটি তাদের রাঁধুনিকে আক্রমণ করে ও রাঁধুনিটির পেটে তখন ভরা ভাত, চোরা মুড়ো ও কচুশাকের ভার ছিল বলে, আলস্যে শরীর মন্থর ছিল বলে, রাঁধুনিটি, "লঃ, কি করবি কর্"—বলে চিতিয়ে পড়ে থাকে। অতঃপর ছেলেটির ঘাড় থেকে বোগদাদী ভূত নামে এবং সে—"ক্যারেও কইও না মাসি" বলে সানুশোচনা অশ্রু ফেলে। রাঁধুনিটি তাকে, "ইয়াতে আর কওন-বলনের আছে কি?"—বলে সত্বর ঘুমোতে যায়। সে কোনোদিনই কিছু বলে দিত না। কেন না তার শরীর ছেলেটিকে আকর্ষণ করেছে জেনে সে যথেষ্ট গর্বিত হয়েছিল। কিন্তু চোরের মন বোঁচকার দিকে। ছেলেটি পাতে অসংগত সংখ্যায় মাছ ও ভাজা দেখে মনে-মনে প্রমাদ গণে। মনে করে, রাঁধুনি তাকে ফাঁসালে সে কেলেঙ্কারিতে পড়বে। অতএব আরেক দুপুরে সে বোগদাদী জিহ্নের তাড়সে মায়ের আংটি চুরি করে, সেটি রাঁধুনীর বালিশের ওয়াড়ে ঢোকায় এবং শোর তুলে রাঁধুনিকে তাড়িয়ে ছাড়ে। আরেক দুপুরে সে বাবার ঘর থেকে রেডিও তুলে নিয়ে বেচে দিয়েছিল। দুপুরের সঙ্গে ছেলেটির এহেন আচরণের সংগতি খুঁজে পাওয়া তার মা-বাপের পক্ষেও মুশকিল, কেন না তার পিতা পঞ্জিকা দেখে হরিসাজের হালদারদের ঐতিহ্যমতে সন্তানদের গভীর নিশীথে

সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুত এ বাড়িতে ফটক পেরোলেই ষোড়শ শতক। পঞ্জিকা ও স্ত্রী-গ্রহণ এ বাড়িতে আজো আচরিত। কিন্তু এসব কথা বাই-লেন মাত্র। এ সকল দুপুরে-বাতিকের জন্যে যশোদার মাতৃত্ব পেশা হয় নি।

কোনো এক দুপুরে কাঙালীচরণ দোকানের মালিককে দোকানে বসিয়ে কোঁচার আড়ালে চারটি চোরাই সিঙাড়া জিলিপি নিয়ে ঘরে ফিরছিল। প্রত্যহই ফেরে। যশোদা ও সে ভাত খায়। ছানাপোনা তিনটি বিকেলে বাসি সিঙাড়া ও জিলিপি খায়। কাঙালীচরণ ময়রার দোকানে তাড়ু নাড়ে ও সিংহবাহিনীর মন্দিরের যাত্রীদের মধ্যে যারা 'হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র' হয় নি, সে সকল জাত্যভিমানী বামুনদের 'সদ্‌ব্রাহ্মণের প্রস্তুত লুচি তরকারি' খাওয়ায় লুচি ভেজে। প্রত্যহই সে ময়দাটা-আশটা সরায় ও সংসারে সুসার করে। দুপুর নাগাদ পেটে ভাত পড়লে যশোদার প্রতি তার বাৎসল্য ভাব জাগে এবং যশোদার স্ফীত স্তন নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে সে ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুর নাগাদ ঘরে ফিরতে ফিরতে কাঙালীচরণ অদূর সুখের কথা ভাবছিল এবং স্ত্রীর সুবর্তুল স্তনের কথা ভেবে সে স্বর্গসুখ পাচ্ছিল। কচি মেয়ে বিয়ে ক'রে তাকে কম খাটিয়ে প্রচুর খাওয়ালে আখেরে দুপুরে সুখ মেলে একথা চিন্তা ক'রে তার নিজেকে দূরদর্শী পুরুষবাচ্চা মনে হচ্ছিল। এহেন সময়ে বাবুদের ছেলে স্টু-ডিবেকার-সমেত ঘ্যাঁক ক'রে কাঙালীচরণকে বাঁচিয়ে তার পায়ের পাতা ও গোড়ালির ওপরের গোছ দুটি চাপা দিল।

নিমেষে লোক জমল। নেহাৎ বাড়ির সামনে দুর্ঘটনা নইলে 'রক্তদর্শন ক'রে ছেড়ে দিতুম' বলে নবীন পাণ্ডা চেঁচাতে লাগল। শক্তি-স্বরূপিণী মায়ের পাণ্ডা সে, দুপুরে রৌদ্ররসে তেতে থাকে। নবীনের গর্জনে হালদাররা যে-যে বাড়িতে ছিল, সবাই বেরুল। হালদারকর্তা সগর্জনে, "হালা আবুইদা ষাঁড়, তুমি ব্রহ্মহত্যা করবায়?" বলে ছেলেকে পেটাতে থাকলেন। ছোট জামাই তখন স্বীয় স্টুডিবেকার সামান্য আহত দেখে স্বস্তিতে হাঁপ ছাড়লেন এবং এই পয়সায়-ধনী, কালচারে-পাঁঠা শ্বশুরগোষ্ঠীর চেয়ে তিনি যে শ্রেষ্ঠতর মানুষ তা প্রমাণের জন্য মিহিন আদ্দির পাঞ্জাবির মতো ফিনফিনে গলায় বললেন, "লোকটা কি মারা যাবে? হাসপাতালে নিতে হবে না?" —কাঙালীর মনিবও ভিড়ের মধ্যে ছিল এবং পথে বিক্ষিপ্ত সিঙাড়া জিলিপি দেখে সে বলতে গিয়েছিল, "ছিঃ ঠাকুর! তোমার এই কাজ?"—এখন সে জিভ আগলাল এবং বলল, "তাই করুন সার!"—ছোট জামাই ও হালদারকর্তা কাঙালীচরণকে সত্বর হাসপাতালে নিলেন। কর্তার মনে আন্তরিক দুঃখ হল। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে, যখন তিনি ছাঁট লোহা বেচে-কিনে মিত্রশক্তির ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে সহায়তা করছেন —তখন কাঙালীচরণ কিশোর মাত্র। বামুন বলে তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা রক্তের পোকা ও সে কারণে ভোরে চাটুজ্যেবাবুকে না পেলে ছেলের বয়সী কাঙালীকে প্রণাম ক'রে তার ফাটা পায়ের ধুলো জিভে ঠেকাতেন। কাঙালী ও যশোদা তাঁর বাড়িতে পালেপার্বণে যায়-আসে এবং বউমারা পোয়াতি হলে যশোদাকে কাপড়-সিঁদুর পাঠানো হয়। এখন তিনি কাঙালীকে বললেন, "কাঙালী! ভাইব না বাপ! আমি থাকতে তোমার কষ্ট অইভ না।"—এখনি তাঁর মনে হল, কাঙালীর পায়ের পাতা দুটি কিমা হয়ে গেছে, ঠেকা পড়লে আর পায়ের ধুলো নিতে পারবেন না। ভেবে বড় দুঃখ হল তাঁর, এবং "কি করল হারামজাদায়" বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। হাসপাতালের ডাক্তারকে বললেন, "সবকিছু করেন! টাকার লিগ্যা ভাইবেন না।"

কিন্তু ডাক্তারেরা পায়ের পাতা ফিরে দিতে পারলেন না। খুঁতো বামুন হয়ে কাঙালী

ফিরে এল। ক্রাচ দুটি হালদারকর্তা করিয়ে দিলেন। ক্রাচ বগলে কাঙালী যেদিন ঘরে ফিরল, সেদিনই সে জানল, হালদার-বাড়ি থেকে প্রত্যহ যশোদার জন্য সিধা এসেছে। নবীন পাণ্ডা পাণ্ডা-কুলে সেজো। মায়ের ভোগের আড়াই-আনার অংশীদার এবং সেই দুঃখে সে নিনু হয়ে থাকত। সিনেমায় রামকৃষ্ণকে কয়েকবার দেখার পর সে অনুপ্রাণিত হয়ে সেইমতে দেবীকে "তুই, বেটি, পাগলী" বলে ও শাক্ত-মতে কারণ-বারি দ্বারা চেতনা নিষিক্ত ক'রে রাখে। সে কাঙালীকে বলল, "তোর জন্যে বেটির পায়ে ফুল চড়িয়েছিলুম। খেপী বললে, "কাঙালীর ঘরে আমার অংশ আছে, তার বরাতে ও বেঁচে উঠবে।" কাঙালী একথা যশোদাকে বলতে গিয়ে বলল, "অ্যাঁ? আমি যখন ছিলাম না, তুই ওই নব্‌নেটার সঙ্গে লটর-খটর কচ্ছিলি?" যশোদা তখনি পৃথিবীর দুই গোলার্ধের মাঝে কাঙালীর সন্দেহী মাথাটি চেপে ধরল ও বলল, "রোজ বাবুদের দুটো ঝি এখেনে শুত আমাকে পাহারা দিতে। নব্‌নেকে আমি আমল দিই? আমি না তোমার সতী স্ত্রী?"

বস্তুত হালদার-বাড়িতে গিয়েও কাঙালী তার স্ত্রীর প্রজ্বলন্ত সতীত্বমহিমার বহু কথা শুনল। যশোদা মায়ের মন্দিরে হত্যা দিয়েছে, সুবচনীর ব্রত করেছে, চেতলা গিয়ে সিদ্ধবাবার চরণ ধরেছে। অবশেষে সিংহবাহিনী স্বপ্নে ধাইয়ের বেশে বগলে ব্যাগ নিয়ে এসে তাকে বলেছেন, "ভাবিস নি। তোর সোয়ামি ফিরে আসবে।" কাঙালী একথা শুনে বিশেষ অভিভূত হল। হালদারকর্তা বললেন, "বুঝলা কাঙালী! হালার অবিশ্বাসীরা কয়, মায়ে স্বপ্ন দিব, তা ধাই সাইজা ক্যান্? আমি কই, তিনি সৃষ্টি করে মা অইয়া, ধাত্রী অইয়া পালন করে।"

এরপর কাঙালী বলল, "বাবু! ময়রার দোকানে কাজ করব কি ক'রে আর। কেরাচ নিয়ে তো বসে তাড়ু নাড়তে পারব না। আপনি ভগবান। কত লোককে কতভাবে অন্ন দিচ্ছেন! আমি ভিক্ষে চাই নি। এট্টা কাজের ব্যবস্থা করে দিন।"

হালদারবাবু বললেন, "হ কাঙালী! তোমার লিগ্যা জায়গা দেইখ্যা থুইছি। আমার বারিন্দায় ছাউনি দিয়া এট্টা দোকান কইরা দিমু। সামনে সিংহবাহিনী! যাত্রী আসে, যাত্রী যায়। তুমি মুড়ি-মুড়খি, চিড়া-বাতাসার দোকান দাও। অহন বারিতে বিয়া লাগছে। আমার সপ্তম পুত্র, হেই আবাইগার বিয়া। যদ্দিন না দোকান অয়, তদ্দিন সিধা যাইবে।"

একথা শুনে কাঙালীর মন বর্ষা সমাগমে বাদুলে পোকার মতো উড্ডীন হল, ও ঘরে ফিরে সে যশোদাকে বলল, "সেই যে কালিদাসের শোলোক আছে, নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে? —আমার কপালে তাই হল রে! বাবু বলছে, ছেলের বিয়ে মিটলে রকে দোকান ক'রে দেবে। যদ্দিন না দিচ্ছে, তদ্দিন সিধে পাঠাবে। ঠ্যাং থাকলে কি এরকমটা হতো? সবই মায়ের ইচ্ছে রে!"

ক্রাচ খটখটিয়ে কাঙালী সুসংবাদটি আপামরকে বিতরণ করল। ফলে তার প্রাক্তন মনিব, নবীন পাণ্ডা, ফুলদোকানের কেষ্ট মহান্তি, মায়ের বাঁধা ঢাকী উল্লাস, সকলে বলল, "আহা! কলি বললে তো হয় না! মায়ের তল্লাটে পাপের পতন, পুণ্যের জয়, এ হতেই হচ্ছে। নইলে কাঙালীর পা খোয়া যাবে কেন? আর হালদারকর্তা বা বামুনের মন্যির ভয়ে এত কথা স্বীকার যাবে কেন? সবচে বড় কথা, যশোদাকে বা মা ধাই বেশে দেখা দেবে কেন? সবই মায়ের ইচ্ছে।"

এ ঘোর কলিতে পাঁচের দশকে কাঙালীচরণ পতিতুণ্ডকে ঘিরে দেড়শো বছর আগে স্বপ্নাদেশে প্রাপ্তা দেবী সিংহবাহিনীর ইচ্ছাসকল এভাবে পাক খাচ্ছে, তা দেখে সকলে

যথোচিত বিস্মিত হয়। হালদারকর্তার হৃদ্‌-পরিবর্তন, সেও মায়েরই ইচ্ছে। হালদার-কর্তা পাত্র না দেখে দয়া করেন না। তিনি স্বাধীন ভারতের বাসিন্দা, যে ভারত মানুষে-মানুষে, রাজ্যে-রাজ্যে, ভাষায়-ভাষায়, রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বৈদিকে, উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়েস্থে, কাপ-কুলীনে প্রভেদ করে না। কিন্তু তিনি পয়সা করেছেন ব্রিটিশ আমলে, যখন ডিভাইড অ্যান্‌ড রুল ছিল পলিসি। হালদারকর্তার মানসিকতা তখনই গঠিত হয়ে গেছে। ফলে তিনি পাঞ্জাবি-উড়িয়া-বিহারি-গুজরাটি-মারাঠি-মসলমান, কারুকে বিশ্বাস করেন না এবং দুর্গত বিহারি শিশু বা অনাহারে কাতর উড়িয়া ভিখারি দেখলে তাঁর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি গোপাল গেঞ্জির নিচে অবস্থিত, চর্বিতে সুরক্ষিত হৃৎপিণ্ডে করুণার ঘামাচি আদপে চুলকোয় না। তিনি হরিসালের সুসন্তান। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মাছি দেখলেও তিনি "আঃ! দ্যাশের মাছি আছিল রিস্টপুস্ট—ঘটির দ্যাশে হকলডি চিমড়া-চামসা" বলে থাকেন। সেই হালদারকর্তা গাঙ্গেয় কাঙালী-চরণকে কেন্দ্র ক'রে করুণাঘন হচ্ছেন, এ দেখে মন্দিরের চারিদিকে সকলেই বিস্মিত হয় এবং কিছুদিন ধরে লোকের মুখে-মুখে এই কথাই ফেরে। হালদারকর্তা এমন ঘোর দেশপ্রেমী যে নাতি, ভাইপো, ভাগ্নেরা দেশনেতাদের জীবনী পাঠ্যপুস্তকে পড়লে কর্মচারীদের বলেন, "হঃ! ঢাকার পোলা, মইমনসিঙের পোলা, যশুইরা পোলা, ইয়াগর জীবনী পড়ায় ক্যান্‌? হরিসাইলা অইল দধীচির হাড়ে তৈয়ার। ব্যাদ উপ-নিষদ হরিসাইলার লিখা, এ্যাও একদিন প্রকাশ পাইব।" তাঁর কর্মচারীরা তাঁকে এখন বলে, "আপনার চেইন্‌জ অফ হার্ট হইত্যাছে, ঘটির লিগ্যা আপনার এই দয়া, ইয়ার পাছে দ্যাখবেন ঈশ্বরের কুন্‌ বা পার্পাস আছে।" কর্তা একথায় হলাদিত হন এবং "ব্রাহ্মণের কি ঘটি-বাঙাল অয়? গলায় উপবীত থাকলে হ্যায় পাইখানায় বইয়া রইলেও মাইন্য দিতে অইব" বলে উচ্চ হাস্য করেন।

চতুর্দিকে এভাবে মায়ের ইচ্ছার প্রভাবে করুণা-মায়ামমতা-দয়ার সুবাতাস বইতে থাকে এবং নবীন পাণ্ডা কয়েকদিন ধরে সিংহবাহিনীর কথা যতবারই ভাবতে যায়, যশোদার উত্তুঙ্গস্তনা, গুরুনিতম্বা শরীর তার চোখে ভাসে এবং মা যশোদাকে কেমন ধাই সেজে স্বপন দিলেন, তাকে যশোদা সেজে স্বপন দিচ্ছেন কিনা সেকথা ভেবে তার শরীরে মন্দ উত্তেজনা জাগে। আট-আনার পাণ্ডা তাকে বলে, "মেয়েছেলের এ রোগ হলে বলে প্যাঁদ রোগ, বেটাছেলের হলে বলে ম্যাদ রোগ। তুই পেচ্ছাপ করার সময় কানে শ্বেত অপরাজিতার শেকড় বাঁদ্‌।"

একথা নবীনের মনে নেয় না। একদিন সে কাঙালীকে বলে, "মায়ের ছেলে, শক্তি নিয়ে র‍্যালা করব না। তবে একটা বুদ্ধি মাথায় এয়েছে। বোষ্টম ভাব নিয়ে র‍্যালা করতে বাধা নেই। তোকে বলি, স্বপ্নে গোপাল পা একখানা। আমার পিসি শ্রীক্ষেত্তর থেকে গোপাল এনিছিল পাতরের। সেটা তোকে দিই। স্বপ্নে পেইছিস বলে প্রচার দে। দেকবি দুদিনে রমরমা হবে, ঝমঝমিয়ে পয়সা পড়বে। পয়সার জন্যে শুরু কর্‌, পরে মনে গোপাল-ভাব আসবে।"

কাঙালী বলে, "ছি দাদা! ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তামাশা করতে আছে?"

নবীন তাকে, "তবে মর্‌গা যা!" বলে তাড়া দেয়। পরে দেখা যায়, নবীনের কথা শুনলে কাঙালী ভাল করত। কেন না, হালদারকর্তা হঠাৎ একদিন হার্টফেল্ল ক'রে মরে যান। কাঙালী ও যশোদার মাথায় শেক্ষপীরের ওয়েল্‌কিন ভেঙে পড়ে।

কাঙালীকে পথে বসিয়ে যান হালদারকর্তা। কাঙালীকে ঘিরে ভায়া-মিডিয়া হালদারকর্তা সিংহবাহিনীর যেসব ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছিল, তা প্রাক্‌-ভোট রাজনীতিক

দল-প্রদত্ত প্রজ্বলন্ত প্রতিশ্রুতির মতো শূন্যে মিলায় ও নিরুদ্দেশ-যাত্রার নায়িকার মতো রহস্যজালের মায়ায় অদেখা হয়। কাঙালী ও যশোদার রঙিন স্বপ্ন-ফানুসটিতে য়ুরোপীয় ডাইনির বডিকিন ফুটকে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী আতান্তরে পড়ে। ঘরে গোপাল, নেপাল ও রাধারানী খাবার তরে আখ্ খুটে বায়না ধরে ও মায়ের মুখ খায়। শিশুদের এই 'ওদনের তরে' কান্নাকাটি খুবই স্বাভাবিক। কাঙালীচরণের চরণ খোয়া যাবার পর থেকে ওরা প্রত্যহ হালদার-বাড়ির সিধায় ভালমন্দ খেয়েছে। কাঙালীও ভাতের তরে কাতর হয় এবং মনে গোপাল-ভাব জাগিয়ে যশোদার বুকে মুখ খুঁশতে গিয়ে ধমক খায়। যশোদা একেবারে ভারতীয় রমণী, যে-রমণীর যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারহীন স্বামীভক্তি ও সন্তানপ্রেমের কথা, অস্বাভাবিক ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা, সতী-সাবিত্রী-সীতা থেকে শুরু ক'রে নিরুপা রায় ও চাঁদ-ওসমানি পর্যন্ত সকল ভারতীয় নারী জনমানসে জাগিয়ে রেখেছেন। এহেন স্ত্রীলোককে দেখেই সংসারের ন্যালা-মাকড়ারা বোঝে, ভারতের সেই ঐতিহ্য প্রবহমান---বোঝে এদের কথা মনে রেখেই এই সব আপ্তবাক্য রচিত হয়েছে :

"স্ত্রীলোকের জান যেন কচ্ছপের প্রায়"---
"বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না"---
"পুড়বে নারী উড়বে ছাই
তবে নারীর গুণ গাই"---

বস্তুত, বর্তমান দুরবস্থার জন্য যশোদার একবারও স্বামীকে দুষতে ইচ্ছে যায় না। শিশুদের তরে যেমন, কাঙালীর তরেও তেমনি মমতা তার বুকে উছলে ওঠে। পৃথিবী হয়ে গিয়ে ফলে-শস্যে অক্ষম স্বামী ও নাবালক সন্তানদের ক্ষুধা মিটাতে ইচ্ছা যায়। যশোদার এই স্বামীর প্রতি বৎসল ভাবটির কথা জ্ঞানী-মুনিরা লিখে যান নি। তাঁরা প্রকৃতি ও পুরুষ এইভাবে নারী-পুরুষকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সে তাঁরা করেছেন আদ্যি যুগে---যখন অন্য দেশ থেকে তাঁরা এই পেনিনসুলায় প্রবেশ করলেন। ভারতের মাটির গুণ এমনি, যে এখানে রমণীরা সবাই জননী হয়ে যায় এবং পুরুষরা সবাই গোপাল-ভাবে আপ্লুত থাকে। সকল পুরুষই গোপাল ও সকল রমণী নন্দরানী, এ ভাবটি যাঁরা অস্বীকার ক'রে নানারূপ 'ইটার্নাল শী'---'মোনালিসা'---'লা পাসিওনারিয়া' ---সিমন দ্য ব্যোভোআর---ইত্যাদি পছন্দমতো কারেন্ট পোস্টার পুরনো পোস্টারের ওপরে সাঁটতে চান ও মেয়েদের সেভাবে দেখতে চান, তাঁরাও এ ভারতের ছানাপোনা। তাই দেখা যায় শিক্ষিত বাবুদের এ সকল অভীপ্সা বাইরের মেয়েছেলেদের জন্যে। ঘরে ঢুকলে তাঁরা বিপ্লবিনীদের মুখে ও ব্যবহারে নন্দরানীকেই চান। প্রসেসটি খুবই জটিল। এটি বুঝেছিলেন বলে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নায়কদের সতত চারটি বেশি ক'রে ভাত খাইয়ে দিতেন। শরৎচন্দ্রের এবং অন্যান্য অনুরূপ লেখকদের লেখার আপাত-সরলতা আসলে খুব জটিল এবং সন্ধেবেলা শান্ত মনে বেলের পানা খেয়ে চিন্তা করার কথা। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরাই লেখাপড়া ও চিন্তাশীলতার কারবার করেন, তাঁদের জীবনে আমাশার প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং সে কারণে বেল ফলটিতে তাঁদের সমধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বেলফল-থানকুনি-বাসকপাতাকে সমধিক গুরুত্ব দিই না বলে আমরা যে কত কি হারাচ্ছি তা নিজেরা বুঝি না।

যা হোক, যশোদার জীবনকথা বলতে বসে বারংবার বাই-লেনে ঢোকার অভ্যেস ঠিক নয়। পাঠকের ধৈর্য কিছু কলকাতার পথঘাটের ফাটল নয় যে দশকে-দশকে

বেড়ে চলবে। আসল কথা হল, যশোদা সমধিক ফাফরে পড়ল। কর্তার শ্রাদ্ধ চলার কালে তারা লুসেপুসে খেল বটে, কিন্তু সব চুকেবুকে গেলে যশোদা রাধারানীকে বুকে ধরে ওবাড়িতে গেল। বাসনা, গিন্নিকে বলেকয়ে তাঁর নিরিমিষ হেঁসেলের রান্নার কাজ চেয়ে নেবে।

গিন্নির বুকে কর্তার শোক বেজেছিল খুব। কিন্তু উকিলবাবু জানিয়ে গেছেন, কর্তা এই বাড়ির মালিকানা, চালের আড়তের স্বত্ব তাঁকেই দিয়ে গেছেন। তিনি সেই বলে বুক বেঁধে আবার সংসার-সাম্রাজ্যের হাল ধরেছেন। মাছটা-মুড়োটা বলে বড় কষ্ট হয়েছিল। এখন দেখছেন উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি, গাঙ্গুরামের দই-সন্দেশ, ঘন ক্ষীর ও মর্তমান কলা খেয়েও কোনোমতে শরীরটা টিকিয়ে রাখা চলে। গিন্নি জলচৌকি আলো ক'রে বসে আছেন। কোলে এক ছ-মেসে ছেলে, গিন্নির নাতি। এ পর্যন্ত ছয় ছেলের বিয়ে হয়েছে ও পঞ্জিকায় যেহেতু প্রায় মাসেই স্ত্রীগ্রহণ অনুমোদিত, সেহেতু গিন্নির বাড়িতে একতলায় সার-সার আঁতুড়ঘর প্রায়শ ফাঁক যায় না। লেডি ডাক্তার ও সরলা ধাই এ বাড়ি ছাড়া হয় না। গিন্নির মেয়ে ছয়টি। তারাও দেড়বছুরে পোয়াতি। তাই কাঁথা-কানি-ঝিনুক-বোতল-রবারক্লথ-বেবিজন্সন্ পাউডার-স্নানের গামলার এপিডেমিক লেগেই থাকে।

গিন্নি নাতিকে দুধ খাওয়াবার চেষ্টায় জেরবার হচ্ছেন ও যশোদাকে দেখে স্বস্তি পেয়ে যেন বললেন, "মা আমার ভগবান হইয়া আসছ! এ্যারে দুধ দাও মা, পা ধরি। মায়ের অসুখ—তা এমুন পোলা যে বুতল মুখে ধরে না।" যশোদা তখনি ছেলেকে দুধ দিয়ে শান্ত করল। গিন্নির সনির্বন্ধ অনুরোধে যশোদা রাত ন-টা অবধি ওবাড়িতে থাকল এবং গিন্নির নাতিকে দফায় দফায় দুধ দিল। তার সংসারের জন্যে রাঁধুনি বাম্নী ভাত-তরকারি গামলা ভরে দিয়ে এল। ছেলেকে দুধ দিতে দিতেই যশোদা বলল, "মা! কর্তা তো কত কথাই বলিছিলেন। তিনি নেই, তাই সেকথা আর ভাবি না। কিন্তু মা! তোমার বামুন-ছেলের পা দুখানা নেই। আমার জন্যে ভাবি না। কিন্তু সোয়ামি-ছেলের কথা ভেবে বলছি, যা হয় এট্টা কাজ দাও। নয় তোমার সোম্সারে রান্না কাজ দিলে?"

"দেখি মা! চিন্তা কইরা দেখি।" গিন্নি কর্তার মতো বামুন-ভজা নন। তাঁর ছেলের দুপুরে বাই চাগানো দোষে কাঙালীর পা গেছে একথা তিনি পুরো মানেন না। নিয়তি কাঙালীরও, নইলে খটখটে রোদে ফিকফিক ক'রে হেসেহেসে পথ ধরে সে যাচ্ছিল কেন? তিনি মুগ্ধ ঈর্ষায় যশোদার ম্যামাল প্রোজেকশান দেখেন ও বলেন, "কামধেনু কইরা তোমায় পাঠাইছিল বিধাতা। বাঁট টানলেই দুধ! আমার ঘরে যেগুলা আনছি, তাদের এ্যার সিকিভাগ দুধ-অ বুঁঠায় নাই!"

যশোদা বলে, "সে আর বলতে মা! গোপাল ছেড়ে দিল, বয়স হল তিনবছর। এটা তখনো পেটে আসে নি। তাতেও দুধে যেন বান ডাকত। কোত্থেকে আসে মা? খাওয়া নেই, মাথা নেই!"

একথা নিয়ে রাতে মেয়েমহলে প্রচুর কথা হয় এবং রাতে ব্যাটাছেলেরাও একথা শোনেন। মেজ ছেলে, যাঁর স্ত্রী অসুস্থ এবং যাঁর ছেলে যশোদার দুধ খেল, তিনি সবিশেষ স্ত্রৈণ। অন্য ভায়েদের সঙ্গে তাঁর তফাত হল, ভাইরা পাঁজি দেখে সুদিন পেলেই সপ্রেমে বা অপ্রেমে বা বিরক্ত মনে বা কারবারে গুণ-চটের কথা ভাবতে ভাবতে সন্তান সৃজন করেন। মেজছেলে একই ফ্রিকোয়েন্সিতে স্ত্রীকে গর্ভবতী করেন, কিন্তু তার পেছনে থাকে সুগভীর প্রেম। স্ত্রী বারবার গর্ভবতী হন, সে ভগবানের

হাত। কিন্তু সেইসঙ্গে স্ত্রী যাতে সুন্দরী থাকেন, সেজন্যেও মেজছেলে আগ্রহী। ক্রমান্বয় গর্ভাধান ও সৌন্দর্যের কমবিনেশন কিভাবে করা যায়, একথা তিনি অনেক ভেবে থাকেন, কিন্তু কূল পান না। মেজছেলে আজ স্ত্রীর মুখে যশোদার সারপ্লাস দুধের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ বলেন, "পাইছি পথ।"

"কিসের পথ?"

"এই, তোমার কষ্ট বাচাইবার পথ।"

"কেম্‌তে? আমার কষ্ট যাইব চিতায় ওঠলে। বছুর-বিয়ানীর আর শরীল সারে?"

"সারব, সারব, ভগবানের কল হাতে পাইছি যে! বছুর বিয়াইবা, দ্যাহও থাকব।"

স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ হল। স্বামী সকালে গিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলেন ও ঘুচুর-ঘুচুর ক'রে কথা কইলেন। গিন্নি প্রথমটা গাঁইগুঁই করতে লাগলেন, কিন্তু তারপরে স্বগত-চিন্তা করতে করতে বুঝলেন প্রস্তাবটি লাখ টাকার। বউরা এসেছে, বউরা মা হবে। মা হলে ছেলেকে দুধ খাওয়াবে। যেহেতু যতদিন সম্ভব, ততদিনই মা হবে—সেহেতু ক্রমান্বয়ে দুধ খাওয়ালে চেহারা ঝটকাবে। তখন যদি ছেলেরা বারমুখো হয়, বা বাড়ির ঝিদের ওপর উৎপাত করে, গিন্নি কিছু বলতে পারবেন না। ঘরে পাচ্ছে না বলে বাইরে যাচ্ছে—হক কথা। তাই যশোদা যদি কচিকাঁচাদের দুধ-মা হয়, তাহলে নিত্য সিধা, পুজোয় পার্বণে কাপড়, মাসান্তে কিছু টাকা দিলেই কাজ হয়। গিন্নির বাড়িতে আজ চাপড়াষষ্ঠী, কাল সুবচনী, পরশু মঙ্গলচণ্ডী ব্রত লেগেই থাকে। তাতেও যশোদাকে বামুন-এয়ো করা চলবে। তাঁর ছেলের কারণে যশোদার এত খোয়াব, পাপও স্খালণ হবে।

যশোদা তাঁর প্রস্তাবে হাতে মন্ত্রীত্ব পেল। নিজের স্তন দুটিকে বড় মহার্ঘ মনে হল তার। রাতে কাঙালীচরণ খুনসুড়ি করতে এলে সে বলল, "দেখ! এখন এর জোরে সংসার টানব। বুঝেশুনে ব্যবহার করবে।" কাঙালীচরণ সে রাতে গাঁইগুঁই করল বটে, কিন্তু সিধাতে চাল-ডাল-তেল-আনাজের বহর দেখে তার মন থেকে গোপাল-ভাবটি নিমেষে চলে গেল। শ্রদ্ধা-ভাবে সে উদ্দীপিত হল এবং যশোদাকে বুঝিয়ে বলল, "পেটে সন্তান থাকলে তবে তো তোর বুকে দুধ আসবে। এখন সেকথা ভেবেই তোকে কষ্ট করতে হবে। তুই সতীলক্ষ্মী। নিজেও পোয়াতি হবি, পেটে ছেলে ধরবি, বুকে পালন করবি, এ ত জেনেই মা তোকে ধাইবেশে দেখা দিইছিল।"

যশোদা এ কথার যাথার্থ্য বুঝল ও সাশ্রুচোখে বলল, "তুমি স্বামী, তুমি গুরু। যদি বিস্মরণ হয়ে না-না করি, তুমি সোঙ্‌রে দিও। কষ্ট আর কি বল? গিন্নি মা কি তেরটি বিয়োয় নি? গাছের কি ফল ধরতে কষ্ট হয়?"

অতএব সেই নিয়মই বহাল রইল। কাঙালীচরণ পেশাদারী পিতা হল। যশোদা হল প্রফেশানে মা। বস্তুত যশোদাকে দেখলে এখন সেই সাধকমার্গের গানটির গভীরতা অবিশ্বাসীরও মনে জাগে। গানটি হল:

মা হওয়া কি মুখের কথা?
শুধু প্রসব কল্লে হয় না মাতা।

হালদার-বাড়ির একতলায় চক্‌মেলানো উঠোনের চারধারে বড়-বড় ঘরে বারো-চোদ্দটি সুলক্ষণা গাভী হামেশা হামেহাল বজায় থাকে। দুজন ভোজপুরী গোমাতা জ্ঞানে তাদের পরিচর্যা করে। খোল-ভুসি-খড়-ঘাস-গুড় পাহাড়-পাহাড় আসে। হাল-

দারগিন্নি বিশ্বাস করেন, গরু খাবে যত, দুধ দেবে তত। যশোদার জায়গা এ বাড়িতে এখন গো-মাতাদের ওপরে। গিন্নির ছেলেরা ব্রহ্মাবতার হয়ে প্রজাদের সৃষ্টি করে। যশোদা প্রজা প্রপালিকা। তার দুগ্ধসঞ্চয় যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে হালদারগিন্নি কড়া নজর রাখলেন। কাঙালীচরণকে ডেকে বললেন, "হ্যাঁ বামুন ছেলে? দোকানে ত তাড়ু নাড়তা, ঘরে পাকসাকের ভারটা নিয়া অরে আরাম দেও। নিজের দুটা, এখানে তিনটা, পাঁচটারে দুধ দিয়া ঘরে গিয়া পাকসাক করতে পারে?"

কাঙালীচরণের জ্ঞাননেত্র এভাবে খুলে গেল এবং নিচে এলে ভোজপুরীদ্বয় তাকে খৈনি দিয়ে বলল, "মা জী ত ঠিকহি বলেছে। হামরা গৌ-মাতার ইতনা সেবা করি —তা তুর বহু তো জগৎমাতা আছে।"

এরপর থেকে কাঙালীচরণ বাড়ির রান্নার ভার তুলে নিল হাতে। ছেলেমেয়েদের ক'রে তুলল কাজের সাগরেদ। ক্রমে সে থোড়ঘন্ট, কলাই ডাল, মাছের অম্বল রাঁধতে বড়ই সেয়ানা হল এবং সিংহবাহিনীর প্রসাদী পাঁঠার মাথার মুড়িঘন্ট রেঁধে নবীনকে খাইয়ে-খাইয়ে সেই দুর্দান্ত গেঁজেল মাতালকে নিজের বশীভূত ক'রে ফেলল। ফলে নবীন কাঙালীকে নকুলেশ্বর শিবের মন্দিরে ঢুকিয়ে দিল। যশোদা প্রত্যহ রাঁধা ভাতব্যঞ্জন খেয়ে পি. ডব্ল্যু অফিসারের ব্যাংক-অ্যাকাউন্টের মতো ফুলে ফেঁপে উঠল। তার ওপর গিন্নিমা তাকে দুধ উঠ্‌নো ক'রে দিলেন। পোয়াতি হলে তার জন্যে আচার-ঝালনাড়ু-মোরব্বা পাঠাতে থাকলেন।

এইভাবে অবিশ্বাসীদেরও প্রত্যয় জন্মাল, যশোদাকে সিংহবাহিনী এই কারণেই বগলে ব্যাগ নিয়ে ধাই হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। নইলে নিরন্তর গর্ভধারণ, সন্তান-প্রসব, অপরের ছানাপোনাকে গাভীর মতো অকাতরে দুগ্ধদান, কে কবে শুনেছে বা দেখেছে? নবীনের মন থেকেও মন্দ ভাব চলে গেল। পাঁঠার মাথা, কারণ-বারি, গাঁজা, এহেন উগ্র জিনিস খেয়েও তার শরীর আর তাতল না। মনে আপনা হতেই ভক্তিভাব এল। যশোদাকে সে দেখা হতেই "মা! মা! মাগো!" বলে ডাকতে থাকল। চতুর্দিকে সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য বিষয়ে বিশ্বাস পুনর্জাগ্রত হল এবং অঞ্চলটির বাতাসে দেবীমাহাত্ম্যের ইলেকট্রিফাইং প্রভাব বইতে থাকল।

যশোদা বিষয়ে সকলের ভক্তিভাব এমন প্রখর হল যে বিয়ে-সাধ-অন্নপ্রাশন-পইতেতে সকলে তাকে ডেকে প্রধানা এয়োর সম্মান দিতে থাকল। যশোদার ছেলে বলে নেপাল-গোপাল-নেনো-বোঁচা-পটল ইত্যাদিকে সবাই সেই চোখে দেখতে থাকল, এবং যে যেমনটি বড় হল, পইতে নিয়ে মন্দিরে যাত্রী ধরে আনতে থাকল। রাধারানী, আলতা-রানী, পদ্মরানী, ইত্যাদি মেয়েদের জন্যে কাঙালীকে বর খুঁজতে হল না। নবীন আশ্চর্য তৎপরতায় মেয়েদের বর জুটিয়ে দিল ও সতী মায়ের সতী কন্যারা যে যার শিবের ঘর করতে গেল।

হালদার-বাড়িতে যশোদার আদর বেড়ে গেল। স্বামীরা খুশি, কেন না এখন আর তাদের পাঁজি উলটোতে দেখলে বউদের হাঁটুতে ঠকঠকি লাগে না। তাঁদের গোপালরা যশোদার স্তন্যে লালিত হচ্ছে বলে তাঁরা যথেচ্ছ গোপাল হতে পারেন বিছানায়। বউদের 'না' বলবার মুখ রইল না। বউরা খুশি। কেন না দেহের ডোলটি ভাল থাকল। তারা যথেচ্ছ মেম কাটের জামা ও বডিস্ পরতে পারল। হোলনাইট সিনেমা দেখে শিব-রাত্তির করার সময়ে ছেলেকে দুধ দিতে হল না। এ সবই সম্ভব হল যশোদার জন্যে। ফলে যশোদার মুখ খুলল এবং শিশুদের নিরন্তর স্তন দিতে দিতে গিন্নির ঘরে বসে সে ফুট কাটতে থাকল, "মেয়েছেলে বিয়োবে, তার জন্যে ওষুধ রে, ঝাড়পোঁছার দেখা

রে, ডাক্তার দেখানো রে। আদিখ্যেতা! এই তো আমি! বছর-বিউনি হইছি। তাতে কি শরীর চস্‌কাচ্ছে, না দুধ কমছে? কি ঘেন্না মা! শুনছি না কি ইঞ্জিশান দিয়ে সব দুধ শুকিয়ে ফেলছে। এমন কথাও শুনি নি কখনো!"

হালদার-বাড়ির ছেলেদের মধ্যে যারা কিশোর, তাদের বাপ-জ্যেঠা-কাকারা গোঁফ গজাতেই ঝিদের আওয়াজ দিত। দুধ-মার দুধে তারাও মানুষ, তাই দুধ-মার বন্ধু ঝি-রাঁধুনিকে তারা এখন মাতৃভাবে দেখতে থাকল এবং মেয়ে-ইস্কুলের চারপাশে হাঁটাহাঁটি শুরু করল। ঝিয়েরা বলল, "যশি! ভগবতী হয়ে এইছিলি তুই! তো' হতে বাড়ির হাওয়া পালটাল?"

ছোট ছেলে যখন একদিন উবু হয়ে বসে যশোদার দুগ্ধদান দেখছে, তখন যশোদা বলল, "তুমি বাছা, আমার লক্ষ্মী! বামুনের ঠ্যাং খুঁতো করিছিলে বলে তো এতসব হল? বল দেখি কার ইচ্ছেয় হল?"

ছোট হালদার বলল, "সিংহবাহিনীর ইচ্ছে!"

তার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল, ঠ্যাং নেই, তবু কাঙালীচরণ ব্রহ্মা হয় কি উপায়ে? কথাটা ঠাকুরদেবতার দিকে চলে গেল বলে, সেও প্রশ্নটি ভুলে গেল।

সবই সিংহবাহিনীর ইচ্ছে!

৩

পঞ্চাশের দশকে কাঙালীর ঠ্যাং কাটা যায়, আমাদের কাহিনী এই সময়ে পোঁছেছে। পঁচিশ বছরে, থুড়ি তিরিশ বছরে, যশোদা কুড়ি বার আঁতুড়ে ঢুকেছে। শেষের দিকের মাতৃত্বগুলো বেফয়দা যায়, কেন না, কেমন ক'রে যেন হালদার-বাড়িতে নতুন হাওয়া ঢুকে পড়ল। ওই পঁচিশ না তিরিশ বছরের গণ্ডগোলটুকু সেরে নিই। কাহিনী যখন শুরু হয় তখনি যশোদা তিন ছেলের মা ছিল। তারপর তার সতেরো বার সন্তান-সম্ভাবনা হয়। হালদার গিন্নিও মরে গেলেন। তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল, তাঁর শাশুড়ির যেমনটি হয়েছিল, তেমনটি বউদের কারো হোক। কুড়িটি সন্তান হলে আবার স্বামী-স্ত্রীর বিয়ে হবার নিয়ম ছিল বংশে। কিন্তু বউমারা বারো-তেরো-চোদ্দতে ক্ষান্ত দিল। দুর্বুদ্ধিবশত তারা স্বামীদের বোঝাতে সক্ষম হল এবং হাসপাতালে গিয়ে ব্যবস্থা ক'রে এল। এ সবই নতুন হাওয়ার কুফলে ঘটল। কোনো যুগেই জ্ঞানী পুরুষ বাড়িতে হাওয়া ঢুকতে দেন না। দিদিমার কাছে শুনেছি জনৈক ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে এসে 'শনিবারের চিঠি' পড়ে যেতেন। কদাচ ঘরে বইটি ঢোকাতেন না। বলতেন, "বউ-মা-বোন যে ওই কাগজ পড়বে, সেই বলবে আমি নারী! মা নই, বোন নই, বউ নই।" ফলে কি ঘটবে, তা জিগ্যেস করলে বলতেন, "চটি পরে ভাত রাঁধবে।" নতুন হাওয়ার প্রকোপে অন্দরে অশান্তি হয়, এ চিরকালের নিয়ম।

হালদার-বাড়িতে চিরকাল ষোড়শ শতক চলছিল। কিন্তু সহসা বাড়িতে মেম্বর সংখ্যা অগণিত হল বলে ছেলেরা যে-যার মতো নতুন বাড়ি বানিয়ে সটকে পড়তে থাকল। সবচেয়ে আপত্তির কথা, মাতৃত্ব বিষয়ে গিন্নির নাতবৌরা একেবারে উলটো হাওয়া খেয়ে ঘরে ঢুকল। বৃথাই গিন্নি বললেন, চালের অভাব, টাকার অভাব নেই। কর্তার বড় সাধ ছিল হালদারদের দিয়ে অর্ধেক কলকাতা ভরে ফেলেন। নাতবৌরা নারাজ। তারা বুড়ির দাবড়ি অগ্রাহ্য ক'রে স্বামীদের নিয়ে কর্মস্থলে ছুটল। এরই

মধ্যে সিংহবাহিনীর মন্দিরের পাণ্ডাদের মধ্যে বিষম কলহ হওয়াতে কে বা কাহারা যেন দেবীর মূর্তি ঘুরিয়ে দিল। মা মুখ ফিরিয়েছেন একথা শুনে গিন্নির বুক ভেঙে গেল এবং মনোদুঃখে ভরা জ্যৈষ্ঠে অসংগত পরিমাণে কাঁঠাল খেয়ে দাস্তবমি হয়ে তিনি মরে গেলেন।

৪

গিন্নি মরেই খালাস পেলেন, কিন্তু জ্যান্ত থাকার জ্বালা মরণ হতে বেশি। গিন্নির মৃত্যুতে যশোদার আন্তরিক দুঃখ হল। বয়স্ক মানুষ পাড়ায় মরলে বাসিনীর মতো সুবিন্যাসে কেউ কাঁদতে পারে না, বাসিনী এ বাড়ির পুরনো ঝি। কিন্তু যশোদার ভাতের থালাটি গিন্নির সঙ্গে বিসর্জন গেল, তাই যশোদা আরো সুবিন্যাসে কেঁদে সকলকে অবাক ক'রে দিল।

বাসিনী কাঁদল, "অ ভাগ্যিমানী মা! মাথার চুড়োটি খসতে কত্তা হয়ে সকলেরে যে আগলে রেকেছিলে মা! কার পাপে চলে গেলে মা গো! ওগো, আমি যে বন্নু, অত ক্যাঁটাল খেওনি, তা মোর কতা যে মোটে নিলে না গো মা!"

যশোদা বাসিনীকে দম নিতে সুযোগ দিল ও সেই বিরতিতে কেঁদে উঠল, "কেন রইবে মাগো! ভাগ্যিমানী তুমি, পাপের সংসারে রইবে কেন বল গো মা! সিংহাসন পাতা ছিল তা যে তুলে ফেললে গো বউদিরা! গাচ যখন বলে ফল ধরবনি, সে যে পাপ গো! অত পাপ কি তুমি সইতে পার মাগো! তা বাদে সিংহবাহিনী যে মুক ফেরালে গো মা! বুঝিছিলে পুণ্যের পুরী পাপের পুরী হয়ে গেল, এ পুরীতে কি তুমি বাস কত্তে পার? কত্তা চলে যেতে তোমারো যে মন চলে গিইছিল গো মা! শরীলটা সংসারের দিকে চেয়ে ধরে রেখেছিলে বই তো নয়। অ বউদিরা! আলতা দিয়ে পায়ের ছাপ উঠিয়ে রাখ গো! ও পায়ের ছাপ ঘরে রইলে লক্ষ্মী বাঁদা থাকবে গো! সকালে উঠে ওতে মাতা ঠেকালে ঘরে রোগ দুঃখ ঢুকবে না গো!"

শবদেহের পেছন-পেছন যশোদা কেঁদে-কেঁদে শ্মশানে গেল ও ফিরে এসে বলল, "স্বচক্ষে দেক্‌নু সগ্‌গ থেকে রথ নেমে এসে চিতার বুক থেকে গিন্নিমাকে নিয়ে ওপর-পানে চলে গেল।"

গিন্নির শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে বড় বউ যশোদাকে বললেন, "বামুন দিদি! সংসারে তো ভাঙন ধরল। মেজ সেজ বেলেঘাটার বাড়িতে উইঠা যাইত্যাছে। রাঙা আর নতুন যাইত্যাছে মাণিকতলা-বাগমারী। ছোট্ট যাইব গিয়া আমাগো দক্ষিণেশ্বরের বাড়ি।"

"এখেনে কে থাকবে?"

"আমিই থাকুম। তবে গিয়া নিচতলা ভাড়া দিব হ্যায়। অহন সংসার গুটাইতে অইব। তোমার দুগ্ধে সবারে পালছ, নিত্য সিধা গেছে। হ্যাষ সন্তান দুধ ছারছে, তবুও আট বছর মা সিধা পাঠাইছে। উনি যা মন লয় তাই করছে। পোলারা কথা কয় নাই। কিন্তু অহন ত আর পারতাম না।"

"আমার কি হবে বড়বউদি?"

"তুমি যদি আমার সংসারে পাক-সাক কর, তোমার প্যাট চলব। কিন্তু ঘরের হক্কলডির কি করবা?"

"কি করব?"

"তুমিই কও। জেয়ন্তে তুমি বারো সন্তানের মা! মাইয়াগুলান্ বিয়া অইয়া গিছে। পুলারা ত শুনি যাত্রী ডাকে, মন্দিরে ভোগ খায়, চাতালে পাইড়া থাকে। বামুনও ত শুনি নকুলেশ্বর মন্দির ভালই জমাইছে। তোমার অভাব কিসের?"

যশোদা চোখ মুছে বলল, "দেখি! বামুনকে বলি।"

কাঙালীচরণের মন্দিরে এখন খুবই রমরমা। কাঙালী বলল, "আমার মন্দিরে তুই কি করবি?"

"নরেনের বোনঝি কি করে?"

"সে মন্দিরের সোম্‌সার দেখে, রাঁধে-বাড়ে। তুই ঘরেই রাঁধিস না ক'দ্দিন। মন্দিরের উঠ্‌নো তুই ঠেলতে পারিস?"

"ওবাড়ির সিধে উঠে গেল। সে কতা মাথায় ঢুকল ড্যাকরার? খাবে কি?"

নবীন বলল, "সে তোকে ভাবতে হবে না।"

"এ্যাদ্দিন ভাবিয়েছিলে কেন? মন্দিরে খুব দু'পয়সা হচ্ছে, তাই না? সব জমিয়েছ আর আমার গতরজল করা ভাত খেয়েছ বসে-বসে।"

"বসে বসে রাঁধত কে?"

যশোদা হাত নেড়ে বলল, "বেটাছেলে এনে দেয়, মেয়েছেলে রাঁধে-বাড়ে। আমার কপালে সকলই উলটো হইছিল। আমার ভাত খেয়েছ যখন, তখন আমাকে ভাত দেবে এখন। ন্যায্য কথা।"

কাঙালী ফস্ ক'রে বলল, "কোত্থেকে ভাত যোগাড় করলি? হালদার-বাড়ি তোর কপালে জুটত? আমার ঠ্যাং কাটা গেল বলেই না তোর কপালে ওবাড়ির দোর খুলল? কত্তা তো আমাকেই সব দেবেথোবে বলিছিল। সব ভুলে বসে আছিস মাগী?"

"তুমি মাগী না আমি মাগী। বউয়ের গতরে খায়, সে আবার বেটাছেলে?"

একথা থেকে দুজনের তুমুল কলহ বেধে গেল। দুজনে দুজনকে শাপশাপান্ত করল। অবশেষে কাঙালী বলল, "তোর মুখ আর দেখব না, যাঃ!"

"না দেখলে না দেখবে।"

যশোদাও রেগে ঘর ছেড়ে বেরলো। ইতিমধ্যে পাণ্ডাদের শরিকে-শরিকে সট হয়েছে, ঠাকুরের মুখ ফেরাতে হবে, নইলে সমূহ সর্বনাশ। সে জন্যে মন্দিরে মহা ধুমধামে প্রায়শ্চিত্ত পুজো হচ্ছে। যশোদা সেখানে হত্যা দিতে গেল। দুঃখে তার প্রৌঢ়, দুগ্ধহীন, স্থূল বুক দুটি ফেটে যাচ্ছে। সিংহবাহিনী তার দুঃখ বুঝে পথ বাতলে দিন।

তিনদিন যশোদা চাতালে পড়ে থাকল। নতুন হাওয়া সম্ভবত সিংহবাহিনীও খেয়েছেন। তিনি মোটেই স্বপ্নে দেখা দিলেন না। উপরন্তু তিনদিন উপোসী থেকে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে যশোদা যখন ঘরে গেল, ছোট ছেলে বলে গেল, "বাপ মন্দিরে থাকবে। আমাকে আর নবাকে বলেছে তোরা ঘন্টা বাজাবি, রোজ পেসাদ পাবি, পয়সা পাবি।"

"বটে! তা বাপ কোথা!"

"শুয়ে আছে। গোলাপী মাসি বাবার পিঠের ঘামাচি গেলে দিচ্চে। বলল, তোরা পয়সা দিয়ে ল্যাবেঞ্চুস খেগে যা! আমরা তাই তোকে বলতে এনু।"

যশোদা বুঝল, হালদার-বাড়িই নয়, কাঙালীর কাছেও তার দরকার ফুরিয়েছে। জলবাতাসা খেয়ে সে নবীনকে নালিশ করতে গেল। নবীনই সিংহবাহিনীর প্রতিমা হেঁচকে বিমুখ করেছিল ও অন্য পাণ্ডাদের সঙ্গে বাসন্তী পুজা, জগদ্ধাত্রী পুজা ও শারদ

দুর্গাপূজার বিশেষ রোজগার বিষয়ে ফয়সলা হবার পর পুনর্বার প্রতিমাকে হিঁচড়ে মুখ ফিরিয়ে সে ব্যথিত নড়ায় পাকি মদ মালিশ ক'রে গাঁজা টেনে বসেছিল এবং স্থানীয় ভোটের ক্যাণ্ডিডেটের উদ্দেশে বলছিল, "পুজো দিলি নে তো? মায়ের মাহাত্ম্য আবার ফিরেছে। এবার দেখে নোব কেমন ক'রে জিতিস!"

মন্দিরের আওতায় থাকলে এ দশকেও কি কি অলৌকিক ঘটনা ঘটে, নবীনই তার প্রমাণ। দেবীর মুখ সে নিজেই ফিরিয়েছিল এবং নিজেই বিশ্বাস করেছিল পাণ্ডারা ভোট-চাই দলসকলের মতো জোট বাঁধছে না বলে মা বিমুখ হয়েছেন। এখন মার মুখ ফেরাবার পর তার আবার ধারণা জন্মাল, মা নিজে ফিরেছেন।

যশোদা বলল, "কি বকছ?"

নবীন বলল, "মায়ের মাহাত্ম্যের কথা কইছি।"

যশোদা বলল, "নিজে ঠাকুরের মুখ ঘুরিয়েছিলে তা জানি না ভেবেছ?"

নবীন বলল, "চুপ কর যশি। ঠাকুর শক্তি দিলে, বুদ্ধি দিলে, তবে না আমা হতে কাজটি হল?"

"তোমাদের হাতে পড়ে মায়ের মাহাত্ম্যি গেল!"

"মাহাত্ম্যি গেল! গেলে পরে পাখা ঘুরছে, পাখার নিচে বসে আছিস, তা হল কি ক'রে? চাতালের ছাতে ইলেকট্টিরি পাখা এর আগে ঘুরেছে?"

"তা ত হল। এখন আমার কপাল পোড়ালে কেন, তাই কও দিখি? আমি তোমার কি করিছি?"

"কেন? ক্যাঙালী তো মরে নি?"

"মরবে কেন? মরার বাড়া হয়েছে।"

"কি হল?"

যশোদা চোখ মুছে ভারি গলায় বলল, "এতগুলো পেটে ধরিছি, সেই বলে বাবুদের বাড়ি বাঁধাধরা দুধ-মা ছিলাম। জান তো সবই। কোনোদিন কুপথে হাঁটি নি।"

"আই শ্বাস্! তুই হলি গে মায়ের অংশ।"

"মা তো ভোগেরাগে রইল। অংশ যে অন্ন বিনে মরতে বসেছে। হালদারবাড়ি তো হাত ওঠালে।"

"তুই বা ক্যাঙালীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলি কেন? বেটাছেলে ভাতের খোঁটা সয়?"

"তুমি বা তোমার বোনঝিকে হোথা গছালে কেন?"

"সে ঠাকুরের লীলে হয়ে গেল। গোলাপী যেয়ে মন্দিরে ধন্না দিত। তা ক্রেমেক্রেমে ক্যাঙালী বুঝল ও হচ্চে ঠাকুরের ভৈরব আর গোলাপী ওর ভৈরবী।"

"ভৈরবী! খ্যাংরা মেরে ওর হাত হতে সোয়ামি ছাড়িয়ে আনতে পারি এখনি।"

নবীন বলল, "নাঃ! সে আর হতে হচ্চে না। ক্যাঙালী পুরুষ ছেলে, ওর আর তোতে মন ওঠে? তা বাদে গোলাপীর ভাইটে সাক্ষাৎ গুণ্ডা, সে হোথা যেয়ে পওরা দিচ্ছে। আমাকেই গেট আউট ক'রে দিলে। আমি যদি দশ ছিলিম টানি, সে টানে বিশ ছিলিম। ক্যাঁকালে লাথি মেরে দিলে। যেয়েছিলাম তোর কথা বলতে। ক্যাঙালী বললে, ওর কতা আমায় বল না। ভাতার চেনে না, বাবু-বাড়ি চেনে। বাবু-বাড়ি ওর ইষ্টিদেবতা, সেথা যাক্ গা!"

"তাই যাব!"

বলে সংসারের অবিচারে পাগল-পাগল যশোদা ঘরে ফিরল। কিন্তু শূন্যঘরে মন

টেকে না। দুধ থাক না থাক, কোলের কাছে একটা ছেলে না থাকলে ঘুম আসে না। মা হওয়া বড় ভীষণ নেশা। সে নেশা দুধ শুকোলেও কাটে না। অগত্যা মান খুইয়ে যশোদা হালদারনীর কাছে গেল। বলল, "রাঁধব বাড়ব, মাইনে দেবে দিও, না দেবে না দিও। হেথা থাকতে দিতে হবে। মিনসে নিজের মন্দিরে থাকতেছে। ছেলেগুলো কি বেইমান মা! সেথা গিয়ে জুটেছে। কার তরে ঘর আটকে রাখব মা?"

"তা থাকো। তুমি ছেলেদের দুধ দিছ, তায় বামুন। তা থাক। কিন্তু দিদি, থাকতে তোমার কণ্ট হইব। ওই বাসিনীদের লগে এক ঘরে থাকবা। ক্যারো লগে ঝগড়াবিবাদ কইর না। বাবুর মাথা গরম। তায় সেজ পুলা বুম্বে গিয়া সেই দেশী মেয়ে বিয়া বসছে বইলা ম্যাজাজ মন্দ। ক্যাচাকেচি হইলে তাঁই চটব।"

সন্তান হবার ক্ষমতাই যশোদার লক্ষ্মী ছিল। সেটি খতম হতেই তার কপালে এত-এত দুর্গতি ঘটল। পাড়ায় মায়ের ভক্তবাড়িগুলির শ্রদ্ধেয়া দুগ্ধবতী সতীসাধ্বী যশোদার এখন পড়তির সময়। মানুষের স্বভাবধর্ম হল উঠতির কালে অসংগত অহমিকা হয় এবং পড়তির কালে "অবস্থা বুঝে নিনু হয়ে থাকি"—এ সারেণ্ডার আসে না মনে। ফলে মানুষ তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আগের দাপে দাপড়াতে যায় ও ব্যাঙের লাথি খায়।

যশোদার কপালেও তাই হল। বাসিনীরা তার পা ধোয়া জল খেত। এখন বাসিনী অক্লেশে বলল, "তুমি তোমার বাসন মেজে নেবে। তুমি কি মনিব, যে তোমার এঁটো বাসন মাজব? তুমিও মনিবের চাকর, আমিও।"

"জানিস আমি কে?"—বলে গর্জে উঠতে যশোদা বড় বউয়ের মুখ শুনল, "এই লিগাই আমার ডর ছিল খুব। মায়ে অরে মাথায় উঠাইয়া দিয়া গেছে। দেখ বামুন দিদি! ডাইকা আনি নাই, সাইধা আসছ, অশান্তি কইর না।"

যশোদা বুঝল, এখন আর তার টুঁ কথাটিও কেউ শুনবে না। মুখ বুঁজে সে রাঁধল বাড়ল, এবং বিকেলে মন্দিরের চাতালে গিয়ে কাঁদতে বসল। মন খুলে কাঁদতেও পারল না। নকুলেশ্বর মন্দির থেকে আরতির বাজনা শুনে ও চোখ মুছে উঠে এল। মনে মনে বলল, "এবার দয়া কর মা! শেষে কি টিনের বাটি হাতে পতে বসতে হবে? তাই চাও?"

হালদার-বাড়ি ভাত রেঁধে আর মায়ের কাছে মনোদুঃখ নিবেদন ক'রে দিন কাটতে পারত। কিন্তু যশোদার কপালে তা হইল না। যশোদার দেহ যেন এলে পড়ল। কেন কিছুতে ভাল লাগে না, যশোদা বোঝে না। মাথার ভেতর বিভ্রম সব। রাঁধতে বসলে মনে হয় সে এ বাড়ির দুধ-মা। কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে সে সিধে নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। স্তন দুটি বড় শূন্য লাগে, যেন বরবাদ। স্তনবৃন্তে শিশুর মুখ নেই, এ তার জীবনে ঘটবে বলে ভাবে নি।

খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল যশি। ভাত তরকারি প্রায় সবই বেড়ে দেয়, নিজে খেতে ভুলে যায়। মাঝে মাঝে নকুলেশ্বর শিবের উদ্দেশে বলে, "মা না পারে, তুমিই আমায় সরিয়ে নাও। আর পারি না।"

শেষে বড় বউয়ের ছেলেরাই বলল, "মা! দুধ-মার শরীর কি অসুস্থ? কেমন যেন হইয়া গেছে?"

বড় বউ বলল, "দেখি!"

বড়বাবু বলল, "দেখ! বামুনের মাইয়া, কিছু অইলে আমাগো পাপ অইব।"

বড় বউ জিগ্যেস করতে গেল। ভাত চড়িয়ে যশোদা রান্নাঘরেই আঁচল পেতে শুয়ে-

ছিল। বড় বউ তার আদুড় গা দেখে বলল, "বামুন দিদি! তোমার বাঁও মাইয়ের উপরটা লাল মত দেখায় ক্যান? ইশ! দগদগা লাল!"

"কি জানি। ভেতরে যেন পাতর ঠেলে উঠেছে। বড় শক্ত, ভিল পারা।"

"কি অইল?"

"কি জানি? এতগুলোকে দুধ দিইছি, তাতেই হয়ত অমন ধারা হল?"

"ধুর! ঠুনকা হয়, মাইঠোস হয় দুগ্ধ থাকলে। তোমার তো কুলেরটা দশ বছইরা।"

"সেটা নেই গো! তার উপরেরটা আছে। সেটা ত আঁতুড়ে গেছে। গেছে, ভাল গেছে। পাপের সংসার!"

"রও কাল ডাক্তার আইব নাতিরে দেখতে। তারে জিগামু। আমি য্যান্ ভাল দেখি না।"

যশোদা চোখ বুঁজে বলল, "যেন পাতরের মাই গো, পাতর পোরা। আগে শক্ত গুলিটা সরত নড়ত, এখন আর নড়ে না, সরে না।"

"ডাক্তাররে দেখামু।"

"না বউদিদি, বেটাছেলে ডাক্তারের কাছে আমি গা আদুড় করতে পারব না।"

রাতে ডাক্তার আসতে ছেলেকে সামনে রেখে বড় বউ জিগ্যেস করল। বলল, "ব্যথা নাই, জ্বালা নাই, কিন্তু হ্যায় জানি আলাইয়া পড়ত্যাছে।"

ডাক্তার বললেন, "জেনে আসুন দিকি, কুঁচকে গেছে না কি নিপ্‌ল, বগলের নিচটা বিচিফোলা মতো কি না!"

"বিচিফোলা" শুনে বড় বউয়ের মনে হল ছিঃ! কি অসভ্য! তারপর সরজমিনে তদন্ত সেরে এসে বললেন, "কয়, অনেকদিন ধইরাই আপনে যা যা বললেন, তা হইছে।"

"বয়স কত?"

"বড় ছেলের বয়স ধল্লে পরে পঞ্চান্ন হবে।"

ডাক্তার বললেন, "ওষুধ দেব।"

"বেরিয়ে গিয়ে বড়বাবুকে বললেন, "আপনার কুকের ব্রেস্টে কি হয়েছে শুনলাম। আমার মনে হয় ক্যানসার হাসপাতালে নিয়ে দেখানো ভাল। চোখে দেখি নি। তবে যা শুনলাম, তাতে ম্যামারি গ্ল্যাণ্ডে ক্যানসার হতে পারে।"

বড়বাবু ষোড়শ শতকে সেদিন অব্দি ছিলেন। অতি ইদানীং তিনি বিংশ শতকে এসেছেন। তেরটি সন্তানের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন এবং ছেলেরা যে যার পথে ও মতে বড় হচ্ছে, বড় হয়েছে। কিন্তু এখনো তাঁর মগজের বুদ্ধিকোষ অষ্টাদশ এবং প্রাক্‌-রেনেসাঁস উনিশ শতকীয় অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢাকা। আজও তিনি বসন্তের টিকা নেন না ও বলেন, "বসন্ত হয় ছুডলোকের। আমার টিকা লইতে লাগত না। উচ্চ বংশ, দেবদ্বিজে ভক্তিমান বংশে ও রোগ হয় না।"

"ক্যানসার" শুনে তিনি উড়িয়ে দিলেন ও বললেন, "হুঃ! হইলেই হইল ক্যানসার! অতই সোজা! কি শুনতে কি শুনছেন, যান, মলম দিলেই সারব। আপনের কথায় আমি বামুনের মাইয়ারে হাসপাতালে পাঠাইতে পারব না।"

যশোদাও শুনেমেলে বলল, "হাসপাতালে যেতে পারব নি বাপু। তার চে আমায় মত্তে বল। ছেলে বিয়োতে হাসপাতালে গেলাম না, এখন যাব? হাসপাতালে গেছল বলে ত মড়িপোড়া ঠ্যাং দুটো খুঁতো ক'রে ফিরে এল!"

বড় বউ বলল, "সিদ্ধ মলম আইনা দেই লাগাও। সিদ্ধমলমে ঠিক আরাম হইব। গুপ্ত ফোড়া মুখ লইয়া ফাটব।"

সিদ্ধমলমে কোনাই কাজ হল না এবং ক্রমে যশোদা খাওয়াদাওয়া ছেড়ে হীনবল হল। বাঁ দিকে আঁচল রাখতে পারে না। কখনো মনে হয় জ্বালা, কখনো মনে হয় ব্যথা। অবশেষে চামড়া ফেটে ফেটে ঘা দেখা দিল। যশোদা বিছানা নিল।

ভাবগতিক দেখে বড়বাবুর ভয় হল, বুঝি তার ভিটেতে বামুন মরে। যশোদার ছেলেদের ডেকে সে ধমকে বলল, "মা হয়, এতদিন খাওয়াইছে, এখন হ্যায় যে অসুখে মরে। তোরা নিয়া যা! হকলডি থাকতে হ্যায় কায়েতের ভিটায় মরব?"

কাঙালী একথা শুনে বড়ই কাঁদল ও যশোদার প্রায়ান্ধকার ঘরে এসে বলল, "বউ! তুই সতীলক্ষ্মী! তোকে হেনস্তা করার পর দু বছরের মধ্যে মন্দিরের বাসন চুরি হল, আমার পিঠে ফোড়া হয়ে ভুগলাম, গোলাপী হারামজাদী ন্যাপলাটাকে ভুলিয়ে বাক্স ভেঙে সর্বস্ব নিয়ে তারকেশ্বরে দোকান দিলে। চ' তোরে আমি মাথায় ক'রে রাখব।"

যশোদা বলল, "বাতিটা জ্বাল।"

কাঙালী বাতি জ্বালল।

যশোদা অনাবৃত ও ঘা-বিজবিজে বাম স্তন দেখিয়ে বলল, "ঘা দেখেছ? ঘায়ের গন্ধ কেমন জান? এখন নিয়ে যেয়ে কি করবে? নিতে বা এলে কেন?"

"বাবু ডাকলে।"

"বাবু তবে রাখতে চাইছে না।"—যশোদা নিশ্বাস ফেলল, ও বলল, "আমারে দিয়ে কোনো সুসার হবে নি জান? নিয়ে যেয়ে করবে বা কি?"

"তা হোক, কাল নে যাব। আজ ঘর পষ্কের ক'রে রাখি। কাল নিয্যস নে যাব।"

"ছেলেরা ভাল আচে? মাঝে মধ্যে নবলে আর গৌরটা আসত, তাও আসে না।"

"সব বেটা স্বার্থপর। আমার ঔরসে জন্ম তো? আমার মতোই অমানুষ।"

"কাল আসবে?"

"আসব—আসব—আসব।"

যশোদা সহসা হাসল। সে হাসি বড়ই বুকে দাগা-দেওয়া ও প্রাচীন স্মৃতির কথা মনে-পড়ানো।

যশোদা বলল, "হ্যাঁ গো, মনে আচে?"

"কি মনে থাকবে বউ?"

"এই মাই নিয়ে তুমি কত সোহাগ কত্তে? নইলে তোমার ঘুম হতো না? কোল খালি হতো না, এটা বোঁটা ছাড়ে তো ওটা ধরে, তার বাবুর বাড়ির ছেলেগুলো! কি ক'রে পাত্তাম, তাই ভাবি!"

"সব মনে আছে বউ!"

কাঙালীর এ কথাটি এ মুহূর্তে সত্য। যশোদার ক্লিষ্ট, শীর্ণ, কাতর চেহারা দেখে কাঙালীর স্বার্থপর দেহ ও প্রবৃত্তি এবং উদরসর্বস্ব চেতনাও অতীত স্মরণে মমতা-কাতর হল। সে যশোদার হাতটি ধরল ও বলল, "তোর জ্বর?"

"জ্বর তো হয়ই। আমি ভাবি ঘায়ের তাড়সে?"

"এমন পচা গন্ধ কোত্থেকে আসছে?"

"এই ঘা হতে।"

যশোদা চোখ বুঁজে রইল। তারপর বলল, "তুমি বরং সন্নিসী ডাক্তারকে দেখিও। তিনি হোমোপাথি দিয়ে গোপালের টাইফয়েড সারিয়েছিল।"

"ডাকব। কালই নে যাব তোকে।"

কাঙালী চলে গেল। সে যে বেরিয়ে গেল, ক্রাচের খটখট শব্দ যশোদা শুনতে পেল না। চোখ বুঁজে, কাঙালী ঘরে আছে জানে নিজেকে বলল, "দুধ দিলে মা হয়, স—ব মিছে কতা! না নেপাল-গোপালরা দেখে, না বাবুর ছেলেরা উঁকি মেরে এট্টা কতা শুধোয়।"

ঘা-গুলি শত মুখে, শত চোখে যশোদাকে ব্যঙ্গ করতে থাকল। যশোদা চোখ মেলে বলল, "শুনচ?"

তারপরই সে বুঝল কাঙালী চলে গেছে।

রাতেই সে বাসিনীকে দিয়ে লাইফবয় সাবান আনাল ও ভোর হতে সাবান নিয়ে নাইতে গেল। গন্ধ, কি দুর্গন্ধ! বেড়াল-কুকুর ডাস্টবিনে পচলে এমন গন্ধ হয়। যশোদা চিরকাল, বাবুদের ছেলেরা স্তনবৃন্ত মুখে দেবে বলে কত যত্নে তেলে-সাবানে স্তন দুটি মার্জনা করেছে। সেই স্তন তার এমন বেইমানি করল কেন? সাবানের ঝাঁঝে চামড়া জ্বলে ওঠে। যশোদা তবু সাবান দিয়ে স্নান ক'রে এল। মাথা ঝিমঝিম করে, সব যেন আঁধার আঁধার। যশোদার শরীরে আগুন, মাথায় আগুন। কালো মেঝেটি বড় ঠাণ্ডা। যশোদা আঁচল বিছিয়ে শুল। স্তনের ভার সে দাঁড়িয়ে সইতে পারছিল না।

সেই যে শুল যশোদা, জ্বরে অজ্ঞান ও বিবশ। কাঙালী ঠিক সময়েই এল; কিন্তু যশোদাকে দেখে সে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। অবশেষে নবীন এসে ধমকে বলল, "এরা কি মানুষ? সবগুলো ছেলেকে দুধ দিয়া বাঁচাল তা এট্টা ডাক্তার ডাকে না? হরি ডাক্তারকে ডেকে আনছি।"

হরি ডাক্তার দেখেই বললেন, "হাসপাতাল।"

এমন রুগী হাসপাতালে নেয় না। কিন্তু বড়বাবুর চেষ্টায় ও সুপারিশে যশোদা হাসপাতালে ভর্তি হল।

"কি হয়েচে? অ ডাক্তারবাবু, কি হয়েচে"—কাঙালী বালকের মতো কেঁদে জিগ্যেস করল।

"ক্যানসার।"

"মাইয়ে ক্যানসার হয়?"

"নইলে হল কি ক'রে?"

"নিজের কুড়িটা, বাবুদের বাড়ির তিরিশটা ছেলে—খুব দুধ ছিল ডাক্তারবাবু—"

"কি বললে? কতজনকে ফীড করেছে?"

"তা পঞ্চাশ জনা ত হবে।"

"প—ঞ্চা—শ—জ—ন?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"ওর কুড়িটা সন্তান হয়েছে?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"গড্!"

"বাবু!"

"কি?"

"এত মাই খাওয়াত বলেই কি—?"

"তা বলা যায় না ক্যানসার কেন হয়, তা বলা যায় না। তবে বুকের দুধ যারা অতিরিক্ত খাওয়ায়—আগে বোঝ নি? একদিনে ত এমনটা হয় নি?"

"আমার কাছে ছিল না বাবু। ঝগড়া ক'রে—"

"বুঝেছি।"

"কেমন দেখছেন? ভাল হবে তো?"

"ভাল হবে! কদিন থাকে সেই দেখ। এনেছ তো শেষ অবস্থায়। এ অবস্থা থেকে কেউ বাঁচে না।"

কাঙালী কাঁদতে কাঁদতে চলে এল। বিকেলে, কাঙালীর কান্নাকাটিতে বিপর্যস্ত হয়ে বড়বাবুর মেজছেলে ডাক্তারের কাছে গেল। যশোদার জন্যে তার সামান্যই উৎকন্ঠা ছিল, কিন্তু বাবা হুড়কো দিলেন—সে বাবার টাকার ওপর নির্ভর করে।

ডাক্তার তা.ক সব বুঝিয়ে বললেন। একদিনে হয় নি, বহুদিন ধরে হয়েছে। কেন হয়েছে? তা কেউই বলতে পারে না। বুকের ক্যানসার কিভাবে বোঝা যাবে? স্তনের ওপর দিকে ভেতরে শক্ত গুলি, সেটা সরানো চলে। তারপর ক্রমে ভেতরের গুলি শক্ত ও বড় ও জমাট চাপের মতো হল। চামড়া কমলারঙা হওয়া প্রত্যাশিত, যেমন প্রত্যাশিত স্তনবৃন্তের সংকোচন। বগলের নিচে গ্ল্যাণ্ডটি আওরে উঠতে পারে। আল্‌সারেশন, অর্থাৎ ঘা যখন হল, তখন বলা চলে শেষ অবস্থা। জ্বর? সেটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে পড়বে গুরুত্বের দিক থেকে। শরীরে ঘা জাতীয় কিছু থাকলে জ্বর হতেই পারে। সেটা সেকেণ্ডারি।

এতগুলি বিশেষজ্ঞ-কথা শুনে মেজছেলের মাথা গুলিয়ে গেল। সে বলল, "বাঁচব?"

"না।"

"কদ্দিন কষ্ট পাইব?"

"মনে হয় না বেশি দিন।"

"কিছুই যখন করার নাই, কি চিকিৎসা করবেন?"

"পেইনকিলার, সেডেটিভ, জ্বরের জন্যে অ্যান্টিবায়োটিক। শরীরও তো ডাউন খুব, খুবই।"

"খাওয়া ছাইরা দিছিল।"

"কোনো ডাক্তার দেখান নি?"

"দেখছিল।"

"বলেন নি?"

"বলছিল।"

"কি বলেছিলেন?"

"ক্যানসার অইতে পারে। আসপাতালে লইতে বলছিল। হ্যায় যাইতে চায় নাই।"

"চাইবে কেন? মরবে যে!"

মেজছেলে বাড়ি ফিরে এসে বলল, "তখন যে অরুণ ডাক্তার কইল ক্যানসার হইছে, তখন লইলেও বাচত বুঝি!"

তার মা বলল, "অতই যদি বুঝিস তবে লইস নাই ক্যান? আমি কি বাধা দিছিলাম?"

মেজছেলে ও তার মার মনের কোথাও অজানা পাপবোধ ও অনুশোচনা পচা ও আবদ্ধ জলে বুদ্‌বুদের মতো জাগছিল ও নিমেষে লয় পাচ্ছিল।

পাপবোধ বলছিস—আমাদের কাছেই আছিল, কুনদিন দেখি নাই উঁকি মাইরা, কবে বা হছিল রোগ, গুরুত্ব দেই নাই। হ্যায় ত আবুইদা মানুষ, আমাদের এত জনরে পালছিল, দেখি নাই অরে। অহন হকলে রইতে আসপাতালে গিয়া মরতাছে, পুলা এতগুলা, স্বামী আছে, আমাদের আকড়াইয়া ধরছিল যহন, তহন আমাদেরই—! এইও তাজা শরীর আছিল, দুধ বাইরাইত ঠিকর দিয়া, কুনদিন ভাবি নাই হেয়ার এই রোগ অইব।

পাপবোধের লয় বলছিল—নিয়তি কে খণ্ডাইতে পারে? হেয়ার কপালে আছে ক্যানসারে মরণ—ঠেকাইব ক্যাডা? আমাদের এহানে মরলে দোষ অইত—হেয়ার স্বামীপুত্র কইত কি কইরা মরল? অহন হেই দোষ হইতে বাচছি। কেও কিছু বলতে পারত না।

বড়বাবু ওদের আশ্বস্ত ক'রে বলল, "অহন অরুণ ডাক্তার কইতাছে ক্যানসার হইলে কেও বাচে না। বামুন দিদির যেই ক্যানসার হইছে তা অইলে মাই কাইটা ফালায়, জরায়ু বাদ দেয়, হেয়ার পরও মাইন্ষে ক্যানসারে মরে। দেহ, বাবায় বামুন বইলা বড় ভক্তি দিয়া গিছে—বাবার দয়ায় আমরা বাইচা আছি। ভিটায় বামুনদিদি মরলে প্রায়শ্চিত্ত করতে অইত।"

যশোদার চেয়ে কম আক্রান্ত রোগী কত আগে মরে, যশোদা ডাক্তারদের আশ্চর্য ক'রে প্রায় একমাস টিকে রইল হাসপাতালে। প্রথম প্রথম কাঙালী, নবীন, ছেলেরা যাতায়াত করেছিল বটে, কিন্তু যশোদা একই রকম আছে, কোমাটিক, জ্বরে ভাজা-ভাজা, আচ্ছন্ন। স্তনের ক্ষতগুলি ক্রমেই বড়-বড় হাঁ করছে এবং স্তনটির চেহারা এখন এক নগ্ন ক্ষতসদৃশ। অ্যান্টিসেপটিক লোশন-নিষিক্ত পাতলা গজ কাপড়ে সেটি আবৃত, কিন্তু গলিত মাংসের তীব্র গন্ধ ঘরের বাতাসে ধূপের ধোঁয়ার মতো নীরবে ও চক্রাকারে ছড়াচ্ছে সর্বদা। তা দেখে কাঙালীদের উৎসাহে ভাটা পড়ল ও ডাক্তারও বললেন, "সাড়া দিচ্ছে না? না দিলেই ত ভাল। অজ্ঞানেই সওয়া যায় না, সজ্ঞানে কেউ ঐ যমযন্ত্রণা সইতে পারে?"

"কিছু জানছে, আমরা আসি যাই বলে?"

"বলা কঠিন।"

"খাচ্চে কিছু?"

"নল দিয়ে।"

"তাতে মানুষ বাঁচে?"

"এখন যে খুব—"

ডাক্তার বুঝলেন, যশোদার এ অবস্থার জন্য তাঁর মনে অহেতুক রাগ হচ্ছে। যশোদার ওপর কাঙালীর ওপর, যেসব মেয়েরা ব্রেস্ট-ক্যানসারের লক্ষণকে যথেষ্ট সিরিয়াসলি নেয় না এবং আখেরে বীভৎস নরকযন্ত্রণায় মরে, তাদের ওপর। ক্যানসার, রোগী ও ডাক্তারকে নিয়ত পরাজিত করে। একটি রোগীর ক্যানসার মানে রোগীর মৃত্যু এবং বিজ্ঞানের পরাজয়, ডাক্তারের ত বটেই। সেকেণ্ডারি সিম্পটমের ওষুধ দেওয়া যায়, খাওয়া বন্ধ হলে ড্রিপ দিয়ে শরীরকে গ্লুকোজ খাওয়ানো চলে, শ্বাস নিতে ফুসফুস অপারগ হলে অক্সিজেন—কিন্তু ক্যানসারের অগ্রগমন, প্রসারণ, ব্যাপ্তি, হত্যা, অব্যাহত থাকে। ক্যানসার শব্দটি এক সাধারণ সংজ্ঞা, এ সংজ্ঞা দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ম্যালিগ্‌নান্ট গ্রোথ বোঝায়। 'দি গ্রোথ ইজ পার্পাসলেস, প্যারাসাইটিক, অ্যান্ড ফ্লারিশেস অ্যাট দি এক্সপেন্স অফ দি হিউম্যান হোস্ট।' এর

চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য হল, সংক্রমিত শরীরাংশকে ধ্বংসকরণ, মেটাস্টাসিয়া দ্বারা ব্যাপ্তি, রিমুভালের পর প্রত্যাবর্তন, টক্সিমিয়া সংঘটন।

কাঙালী তার প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে বেরিয়ে এল। মন্দিরে এসে সে নবীন ও ছেলেদের বলল, "আর যেয়ে লাভ নেই। চিনতে পারে না, চোখ খোলে না, জানতে পারে না। ডাক্তার যা পারে কত্তেছে।"

নবীন বলল, "যদি মরে যায়?"

"বড়বাবুর টেলিফোন নম্বর আচে, বলবে।"

"ধর যদি তোমারে দেকতে চায়। সতীলক্ষ্মী বউ তোমার ক্যাঙালী! কে বলবে এতগুনোর মা! শরীর দেকলে—তা কোনো দিকে হেলে নি, চায় নি।"

বলতে বলতে নবীন গুম্ মেরে গেল। বস্তুত, অচৈতন্য যশোদার ক্ষতাক্রান্ত স্তন দেখার পর তার গাঁজা-চরস-মদ জনিত ঘোলাটে মাথায় বহু দার্শনিক চিন্তা ও দেহ-তত্ত্বের কথা মিথুনমত্ত ঢোঁড়া সাপের মতো মন্থর খেলা করে। যেমন,—ওর জন্যেই এত আকুলি-ব্যাকুলি ছিল?—সেই মনমাতানো বুকের এই পরিণাম? হোঃ! মানব-দেহ কিস্‌সু নয়। তার তরে পাগল হয় যে সেও পাগল।

কাঙালীর এত কথা ভাল লাগল না। যশোদার প্রতি তার মন থেকেই রিজেকশান এসে গিয়েছিল। সেদিন হালদার-বাড়ি যশোদাকে দেখে মন সত্যিই কাতর হয় ও হাসপাতালে নেবার পরও ব্যাকুলতা থাকে। কিন্তু সে অনুভূতি ঠাণ্ডা মেরে আসছে এখন। ডাক্তার যখনি বলেছে যশোদা বাঁচবে না, সে মন থেকে যশোদাকে প্রায় অকষ্টে বাদ দিয়েছে। তার ছেলেরাও তারই ছেলে। তা ছাড়া মা তাদের কাছে অনেকদিনই দূরের মানুষ হয়ে গেছে। মা মানে চুড়ো ক'রে বাঁধা চুল, ধপধপে কাপড়, প্রবল ব্যক্তিত্ব। হাসপাতালে যে শুয়ে আছে, সে অন্য কেউ, মা নয়।

স্তনের ক্যানসারে ব্রেন কোমাটোজ হয়, যশোদার বেলা সেটি মুশকিলআসান হল।

সে যে হাসপাতালে এসেছে, হাসপাতালে আছে, তা বুঝল যশোদা এবং এও বুঝল, এই যে বিবশকারী ঘুম, এ ওষুধের ঘুম। তাতে খুব স্বস্তি হল তার। এবং দুর্বল ও আক্রান্ত, আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে মনে হল, হালদার-বাড়ির কোনো ছেলেটা কি ডাক্তার হয়েছে? নিশ্চয় তার দুধ খেয়েছে বলে এখন দুধের ঋণ শুধছে? কিন্তু ওবাড়ির ছেলেরা তো স্কুল না পেরোতে কারবারে ঢোকে! যেই হোক, যারা এত করছে তারা বুকের দুর্গন্ধময় উপস্থিতিটা থেকে তাকে মুক্তি দেয় না কেন? কি দুর্গন্ধ, কি বেই-মানি? এই স্তনকে সে ভাতের যোগানদার জেনে নিয়ত গর্ভ ধরে দুধে ভরে রাখত। স্তনের কাজই দুধ ধরা! কত গন্ধসাবানে স্তন মেজে পরিষ্কার রাখত, বড্ড ভারি ছিল বলে জামা পরে নি যৌবনেও।

সেডেশান কমে এলেই যশোদা চেঁচিয়ে ওঠে, "আঃ! আঃ! আঃ!"—এবং ব্যাকুল ঘোলাটে চোখে নার্স ও ডাক্তারকে চায়। ডাক্তার এলে সাভিমানে বিড়বিড় ক'রে বলে, "দুধ খেয়ে এত বড়টা হলে, এখন এমন কষ্ট দিচ্চ?"

ডাক্তার বলে, "বিশ্বসংসারে দুধ-ছেলে দেখছে!"

আবার ইঞ্জেকশন ও আবার নিদ্রাচ্ছন্ন অসাড়তা। যন্ত্রণা, ভীষণ যন্ত্রণা, অ্যাট দি এক্সপেন্স অফ দি হিউম্যান হোস্ট ক্যানসার সংক্রমিত হচ্ছে। ক্রমে যশোদার বাম স্তন ফেটে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার-সদৃশ হল। পূতিগন্ধে কাছে যেতে কষ্ট হয়।

শেষে একরাতে, যশোদা বুঝল তার পা ও হাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ও বুঝল এবার মৃত্যু আসছে। চোখ খুলতে পারল না যশোদা, কিন্তু বুঝল, কেউ কেউ তার

হাত দেখছে। সূচ বিঁধল বাহুতে। ভেতরে শ্বাসের কষ্ট। হতেই হবে। কারা দেখছে? তারা কি তার আপন কেউ? যাদের পেটে ধরেছিল বলে দুধ দেয়, ভাতের জন্যে যাদের দুধ দেয়, যশোদার মনে হল সে ত বিশ্বসংসারকে দুধ দিয়েছে, তবে সে কি একা-একা মরতে পারে? যে ডাক্তার রোজ ওকেদেখছে সে, যে ওর মুখে চাদর টেনে দেবে সে, যে ওকে ট্রলিতে তুলবে সে, যে ওকে শ্মশানে নামাবে সে, যে ওকে চুল্লিতে দেবে সে-ডোম, সবাই তার দুধ-ছেলে। বিশ্বসংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না। অথচ শেষ সময়টা কারো থাকার কথা ছিল। সে কে? কে সে? সে কে?

যশোদা মারা গেল রাত এগারোটায়।

বড়বাবুর বাড়ি ফোন গেল। বাজল না। রাতে ওঁদের ফোন ডিস্‌কানেক্ট করা থাকে।

হাসপাতালের মর্গে যথাবিধি পড়ে থেকে যশোদা দেবী, হিন্দু ফিমেল, যথাসময়ে গাড়িতে শ্মশানে গেল ও দাহ হল। ডোমই তাকে দাহ করল। যশোদা যা-যা ভেবেছিল, ঠিক তাই-তাই হল। যশোদা ঈশ্বর-স্বরূপিণী, সে যা ভাবে, অন্যেরা ঠিক তাই করে, তাই করল। যশোদার মৃত্যুও ঈশ্বরের মৃত্যু। এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে সতত একলা মরতে হয়।



বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম: ১৯৩০, পূর্ববঙ্গে, ঢাকায়। এই বঙ্গে আছেন, সেও বেশ কিছুকাল হয়ে গেল। শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন অনেক দিন, অধুনা সাংবাদিকতাকে জীবিকা করেছেন। এছাড়া লেখা—সে তো আছেই।

এক নিশ্বাসে কাউকে যদি প্রধান ছোটগল্পকারদের নাম করতে বলা হয়, তবে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম আসবেই। তাঁর অজস্র ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে। 'একালের বাংলা গল্প'-র অধিকাংশ গল্পই তার প্রমাণ। এছাড়া 'বজরা', 'কয়েকজন অপু' তাঁর অন্যদুটি গল্প সংকলনের নাম।

সুঔপন্যাসিক এই লেখক 'নিশীথফেরি', 'ভালোবেসেছিলাম' উপন্যাস দুটি লিখে সকলের মনোযোগ কেড়ে নেন। 'বনবিবি উপাখ্যান' তাঁর আর একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। এছাড়া ছোটদের গল্প এবং ছড়া-তেও ইনি সিদ্ধহস্ত। দারুণ একটি ছড়ার সংকলন কিছু দিন আগে সবাই পড়েছেন তারিয়ে তারিয়ে।

বিনম্র এই লেখককে পুরস্কার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় মৃদু হেসে বলেছিলেন, পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিনি। অবিশ্বাস নিয়ে বাড়ি চলে আসার পরই শুনতে পাই, তিনি মতিলাল পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। অজস্র পাঠকের ভালোবাসার পুরস্কারের কথা আপাতত অনুক্তই থাক।

'শ্রেষ্ঠগল্প' সম্পর্কে লেখকের কোন মোহ থাকা উচিত নয়। আমার আদৌ নেই। সামান্য যা কিছু লেখালেখি করেছি, তাতে এটুকু মনে হয়েছে, একজন লেখক তাঁর দেখা আর উপলব্ধি আর দশজনের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য লেখেন। লেখার ভিতর দিয়েই তাঁর মানসিকতা প্রকাশ পেতে থাকে। বলাই বাহুল্য, আমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নেই। সেই অর্থে একজন লেখক কোন একটি বিশেষ গল্পে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেন কিভাবে, আমার জানা নেই। অবশ্য লেখার জগতে যাঁরা রাজা উজির, নিজেদের কৃতিপুরুষ বলে ভেবে তৃপ্তি পান, তাঁদের সম্পর্কে আমার এ মন্তব্য নাও খাটতে পারে।

তবু প্রকাশকের আর্জি, একটি গল্প আমাকেই বেছে দিতে হবে। দায়িত্বটা সম্পাদক বা পাঠকের হাতে তোলা থাকলে অনেক স্বস্তি পেতে পারতাম। কেন না, 'বঙ্গ আমার জননী আমার' বাছতে গিয়ে মনে হল, অনেক গল্পের উপর হয়তো অবিচার করে ফেললাম।

'বঙ্গ আমার জননী আমার' লিখেছিলাম এমন একটা সময়ে যখন দেশের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এবং সমাজ জীবনে একটা দুঃসহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আমার এইখানি বয়সে মানুষের চিরন্তনী মূল্যবোধের শিকড়ে এমন করে টান পড়তে এর আগে আর কখনো দেখিনি। ভগবানকে ধন্যবাদ, ও বাংলার মানুষ হলেও বঙ্গভঙ্গ বা দাঙ্গার ছোঁয়াচ তেমন করে আমাদের পরিবারের গায়ে লাগে নি।

আর হয়তো এই পরিস্থিতিতে যে সময় বা যে চরিত্রগুলিকে ধরবার চেষ্টা করেছি এই গল্পে তার যথেষ্ট মূল্য আমার কাছে আছে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়
১০-৮-৭৮

বঙ্গ আমার, জননী আমার

ডান অথবা বাঁ, বুকের কোন্ দিকে যে শ্বাসযন্ত্রটা ধুকধুক করছে বুঝতে পারে না সতীশ। বুঝতে পারে না এক বিঘত লম্বা ঝকঝকে ছুরিখানা ওর পাঁজরার ডান দিক দিয়ে ঢুকল না বাঁ দিক দিয়ে। যে দিক দিয়েই ঢুকুক, পলকেই ওর চোখের সামনে হলুদ রোদ ফিনকি দিয়ে উঠল। চোয়াল দুটো ফাঁক হয়ে খিল লেগে রইল অনেকক্ষণ, অবশেষে অর্থহীন কয়েকটা শব্দ বীভৎসভাবে বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে।

সতীশ টলতে শুরু করল। ফিনকি দেওয়া রক্তের ধারাটুকু খাবলে দু' হাতের মুঠোয় চেপে ধরার চেষ্টা করেও রেহাই পেল না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বুজবুজ করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। অথচ কি আশ্চর্য যন্ত্রণাটা যেন ক্ষতস্থান থেকে সরে গিয়ে নিম্ন পেটে নাভির কাছাকাছি এসে ঘুরপাক খাচ্ছে। মনে হচ্ছে, নাভির শুকনো কলিটাকে লক্ষ্য করে গনগনে একটা লোহার শিক ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। যেমনভাবে শুকরনিধন যজ্ঞ হয়, ব্যাপারটা যেন অনেকটা সেইরকম। এ অবস্থায় সতীশ কোন একটা অবলম্বনের আশায় নর্দমার পাশে ল্যাম্পপোস্টটাকেই জড়িয়ে ধরে টান-টান হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। অথচ সেই বানর আর বাঁশের অঙ্কের মতই ল্যাম্প-পোস্টের গা বেয়ে পিছলে ও নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল বারবার।

শেষ পর্যন্ত পোস্টের গোড়ায় কিম্ভূত-আকৃতি একটা জীবের মত দলা পাকিয়ে গেল সতীশ। পোস্টের বাল্বখানা দিন কয়েক ধরেই ফিউজ হয়ে পড়েছিল। কে জানে, পিনকিরাই ওকে বাড়ি ফেরার পথে এইভাবে আক্রমণ করবে বলে বাতিটার ঐ হাল করে রেখেছিল কিনা। এখন আবছা অন্ধকারের মধ্যে সতীশকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। হাত পা বুক পেট সব কিছু একাকার। মুখখানা ছুচলো যেন এই মাত্র নর্দমার কাঁদা খুঁচে এসেছে ও। অথচ মিনিট কয়েক আগেও পূর্ণাঙ্গ একটা মানুষের মত সতীশ এ রাস্তা ধরেই হেঁটে এসেছিল। বাস থেকে নেমে চার পয়সার বিড়ি কিনেছিল ও মামুদের দোকান থেকে। পরনে ছিল পাজামা আর হাফ-হাতা শার্ট। কাঁধ বেয়ে একটা ঝোলান ব্যাগের ভিতর ছিল আধা-ফিনিশ লজেন্সের বোয়ম আর চামচ। সতীশ বনগাঁ লাইনে লজেন্স ফিরি করে। রেল কোম্পানীর দয়ায় জামা-কাপড়ের যা ফুটি-ফাটা অবস্থা তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হবে না কারো। আর এক প্রস্থ জামা-কাপড় না করালেই নয়। অথচ গোটা মাস ধরেই মন্দা চলছে বাজারে। সতীশ লক্ষ্য করেছে, প্যাসেঞ্জাররা বোয়মের উপর চামচ ঘষার শব্দ শোনে, তাকায়, দুটো চারটে ফুটকুরিও কাটে কেউ কেউ, অথচ কেনার নামে চুঁ চুঁ। তা ছাড়া লাইনের অবস্থাও আর আগের মত নেই। মনে পড়ছে, আগে এখানে সাকুল্যে ছিল চার পাঁচ জন ফেরিঅলা, এখন পঞ্চাশ ষাট তো বটেই, আরো বেশী কিনা কে জানে। এর মধ্যে আবার লজেন্সের দিকেই ঝোঁকটা যেন বেশী।

ব্যাপার-স্যাপার একটু খতিয়ে দেখলে মুষড়ে পড়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করে সতীশের মত একজন নগণ্য লোকের পক্ষে তো কথাই নেই। চলন্ত গাড়ির মধ্যে

ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি, জীবন মুঠোয় করে এক বগি থেকে আর এক বগিতে গা ঘষতে ঘষতে এগোনো—কিন্তু এত করেও যদি দু' চার পয়সা রোজগারই না হল, তা হলে আর কিসের আশায় লাইনে থাকা। তবু দিনের আশাতেই লেগে থাকতে হয়েছিল ওকে। দিনের আশাতেই ছুটোছুটি করে টিঁকে ছিল সতীশ।

এদিকে পাড়ার অবস্থাও কহতব্য নয়। বোমাবাজি তো আছেই, পার্টি পার্টি খণ্ড-যুদ্ধটুদ্ধ এখন গা সওয়া, কিন্তু ইদানীং এক উটকো মাগীর কীর্তিকলাপ দেখে চক্ষু থ হয়ে গিয়েছিল সবার। মহিলাটি দিন কয়েক আগে আড়ম্বর করে ধুনিটুনি জ্বেলে প্রচার করল, সে কালী পেয়েছে স্বপ্নে। কালীর মহিমা শেষ পর্যন্ত পুলিসে গিয়ে গড়াল। বেআইনীভাবে তারাপদবাবুর জমির উঁপর সে মন্দির গড়ার চেষ্টা করায় পুলিস এসে তাকে ভ্যানে তুলে থানায় নিয়ে গেল। সে এক হুলস্থুল ব্যাপার। আর এ ঘটনার ঠিক পরদিনই তারাপদবাবুকে কে বা কারা যেন কুপিয়ে মেরে রেখে গেল এই নর্দমার ধারে। ঠিক এ রাস্তায় এই লাইটপোস্টটার কাছেই। তারাপদবাবুর মৃত্যু যে এই মহিলাটির সঙ্গেই জড়িত কোন ব্যাপার সন্দেহ রইল না কারো।

যথাবিহিত আবার পুলিস ঢুকল পাড়ায়। পুলিসের কুকুর তারাপদবাবুর দেহের উপর নাক রেখে গন্ধ শুঁকে পাড়াটাকে আগাপাশতলা চষে হতাশ হয়ে ফিরে এল। ভাগ্যিস সে সময় পাড়ায় সতীশ ছিল না। পুলিস দেখলেই ওর বুকের ভিতর এক ধরনের কম্পন শুরু হয়। মনে মনে আশঙ্কা জাগে, পৃথিবীর যাবতীয় অপরাধ যেন ওর জন্যই ঘটে যাচ্ছে। পুলিসের কুকুরের যেন অধিকার আছে হঠাৎ ওর বুকের ওপর লাফিয়ে পড়ে ওর গলার নলিটাকে কামড়ে ধরার।

অথচ তারাপদবাবুর খুনের ব্যাপারে সতীশ সন্দেহ করত পিনকিকে। সকলেই করত বোধ হয়, কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা কেউ উচ্চারণ করতে সাহস পেত না। পিনকির ব্যাপারে ভুলেও নাক গলাতে চায় না সতীশ। পিনকি একাই এক শ'। সাহস আছে। নিজের চোখেই সতীশের দেখা, চারপাশ থেকে রাইফেলধারী পুলিস চড়াও হয়েছিল ওর ওপর। পিনকি আর পিনকির বউ তখন ঘরে। ট্যা ফুঁ করলেই ব্যুম ব্যুম করে ফায়ার করবে পুলিস, এমনি একটা মতিগতি। সতীশ তার নিজের বাড়ির জানালা ফাঁক করে নেয়ে ঘেমে একাকার হয়ে তাকিয়ে ছিল ঘটনাটার দিকে। সেদিনও এমনিধারা আলো জ্বলেনি রাস্তায়। আকাশটা মেঘলা মেঘলা ছিল, কয়েক পশলা নামলেও নামতে পারত, নামেনি। সতীশ কেবল রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়েই ছিল ওদিকে। রাইফেল থেকে আগুনের ঝলক দিয়ে গুলি বেরুতে যেটুকু সময়। পুলিস সার্জেন্ট একবার হেঁকেও উঠেছিল, পিনকি বেরিয়ে আয়, বাঁচতে চাস তো বেরিয়ে আয় পিনকি। অথচ বেশ কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়েই হম্বিতম্বি করছিল পুলিসগুলো, প্রাণের ভয় কারই বা না আছে।

সতীশ এর পর যে দৃশ্য দেখেছিল, জীবনে ভুলবে না। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ দুম্‌দুম করে দুটো পেটো। পুলিসগুলো হকচকিয়ে শুধু মুহূর্তখানেক সময় নিয়েছে, সাদা ধুঁয়োর ভিতর দিয়ে অমনি পোঁকের পিনকি কাট।

এই হল পিনকির চেহারা। ফলে, বড় রাস্তায় বাস থেকে নেমে সতীশ যখন বিড়ি কিনে গলির মুখে পা বাড়িয়েছিল সে সময়ই ওর সাবধান হওয়া উচিত ছিল কিছুটা। কয়েক পা এগিয়ে এসে সতীশ লক্ষ্য করেছিল, পিনকি আর অপরিচিত একটি মুখ ধীরে ধীরে ওরই পেছু ধরেছে।

সতীশ ঐকটা বিড়ি ধরিয়ে নিজেকে নিরপরাধ রাখার চেষ্টা করল। মনে মনে

গুন্‌গুন্ করে একটা গান আওড়াবার চেষ্টা করল ও। মনে পড়ে গেল দাদের মলমের বিপিনের অঙ্গভঙ্গি করে ছড়া কাটা: বিকৃত করিয়া মুখ, চুলকাইতে বড় সুখ, সুখ রে—এ এ এ। মনে পড়ে গেল ওরও পাজামার নিচে কুঁচকির কাছাকাছি একটা দাদচক্র জন্ম নিতে শুরু করেছে আজকাল। এক কৌটো মলম বিপিনের কাছ থেকে চেয়ে নিলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না। কিন্তু—

বিড়িটা নিবে যাওয়ায় আবার ওকে ধরাতে হল। আর ঠিক এ সময়ই ও শুনতে পেল, পিনকি ওকে দাঁড়াতে বলছে, ডাকছে।

সতীশ দাঁড়িয়েছিল।

চোখের নিমেষে ওরা দু পাশে এসে শুধু পজিশন নিতে যেটুকু সময় নিল। তারপর বাঁকা চোখে তাকাল।

কি হয়েছে রে? সতীশ ভয়ে ভয়ে শুধাল।

কি হয়েছে! পিনকি যেন শবাগার থেকে উঠে আসা মমির মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কি হয়েছে এখনো তোমাকে খুলে বলতে হবে সতীশদা। কি হয়েছে তুমি জান না? পিনকি চোয়াল শক্ত করে খিস্তি করতে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে বলল, আমাদের লিস্টে নাম রয়ে গেছে তোমার, বুঝতে পারছ?

পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন রসিকতা বলে মনে হল সতীশের। ফলে দুর্বলতাটুকু চাপা দেবার চেষ্টা করে গলায় কৌতুক মিশিয়েই সতীশ শুধাল, লিস্টে! কোন্ লিস্টে আবার নাম উঠে গেল আমার?

অপরিচিত লোকটি সহসা একটা ঝকঝকে ছোরা জামার ভেতর থেকে বার করে এনে সতীশের সামনে তুলে ধরল। সতীশের চোখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুহূর্তেই। ঘটনাটা যে সামান্য নয়, অত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার নয়, বুঝতে অসুবিধা হল না ওর। বুকের ঠিক যে জায়গায় ছোরাটাকে তাক করে ধরে রেখেছে ওরা সে জায়গায় কেমন যেন সুড় সুড় করে চরকি খেয়ে উঠল। সারা গায়ে সজারুর কাঁটার মত কিরকির করে লোম গজিয়ে উঠল ওর। ভয়ে, বিস্ময়ে কেমন যেন কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, তবু মাইডিয়ারী গলায় বলবার চেষ্টা করল, এই পিনকি, কি করছিস তোরা, লেগে যাবে যে!

পিনকি জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল বার কয়েক। জানের জন্য খুব মায়া হচ্ছে, না সতীশদা? তারাপদবাবুর ব্যাপার নিয়ে পুলিসের কাছে চুকলি কেটেছ কেন? মনে আছে?

পুলিসের কাছে! আমি! সতীশ যেন আকাশ থেকে পড়ল। যাহ্ মাইরী, তোরা শেষ পর্যন্ত ভুল ঘোড়ায় বাজি ধরেছিস।

পুলিসের লোকই নাম বলেছে তোমার।

অসম্ভব। হতে পারে না। হঠাৎ আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সতীশ, অপরিচিত লোকটা হাঁটু চালিয়ে ওর পেটের নিচে একটা কোঁৎকা মারল, চেঁচালে শালা এখনি এটাকে বাঁট সুদ্ধ গুঁজে দেব। চোপ্!

কান্না পেল সতীশের। মাইরী পিনকি, বিশ্বাস কর, কোন কিছুই জানি না আমি। যদি আমি পুলিসকে কিছু বলে থাকি, মাইরী আমার কুষ্ঠ হবে।

কি হবে! ছায়াছবির পর্দায় দেখা মমির মত অবিকল মনে হচ্ছিল পিনকিকে। শত সহস্র ফাটল ধরা জীর্ণ একটা দেহ নিয়ে পিনকি ওর সামনে দাঁড়িয়ে বিকৃত গলায় হেসে উঠেছে। ওর চোখ পড়ল পিনকির ঝুলন্ত হাতের দিকে। হাতের আঙুলে

শক্ত করে জড়ান রয়েছে লোহার পাঞ্চ। একটা শটেই ছিটকে গিয়ে নর্দমায় গড়িয়ে পড়তে পারে সতীশ।

ইচ্ছে হল ঘপাত করে পা দুটো ও জড়িয়ে ধরে পিনকির। বাড়িতে ওর বউ রয়েছে, রয়েছে আড়াই-বছরি একটা বাচ্চা। এ তো আর সতীশকেই শুধু খতম করা নয়, ও দুটোকেও স্রেফ লেড়িকুত্তা বানিয়ে ছাড়া।

পাড়ায় তোমাকে ভালমানুষ, ভেজা বেড়াল বলেই জানতাম সতীশদা, কিন্তু পুলিসের কাছ থেকে পয়সা খেয়ে ভেবেছ খুব পার পেয়ে যাবে, তাই না!

সতীশ গলা নিচু রেখেই প্রতিবাদ করে উঠল, মিথ্যে কথা। স্রেফ বানানো কথা ওগুলো। পুলিস দেখলেই আমার পেচ্ছাব পেয়ে যায়, জানিস—তোদের কাছে মিথ্যে কথা বলব না বলেই বলছি।

তারাপদবাবু যে পুলিসের টিকটিকি ছিল জান না তুমি?

তোরা মাইরী এমন করছিস—আমি ওসব কিছুই জানি না। বিশ্বাস কর—

ছোরার ডগাটা এখন চামড়ার সঙ্গে লেগে আছে। একটু নড়তে গেলেই বুকের মধ্যে বিঁধে যাবে। পুকুরের জলে ঢিল পড়লে যেমন হয়, ছোরার ডগা থেকে তেমনি করে সারা গায়ে ওর ঢেউ গড়াচ্ছে। ঘাড়ের পাশে ঢেউগুলি এগিয়ে এসে যেন চড়াত চড়াত করে ভেঙে পড়ছে। সত্যি সত্যি চালিয়ে দেবে না তো ছোরাটাকে। পিনকিদের পক্ষে এ সব কাজ যে এতটুকু কঠিন নয় সতীশ জানে। তবু বিশ্বাস করতে কেমন যেন খটকা লাগছিল ওর। তা হোক, এখনো ওরা সতীশদা বলেই সম্বোধন করছে ওকে।

সতীশ ঝকঝকে ছুরিটার দিকে তাকাল। ইস্পাতের ফলার দুটো দিকই ব্লেডের মত ফিনফিনে মনে হল ওর। শুধু ছুঁইয়ে দিতেই যেটুকু সময়। এ সময় শালা আশেপাশের বাড়িগুলোও কেমন ঝিম মেরে ঘুমিয়ে আছে দেখ। দরজা খুলে লাঠি-সোটা নিয়ে হই হই করে বেরিয়ে পড়ছে না কেন সবাই। অন্তত ঐ হলুদ রঙের কোণের বাড়ির জানালাটাকে বার তিনেক তো খুলতে দেখল আবার বন্ধ করতেও দেখল সতীশ। মেয়েছেলেগুলো বোধ হয় জানালার ধারেই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্য করছে ওদের। সতীশের কেমন কুলকুল করে বমির উদ্রেক হল। পচা লাশের গন্ধও বোধ হয় মিশে আছে, পচা নর্দমার ভুসভুসে গন্ধটাই যেন ওকে ঘিরে ধরেছে এ সময়। তারাপদবাবুর পচা লাসের গন্ধও বোধ হয় মিশে আছে ওর ভিতর। সতীশ নিশ্বাস নেওয়া বন্ধ করল।

হ্যা, তারাপদবাবুই যত ঝামেলা বাধিয়েছে ও বুঝতে পারছে। অথচ লোকটার সঙ্গে সতীশের যোগাযোগ না রেখেও উপায় ছিল না। মালতীর শেষ সম্বল বালা দুটো লোকটার কাছেই বন্ধক রেখেছিল ও। সে আজ মাস পাচ ছয় আগের কথা। সুদের চোট সামলাতে সামলাতে জিভ বেরিয়ে যাচ্ছিল ওর। ফলে মাঝে মাঝেই লোকটার কাছে আসতে হত সতীশকে। সে সময় হয়তো দেশকালের অবস্থা নিয়ে গল্পসল্পও হত। আট পার্টির জোর বাড়ছে, না ছ' পার্টির, নাকি আবার নাক ঘুরিয়ে রাবণ রাজাই রাজ্য চালাবে সে সব কথাই ফেদে বসত লোকটা। সতীশ অত পার্টি-ফার্টির ঝামেলায় থাকতে চায় না। যে যতই পার্টি কর বাবা, আলু দেড় টাকা, কুমড়ো এক, চাল আড়াই। চালের কথায় ওর মনে পড়ে যায়, চাল পাচারকারী সেই মেয়ে, সন্ধ্যার কথা। লাইনে হাজার হাজার মেয়ে চাল নিয়ে ছুটোছুটি করছে কিন্তু সন্ধ্যাকেই কেমন যেন ওর মনে ধরেছিল, দেখা হলেই লজেন্স নিয়ে সাধত সতীশ, খাবি? মেয়েটাকে ও লজেন্স খাওয়াত বিনি পয়সায়, মেয়েটা খাওয়াত ওকে সুপুরিকুচি। সেই সন্ধ্যা

পুলিসের কাছে তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে জীবনটাকেই শেয়াল-কুকুরের মত বিলিয়ে দিল। এত সাবধান থাকা সত্ত্বেও দেহটাকে বাইরের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে পাদানির কাছে নিজেকে লুকোতে গিয়েছিল ও! ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিল দশ বিশ হাত দূরে। পানাকচুরির মধ্যে। নে, কত চাল পাচার করবি এবার কর। আসলে লাইনটাই বড় রিস্কের!

অথচ এই রিস্কের ভিতর দিয়েই সতীশকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে বড় কৌশলে। কৌশল বইকি! তবে পিনকিদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সতীশ কেমন যেন হিমসিম খেয়ে উঠছে এখন। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ওর।

পিনকি শুধলো, তারাপদবাবুর কাছে আমাদের নামে ফুসুর ফুসুর করনি তুমি?

কক্ষনো না। সতীশ আকুতি মিশিয়ে প্রতিবাদ করল।

অপরিচিত লোকটা রাগে দাঁতের উপর দাঁত ঘষে নিল একবার। মুখটা ওর কার্টুনের মত বাঁকা হয়ে উঠল। ঐ অবস্থাতেই ও ছোরাটাকে আরো খানিকটা সাটিয়ে ধরল ওর পাজরার কাছে, ভ্যানতারা আর ভাল লাগছে না র পিনকি। ছেড়ে দিবি তো দে। নইলে বল কিচাইন করে কেটে পড়ি।

পিনকি আর একটু ধৈর্য ধরবার জন্য হাত তুলেছিল, কিন্তু কতগুলি ঘটনা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা করে না। গলির মুখ থেকে সাঁ সাঁ করে দুটো কুকুর দৌড়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল ওদের। পিনকি হাতের পাঞ্চ সমেত বো করে ঘুরে দাড়াল, আর সেই মুহূর্তেই সতীশ বুঝতে পারল, ওর বুকের ডান অথবা বা যে-কোন একটা দিক দিয়ে ছোরাটা আমূল ঢুকে গিয়ে আবার রক্তের চাপেই পিছলে বেরিয়ে আসছে।

ওর মুখটা শুয়োরের মত ছুঁচলো হয়ে গেল এর পর। হাত-পাগুলো ছোট ছোট। পেটের দিকটা পাম্প খেয়ে ফুলে ওঠার মত, রক্তে রক্তে একাকার হয়ে লাইটপোস্টের গোড়ায় আস্ত একটা শুয়োরের মতই পড়ে রইল ও।

আর, এ অবস্থায় ও লক্ষ্য করল, আশেপাশে অনেকগুলি জানালা থেকেই গোপনে গোপনে কারা যেন ওকে লক্ষ্য করছে। ভাগ্যিস ফুটফুটে আলো নেই এখানে, নইলে এখনকার এই সতীশ বেচারার অবস্থা দেখে হাহা হিহি করে হেসে উঠত সবাই। হাসত, আর আঙুল তুলে দেখাতে দেখাতে বলত, বাঁচতে হয় কেমন করে শেখেনি লোকটা, দেখেছ।

পেটের ভিতরে গনগনে লোহার শিকটা ওর নাড়িভুঁড়িগুলো পুড়িয়ে পুড়িয়ে কেমন খাক করে দিচ্ছে এখন। কুতকুতে চোখে সতীশ এপাশে ওপাশে তাকাবার চেষ্টা করল। চোখ তো নয়, লোহার দরজা। যেন মরচে পড়ে গেছে, খুলতেই চায় না। অথচ একটা কোন পুলিসের গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্সের জন্যই যেন অপেক্ষা করত হবে এখন। হর্ন বাজাতে বাজাতে গাড়িগুলো এগিয়ে এলেই যেন সতীশ বাঁচোয়া।

স্ট্রেচারে ওর বডিটাকে তুলতে তুলতে হয়ত ওর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়বে কেউ, ও মশাই, শুনতে পাচ্ছেন, আপনি কি ওদের চিনতে পেরেছিলেন? নাম বলুন না দু'একজনের।

সতীশ হয়ত পিনকির নামটাই বলবে বলে ভেবে রাখছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ল, পুলিসের কাছে চুকলি কাটায় বিপদ অনেক, বিশেষ করে পিনকির নাম। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে হয়। তার চেয়ে বরং স্রেফ মাথা নেড়ে দেব, উঁহু, কাউকেই মশাই চিনি না আমি। আপনাদের যেমন চিনি না তেমনি ওদেরও আমি চিনি না। আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দেবেন এখন।

কিন্তু পুলিসও শালা তেমনি কেউ। বকর বকর চালিয়েই যাবে কানের কাছে। তাড়াতাড়ি নাম ঠিকানা বলে ফেলুন দেখি। বলুন, বলুন। মানে, ওদের মতলবখানা যেন এরকম, তাড়াতাড়ি সতীশ মরে গেলে ওর বডিটাকে সনাক্ত করে যেন বরফ চাপা দিয়ে ফেলে রাখতে না হয় বেশী দিন; সতীশের বালবাচ্চার কাছে বডিটাকে চালান করে দিতে পারলেই যেন খেল খতম।

পুলিস দেখলেই পিলে চমকায় সতীশের। সতীশ নাম বলবে, ঠিকানা বলবে। বলবে, দেখুন তো আমার মুখটা শুয়োরের মত ছুঁচলো দেখাচ্ছে কি না?

ততক্ষণে স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নেওয়া হবে ওকে। স্ট্রেচারের নীচে চাকা লাগান, অ্যাম্বুলেন্সের ঝোলানো রেলে চাকাগুলো লাগিয়ে দিয়ে সুরুত করে ভিতরে ঠেলে দেওয়া হবে।

সতীশ হয়তো এ সময় দড়াম করে কোন কিছুর সঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে খানিকটা কাত হয়ে পড়বে, সে দিকে কারো ভ্রূক্ষেপই থাকবে না। সব শালা ডিউটি করে। এদের ডিউটি হচ্ছে স্পট থেকে হাসপাতাল অবধি নিয়ে যাওয়া। পথে যদি মরেই যায় সতীশ কার কিবা এল গেল। সতীশ মরে গেলে ডাক্তার একটা সারটিফিকেট লিখে দেবে খস্‌খস্ করে, সতীশ ডেড।

সতীশ ডেড। বেশ তো, সতীশ না-হয় মরেই গেল। এবার ওর বউ আর বাচ্চাটার হাতে ছেড়ে দাও দেখি বডিটা। কিন্তু মরেও কি কারো শান্তি আছে, পুলিসের কাজ পুলিস করল, ওদিকে পাড়াময় খবর ছড়িয়ে গেল সতীশ খতম। সতীশ হো গিয়া, মরগে পৌঁছে গেল সতীশ।

দরজা ঠেলে সতীশকে মরগের ভিতর ঢোকাতেই টের পাওয়া গেল বরফের মত ঠাণ্ডা জমে আছে চারপাশে। মিনমিন করা আলো, থরে থরে সাজান রয়েছে টেবিল। সেই টেবিলে উদোম ন্যাংটা হয়ে শুয়ে আছে সব মানুষ। সতীশকেও শুইয়ে দিয়ে কে যেন চোরের মত ওর জামাকাপড়গুলো খুলে নিয়ে পিটটান মারল।

সতীশ হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। মরেই যখন গেছে ও, ন্যাংটো থাকতে আর ক্ষতি কি। কিন্তু মরগের বাইরে কারা যেন এ সময় গলা ফাটিয়ে চেচাচ্ছে শুনতে পাচ্ছে সতীশ। কমরেড সতীশ জিন্দাবাদ। খুনকা বদলা খুন হ্যায়, জানকা বদলা জান। একজন বিলম্বিত লয়ে সুর করে চেঁচাচ্ছে, কমরেড সতী-ঈ-ঈ-শ— আর সকলে ধুয়ো তুলছে, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

সতীশের খুব কৌতূহল হল। টেবিল থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর দরজা ফাঁক করে একটু বাইরের দিকে তাকাল। তাকিয়েই থাকল। অনেককেই ও চিনতে পারছে এখন। ওদের পাড়ার মিহিরবাবু এক হাতে কোচা সামলিয়ে তারস্বরে বক্তৃতা ঝাড়ছে, দেখতে পেল সতীশ। মিহিরবাবুর সঙ্গে ভোটের সময় আলাপ হয়েছিল ওর। ভোটার লিস্টে সতীশের নাম ছিল না। মিহিরবাবু বুঝি তাইতেই আগ্রহ দেখিয়ে সতীশকে দিয়ে একটা ফলস ভোট দিইয়েছিলেন। সে একটা মজার অভিজ্ঞতা ওর।

মিহিরবাবু বলছেন, সতীশ ছিল আমাদের লোক। আমাদের পারটির একজন কর্মী। তাকে যারা নৃশংসভাবে হত্যা করল, বন্ধুগণ, আমরা তাদের ক্ষমা করতে পারি না।

সতীশ এখন ন্যাংটো হয়ে আছে বলেই বাইরে বেরিয়ে ঠাস করে লোকটার গালে একটা চড় কষাতে পারছে না। বেড়ালের মত পা ফেলে ফেলে দরজাটা ভেজিয়ে রেখে আবার ও টেবিলে এসে শুয়ে পড়ল।

ফুলের মালা নিয়ে এসেছে লোকগুলো। হয়ত সতীশকে নিয়ে ওরা মিছিল করবে। ওরা বলাবলি করছে, সতীশ মরেনি। শহীদ হয়েছে সতীশ। ভালই হল, মরে গিয়ে তো আর কিছুই হওয়া যাচ্ছিল না, শহীদ হওয়া গেল। সতীশ আবার মনের সুখে দাদের মলমের বিপিনের ছড়াটাকে আওড়াতে শুরু করল, চুলকাইতে বড় সুখ, সুখ রে—

কিন্তু সতীশের মনে হচ্ছে, বাইরে যেন হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। সবাই কেমন চুপ মেরে গেছে। হঠাৎ এরকমভাবে উত্তেজনা থেমে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারল না ও। অপেক্ষা করল। চারপাশে তাকাল, উদোম ন্যাংটো ছেলে মেয়ে বুড়ো, দশাসই জোয়ান আর যুবতী ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে। সব শালাই চিত্ত নয়, কেউ চিত, কেউ কানকি মেরে এক পাশে হেলে, কেউ বা উপুড় হয়ে। সব শালাই কটমট করে তাকিয়ে নেই, কেউ হাফ-চোখে, কেউ ফুল, কেউ বা আবার পুরোটাই বুজে রেখেছে চোখ। কারো মাইয়ের ছায়া পড়েছে পেটের দিকে, কারো হাঁটু চকচক করছে আলোয় কলাগাছের মত। বেশ সুখেই আছে মনে হচ্ছে সবাইকে।

সতীশ ঠিক কোন পজিশন নিয়ে শুয়ে থাকবে বুঝতে পারল না। হঠাৎ ওর কানে এল বাইরে যেন আবার গোলমাল শুরু হয়েছে। তবে কি এবার ভিন্ন আর একটা দল এল মালা নিয়ে? এক হাতে মালা এক হাতে বল্লম। হয়তো এবার পিনকিদের দলটাই এসেছে পার্টির ফেস্টুন নিয়ে। হয়তো এবার পিনকিই বক্তিমে ঝাড়বে, প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে খুন হয়েছে সতীশ, এ অত্যাচার বাংলা দেশ সইবে না। বন্ধুগণ- - -

কানে তুলো গুঁজে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হল ওর। পারল না। বাইরে হয়তো দু' দলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে শান্তিরক্ষা করছে পুলিস। কিন্তু এমন মজার দৃশ্য দেখবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করল না সতীশ।

বরং সতীশ পাশের ধুমসী মাগীটার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। নাকের দিকটা ধ্যাবড়া হয়ে আছে মাগীটার। শোবার সময় কোকড়ান চুলগুলো টেনে এনে মাইয়ের উপর ফেলে রেখেছে। ময়দার তালের মত মাংসপিণ্ড দুটো উঁচু হয়ে আছে। যেমন মাই আর তেমনি ভুঁড়ি। ভুঁড়ি, না পেটে বাচ্চা আছে বুঝতে পারল না সতীশ।

মহিলাটিও গটমট করে সতীশের দিকে তাকাল। সতীশ সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে ভিন্নমুখী হল। দেখল, আর এক পাশে, দেহের সঙ্গে গলাটা সরু একটু চামড়ায় লেগে ঢুলঢুল করছে লোকটার। কেউ হয়তো সড়কি চালিয়ে গলাটাকে পুরোপুরি নামিয়ে দিয়েছিল ওর। সতীশ চুকচুক করে জিভ নাড়ল, আহা বেচারা।

লোকটা কেমন গৌতম বুদ্ধের মত হাসি ছড়িয়ে রেখেছে চোখে। বাণী দেওয়ার মত করে বলল, সাত দিন ধরে পড়ে আছি দাদা, নো ক্লেম। পুলিসও আমার কিনারা করতে পারছে না কিছুই। বেশ ভালই আছি এখানে।

সতীশ উঠে বসল। পায়ের দিকে নজরে পড়ল, আঠারো বছরের একটা ছেলে। ছেলেটার দিকে তাকাতে না-তাকাতেই শুনতে পেল সতীশ, ছেলেটা বলছে, পাইপ গান চেনেন, আমি পাইপ গানে প্রাণ দিয়েছি। ক্ষতি নেই, কিন্তু আরো কয়েকটাকে খতম করে মরতে পারতাম তো শান্তি হত।

ওরই পাশাপাশি আর একটি ছেলে, উৎসাহে চিঁহি চিঁহি করে বলল, আমি বোমায়। মুখটাকে এপাশে-ওপাশে নেড়ে চেড়ে দেখাল, ভেজা পাউরুটির মত ল্যাতপ্যাত করছে ওর চোয়াল আর গলা।

তাকাতে কেমন ঘেন্না হচ্ছিল সতীশের। উঠে দাঁড়িয়ে এপাশে ওপাশে খানিক হাটল। বাইরে ততক্ষণে চেল্লাচেল্লির কম্পিটিশন লেগে গেছে। ভেতরে ও সব বালাই নেই।

হিমঘরে হিম হয়ে আছে বডিগুলো। কারো নিতম্ব পাহাড়ের মত উঁচু, কারো মুখে দাড়িই গজায়নি এখনো, কারো আঁকা জ্রর কারিকুরিগুলো ধেবড়ে একাকার হয়ে ধরা পড়ে গেছে।

আট দশ বছরের একটা মেয়ের দিকে চোখ পড়ল হঠাৎ। মেয়েটা অমনি ঝটপট করে বলে বসল, আমারটা হচ্ছে রেপ কেস। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে একজন মধ্য-বয়সী গ্রীসিয়ান ফেস ভদ্রলোক, যার বুকের মাংস পাকা কুমড়োর মত দেখাচ্ছে, তড়বড় করে বললেন, আমার কিন্তু কোনও পলিটিক্যাল ব্যাপার নয় মশাই। আমারটা স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট। ব্রেক ফেল করেছিল।

আপনার? বুড়োমত এক ভদ্রলোককে শুধোল সতীশ। ভদ্রলোকের মুখভর্তি শুভ্র দাড়ি: মাথায় বাবরি, অনেকটা ঠিক রবি ঠাকুরের পাথরের মূর্তির মত দেখাচ্ছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা পদ্য ওর মনে পড়ে গেল, শুধু বিঘে দুই, ছিল মোর ভুঁই। আর সবি গেছে ঋণে---

ভদ্রলোক কেবল মিটমিট করে হাসছিলেন। বললেন ওপাশে যাও, ওপাশে বিদ্যা-সাগর মশাই পড়ে আছেন। ওকেই জিজ্ঞেস করে এসো।

বিদ্যাসাগর! সতীশ উৎসাহে ---বিদ্যাসাগরের দিকে এগোতে গিয়ে আগেই একটা টেবিলের উপর নেতাজীকে পড়ে থাকতে দেখল।

নেতাজী খানিকটা ফৌজী কায়দায় ধমকে উঠলেন; দেখতে পাচ্ছ না, কী ভাবে পড়ে আছি। ফাজলামো করার আর সময় পাও না, না? এই দেশটার জন্যই কিনা আমি জীবন শপথ নিয়েছিলাম!

সতীশ লজ্জা পেয়ে সরে এল। আর বুঝতে পারল চারপাশ থেকে হই হই করে সবাই এখন ওকেই প্রশ্ন করছে, আপনি? আপনার কি হয়েছিল বলুন?

কিছুটা আমতা আমতা করে সতীশ পিনকির নামটাই বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিনকির নামে চুকলি কাটার পরিণতির কথা ভেবে বিষণ্ন গলায় বলল, আমার কথা শুনলে আপনারা হাসবেন। আসলে আমাকে একটা শুয়োরের মত দেখায় বলে ভুল করে চাকু চালিয়ে দিয়েছে এক আততায়ী। হে হে---

সতীশ অনুভব করল, সত্যি সত্যি ওর মুখটা শুয়োরের মত লম্বা। হাত-পাগুলো ছোট ছোট, পেটের দিকে চর্বিঠাসা পুরুমত চামড়া। অবিকল একটা শুয়োর।

ফলে বিষণ্নভাবে সতীশ নিজের টেবিলে এসে শুয়ে পড়ল। স্যাঁতসেতে হিমের মধ্যে আর নড়তে ইচ্ছে হল না ওর। তবু চোখ পিটপিট করে ও দেখল, টেবিলে টেবিলে দেহ, বিকৃত, বীভৎস, উদোম ন্যাংটো। চালচুলো সব কেমন একাকার হয়ে গেছে সবার।

আর এইসব দৃশ্য দেখে বুকের ভিতরে ঝিমঝিম-করা একজাতীয় অস্থিরতা বোধ করল সতীশ। মুখ বাঁকা করে অনেকটা ঠিক বিপিনের মতই প্যাঁক দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল ওর। কিন্তু মরে গেলে প্যাক দেওয়ার আর অধিকার থাকে না বলে সতীশ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। হিমঘরে দুলে দুলে হিমবাতাস বইতে লাগল। সতীশ চোখের জলে আঁকাবাকা অক্ষরে লিখল, সে বাঙালী, ১৯৭০ সালের কোনও এক সন্ধ্যায় চোরাগোপ্তা খেয়ে সে মারা গেছে। মরে গিয়েও এই দেশেই সে আরো একবার জন্ম নিতে চায়। এই মাটিতে, এই ধুলায়, এই কলঙ্কে। তারপর ভাঙা গলায় অস্পষ্ট করে হঠাৎ গান গেয়ে উঠল: বঙ্গ আমার---



সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

জন্ম: ১৯৩০, খোসবাসপুর, মুরশিদাবাদ। ছোটবেলা কেটেছে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে। বিচিত্র সব জীবনের সাক্ষী হয়ে আছেন সৈয়দ মুস্তাফা। ১৯৬৪ সাল থেকে এই লেখক কলকাতায়, এখন সাংবাদিকতার পেশায় নিযুক্ত।

এ-যাবৎ তাঁর বলার কথা একটিই—কোনও চলমান যান থেকে নেমে যাওয়ার পরও তার গতি গায়ে লেগে থাকে। একটি কিশোর তার দাদুর কাঁধে চড়ে ছোটবেলা কবর দেখতে গিয়েছিল। সেই গতি আজও তার গায়ে লেগে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে কবরের দিকে চলেছে—এই রকম একটি আশ্চর্য লেখা একদা লিখেছিলেন এই লেখক। যদিও তিনি বলেছিলেন, তাঁর বলার কথা একটিই, তবু বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা জানেন, অজস্র তাঁর বক্তব্য বিষয়। গ্রাম্য, আদিম, সরল জীবনই শুধু তাঁর রচনার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে নেই, আছে আরও বহু কিছু। গভীর কোনও উপলব্ধি, মৃত্যু সম্পর্কে কোনও মোহাচ্ছন্নতা, কামনা-বাসনার দুরন্ত কোনও চলচ্চিত্র তাঁর লেখার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আর গদ্য? তাঁর গদ্যের শরীরে কবিতা থাকে না, কবিতা থাকে গদ্যের বুকের ভিতরে। এক-একটা গল্পে হঠাৎ এক-একটা লাইন দর্শন হয়ে ওঠে, পাঠককে কাঁপিয়ে দেয়।

তাঁর 'কিংবদন্তীর নায়ক' এক সময় খুব জনপ্রিয় হয়। 'উত্তর জাহ্নবী' দৃষ্টি কেড়ে নেয় সকলের। 'তৃণভূমি', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'এখন অন্ধকার', 'নিশিলতা' প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'রাণীর ঘাটের বৃত্তান্ত', 'মৃত্যুর ঘোড়া', 'ইন্তি, পিসি ও ঘাটবাবু', 'গাজনতলা', 'কালবীজ' কয়েকটি গল্পের নাম। অজস্র পাঠকের ভালোবাসার পুরস্কারে পুরস্কৃত এই লেখক।

অজস্র গল্প লিখেছি। তাদের মধ্যে 'সূর্যমুখী' কেন আমার কাছে শ্রেষ্ঠ, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারব না। তাছাড়া এখন এ-মুহূর্তে একে আমার লেখা শ্রেষ্ঠ গল্প বলছি বলে পরের কোনো মুহূর্তেও এ গল্প আমার কাছে, শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকবে, তার এতটুকু গ্যারান্টি নেই। তবে একথা বলতে পারি, 'সূর্যমুখী' আমার মূল মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব নিঃসন্দেহে করতেই পারে। আমার প্রিয় স্মৃতির বিষয় ধু ধু মাঠ। রাঢ়বাংলার এইসব মাঠ অধুনা হয়তো তথাকথিত সবুজবিপ্লবের ফলে বারোমাসই সবুজ এবং পূর্ণ হয়ে থাকছে। কিন্তু আমার ছেলেবেলায় সে-মাঠ স্মৃতিতে তেমনি ধু ধু নির্জন বৃক্ষবিরল একটি বিশাল ব্যাপকতা হয়ে থেকে গেল। আমার অধিকাংশ গল্পে এই মাঠ উপস্থিত হয়েছে কখনও পরিপ্রেক্ষিত, কখনও চরিত্র হয়েই।

এইসব মাঠকে কেন্দ্র করে রাঢ়ের গ্রামীণ মানুষের মনেও অনেক কিংবদন্তী, অনেক মিথ, অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী জমা আছে। 'সূর্যমুখী'-র মাঠের নাম 'ধুলোউড়ির মাঠ'। তার বিশদ বৃত্তান্ত গল্পেই আছে। এ মাঠে জীবনের কতকিছু হারিয়ে আসতে হয়, কতকিছু কুড়িয়েও পাওয়া যায়। এখানে অনেক অলৌকিকতা আছে। এক গাঁওবুড়ো আমাকে বলেছিল, 'ধুলোউড়ির মাঠে জ্যোৎস্নারাতে পরী নামে।'

'সূর্যমুখী'তে ধুলোউড়ির মাঠে দুটি মানুষের কথা আছে, যারা গৃহাভিমুখী। একজন নিঃসঙ্গ পুরুষ, আর এক আত্মবিশ্বাসী সাহসী গ্রামবধূ। গল্পের থিম এখানে বলার প্রয়োজন দেখিনা, পাঠক সেটা খুঁজে বের করুন—যদি তাঁর ভাল লাগে। আমার বাড়তি কথাটা শুধু এই: প্রকৃতি মানুষকে কাছে পেলেই কী এক সূচে তার অস্তিত্বকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলে। এটা আমি জানি। আক্রান্ত হয়েছি বারবার। সেই যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা এ গল্পে করেছি। তাই এ গল্প আমার কাছে এত প্রিয়, এত শ্রেষ্ঠতাময়। এর বর্ণনাভঙ্গীতে আগাগোড়া আমি লোকসঙ্গীত-সমাচ্ছন্ন কথকতার ধাঁচ অনুকরণ করেছি। আরোপ করেছি প্রকৃতিসংসর্গজাত সৌন্দর্যবোধসমূহ। 'সূর্যমুখী'-র ঘটনাকাল চৈত্র। আমার প্রিয় মাস। আমার অধিকাংশ লেখায় চৈত্রের ছড়াছড়ি আছে। এমাসে নিমফুল ফোটে। এ গল্পে সেই নিমফুলের অলীক গন্ধ আছে। নিমফুলের প্রতি আমার আসক্তি গভীরতর। ব্যক্তিগত এই আসক্তিকে এত জোরালো করে আর কোনো গল্পে মেশাতে পারিনি।

'সূর্যমুখী' আমার কাছে 'শ্রেষ্ঠ গল্প' কেন, তার সামান্য কিছু কারণ দেখানোর চেষ্টা করলাম। তবু মনে হচ্ছে, শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণটা দেখাতেই পারলাম না। কারণ, ওটা প্রকাশের মাধ্যম ভাষা নয়, বোধ। যার কথা জীবনানন্দ বলেছিলেন।

•

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
১-৮-৭৮

সূর্যমুখী

এ মেয়ে সেই মেয়ে। নবীন খুবই চেনে। পাড়াগায়ের পথে দুপুরবেলার ভিড়ে অনেক সোনামুখ রাঙামুখ চলচলেমুখের এক মুখ। কত নামে নবীন তাদের ডাকে। মুখের নামে ডাকে। আর এই মেয়েই তো বলে, 'কাপুড়ে'র মনে যেন নামের লিস্টি নেকা আছে গো!

হুঁ, এই সেই মেয়ে। কিন্তু কোন্ গায়ের পথে চেনাচিনি, ঠিক মনে পড়ে না। কবে কিছু কিনেছিল কিনা—রাঙা ব্লাউস কিংবা সাদা লেসের নকশাকাটা সুনীল সায়া, অথবা বোনের জন্যে রঙ ঝিলমিল ফ্রক, ভায়ের জন্যে ডোরাকাটা পেন্টুল—বলতে পারে না নবীন। কতজনে তো কেনেই না। শুধু হাত বুলিয়ে রঙ ছোঁয়, নরমতার স্বাদ নেয় টিকোল আঙুলে—আর কত হাতে শাখা-নোওয়া, কত হাতে বেলোয়ারি চুড়ি, কত হাত শূন্য ধূসর ও বিষাদময়।

এ মেয়ে কি কিছু কিনেছিল কোন দিন? দু-চারবার খুঁজে ছেড়ে দেয় নবীন। হাতের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নেয়। সধবার হাত। মুখের দিকে একবার আলগোছে ঘুরে তাকিয়ে নেয়। বিকেলের নিস্তেজ রোদ্দুর উস্কোখুস্কো রুক্ষ চুলের ওপর আচমকা হু হু ফেটে পড়ে এবং জ্বলে যায়। ঘোর লাল আর মারমূর্তি সিঁদুরটা তেড়ে আসে নবীনকে। সে চোখ নামায় পথের মাটিতে। কী নামে ডেকেছিল এই মেয়েকে? সোনামুখী? না—রাঙামুখী, চলচলমুখী? নামের লিস্টিতে কত নাম নেকা আছে নবীনের। ডেকেছিল শশীমুখী বিধুমুখী হাসিমুখী—নাকি মধুমুখী? নিশ্চয় একটা কিছু বলে ডেকেছিল। মনে নেই, মনে পড়ে না। ছটফট করে মনে মনে। এলোমেলো পা পড়ে তার। ধুলোয় ধূসর স্যাণ্ডেল দুটো সরু চিকন খটখটে আলপথে চাপা আওয়াজ তোলে। তারপর আর মন মানে না নবীনের। এই অগাধ নির্জনতা, সুবিশাল মাঠ, এই শান্ত বিকেল—তার মন ছটফট করে।

কী হল, 'কাপুড়ে'? দাঁড়ালে ক্যানে গো?—পিছন থেকে পাখির স্বরে কথা বলে ওঠে মেয়েটি।

একটা কথা।—বলে নবীন কাপুড়ে ঘোরে। খিকখিক করে একটু হাসে।—বনকাপাসি—নাকি ঝাপুইহাটিতে দেখেছিলাম?

মেয়েটি হাসে। ভুরু কুঁচকে বলে, উঁহু—হলেই না।

চণ্ডীতলা?

মরণ আমার! সব থাকতে ওই গাঁয়ে? কথায় বলে—এ গাঁয়ে ভাতার নাই তো নগাঁসিঙাড়!*

কী ঠোঁটকাটা মেয়ে রে বাবা! এই অবেলায় ধু ধু মাঠ—জন নেই মানুষ নেই

* মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের প্রবাদ। লালবাগ মহকুমার একটা থানা নবগ্রাম বা নগাঁ। তার পাশেই সিঙাড় নামে একটা গ্রাম আছে। কেন এ প্রবাদ চালু, জানা নেই। কোনকালে বুঝি ওখানে প্রচুর বর কিংবা স্বামী সুলভ ছিল!—লেখক

গাছ নেই পালা নেই, গায়ে গায়ে চলচল যৌবন এবং পরপুরুষ। নবীন বিবেচনা করে। সে বিব্রতমুখে বলে, শানকিভাঙা?

বুড়ো আঙুল নাচিয়ে মেয়েটি খিলখিল করে হাসে।---হল না, হলই না।

আম্রপাড়া?

চোখ পাকিয়ে সে জবাব দেয়, হুঁ--আর কাজ ছিল না, স্যাখের গাঁয়ে জম্মো।

তাও বটে।---বলে নবীন পা বাড়ায়। আমপাড়ায় তো সবাই মুসলমান। পিঠের বোচকাটায় একটু ঝাঁকুনি দিয়ে সে কুঁজো হয়ে হাটে।

পিছন থেকে মেয়েটি বলে, তাহলে পারলে না তো?

নাঃ, পারলাম না।

হট্ মানছ?

মানছি।

নবীন কাপুড়ে একটু বিরক্ত হয়েছে। হয়তো নিজের ওপর, হয়তো মেয়েটির ওপর। কিন্তু এদিকে কী এক জ্বালায় পড়া গেছে। পিছনে কী টান, কী টান! এ মাঠ যেন মাঠ নয়--নদী। উজানে যেতে বড় কষ্ট হয়। বগলের ফাঁক দিয়ে বাধা বোচকাটা পিঠের ওপর চেপে বসছে আস্তে আস্তে। একটা চাপা কষ্ট শরীরে আর মনে গরগর করছে। নবীনের ঘাম হচ্ছে। কোথায় দেখেছিল--অনেক-অনেক বার দেখা, দরাদরি, ব্লাউস কিংবা সায়া কিংবা ফ্রক কিংবা পেন্টুল, খুব চেনা মুখ-- অথচ মনেই পড়ল না। যেন মনে পড়লে কিছু একটা ঘটে যায়।

কাপুড়ে!

হুঁ, বলো।

কী বলে ডেকেছিলে মনে নাই?

না তো। খুঁজছি।

তাও ভুলে বসেছ! কী মানুষ রে বাবা! ---পিছনে মেয়েটি বড়-বড় চোখে তাকিয়ে আছে, তা নবীন অবিকল দেখতে পায়।

নবীন বিরক্ত হয়েই বলে, কত গাঁয়ে ঘুরি--কত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। অত কি মনে থাকে?

তবে যে খুব চেনা বললে?

হ্যা--বললাম। আমাদের এমন হয়। চেহারা দেখে চেনা লাগে--ওটুকুনই।

মেয়েটি যেন নিরাশ হল। হাসল একটু। কিন্তু কেমন দুঃখিত হাসি।---কপাল আমার! নিত্যিকার চেনা মানুষ দেখে দৌড়ে এসে সঙ্গ নিলাম, তো এ কী বুলি মানুষের! জানো কাপুড়ে, আজ আমার আসাই হত না--তোমাকে না দেখতে পেলে? পিসি একা-একা ছাড়ত ভেবেছ? যা তা লয় বাবা, ধুল্লোউড়ির মাঠ--বুক ফেটে চ্যাচালেও কেউ আসবে না।

মুখ তুলে মাঠটা একবার দেখে নবীন। সামনে পুবে দূরে--অনেক দূরে ধূসর গ্রাম পিছনের পড়ন্ত সূর্যের লালচে রোদ্দুর মুছে ফেলছে গা থেকে। শূন্য ক্ষেতে বন-চড়ুই শালিখ পায়রার ঝাক শস্যদানা থেকে ঠোঁট তুলে অন্যমনস্ক তাকাচ্ছে। দূরে আল কেটে-কেটে তৈরী মরশুমী গাড়িচলা পথে ছইঢাকা একটা গরুর গাড়ি চাকায় চাকায় ধুলো উড়িয়ে চলেছে। আরও দূরে ঘরেফেরা গরুবাছুরের ক্ষুরের চাপে উড়ন্ত পুঞ্জ পুঞ্জ ধুলোর ধোঁওয়া ভাসছে। এই মাঠে চৈত্র থেকেই ধুলো ওড়ে দিনরাত। যেতে

যেতে নখের আঁচড়ে মুঠো মুঠো ধুলো ওড়ায় হাওয়া। ধুলোয় ধুলোয় ঘূর্ণী বয়ে যায় অগ্নিকোণ থেকে বায়ুকোণে—মাথায় তাদের খড়কুটো পাখির পালক শুকনো পাতা আর সাপের খোলস দিয়ে গড়া অদ্ভুত 'মটুক'। এ মাঠ তাই 'ধুলো-উড়ির মাঠ'। দুপুরে এ মাঠে সোনালী ঝড়ের ছবি আঁকা থাকে। থরথর করে সেই ছবি কাঁপে। আর উদাস নিঃঝুম পাড়াগেঁয়ে দুপুরে কাথা সেলাই করতে করতে মেয়েরা গুনগুন করে গায় :

'ধুল্লোউড়ির মাঠে রে ভাই
রোদ ঝনঝন করে।
পানের সখার সঙ্গে দেখা
বেলা দুপহরে॥'- - -
- - -'আর যাব না আর যাব না
ধুল্লোউড়ির মাঠে।
একলা পেয়ে গায়েগতরে
ডংশালে কালসাপে॥'- - -
- - -'ও ছুঁড়ি তোর পিঠে কী
মর্ চোখখাকী তোর তা কী,
ধুল্লোউড়ির মাঠে
বসতে ধুলো শুতে ধুলো
আমি করব কী॥'- - -

তবে কিনা নবীন কাপুড়ে ফেরিওলা মানুষ। সূর্যকে পিছনে নিজের ছায়া সামনে রেখে সে ধুলোউড়ির মাঠ পেরিয়ে গাঁওয়ালে যায়, আবার সূর্যকে পিছনে নিজের ছায়া সামনে নিয়ে সে ধুলোউড়ির মাঠ পেরিয়ে ঘরে ফেরে। সূর্যটি তখন যেমন মাটি ছুঁইছুঁই, ফেরার সময়ও তেমনি মাটি ছুঁইছুঁই—রঙ ঘোর লাল, ডিমের কুসুম। তখন যেমন নবীনের ছায়াটি লম্বা, এখনও তেমনি লম্বা। ধুলোউড়ির মাঠের সোনালী ধুলোমাটির ওপর সে দুবেলায় শুধু বেড়ে যায় আর বেড়ে যায়। নবীন পিঠের বোঝা-টির চাপে একটু ঝুঁকে শুধু ছায়াটিকেই দেখতে দেখতে হাটে। নিজের চেয়ে ছায়াটি বেড়ে যায়, কেবলই বড় হতে থাকে—এ এক আশ্চর্য বটে।

আজ অন্য রকম। তার ছায়ার ওপর আরেক ছায়া। ধুলোউড়ির মাঠের ওপর আজ আরেক ধুলোউড়ির মাঠ এসে পড়ছে। বিকেলের ওপর দুপুরের উৎপাত—সেই সোনালী ঝড়ের ছবি। আর ধুলোউড়ির মাঠটি এখন কাঁসর ঘন্টা। একটু ছুঁলেই চঙচঙ করে বেজে উঠবে ভয় আছে। নবীন সাবধানে হাটে। কী কথা বলে বসল মুখরা মেয়েটি, গা বাজে নবীন কাপুড়ের।- - -যা তা নয় বাবা, ধুল্লোউড়ির মাঠ—বুক ফেটে চ্যাচালেও কেউ আসবে না।

কী একটা হয় নবীনের। গুরগুর করে কোথাও কী চাপা আওয়াজ ফোটে নাকি? যেমন কিনা সারা আকাশ খালি, অথচ দিগন্তের কোণায় চুপিচুপি ঝিলিকি, থমথমে ভাব, সামান্য অবছা ওদিকটা, কোথাও কোন দূরের দেশে নাকি ঝড় চলেছে—ঠিক সেই রকম লাগে।

তখনই শনশন করে একটা হাওয়া এল গায়ে। চুলগুলো দুলতে লাগল। কিছু ধুলো উড়ে গেল সামনে দিয়ে।- - -কাপুড়ে, তাহলে বুঝলে তো?- - -হাটুর ওপরটা ঢাকতে ঢাকতে মেয়েটি বলল।

হুঁ!

চেনা মুখের সাহসে সাহস। তাইতে আসতে দিলে পিসি। কিন্তু ওস্মা!---আবার খিলখিল করে সে হাসে।---এসে দেখি, কাপুড়ে বলছে কি না—আমাদের অমন হয়। কী হয়, কেমন হয় শুনি? হ্যা গো কাপুড়ে, তা হলেও বাপু কথা আছে। কাকেও-কাকেও তো মনে পড়বে? সব্বাই তো এক ছাচে গড়া লয়। না কী?

নবীন ঘোৎ ঘোৎ করে বলে, পড়ছে বই কি মনে।

ছাই পড়ছে। আমাকে তুমি কী বলে ডেকেছিলে, শুনবে? সুজ্জমুখী!

নবীন দাড়ায়। পিছনে ঘুরে বলে, সূর্যমুখী?

হুঁ, সুজ্জমুখী।

অন্যমনস্ক নবীন বলে, ক্যানে?

মরণ। তা তুমিই জানো ক্যান বলেছিলে।

নবীন আবার হাটতে থাকে। উরু দুটো ভারি লাগে তার। বুকের ভিতরে হাতুড়ি পড়তে থাকে। কেন এমন হচ্ছে, সে বুঝতে পারে না। একটু পরে সে বলে, তুমি আগে নাও না বাপু। পিঠে ভার নিয়ে ঘুরতে অসুবিধে হচ্ছে। আগে-আগে চলো, সোজামুখে কথা বলতে-বলতে যাই।

উঁহু।---মাথা দোলায় সে।---বেশ তো যাচ্ছি।

নবীন আবার দাঁড়ায়। শুকনো হেসে বলে, কাজের কথা নয়। এস, এগোও। কথায় বলে, পিছের মানুষকেই পোকায় (সাপ) কাটে!

আর আগে গেলে যে বাঘে খায়, তার বেলা?---সে চাপা হাসে। নবীন একটু সাধে।---আহা, শোনই না কথাটা। পিছনে একটা কিছু হলে জানতেই পারব না।

ভুরু কুঁচকে তাকায় মেয়েটি। নাকের ফুটো মৃদু কাপে। নাকছাবিটা ধু ধু জ্বলে।--কী হবে, শুনি?

কথার কথা। আগে আগে যেতে হয় মেয়েছেলেদের।

রূপ দেখতে-দেখতে যাবে নাকি? ও কাপুড়ে।---বাঁকা ঠোটে হাসে সে।

মলোচ্ছাই!---ফের বিরক্ত হয়ে নবীন পা বাড়ায়।---সূর্যমুখীর মুখ কি পিঠের দিকে নাকি? বলে সে একটু জোরেই হাঁটে।

ধুপ ধুপ শব্দ ওঠে পিছনে।---একটু আস্তে চলো, বাপু। অত রাগ ক্যানে তোমার? কাপড় গছাবার সময় তো দেখি না—তখন মুখে মধু ঝরে যেন।

নবীন রা কাড়ে না। সেই চাপা গুরগুর আওয়াজটা মন দিয়ে শোনে। একবার করে মুখ তুলে আদিগন্ত বিশাল ব্যাপকতাটা মেপে নেয়। নির্জন ধু-ধু ধুলোউড়ির মাঠ। মাথার ওপর বালিহাসের ঝাক চলে যায় শনশন শব্দে। ফিনফিনে রেশমী রোদ্দুরটাও কিছুক্ষণ কেপে ওঠে কুচি-কুচি ছায়ার আঁচড়ে।

হ্যা কাপুড়ে, সেদিন সেই জামাটা দেখলাম—সামান্য দু আনার জন্যে দিলে না, মনে পড়ছে না? বেচে দিয়েছ, না আছে গো?---হুঁ, কাপুড়ের রাগ হয়েছে।

পিঠের ওপর কন্ঠস্বর, যেন দু-কানে এসে শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটানি লাগে—নবীন চমকায়। তবু কথা বলে না। কী জানি, অমর্ত ফুলের ঘ্রাণে আত্মা কোটরে সাপের মতন নড়ে ওঠে।

চপলতা করে সে পিছনে।---একবার তোমার বুলিটা শোনাও না বাপু। ফ্রক-সায়া-বেলাউস! ফ্রক-সায়া-বেলাউস।

পিছনে অদৃশ্য ফুলের বনে ঝড় বইছে। ফুলের বনে এখন সোনালী ঝড়ের ছবি—ধুলোউড়ির মাঠে একটা দুপুর থরথর করে কাপছে। নবীন নীরবে দরদর ঘামে।

আর কী বলো যেন?---'নীলাম নীলাম! কী নিলাম?' 'পছন্দ!' 'নীলাম নীলাম। কি নিলাম?' 'পয়সা!' পাখির বুলি শিখেছ বাপু! আহা, বলোই না একবার, ও কাপুড়ে! 'নিলাম পয়সা, দিলাম কী?' তারপর কী বলো যেন?---ছাই, মনে পড়ছে না। নিলাম পয়সা, কী দিলাম---ও কাপুড়ে, কী দাও বলো না?

নবীন হঠাৎ ফেরে, চোখ দুটো কাপে—বলে, নিলাম পয়সা দিলাম রূপ-যৌবন।

পলকে লজ্জায় রাঙা 'সূর্যমুখী' মুখ নামায়।---যাঃ!

হ্যা, তাই তো দিই।

তুমি বড্ড কী যেন। যাও!

নবীন বলে, সেই জামাটা দেখবে না?

এখন পয়সা নেই সঙ্গে।---মুখ নামিয়ে সে পা বাড়ায়। কণ্ঠস্বর কাপছিল।

পয়সা পরের কথা।---নবীনের কণ্ঠস্বরও কাপে। অমন জিনিস কখন কোথায় কার হাতে চলে যাবে, ঠিক নেই। কোন প্যাচামুখীর ময়লা গতরে।---ছ্যা, ছ্যা! কেন মনে খেদ থেকে যাবে—সূর্যমুখী বলে ডেকেছি। এস, দ্যাখো।

নবীন বোঁচকাটা আলের ওপর ঝকঝকে কঠিন মাটিতে ধুপ করে ফেলে দেয়। পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে। ছোট্ট আকন্দ ঝাড়ের কাছে মেয়েটি দাঁড়িয়ে গেছে। আলতারাঙা পায়ের আঙুলে শুকনো ঘাস টানে সে। ঘাস দেখে। চিবুক বুকে বিধে থাকে। খোঁপা সামান্য টলে পড়ে চৈত্রের হাওয়ায়। রুক্ষ উরুলিঝুরুলি কিছু চুল ওড়ে কানের পাশে, কপালের ওপর। নাকের ডগায় ঘামের ফোটা টলটল করে। নাকছাবিটা হু হু জ্বলে যেতে থাকে। দুটো বাহু এসে তলপেটের নিচে মিলে থাকে, আঙুলে আঙুল জড়ানো। কী বাহু, নাকি দুটো লাজুকতাময় নরম প্রতিরোধ। কী বুক, ওঠে পড়ে, শ্বাসপ্রশ্বাসে পুষ্পের ঘ্রাণ, অসামান্য সুখরক্ষর দুটি স্বাদু ফল। আর নবীনের মনে হয়, ওখানে কোথাও জল দাঁড়ায় না, রেশমি ব্লাউস পিছলে খসে পড়ে যায়। আর রক্তে কাতর হতে থাকে নবীন কাপুড়ে, মাংসে ছটফট করে তার ফেরিওলার আত্মাটা। সে বলে, হ্যা, দেখ—দেখতে দোষ নেই। সব—সব দেখ, যা পছন্দ হয়। এইটে, এইটে---কিম্বা এইটে---। একটার পর একটা রঙিন ব্লাউস বের করে তুলে ধরে সে। দাতে হাসি চকচক করে। ---কী হল? সূর্যমুখী বলে ডেকেছিলাম, তুমিই বললে। তাই ডাকছি সূর্যমুখী, রাগ করলে নাকি? আর লজ্জাই বা কিসের? ধুলো-উড়ির মাঠের এ বাজারে আর তো কেউ নাই! শুধু দুজনা—তাই না সূর্যমুখী? তুমি একলা খদ্দের, আমি একলা দোকানদার। কী বলো,---ঘোৎ ঘোৎ করে হাসে নবীন।

আড়চোখে তাকিয়ে আছে সূর্যমুখী, নবীন টের পায়। নবীন 'কাপুড়ে-মানুষ' বলেই মেয়েমানুষের কত কিছু টের পায়। একটা করে ভাজ খোলে, পড়ন্ত বেলায় রোদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, লাল রঙের আগুন জ্বলে, নীল রঙের আগুন জ্বলে। সূর্যমুখীর সরম সংকোচ ভীরুতা জড়তার ওপর অতি প্রযত্নে আঁচ বোলাতে থাকে নবীন। বুক ঢিপঢিপ করে তার। টেরচা চোখে তাকিয়ে ধুলোউড়ির নির্জনতা বার বার দেখতে ভোলে না। তার এমন হয়, এক দেহ ঊর্ধ্বমুখে কিছু প্রার্থনা করে চলে—আরেক দেহ পায়ের তলে বসে অস্থির আর মিটিমিটি চোখে প্রার্থনা দেখে ক্ষুধার্ত কুকুরের মতন প্রতীক্ষায়।

সূর্যমুখী এবার ঠোঁট কামড়ায় একবার। তারপর অস্ফুট বলে, সেইটে কই?

নবীনের নাভিমূল থেকে প্রচণ্ড চিৎকারটা ঠোটে এসে মৃদু হয়, স্খলিত পাতার মতন সামান্য খসখস করে মাত্র।---কোনটা, কোনটা গো সূর্যমুখী?

দু পা এগিয়ে সূর্যমুখী অল্প হেসে বলে, সেইটে—সেদিন যেটা দেখেছিলাম!

নবীন দু-হাতে জামাগুলো ওলটপালট করতে করতে বলে, কী রঙ? হাতকাটা, না গোটা হাতা? সাইজ কত?

হাঁটু দুমড়ে নিঃসঙ্কোচে বোঁচকার ওপারে বসে পড়ে সূর্যমুখী।---হাতকাটা গো, হাতকাটা। ওই তো পরছে সবাই আজকাল। বেশ দগদগে জবাফুলের রঙ।---আলতো আঙুলে একটা করে ওলটপালট করে সেও, ঠোঁট বাকা, তাচ্ছিল্যের ভ্রূভঙ্গী।

নবীন ছটফট করে একটা মোড়ক প্রায় ছিঁড়ে ফেলে। রুদ্ধশ্বাসে বলে, এই হচ্ছে গে সবচেয়ে সরেস মাল। বাবুবাড়ির মেয়েদের জন্যে রাখা। দেখছ, কী জিনিস! ফাইন চটকদার মাল। বিলিতী গো, খাঁটি বিলিতী। রঙ দেখছ? কী চেকন মিহি সুতো! জেল্লাখানা দেখ! ম্লান রোদে একটা ব্লাউস তুলে ধরে সে। প্রজাপতি যেন ছটফট করে হাতেধরা। প্রচণ্ড আশায় ফুলে ওঠে নবীন।

সূর্যমুখীও তাকিয়ে থাকে। একবার ছোঁয়। তারপর ফের বোঁচকার বিশৃঙ্খল রঙের বাগানে ঢুকে পড়ে। ছোট কপালে লালচে রোদ সুখে খেলা করতে থাকে। কাচপোকার কালো টিপ ঝলমল করে।

নবীন আফসোসে বলে, এতেও মন ভরল না? সূর্যমুখী তোমার চোখ নেই, তুমি কানা।---এবং নবীনের মনে রাগ ফুঁসে ওঠে। ছোটলোকের মেয়ে! তুই কী বুঝবি এর মর্ম মাগী! তোকে ফুল শোকানোও যা, গু-গোবরও তাই। তোর কাছে সব সমান।

সূর্যমুখী সব ওলটপালট করে দিচ্ছে। কখনও কোন একটা ব্লাউস তুলে বুকের ওপর ধরে রাখছে। ফেলে দিচ্ছে অবহেলায়। তার চোখে তীব্র অনুসন্ধান টলটল করছে, দেখতে পায় নবীন। ফের একটা তুলে বুকের ওপর মেলে ধরলে নবীন তার দু কাঁধের ওপর আঙুল চেপে বলে ওঠে, আহা! টানটান করে ধরো। তবেই তো সাইজ বোঝা যাবে।

ইচ্ছে করেই ব্লাউসটা ফেলে দেয় সূর্যমুখী। ঝাঁঝে বলে, খুব হয়েছে!---তারপর দেখে নবীন তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। তক্ষুনি চকিতে বুকের কাপড় ঠিকঠাক করে সে তেড়ে ওঠে, এই কাপুড়ে! কী দেখা হচ্ছে শুনি?

সাইজ। তোমার চৌত্রিশ লাগবে।---নবীন অপ্রস্তুত হাসে।

কিন্তু সেই জামাটা কই? সেদিন যেটা দেখেছিলাম?

এতগুলোর কোনটাতেও মন উঠল না?

নাঃ।

আবার বলো তো, কী রঙ? হাতকাটা?

হাতকাটা। জবাফুলের মতন দগদগে রঙ।

এইটে?

নাঃ।

এইটে।

না, না।

নিশ্চয় এইটে।

না, না, না।

নবীন কাপুড়ের হাতে রক্তলাল হাতকাটা চৌত্রিশ ব্লাউস এক প্রচণ্ড সোনালী ঝড়ের দাপটে থরথর করে কাপে। দু চোখে করুণ কামনা টলটল করে। রক্ত-মাংসে ছটফট করে সে। একটু ঝুঁকে আসে। ফিসফিস করে বলে, নাও, নাও। দাম নেবে না নবীন। তুমি নাও। এটাই নাও।

মুখ নামিয়ে নাকছাবি খোটে সূর্যমুখী। মাথাটা সামান্য দোলায়। তারপর অস্ফুট কন্ঠে বলে, ক্যানে? এমনি-এমনি দেবে ক্যানে?

ক্যানে?---নবীন জবাব খুঁজে পায় না। তার মুঠো শক্ত হয়ে যায়। জামাগুলো ঘামে ভেজে। এই বিরাট পৃথিবীতে নবীন কাপুড়ের জীবনটা কী ব্যর্থ, আজও তার নারীসঙ্গ হয়নি, সে স্বভাবত ভীতু, দুর্বলচেতা, নির্বান্ধব আর কৃপণ মানুষ। গ্রামের একপ্রান্তে একা থাকে সে। কেউ তাকে ভালবাসে না। সবাই জানে, ভীষণ বদমেজাজী আর হাড়ে হাড়ে কৃপণতা আছে নবীনের। সামান্য পুঁজি নিয়ে গাঁওয়ালে কাপড় বেচে বেড়ানো পেশা যার, তাকে কোনো বাপ মেয়ে দিতে চায়নি। সব বাপই বলেছে, ওর পাল্লায় পড়লে মেয়ে আমার না খেয়ে মরবে। প্রাণে ধরে দু মুঠো খেতে-পরতে দেবার লোক নাকি ও? দ্যাখো না, ঘরের চাল ফুটো---বর্ষায় জল পড়ে মেঝেয়। তাও পয়সা খরচের ভয়ে সারাতে চায় না ব্যাটা। উঠোনে আগাছার বন। সবখানে মাকড়-সার ঝুল, চামচিকের নাদি, টিকটিকি ডিম পাড়ে। তবু কি হুঁশ আছে লোকটার? শুধু পয়সা ছাড়া আর কিছু চিনলেই না সংসারে। কখন দাতকপাটি খেয়ে পড়ে থাকবি ঘরে, তখন দেখবি---পয়সা সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিস নাকি!

এত বেরসিক বদমেজাজী নবীন কাপুড়ে গাঁওয়ালে গিয়ে কিন্তু অন্য রকম। তার বুলি শুনলে অবাক লাগে। কিন্তু সেও তো চালাকি তার! পয়সার জন্যে ওটুকু না করলেই নয়। বোঁচকা বেধে ফেরার পথে মুখখানা দেখলেই চমকে উঠতে হয়। এ মানুষ কি সেই মানুষ? এই তিরিক্ষি ভুরু বাকানো নিস্পৃহ মুখই আসল মুখ নবীনের।

আজ হঠাৎ এতদিন পরে ধুলোউড়ির মাঠে একটা বিকেল সেই নবীন কাপুড়েকে গুরুতরভাবে বদলে দিয়েছে। পিছনে আচমকা ধুপধুপ শব্দ শুনে মুখ ফেরামাত্র সে শুনেছে---ও কাপুড়ে, দাঁড়াও দাঁড়াও---আমি তোমার সঙ্গে যাব।

আর মুহূর্তে নবীন বদলে গেছে। ধুলোউড়ির বিশাল নির্জন মাঠ, পড়ন্ত বিকেল, এই ঢলঢল ডাগর মেয়ে।---

আবার নবীন হাঁসফাঁস করে বলে, ক্যানে? সূর্যমুখী, তা কি কষ্ট করে বলতে পারি? পারি না। আমার মন বললে, সূর্যমুখী বলে যাকে ডেকেছি---তাকে বিনি দামেই দিই। তোমার দিব্যি, তোমাকে বিনি দামে দিলেই যেন সার্থক হই। হ্যা, মন বললে একথা।

পা দুটো শুকনো ঘাসে একটু দুলিয়ে এবার হঠাৎ ফিক করে হেসে ওঠে সূর্যমুখী। ---দেবে যদি, সেইটে দাও। আমার পছন্দ সেটা।

ভাঙা গলায় নবীন বলে, সেটা---সেটা হয়তো নাই। সেটা যে নাই!

তা হলে আর কী? ওঠ, বেলা পড়ে এল।---বলে সে উঠে দাঁড়ায়। দু হাত মাথার ওপর তুলে একবার আড় ভেঙে নেয়। আবার বলে, কই, ওঠ কাপুড়ে!

নবীন ব্যস্ত চোখে মাঠের চারদিকটা দেখে নেয়। এ কী হতে লাগল---হঠকারী প্রাকৃতিক উপদ্রব! শান্ত নিঃসাড় তার ভীতু যৌবন বিকেলের ধুলোউড়ির মাঠের মতন চুপচাপ শুয়ে ছিল এতদিন। ফেটেফুটে একটা উগ্র দুপুর বেরিয়ে এল। ঝাঁঝাল লু হাওয়া বইতে লাগল। সোনালী ধুলোর ঘূর্ণী এল একটার পর একটা---মাথায় তাদের খড়কুটো, শুকনো পাতা, পাখির পালক আর সাপের খোলসের রহস্যময় 'মটুকু'। জ্বরজ্বর নবীন কাপুড়ে আবার তাকাল মেয়েটির দিকে। ও ঠোঁট কামড়াচ্ছে। নাসারন্ধ্র কাঁপছে। নাকছাবিটা জ্বলছে। সিঁদুরটা ভয়ঙ্কর ধু ধু ধোঁয়াচ্ছে। আর

বুকে এক সোনালী ঝড়ের ঝাপটানি লেগে সুধবৃক্ষের দুটি স্বাদু ফল দুলছে, দুলছে। আর দেহে ওর নাগিনীছন্দা। ধুলোউড়ির মাঠে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে পড়ে চৈত্র বিকেলের মরমী হাওয়া।

নবীন ওঠে। পায়ের নিচে রঙের বাজারে আজ চড়া নীলামের ওলটপালট। নবীন একবার জামা তুলে পেট চুলকোয়। একটা ব্লাউস ভুল গায়ে চলে গেছে—কোন গায়ে, কোন অন্যমনস্ক দুপুরবেলায়। সেই ব্লাউসটার জন্যে আক্ষেপে গলায় বোবা ধরে। হায়, অজানতে বিকিয়ে গেছে তার জীবন যৌবনের শ্রেষ্ঠ আস্বাদ! যদি জানত নবীন, তা হলে ধুলোউড়ির মাঠের এই বিকেলের জন্যে মজুত রেখে দিত। নবীন কাপুড়ে গলা ঝেড়ে বলে, সেইটে থাকলে নিতে?

নিতাম বইকি।

বিনি দামেই নিতে?

নিতাম। তুমি দিতে চাইছ, আর আমি নেব না? অত ছোট মন নই, কাপুড়ে।

নবীনের চোখ জ্বলে। নাক মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরোয়।---সেটার বদলে যদি এইগুলো—যা আছে, সব—সব দিই? ---চাপা ফিসফিস আওয়াজ আসে তার গলা থেকে।---নেবে, নেবে সূর্যমুখী?

না!---ভুরু কুঁচকে সাঁৎ করে ফণা তোলে ধুলোউড়ি মাঠের মোহিনী সাপ। হু হু করে ধুলোর ঘূর্ণী চলে যায় গায়ের ওপর দিয়ে। খোপা খসে পড়ে। রুক্ষ চুল ওড়ে। শাড়ি সরে লাল শায়ার দেয়াল দেখা যায়। তারপর সে নবীনের নীলামের বাজার এবং নবীনকে রেখে হনহন করে এগিয়ে যায়।

নবীন ভারি গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তাকিয়ে তাকিয়ে তার চলেযাওয়া দেখে। তারপর দুর্বল কাপা হাতে বোঁচকাটা গুছিয়ে নেয়। এত ওজন বেড়ে গেছে বোঝাটার! পিঠে ফেলতে কষ্ট হয়। তখন সে উঁচু আল থেকে ক্ষেতে নামে। অনেক কষ্টে বগলের ফাঁক গলিয়ে পিঠে নেয়। হাঁচড়পাঁচড় করে আহত জন্তুর মতন হাঁফাতে হাঁফাতে আলপথে উঠে দাঁড়ায়। পা বাড়ায় নবীন কাপুড়ে।

সেই সময় হঠাৎ কোত্থেকে অবেলায় নিম ফুলের গন্ধ ভেসে এল।

সে নাক উঁচু করে শোকে। ধুলোউড়ির মাঠে গাছ নেই পালা নেই, কোত্থেকে এল এই উপদ্রব? এ কি মিথ্যে নিম ফুলের গন্ধ—নাকি সত্যিকার নিম ফুলের গন্ধ? তার গা শিউরে ওঠে। অপার নিরালায় চিকন মিহি রোদ। চৈত্রের হাওয়া বয়ে যায়। ধুলো ওড়ে মৃদু মৃদু। দূরে ধূসর হয়ে যায় সূর্যমুখী। সেই কি রেখে গেল এই গন্ধটা?

ক্লান্ত বিষণ্ণ নবীন কাপুড়ে আবার নাক উঁচু করে অসম্ভব নিম ফুলের গন্ধটা হাতড়াতে হাতড়াতে ধুলোউড়ির মাঠ পেরোতে থাকে।

'---ধুলোউড়ির মাঠে রে ভাই রোদ ঝিলমিল করে।
নিম ফুলের গন্ধে আমার মন চনমন করে॥
'---আর যাব না আর যাব না ধুলোউড়ির মাঠে।
কানের সোনা হারিয়ে এলাম মুখ দেখাব কাকে॥'

আবার বয়ে যায় অন্যমনস্ক হাওয়া। আবার খড়কুটো পাখির পালক শুকনো পাতা আর সাপের খোলসের 'মট্রুক' করা ঘূর্ণী আসে ছুটে ধুলোমাখা ছেঁড়া দুটো স্যাণ্ডেলের বিষণ্ণ শব্দ ওঠে দিনশেষে।



মতি নন্দী

জন্ম : ১৯৩২। তারিখ? জিজ্ঞেস করতে বললেন মনে নেই। জন্মস্থান?
কেন, উত্তর কলকাতায়! যেন কথার টান দেখে বুঝে নেওয়া উচিত
ছিল। এমনই কাটা কাটা জবাব মতি নন্দীর। দারুণ অহংকারী। ভেতরটা
ছেলেমানুষ একেবারে। এখন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক।
মতি নন্দী এমন একটি নাম, যে-নামের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী একজন
লেখকের ছবি মনে চলে আসে। পঞ্চাশের পর যে-ক'জন লেখক বাংলা সাহিত্যের
আলোচ্য হয়ে ওঠেন, সেই কয়েকজনের মধ্যে মতি নন্দী একজন।
একটা রূঢ়তা একটা কাঠিন্য একটা নিয়তি-নির্দিষ্ট নিষ্ঠুরতা তাঁর লেখায়
বিশেষভাবে স্থান পায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোত্রের
সবচেয়ে সফল লেখক তিনি। 'শবাগার'-এর মতো গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যকে
চমকে দিয়েছিলেন তিনি, চমকে দিয়েছিলেন 'বেহুলার ভেলা'
গল্প ও 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান'-এর মতো উপন্যাস লিখে।
ভারতীয় সাহিত্যে বিষয়-পরিধিকে বিস্তার দিয়েছেন মতি নন্দী। ভারতে
একমাত্র তিনিই খেলাকে সাহিত্যের বিষয় করেছেন। 'দ্বাদশ ব্যক্তি'
কিংবা 'স্ট্রাইকার'-এর মতো মহৎ রচনা এই বিষয়টিকে
নির্ভর করে রচিত। 'কোনি', 'স্টপার' তাঁর অন্য দুটি বহুল-গৃহীত উপন্যাস।
বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব মতি নন্দী। 'তাপের শীর্ষে',
'চতুর্থ সীমানা', 'একটি মহাদেশের জন্যে', উজ্জ্বল মণি-মাণিক্য-বিশেষ।
আনন্দ পুরস্কার ছাড়াও ছোট-বড় মিলিয়ে বেশ কয়েকটা পুরস্কার
পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই।

'আমার সব সন্তানের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ'—কোনো মা কোনদিন এই কথা বলেছেন কি? ভাবতেও পারিনা, 'এই আমার শ্রেষ্ঠ গল্প' বলে কোন একটিকে বেছে নেব। যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এক একটি গল্প বেরিয়ে এসেছে চেতনার গর্ভ থেকে। প্রতিটি গল্পই কল্পনা অনুভূতি বোধ ও বুদ্ধির রস শুষে, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে আকৃতি নিয়েছে। হয়তো ওদের মধ্যে কেউ দুব্‌লা কেউ কুদর্শন কিন্তু আমার কাছে প্রত্যেকেই আদরের। নিজের কোনো গল্পকেই স্নেহ ও মায়ার গণ্ডি থেকে হরণ করে আনার সাধ্য বা ইচ্ছা আমার নেই। আমার কোনো শ্রেষ্ঠ গল্প নেই। ছোট মেয়েকে বইটা দিয়ে বললাম, চোখবুঁজে হুট্ করে খোলোতো। তাই করল। এই গল্পটাই সে খুলেছিল। অতএব এটাই তাহলে শ্রেষ্ঠ।

মতি নন্দী

১২-৮-৭৮

ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন

মাঘের দুপুরে, যদি, তকতকে ঘাসে পা দিয়েই মৃদু তাপ লাগে, পোড়া পেট্রোলের গন্ধ আসে, একটি কি দুটি লোক বিরাট মাঠটা একাকী পার হতে থাকে, উপুড় হয়ে পুকুর ধারে কেউ ঘুমোয় এবং হঠাৎ শঙ্খচিলের ডাক শোনা যায়---তখন ইচ্ছা করে 'এবার একটু বসা যাক।' বিনোদ গড়ের মাঠের দিকে মুখ করা বেঞ্চটা দেখিয়ে বলল।

'হ্যাঁ অনেক হেটেছি।' বলেই কমলা আগে গিয়ে বসল। সিঁথিতে, কপালে দগদগে তেল-সিঁদুর। খোকা এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। তার জন্যই কালীঘাটে পুজো দিতে কলকাতায় আসা। ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে যাদুঘর পর্যন্ত সবাই হেটে গেছে। এবার মনুমেন্ট দেখার কথা। সীতা আঙুল দিয়ে পীতু-নীতুকে তা দেখিয়ে দিল, 'ওই যে।'

একজন ফিসফিস করে বলল, 'আমরা ওর কাছে যাবো না?'

'এখান থেকেই তো দেখা যাচ্ছে।'

ওরা দুজন আর কথা বলে নি। মুখ ফিরিয়ে বসে রাস্তায় গাড়ি চলাচল দেখতে লাগল। কিছুদূরে গাছের ছায়ায় একজোড়া ছেলেমেয়ে গল্প করছে আর মেয়েটি খুব হাসছে। সীতা তাদের দিকে মুখ করে বসল। কমলা ঠেস দিয়ে মুখটা আকাশমুখো করে চোখ বন্ধ করে রইল। তার সারা অঙ্গে ক্লান্তি। খোকা একটু অধৈর্য হয়েই বলল, 'কতক্ষণ বসবে?'

বিনোদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাবোই বা কোথায়?'

খোকা উঠে দাড়াল। পকেটে হাত ভরে কয়েক পা এগিয়ে একটা ভাঁড়কে লাথি মারল। সে: ভেঙে যেতে আর কোনো কাজ না পেয়ে মাঠের মধ্যে এগিয়ে গেল।

খোকার থুতনিতে কেশ দেখা দিয়েছে, কন্ঠস্বরে কর্কশতা এসেছে। দুই পায়ে ঘনরোম। বাহুর পেশী আকৃতি নিচ্ছে। এবার প্রথম একটা বড়ো পরীক্ষায় বসবে। এখন ও কি রকম বোধ করছে, সেইটা জানতে বিনোদের সাধ হল। তাই সেও উঠে পায়চারী করতে করতে খোকার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'তোর মা বড্ড হাপিয়ে পড়েছে, একটু জিরোক। তুই বোসনা, সকাল থেকে তো বোসতে দেখলুম না।'

খোকা কথাটা গায়ে মাখলো না। দূরে রাস্তার ওপারে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে, একদল মেয়েপুরুষ, বিনোদের মনে হল তারা বেহারী, এমন ভাবে বাসে উঠল যেন স্টেশনে এক মিনিটের জন্য থামা ট্রেনে উঠছে। বাস ছাড়ার পর দেখা গেল একজন চেঁচিয়ে বাসের পিছনে ছুটতে শুরু করেছে। বিনোদের ভারি হাসি পেল।

'খোকা দেখলি না, একটা ব্যাপার।'

ঘটনাটা বিনোদ বলল। খোকা প্রয়োজনমতো হেসে খেলার দিকে মুখ ফেরাল।

বিনোদও সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শ্রান্ত বোধ করতে শুরু করল। তার ইচ্ছে হল ঘাসে পা ছড়িয়ে বসতে।

'কলকাতাতেই খেলার সুবিধে, কত ক্লাব।' খোকা স্বগতোক্তির মতো করে বললেও বিনোদ জবাব দিল, 'আমাদের ছেলেবেলায় এত কিছু ছিল না। ঘোষেদের মস্ত উঠোন ছিল, সেখানে ব্যাডমিন্টন থেকে শুরু করে সব খেলা হত। পাড়ার বাইরে যাওয়ার দরকারই হত না।'

খোকা শুনছিল, হঠাৎ খেলার মাঠ থেকে চীৎকার উঠল। একজন আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছে। আউটের পদ্ধতিটা দেখতে পায় নি, তাই বিরক্ত হয়ে খোকা, বলল, 'তুমি বরং ওদের কাছে গিয়ে বোসো।'

বিনোদ অপ্রতিভ বোধ করল। কথা না বলে গুটিগুটি ফিরে এল।

পীতু ফিসফিস করে সীতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি, এবার আমরা কি দেখতে যাব?'

'চিড়িয়াখানা?' নীতু বলল।

'জানি না, বাবাকে জিগ্যেস কর।' সীতার হাই উঠছে। ছেলে-মেয়ে দুটো খালি কথাই বলে যাচ্ছে। দেখে দেখে আর দেখতে ভাল লাগছে না।

'চিড়িয়াখানায় আরো সকালে যেতে হয়।' বিনোদ উত্তরটা দিয়ে দিল। কিন্তু ছেলে-দুটির মুখ দেখে তার মায়া হল। বলল, 'অন্য কোথাও অবশ্য যাওয়া যায়।'

'সিনেমা?' সীতা চট্ করে বলল।

'এখন শো আরম্ভ হয়ে গেছে। তাছাড়া এখানে ইংরিজি বই দেখায়।'

বিনোদ মুখ ফিরিয়ে নিল, যাতে সীতা প্রসঙ্গটা টানতে না পারে। খোকাকে দেখতে পেল সে। একটা ঢিল কুড়িয়ে সামনে জোরে ছুঁড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে এদিকেই তাকাল। ও যেন প্রস্তুত ঘোড়ার মতো ছটফট করছে। শুধু গন্তব্যটা জানতে পারলেই হয়।

পীতু ফিসফিস করে বলল, 'আমরা কি এবার বাড়ি ফিরব?'

বিনোদ উঠে দাঁড়াল।

'চল্, একটা জিনিস দেখাব।'

ওরা তাকাল।

'আমাদের বাড়ি দেখাব, খোকাকে ডাক।'

কমলা কথা বলে নি এতক্ষণ। এবার বলল, 'কোন্ বাড়ি? যেটা ছিল?'

কথা না বলে বিনোদ বাস স্টপের দিকে এগিয়ে গেল।

'ও-ছাই দেখে কি লাভ। তার চেয়ে আর-একটু বসে থাকলেই হোত।'

গজগজ করে কমলা উঠে দাঁড়াল। পীতু ছুটে গেছে খোকাকে ডাকতে। সীতা বলল, 'সেদিন মেট্রোয় সিনেমা দেখে গেছে বি-ডি-ও'র বড়ো মেয়ে।' বাস স্টপে দাঁড়িয়ে খোকা বলল, 'এসব ক্লাবে আমিও খেলতে পারি।'

বাসে ওঠা পর্যন্ত বিনোদ কারুর দিকে তাকাল না।

এখনো অফিস ছুটির ভীড় আসে নি। বিনোদ বাসে জানালার ধারে বসল। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বাসটা চলেছে। দুলুনি লাগছে। সে যে কত ক্লান্ত এইবার টের পেল। আরাম পাবার জন্য চোখ বুঁজল। মাঝে মাঝে খুলে দেখে একটা দুটো গাছ, একটু ঘাস-মাটি, জমাট বাঁধা ধূসর বাড়ি। কানে বাজছে বাসের ঘন্টি, এঞ্জিনের শব্দ আর অনবরত প্রবল এক সাঁইসাঁই ধ্বনি। বিনোদ ভিতরে ভিতরে ভার বোধ করতে শুরু করল, যেন দমে যাচ্ছে।

'জানালা দিয়ে মুখ বার কোরো না, পীতু নীতু।'

কমলার গলা শোনা গেল। চোখ খুলে বিনোদ দেখল সামনের লোকটি ঘাড় হেঁট করে কি যেন পড়ছে। পাশেরজন জর্দা-পান চিবোতে চিবোতে শূন্য চোখে সামনে তাকিয়ে। ব্যস্ত হয়ে একজন উঠে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর-একজন সেখানে বসল। বাইরে ট্র্যাফিকের লাল আলোটা জ্বলজ্বল করছে। স্থির বাসটার গোটাদেহ এঞ্জিনের ধ্বকধ্বকানির সঙ্গে কাঁপছে। বিনোদের মনে হল, সপরিবারে কোথায় চেঞ্জে চলেছে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের ওঠা-নামা চলেছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতেই কয়লার গুঁড়ো চোখে পড়ল। মা বললেন, 'বারণ করেছিলুম জানালা দিয়ে মুখ বার করিস না।' আঁচলটাকে সলতের মতো পাকিয়ে চোখের মধ্যে অনেক খুঁজলেন, ফুঁ দিলেন। শেষে কাপড় দলা করে মুখে চেপে ভাপ দিয়ে চোখে চেপে ধরলেন। মা জর্দা খেতেন। গন্ধটা তখন সুন্দর লাগছিল!

'তোর মেজোকাকার চোখে একবার কয়লার গুঁড়ো পড়ে, সেকি কাণ্ড।' এই বলে জানলার কাঁচ নামিয়ে দিয়ে মা হেসে বললেন, 'আর ভয় নেই।' তারপর একটা পান মুখে দিয়ে পাশে বসলেন। আমরা দুজনে একই জানলা দিয়ে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পিচ ফেলার জন্য মা একবার কাঁচটা তুলেছিলেন। বাবা চুরুট মুখে একটা ইংরিজি বই কখন থেকে পড়েই চলেছেন। মা ফিসফিস করে বললেন, 'নদু, তোর বাবাকে বলনা, বই রেখে এখানে এসে বসতে।' বাবাকে বলতেই হেসে কেমন করে যেন মার দিকে তাকালেন। মা ঘোমটা বাড়িয়ে চোখ সরিয়ে নিলেন। তারপর তিন জনে সেই কাঁচতোলা জানলাটি দিয়ে বাইরের গাছ, চাষী, কুঁড়েঘর, মেঠোপথ আর পথিকদের দেখতে লাগলাম। এইভাবেই একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম মা'র কোলে।

অন্ধকারে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে স্টেশনে নামলাম। ওয়েটিং রুমে মা মাথা মুছিয়ে দিয়ে চা খেতে চাইলেন। বাবা বাইরে বেরিয়ে চা আনলেন। আমিও খেলাম। বাবা বললেন, 'নদু, আর-একটা জিনিস দেখাব, কখনো দেখিস নি।'

প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এলেন। কি অন্ধকার চারিদিক। বাবার চশমার কাঁচে বৃষ্টির জল লেগেছে। স্টেশনের দিকে আলোয় তা জ্বলজ্বল করে উঠল।

'তাকা সামনে।'

তাকালাম, গাঢ় অন্ধকার চোখের সামনে ওৎ পেতে। তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেলাম।

'এবার উপর দিকে চোখ তোল্।'

তাই করলাম। চোখ তুলতেই হঠাৎ ঠকঠক করে কেঁপে গেলাম। সেই অন্ধকার এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে। সুতোর মতো আঁকা-বাঁকা ঘোলাটে আকাশ, সেই অন্ধকারের মাথায় চর ফেলেছে। অন্ধকারটা মনে হল ভেঙে পড়বে বুঝি।

বাবা আঙুল তুলে বললেন, 'ওটা হচ্ছে পাহাড়। ওখানে ঝর্ণা আছে। আমরা একদিন দেখতে যাব।' গানের সুরের মতো করে বাবা কথা বলেছিলেন।

অবাক হয়ে ছেলেমেয়েরা তাকাল। আঙুল তুলে বিনোদ বলল, 'ওইটেই ছিল আমাদের বাড়ি।'

'কে আছে ওখানে?' নীতু জিজ্ঞাসা করল।

'লোকেরা থাকে।' সীতা বুঝিয়ে দিল। লোহার গেটের একটিমাত্র পাল্লা। দুপাশের আমগাছ দুটি ন্যাড়া। ফুলবাগানটায় পুরনো ড্রাম স্তূপ হয়ে রয়েছে। দোতালার বারান্দায় কাঠের পার্টিশান। রেলিঙে নানান রঙের কাপড় ঝুলছে। জানালায়

বহু বছর কলি হয় নি, কিন্তু দাগরাজি দেখা যাচ্ছে। ভাঙা পাইপ দিয়ে তিনতলা থেকে ছড়ছড় করে জল পড়ল। দোতলার কার্নিশে একটা বেড়াল মাথা ঝাঁকিয়ে কি চিবোচ্ছে, সম্ভবত চড়াই। সদর দরজা খোলা রয়েছে। রাস্তা থেকেই দেখা যায়, অনেকগুলি মেয়েমানুষ, বাসনমাজা, কাপড়কাচার কাজ করছে। উঠোনে আগে জলের কল ছিল না। দোতলায় হঠাৎ চীৎকার করে কে খিস্তি করল।

'দোতলার ওই বারান্দার পেছনেই হলঘর। বাবা বসতেন।'

'বসে কি করত?' পীতু জানতে চাইল।

'গান হত, রিহার্সাল হত, পাড়ার পুজোর মিটিং হত। একতলার ওই ঘরটা ছিল মেজোকাকার সেরেস্তা। ছোটোকাকা মারা যেতে ওর বৈঠকখানাটা মেজোকাকা নেয়। তখন খুব মক্কেল হয়ে গেছে।'

বাড়ি থেকে একটা লোক ওদের লক্ষ্য করছিল। বিনোদ আঙুল দিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেখাচ্ছিল। তার দিকে আঙুল তুলতে দেখে বেরিসে এসে প্রশ্ন করল, 'কাকে খুঁজছেন?'

বলার ভঙ্গিতে বিনোদ হকচকাল। হঠাৎ পীতুই বলে ফেলল, 'আমাদের বাড়ি দেখতে এসেছি।'

ভ্রূ কুঁচকে লোকটি সপরিবারে বিনোদকে দেখল। চোখেমুখে বিস্ময় ও অস্বস্তি ফোটাল। কিন্তু যখন বিনোদ বলল, 'এটা এককালে আমাদেরই বাড়ি ছিল', লোকটি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

'বেচে দিয়েছেন!'

বিনোদ ঘাড় নাড়ল।

'বেচবার আর লোক পেলেন না। খোঁয়াড় মশাই খোঁয়াড়। জানোয়ার হয়ে বাস করছি। এদিকে ভাড়া নেয় সত্তর টাকা করে।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। বিনোদ রেগে গেল।

'বেলে পাথরের উঠোন, আর সিঁড়ি, মার্বেল পাথরের হলঘর, কত বড়ো বড়ো জানলা দেখেছিস, দক্ষিণমুখো?' খোকার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এই বাড়িকে বলে কিনা খোঁয়াড়! এ রকম বাড়িতে বাস করছে ব্যাটার বাবার ভাগ্যি।'

কমলার দিকে সে তাকাল। আশ্চর্য, পিছন ফিরে কি যেন দেখছে। ধমকের মতো করে বিনোদ বলল, 'এদিকে দেখনা, ওই যে তিনতলায় খড়খড়ির জানলা, ওটা ঠাকুরঘর। ওর পিছনে ছাদ, দুটো ব্যাডমিন্টন কোর্ট হয়ে যায়।'

এক বুড়ো কাশতে কাশতে জানলাটায় এসে দাঁড়াল। কমলা মুখ ফিরিয়ে নিল। নিচু স্বরে সীতাকে বলল, 'সকাল থেকেই ধকল চলেছে, আয় রকটায় বসি।'

'এভাবে, এখানে বোসো না।' বিনোদের কথায় কমলা তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে নিল। কিন্তু উঠল না। এক বৃদ্ধ তখন যাচ্ছিল। বিনোদকে দেখে ইতস্তত করে কাছে এগিয়ে এল।

'হরিকা, আমি বিনোদ, নদু।'

'চিনতেই পাচ্ছিলুম না, চোখে তো আর ভাল দেখি না, তা তুমি যে বুড়িয়ে গেছ।'

'বয়স তো হচ্ছে।' বিনোদ হেসে বলল।

ফোকলা মুখে বুড়ো হাসল। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'একটা লোক ছিলেন বটে তোমার বাবা। কি অন্তঃকরণ! সারাজীবন শুধু দিয়েই গেলেন। একফোঁটা সাহায্যও কারুর কাছ থেকে নিলেন না। ভায়েদের মানুষ করলেন, তারা

গাড়ি বাড়ি করল, আর তিনি?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো চুপ করল। বুকটা ফুলে উঠে টসটস করছে বিনোদের। খোকার দিকে তাকাল। শুনে নিক্, হরিকাকে তো আর সে বলতে শিখিয়ে দেয় নি।

'এইটি আমার বড়োছেলে, এবার স্কুল ফাইনাল দেবে।'

বিনোদ আশা করেছিল খোকা প্রণাম করবে। হরিকা হাজার হোক ব্রাহ্মণ কিন্তু খোকা ওর চোখ ইশারা অগ্রাহ্য করল।

'বেশ বেশ, বংশের মুখোজ্জ্বল কর বাবা। আমার ছোটো নাতি গতবার আই-এস-সি পাশ করল। তোমার মেজোকাকার ছেলে ঘুনুকে ধরে কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছি। লোক ভাল। পাড়ার সক্কলের কথা জিগ্যেস করল। তোমাদের কথাও। যাও না বলে দুখ্যু করল।'

'বাবা কখনো কারো কাছে হাত পাতেন নি। সেই রক্ত আমার গায়েও তো আছে।'

'তা বটে, তা বটে।'

সীতা এসে বিনোদকে ফিসফিস করে বলল, 'মা বলছে, কখন ফিরবে?'

ফেরার সময় কমলা বলল, 'তোমার হরিকা রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলল, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসাতে তো পারত।'

'অবস্থা তেমন ভাল নয়, নইলে কি আর বলত না। ওর বড়ো মেয়ের বিয়েতে সেকি কাণ্ড! পালঙ্ক দেওয়ার কথা ছিল, দিতে পারে নি। বরকে তো সভা থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল বরের বাপ। কান্নাকাটি পড়ে গেল। বাবা তখন জামিন থেকে নিজে দাড়িয়ে বিয়ে দেওয়ালেন। পরদিনই বরের বাপের হাতে চারশো টাকা গুণে গুণে দিলেন। বুঝে দ্যাখ, সে আমলের চারশো টাকা মানে আজকের দেড় হাজার টাকা।

এতক্ষণ পর খোকা মুখ খুলল, 'দিয়ে কি লাভটা হোল!'

শোনামাত্রই ঝিমঝিম করে উঠল বিনোদের মাথা। চুপ করে রইল সে। কিছুক্ষণ পরেই নিজেকে শুনিয়ে একবার শুধু বলল, 'ঘুনু আর আমি একই ক্লাশে পড়তুম।'

কেউ শোনার জন্য আগ্রহ দেখাল না। নীতু মা'র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা লাগছে বলে পীতু কুঁকড়ে বসে। কিন্তু বাবার কাছে গল্প শোনার জন্য জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে। বিনোদ আর কথা বলে নি।

স্টেশন থেকে রেললাইন ধরে প্রায় আধমাইল গিয়ে লোহা কারখানার পাশ দিয়ে গোপাল কুণ্ডু রোড। সেখান থেকে বিনোদের বাড়ির গলি তিন মিনিটের পথ। ওরা ট্রেন থেকে নামল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে। দূরে সিগন্যালের লাল আলো জ্যাবড়া দেখাচ্ছে। রেললাইনের দুহাত উপরে কুয়াশা চাপ বেধে। ঘুমন্ত নীতুকে কোলে নিয়ে কমলা মন্থর হয়ে পড়েছে। পীতুর হাত ধরে বিনোদ স্লিপারে পা রেখে ধাপে ধাপে এগোতে লাগল। এক-একটা স্লিপারের মধ্যে ফাঁক বেশি। পীতু পারছে না দেখে ওকে সীতার কাছে গছিয়ে দিল। তখন কমলা বলল, 'এখানেই তো পুরুতমশাই কাটা পড়েছে।'

খোকা বলল, 'আরোও এগিয়ে, ফুটবল মাঠের কাছে।'

কমলা বলল, 'কি সাহস!'

বিনোদ বলল, 'কিসের সাহস, মরার?'

'মা গো, রাধামাধবের সোনার মুকুট চুরি করা কম সাহসের কাজ! একটুও বুক কাঁপল না! ধরা পড়ে গেল তাই, নয়তো কুষ্ঠ হয়ে যেত ওই হাতে।' খোকা তখন কমলার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি কি করে জানলে যে হোত?'

'তুই থাম্! পাপ করলে ভগবান শাস্তি দেবেনই। আত্মহত্যা করে ফাঁকি দিল তাই। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়, যমের দরবারে তো যেতেই হবে!'

বিনোদ কথা বলল না। ভাবতে শুরু করল ললিত ভটচাজের কথা। একদিন এসে ভোট চাইল মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশ্যনের সময়। বিনোদ বলেছিল, 'ঠাকুর-দেবতার সেবা নিয়ে থাকবে, তুমি আবার এ সবে মাতলে কেন!' ললিত বলে, 'ঠাকুর তো দেশের মানুষ। তাদের সেবাই তো করতে চাই।' খাসা বলেছিল। সবাই ওকে মান্য করত, কথা শুনতো! চুরি ধরা পড়ে অপমান এড়াতে ছ'টা পয়তাল্লিশের ট্রেনে গলা পেতে দিল। দেমাকী ছিল, দেমাক দেখিয়েই চলে গেল। এসব মানুষ আজকাল বড়ো একটা চোখে পড়ে না।

খপ খপ আওয়াজ হচ্ছে সকলের পা ফেলার। পাথরে আঙুল ঠুকে সীতা একবার যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। কমলা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। দেখে দেখে সবাই পা ফেলছে।

'প্রিন্সিপল থাকা দরকার না হলে এলোমেলো হয়ে জীবন কাটে।' চাপা স্বরে বিনোদ বলল খোকাকে। 'বাবা একবার বলেছিলেন, তখন আমি খুব ছোটো। মেজো-কাকার ভায়রা-ভাই যোগেন ঘোষ কর্পোরেশন ইলেকশ্যনে দাঁড়িয়েছিল। বাবার কাছে এলেন ভোট চাইতে। কুটুম বলে তো খুব আদর-যত্ন করে বসালেন। কিন্তু জানিয়েও দিলেন, কংগ্রেস ছাড়া আর কাউকে ভোট দেবেন না। মেজোকাকাও অনেক করে বললেন কিন্তু বাবা অটল। সারারাত ঘুমোলেন না, দোতলার বারান্দায় পায়চারী করলেন। পরদিন মেজোকাকা কোর্টে বেরোচ্ছেন তখন ডেকে বললেন, 'যোগেনবাবু নিজে এসেছিলেন, কুটুম, তার মর্যাদা আছে, সেটা রাখতেই হবে। ওকে জানিয়ে দিও আমি কাউকেই ভোট দেব না।'

একটানা গল্পটা করে বিনোদ প্রফুল্ল বোধ করল। খোকা মাথা নিচু করে দেখে দেখে হাঁটছে। পিছন থেকে সীতা চেঁচিয়ে বলল, 'বাবা একটু দাঁড়াও, বড্ড এগিয়ে গেছ।'

কারখানার কাছে ওরা এসে পড়েছে। একটা পুরনো ঝাঁকড়া বটগাছের পাশ দিয়ে রাস্তাটা পুবে চলে গেছে। বিনোদ খোকাকে নিয়ে গাছটার নীচে দাঁড়াল।

কমলার প্রায় এলিয়ে পড়ার দশা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তোমরা তো জিন লাগিয়ে ছুটছ। আমি ওদিকে ভয়ে মরি।'

সীতা বলল, 'ছ'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়ি আসার সময় হয়েছে, মার খালি ভয় যদি আমরাও কাটা পড়ি।'

'না বাপু, গাড়িটাড়ি নিয়ে খেলা নয়। ও হচ্ছে নিয়তির মতো। হাত দেখালেও থামবে না, পাশ কাটিয়েও যাবে না।'

কমলার বলার ভঙ্গিতে বিনোদের কৌতুক করার ইচ্ছা। সিগনালের রঙ সবুজ হয়ে রয়েছে। সে বলল, 'তাহলে একটু দাঁড়াও, তোমার নিয়তি আসছে তাকে দেখে যাও।'

'না, না, চলো। ঠাট্টা করতে হবে না।'

বিনোদ ওকে হাত ধরে টেনে রাখল। ছেলেমেয়েরা দেখছে লক্ষ্য করে কমলা ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় দূরে এঞ্জিনের হুইসেল বাজল।

সকলে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। গুমগুম শব্দ হচ্ছে। লাইনের উপরে পিছলে যাচ্ছে

আলো। মাঠের মাঝে ইলেকট্রিকের লম্বা খুঁটির মাথা ঝকঝক করে উঠল। একটা শেয়াল ওদের কাছ দিয়ে ছুটে গেল।

'এসে গেছে, এসে গেছে।' বিনোদ কাঁপা গলায় অন্ধকারের মধ্যে বলল। ফিসফিস করে পীতু বলল, 'কি এসে গেছে বাবা?'

'নিয়তি।'

বিনোদ কয়েক পা এগিয়ে গেল। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া চাঙরের মতো দুড়দাড় করে ট্রেনটা এসে পড়েছে। বিনোদ দুহাত বাড়িয়ে শিশুর মতো কলধ্বনি দিয়ে লাইনের দিকে এগিয়ে গেল। কমলা ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করে উঠল। খোকা ছুটে গিয়ে বিনোদের কোমর জড়িয়ে ধরল। যখন, কামরাগুলোর আলো ওদের দেহ থেকে অদৃশ্য হল, মাটি স্থির হল, বাতাস শান্ত ভাবে বয়ে গেল, বটগাছের পাখিরা চীৎকার বন্ধ করল, নক্ষত্রের মালিন্যও ঘুচল, তখন বিনোদ বলল, 'ভয় নেই রে, ও লাইন ধরে চলে। আমি ওর লাইনে যাচ্ছি না।'

কমলা ফুঁপিয়ে বলল, 'কবে তোমার পাগলামি থামবে?'

হা হা করে বিনোদ বলল, 'চলো চলো, এবার যাওয়া যাক।'

বাড়ি পৌঁছে খোকা পড়তে বসল। আধাদামে কেনা গতকালের খবরের কাগজ নিয়ে বিনোদ ওর কাছে বসে পড়ছে আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। খোকা কিছু একটা মনে করে রাখতে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে, থুতনিতে হাত রেখে ঠোঁট কামড়ে টেরিয়ে রয়েছে, হুবহু ওর ঠাকুরদার মতো। সারা মুখ এ সময় একটা দম্ভের মতো দেখায়। আত্ম-প্রত্যয়ে কঠিন মনে হয়। বিনোদ মুগ্ধ চোখে খোকাকে দেখছিল। হঠাৎ তা খোকার নজরে পড়ল। কুঁকড়ে গেল সে।

'তোকে একটা কথা বলব, শুনবি?'

খোকা অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল। ইতস্তত করে বিনোদ বলল, 'তোর ঠাকুর-দার পর আর মান-সম্মানের মুখ দেখি নি। তুই আবার দেখা, পারবি না?'

কথাটা বোঝবার জন্য খোকা সময় নিল। ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে এল ওর মুখ। বিনোদ ঝুঁকে এগিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'মনের মধ্যে সদাসর্বদা বলবি বড়ো হবো বড়ো হবো। ফাঁকি দিবি না, ছোটো কাজ করবি না, একবার নিচু হলে উঠে দাঁড়ানো ভারি শক্ত কাজ রে।'

ভয়ঙ্কর একটা ক্ষুধার্তের মতো সে অপেক্ষা করতে লাগল। খোকা অন্তত একবার মাথাটাও হেলাক। বা একছিটে হ্যাঁ বলুক।

সেই সময় ভিতরের ঘরে পীতু নাকী সুরে টেনে টেনে কান্না জুড়ল। বিনোদ বিরক্ত হয়ে গেল। ওর ক্রুদ্ধ মুখভাবে পীতু চুপ করল। সীতা দ্রুত বেরিয়ে গেল। নীতুও বেরোতে যাচ্ছিল, বিনোদ ওর কান ধরল। 'কাঁদছিস কেন, দাদা পড়ছে না ও ঘরে?'

সেই সময় পীতু বলল, 'দিদি চপ খাচ্ছিল। ওকে দিয়েছে তবু আবার চাইছে।'

'গেল কোথায় তোর দিদি?' পীতু হঠাৎ চুপ করে গেল। সীতা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। বিনোদ তাকে দুবার জিজ্ঞাসা করল। সীতা তবু চুপ। এবার কঠিন ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল, 'পয়সা পেলি কোথায়, কে এনে দিল?'

'কেউ না।'

'তাহলে?'

হঠাৎ পীতু বলল, 'সুশীলদা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি দেখেছি।'

কিছুক্ষণ কেউই কথা বলল না, চোখের পাতাটুকু পর্যন্ত ফেলল না। তারপরই বিনোদের চড়ে সীতা ছিটকে পড়ল কমলার পিঠের উপর। লাথি মারতে যাচ্ছিল, কমলা তখন দুহাতে আগলে ধরে বলল, 'বিয়ের যুগ্যি মেয়ের গায়ে হাত তুলতে, লজ্জা করে না?'

বিনোদ থরথর করে কাঁপছে, গলার কথা আটকে গেছে। গলার স্বর দুমড়ে মুচড়ে কমলা বলল, 'বড়ো বংশের ছেলে, তা বস্তির লোকের মতো আচরণ কেন?'

দিশেহারা হয়ে বিনোদ চারধারে তাকাল। ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে খোকাকে বলল, 'সুশীলকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? এ সব কি ব্যাপার?'

চোখ দুটো সরু করে খোকা বলল, 'কেন, কি করবে?'

'ভেবেছে কি সে। বখামি করার জায়গা পায় নি?'

'সুশীলদা আমায় সাজেশান এনে দেবে কলকাতা থেকে।'

'তাতে কি হয়েছে, তাই বলে—'

বিনোদের কণ্ঠস্বর মৃতের শেষ কম্পনের মতো। কেঁপে উঠে থেমে গেল। খোকার সারা মুখে যেন দম্ভ মাখানো। কঠিন দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়েছে গোঁয়ারের মতো। বিনোদ চোখ নামিয়ে নিল। সন্তর্পণে খোকার পাশ কাটিয়ে বাইরের রক এসে দাঁড়াল। একবার মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকাল যেন এইমাত্র তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জামা পরে খোকা হন হন করে ওর পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। তখন সে মনে মনে বলল, খোকা ফিরে আয়।

তারপর বিনোদ হাঁটতে শুরু করল। গলি ধরে সে ঘুরতে ঘুরতে চৌরাস্তায় পৌঁছল। তখন সিনেমা ভেঙেছে। মানুষের ভীড় আর সাইকেল-রিক্সার ভেঁপুতে বিরক্ত হয়ে কাছের গলিটায় ঢুকতে যাচ্ছে, দেখল চায়ের দোকানে সুশীল আড্ডা দিচ্ছে। সে থমকে দাঁড়াল। তখনই খোকা এসে ওর সামনে জুড়ে বলল, 'কেন এসেছ এখানে? আমি জানতুম তুমি আসবে। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মান-সম্মানের কথা ভেবে ভেবে।'

বিনোদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। আমার ছেলে, আমারই ছেলে খোকা! ওকি ভাবছে আমি ইতর? মাথা নামিয়ে সে দ্রুত ভীড়ের মধ্যে মিশে যাবার জন্য লোকেদের ধাক্কা দিতে শুরু করল।

ফুটবল মাঠের ওধারে রেললাইন। এধারে শিবমন্দির, বেশ্যাপাড়ার গলি, মিউনিসিপ্যালিটির দীঘি, বি-ডি-ও অফিস, তার পাশে ললিতের ঘর। রাস্তার ইলেকট্রিক আলো ঘরের দরজায় কোনক্রমে আসে।

খসখস শব্দ হচ্ছে। অন্ধকার ঘর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ললিতের বুড়ো বাপ বেরিয়ে এল।

'কে?'

'আমি বিনোদ। রথতলার বিনোদ।'

বুড়ো আন্দাজে তাকাল। হাত দিয়ে মাটি থাবড়ে বলল, 'বসো। কি জন্যে?'

'এমনি।'

'অঃ।'

মাথায় টাক। মুখ ভর্তি দাড়ি। গায়ের চামড়া ভাঙা পাথরের মতো কর্কশ, কুঞ্চিত। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

'ছ'দিন হয়ে গেল। একাদশী থেকে আজ। সবাই বলল, একটু আগেই ছ'টার গাড়ির অনেকে ওখান দিয়েই হেঁটে গেছে, তখন কাউকে দেখে নি।'

বিনোদ টের পেল তার শীত করছে। এগিয়ে বুড়োর মুখোমুখি হয়ে বসল। ওঁর শরীর থেকে বন্য গন্ধ আসছে।

'আমাকে ওরা চলে যেতে বলেছে। নয়তো বার করে দেবে। ওরা এটা নিয়ে নেবে।

'কোথায় যাবেন?'

আঙুল তুলে বুড়ো ফুটবল মাঠের ওপারে রেল লাইনের উদ্দেশ্যে দেখাল।

'কেন?' ফিসফিস করে বিনোদ বলল।

ও এমনভাবে মুখ তুলল যেন বিনোদের কথাটার অর্থ জানতে চায়। তারপর মাথা নাড়তে শুরু করল। ওর ঘন ভুরু, দাড়িতে ভরা মুখটা রাস্তার আলোয় বিকৃত দেখাল।

'জানো, আমি আর কিছু বুঝতে পারি না, টের পাই না। গলির একটা মেয়ে কাল ভাত দিল, খেলুম, স্বাদ পেলুম না। লঙ্কা ঘষে আচার দিয়ে খেলুম, তবুও।' ছল ছল করে উঠল বুড়োর স্বর, 'কাল পেচ্ছাপ করে ফেললুম, তাতেই সারারাত শুয়ে রইলুম। বুঝলে, আমার শীত করল না।'

বুড়ো হাতড়াতে লাগল। বিনোদ ডান হাতটা এগিয়ে দিতেই খপ করে ধরে কাছে টানতে লাগল। বিনোদ ঝুঁকে ওর বুকের কাছে মুখ এগিয়ে আনল।

'ছ'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়িতে চলে গেল, আমাকে ফেলে। ও কি আমাকে ঘেন্না করত? আমি আর কথা বলতুম না।' বুড়োর স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

'আজ কিছু খেয়েছেন?'

কথাটার অর্থ বুঝতে বুড়ো আবার মুখ তুলল।

'ও আমার কথা একদম ভাবলই না।' বুড়োর নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়ল। বিনোদের মনে হল, চোখ দিয়ে জল নামছে। ভাল করে দেখার জন্য সে মুখটা বুড়োর মুখের কাছে আনল। মুখ দাড়িতে ভরা।

বিনোদ বন্য গন্ধ পেল। আগাছা আর ঝোপ।

গাছের পাতা ধূসর। খসখস শব্দে তিতির ছুটে গেল। দূর থেকে দূরের দিকে মহিষের গলায় বাঁধা ঘন্টা বাজতে বাজতে চলে যাচ্ছে। উপরে বৃক্ষহীন মসৃণ ঢালু পাথরে পশ্চিম থেকে রোদ পড়েছে। বাবা বললেন, 'ঝর্ণা কোন্ দিকে বলোতো?'

মা চিবুক তুলে একটা দিক দেখালেন। বাবা হাসলেন, 'নদু, তুই বল্।'

বোকার মতো চারধারে তাকালাম। তখন বাবা বললেন, 'আয় আমরা খুঁজে বার করি, পারবি?' আমি মাথা নাড়লাম; বাবা আর মা দুধারে চলে গেলেন। চারধারে আলগা পাথর, হাঁটু-সমান ঝোপ। একটু নীচে বড়ো বড়ো গাছ। মনে হল ওই দিকেই ঝর্ণা। পা টিপে নীচের দিকে নেমে এলাম। একটা উঁচু পাথরে উঠে দাঁড়িয়েছি, দেখি মার হাত ধরে বাবা তাড়াতাড়ি নেমে আসছেন। আমায় দেখে হাত তুললেন। কাছে এসে বললেন, 'নদু, এখুনি ফিরতে হবে। এখানে কাল চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল। এক রাখাল বলল।'

ফেরার সময় বলেছিলাম, 'তোমরা ঝর্ণা পেলে না?' কিন্তু ওরা খুব উদ্বিগ্ন থাকায় জবাব দিলেন না। প্রায় নীচে পৌঁছে গেছি। তখন মনে হল কাছাকাছিই কোথাও ঝর্ণা রয়েছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বাবাকে বললাম। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না, না, বেলা পড়ে আসছে, এখন ঝর্ণার ধারে যায় না। এখন বাঘে জল খেতে আসবে।' মা খুব শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরলেন। তখন খুব সুন্দর সূর্যাস্ত হচ্ছিল: অনেক দূরে গিয়ে একবার পিছু ফিরে তাকিয়েছিলাম। পাহাড়টা অন্ধকারে ডুবে

যাচ্ছে। ওর মধ্যে ঝর্ণা আছে, সেটা আর দেখা হল না। তবু বিনোদ মুখটা আরো কাছে আনল। আঙুলটা বুড়োর চোখে স্পর্শ করিয়ে আলোর দিকে বাড়িয়ে দিল। চিকচিক করে উঠল আঙুলের ডগাটা।

বুড়ো মুখ তুলে তাকিয়ে। মসৃণ মাথা, ধূসর দাড়ি, পাথরখণ্ডের মতো কঠিন চাউনি। হামা দিয়ে ঘরের অন্ধকারে খসখস শব্দ করে চলে গেল।

তখন ফুটবল মাঠ পার হয়ে, বিনোদ রেললাইনের ধারে এসে দাঁড়াল। চীৎকার করতে করতে খোকা ছুটে আসছে, 'বাবা বাবা, একি পাগলামি হচ্ছে।' সারাক্ষণ ও পিছু নিয়ে রয়েছে। বিনোদ ভাবল, ওকি আমায় এখনো ইতর ভাবছে! কিন্তু ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন তো আজ আর আসবে না।



শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম: মারচ, ১৯৩৩। এখনকার বাংলাদেশের তখনকার খুলনা শহরে।
অদ্ভুত মানুষ এই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। জীবন নিয়ে নানান পরীক্ষা
করেছেন তিনি। সেই পরীক্ষার তালিকায় চাষবাস আছে একটা বিশেষ জায়গা
জুড়ে। কখনও গ্রাম, কখনও শহর—লেখকের অভিজ্ঞতার
মধ্যে আছে সবই। সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত দীর্ঘকাল। এখন অমৃত
পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত।
দুর্দান্ত এক গদ্যে এই লেখক সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেন। তাঁর
লেখায় একটা দারুণ রূঢ়তা, একটা কোমল কমনীয়তা মিশে থাকে
সমান সমান। 'কুবেরের বিষয় আশয়' লিখে এক সময়
সকলের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিলেন। অধুনা আর একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ:
'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা'। এছাড়া উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির
মধ্যে আছে 'পরস্ত্রী', 'সতী অসতী', 'জলপাত্র', 'অদ্য শেষ রজনী',
'অনিলের পুতুল', 'নির্বান্ধব', 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' প্রভৃতি।
ছোটগল্পের এক নিজস্ব রীতির প্রবক্তা এই লেখক। সাংঘাতিক সব গল্প
লিখেছেন, আজও লেখেন। 'মহাকাল কেবিন', 'অন্নপূর্ণা',
'চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়', 'তারাগুনতির দেশে', 'কন্দর্প' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য
গল্প। আজকাল তিনি অনেক তরুণ লেখককে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার
মধ্যেও অবাক অবাক ঘটনা ঘটান।
বহু আলোচিত এবং বিতর্কিত এই লেখক যে-পুরস্কার পেয়েছেন,
তার নাম মতিলাল সাহিত্য পুরস্কার।

'রাখাল-কড়াই' গল্পটি লিখেছিলাম ১৯৬৫ সনের শীতকালে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার
মৃত নদীর নাম বিদ্যাধরী। একদিন শীতকালের সকালে মাইল দশেক
বাইক করে গরাণবেড়ে গাঁয়ে গিয়েছিলাম। সেখানকার
একটা বুনো তেঁতুলগাছ দেখিয়ে এক চাষী বলেছিল---এই গাছের এক-একটা
ডাল দিয়ে তাদের পরিবারের এক একজনের মৃত্যুর পর
দাহকাজ হয়ে আসছে। ওদের পরিবারের এক ঠাকুর্দার, ঠাকুর্দার, ঠাকুর্দা
প্রায় দেড়শো দুশো বছর আগে জলে ভরা বিদ্যাধরী দিয়ে
নৌকো বেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে ছিলেন। তিনি ফিরে এলে দাহকাজে যাতে
কাঠের অভাব না হয় সেইজন্য ঐ বুনো তেঁতুলগাছের মগডালটি
না-কেটে রেখে দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে গাছের বয়স, নিরুদ্দেশ মানুষের
ফিরে আসা ও একদা ভয়াল নদীর শুকনো খাতের স্মৃতি
আমায় চমকে দিয়েছিল। আমিতো একলাফে সে বিদ্যাধরী টপকে
পার হলাম। আর শুনলাম এবং চোখেও দেখলাম, গরু চরানীর রাখাল
বালকরা মাঠে মাঠে সারা বেলার খাদ্য আলে আলে গজিয়ে
ওঠা এক ধরনের বুনো কড়াই---যার অন্য নাম রাখাল কড়াই তাই খেয়ে
থাকে। অর্থাৎ---নিরুপায়ের খাদ্য। একদিন চম্পাহাটীতে
শুনলাম, একটি লোক এসেছে---যে মেঝেতে চড় মারলে মেঝে ফেটে যায় এবং
তার লেজ আছে।
এই বয়স্ক তেঁতুলগাছ, নিরুদ্দেশ পূর্বপুরুষ, মৃত নদী, একটি করে
গাছের ডাল এক এক জনের জন্য বরাদ্দ ও রাখাল কড়াই আমার
মনের ভেতর তোলপাড় তুলে দিল। সেই সঙ্গে মনে পড়লো, রথের
মেলায় কী পরিমাণ কাঠ গাছ থেকে ঘরকন্নার জন্যে বাজারে
চাকী, বেলুনী, পিঁড়ি, বারকোস হয়ে চলে আসে। এই নিয়েই গল্প।
গরাণবেড়ের সেই সকাল আজও মনে পড়ে, তাই এই গল্পটাই নির্বাচন করলাম।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
১৬-৭-৭৮

রাখাল কড়াই

চক্রবেড়ের মোড় থেকে বাস চন্দনেশ্বরের বাজারের দিকে ঘুরে গেল। ভাঙড় যাবে। চারদিকে ধানক্ষেত। তার ভেতর রোগা পিচরাস্তা বেয়ে চার চাকার রাজহাঁস ছুটে যাচ্ছে। ক্ষীরোদ পাকড়াশি বাস রাস্তা থেকে নেমে খাল পাড়ে উঠে হন হন করে হাঁটা ধরল। হাতে পাকানো বাসের টিকিট। এখন বিদ্যেধরীর বাদা মাড়িয়ে গরাণ-বেড়ে পৌঁছে দুপুরের আগেই লোকজন ডাকতে হবে।

খবর যতদূর, জিনিস নাকি সরেস—ঘরে রেখে রস মেরে নিলে পিঁড়ি চাই পিঁড়ি, জানলা দরজা কপাট সব হবে। বাদার গাছ, চার মানুষেও বেড় পায় না—হোক না তেঁতুল। সাল সেগুনের কারবারে কে দাঁড়াবে? বৌবাজার, শেয়ালদার ক'খানা বাছাই ঘর বাদে সব দোকানই জাম-জামরুল-তেঁতুলে ছেয়ে গেছে। ভাল পালিশের চেকনাইয়ে কত মিটসেফ, আলনা, আলমারি, ইজিচেয়ার দিব্যি বাজারে চুলে যাচ্ছে। এই ডামা-ডোলে ক্ষীরোদ এমন সরেস তেঁতুল কাঠের খোঁজ পেয়ে লোভ সামলাতে পারেনি। লোকজনের ভরসা না করে নিজেই বেরিয়ে পড়েছে। শ্রীমানি মার্কেটের ধারে ধারে ক'ঘর কবিরাজের দোকান। নানান্ জায়গার লোক শেকড়বাকড়, লতা-পাতা বেচতে আসে। হরনাথ তর্কভূষণ বৃহৎ গুগ্গুল ও চ্যবনপ্রাশের বয়ম রাখবে বলে গত শ্রাবণে জাব্দা মত পাঁচ তাকের এক আলমারি নিয়েছিল। পরশু সেই টাকার তাগাদায় গিয়ে এই গাছের সন্ধান।

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর বাপকেলে দোকান। তর্কভূষণ ইলেকট্রিকের ধার ধারে না। হেরিকেনের সামনে বাঁদুরে টুপি কম্ফটার বালাপোষ চাপিয়ে দশাসই লাস একেবারে সাক্ষাৎ যম সেজে বসে। চার কিস্তিতে আলমারির দাম শোধ হওয়ার কথা —দশ বারেও অর্ধেক উঠিয়ে আনতে পারেনি ক্ষীরোদ। শিষ উঠে হেরিকেন কেবল কালি ওগলাচ্ছে। কম্ফটারের আলগা গেরোর ভেতর দিয়ে এক খাবলা পাকা দাড়ির সাদা ছোপ। আধ ঘন্টা বসেও টাকার কথাটা পাড়তে পারেনি। পা নামাতেই মেঝের ড্যাম্প কোমর অবধি উঠে এসেছিল পরশু। ভাল জ্বালা! এই ড্যাম্পের হাত থেকে ভাল ভাল বটিকা, পাঁচন বাঁচানোর জন্যেই হরনাথ হাত ধরে আলমারি চেয়েছিল একটা। এখন টাকার কথা তুললেই বলে, শীতটা ভাল করে পাকুক—শ্লেষ্মা ধাতের সব রুগী এই তর্কভূষণের দোরে এসে লাইন দেবে। তখন নাকি আলমারির দাম শুধে আগাম সুদ্ধ চার পেয়ার চেয়ারের অর্ডার দেবে হরনাথ।

আগের অবস্থা থাকলে ক্ষীরোদ দু'খানা চেয়ার অমনি করে দিত কবিরাজকে। বুড়ো আর বেশীদিন নেই। ঠিক তখনই ফুটপাত থেকে মুসকো মত একটা লোক সোজা হেরিকেনের সামনে উঠে এসেছিল। গায়ে জড়ানো কাপড়ের খুঁট টেবিলে আলগা করে দিল লোকটা। দেড়পো আধসের ট্যাংরার চেয়েও লম্বা লম্বা তেঁতুল, 'এনেছি—এ কটার বেশি হল না—'

হাত পাঁচেক লম্বা, মাথার চুল অনেকটাই শাদা, কুঁজো হয়ে দাঁড়ানোয় পেটের খোঁদলে দিব্যি একটা ধামা বসিয়ে দেওয়া যায়।

তর্কভূষণ টুপির ভেতর থেকেই বলল, 'এর চেয়ে বড় পেলে না?'

'থাকবে না কেন? পাবার যো আছে---গাছতলায় পড়তেই বেদেদের শোর এসে চেঁচে পুঁছে খেয়ে যাবে---'

একটা তেঁতুল হেরিকেনের সামনে তুলে ধরে কবিরাজ গন্ধ নিল নাকে, 'বাড়ন কমে গেছে বোধহয়---'

'তোমার বাপের আমল থেকে দে যাচ্ছি---কতকেলে গাছ, এবারে ছোট হয়ে আসছে।'

ক্ষীরোদ আর থাকতে পারেনি, 'কত কালের খাছ?'

'তা ধরুণ আমাদের সাত পুরুষ ওর ডালে পুড়েছে---এখন জুড়ে দেখুন।'

মনে মনে হিসেব করতে যাচ্ছিল ক্ষীরোদ। লোকটা সব গুলিয়ে দিল, 'এ তেঁতুল তো খেতি পারিনে আমরা---বিষ! একবার খেলিই জ্বর---তারপর ভুল বকে কাল ঘুম---একদম চলে পড়তি হবেনে!'

হরনাথ একটা তেঁতুল ভেঙে তখনও গন্ধ শুকছে।

ক্ষীরোদের মুখ দেখে কী দয়া হল লোকটার। বলল, 'এ আপনার জঙ্গলে তেঁতুল। ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার বাপ জঙ্গল হাসিল করে গরাণবেড়ের মুলুক বসায়---সেই ইস্তক গাছটা আছে। কী শোভা ছিল আগে---ছোটবেলায় গা ভরে এমন ঝুলে থাকত---'

'না গায়েন, রস কষে গেছে---এ তেঁতুলে আমার হবে না। ও তুমি নিয়ে যাও---'

লোকটা হেরিকেন বরাবর সিধে দাঁড়িয়ে গেল, 'তা হবে না কবিরাজ। কত আজে বাজে লতা পাতা কিনছ দিনভর---আর গাছের এমন আদত্ ফল নে ফিরে যেতি হবে?'

'দরকার না থাকলে যেতে হবে।'

'এতটা পথ ভেঙে এলুম---'

'সে তুমি ফি বারই বল। দরকার না থাকলে কাহাতক কিনি বলতো গায়েন? এমন নয় যে, ঘরে রেখে টক রেঁধে খাব!'

'পোকায় এবার ধান পাট সব শুকিয়ে পুড়িয়ে জেরবার করেছে। নয়ত আসতুম না---নাও রেখে দাও, খরার দিন কাজে দেবে---'

লোকটা নিজে নিজেই সামনে আলমারির খোলা তাকে একটা করে তেঁতুল তুলে সাজিয়ে রাখছিল।

'নোংরা করো না। ঝামেলা ভাল লাগে না গায়েন---' হরনাথ উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার চেয়ারে বসল। গায়েন কাপড়ের খুঁটে তেঁতুল তুলে নিয়ে ফুটপাথে নেমে গেল।

ভীষণ শীত পড়েছে, মুলোর দর এখনও নামছে না---এইসব ধানাই পানাই বলে টাকার কথা না পেড়েই কোন গতিকে ক্ষীরোদ রাস্তায় নেমে পড়ল। তেঁতুল নিয়ে দু' দুটো হুমদো বুড়ো যা করছিল, চোখে দেখা যায় না। ফুটপাথের তেলেভাজা দোকানীর তোলা উনুনের ধোঁয়া ফুঁড়ে শাদা রঙের লম্বাই চওড়াই গায়েন হুস হাস এগোচ্ছে। পরনের কাপড়ের খানিকটা গায়ে। ক্ষীরোদ একরকম দৌড়েই ধরে ফেলল, 'কতদূর যাওয়া হবে?'

রাস টেনে দাঁড়াল লোকটা, 'কোথায় দেখিচি বলুন তো?'

'কবিরাজের দোকানে---এই মাত্তর!'

দুই থাবা দিয়ে ক্ষীরোদের হাত ধরল। জানলার রডের পারা আঙুলগুলো আর একটু লম্বা হলে তার কনুই ধরে ফেলত।

'বুড়োর বাপ থাকতে তেঁতুল, অর্জন ছাল কত কি দে আসতুম—' একটু থেমে বলল, 'আগে কত রুগী বসে থাকত—হরনাথই বা করবে কি!'

ক্ষীরোদের হাত ছেড়ে দিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ক্ষীরোদ দৌড়ুতে লাগল। 'ন'টা আটাম না ধরলে বাস পাব নি। এত আঁধার—এখন আর দু' কোশ একা হাঁটতি ভাল লাগে না।'

ক্ষীরোদ আর ভূমিকা করার সময় পেলে না, 'অনেক দিনের গাছ—'

দমকে বেরিয়ে যাবার আগে গায়েন আবার থামল, 'কোন গাছ?'

ফুটপাতে কথা বলা যায় না। লোকজন বন্ধ নেই কোন সময়, 'তাই তো বলছিলেন গায়েন মশায়—সাতপুরুষের—'

একদম থেমে গেল গায়েন, 'ওঃ! আমাগে গড়াণবেড়ের—সে মশায় বড় অগড়ের গাছ—তার অগড়ের কথা কত বলব—'

'যদি বলেন তো একবার দেখে আসি—'

'যাবেন? গড়াণবেড়ে যাবেন?'

'খুব! সকাল সকাল গিয়ে ঘুরে আসব। কালই সকালে—'

'কাল নয়—আট গাড়ি খড় নে খালিশপুর যেতি হবে—পরশু আসন—ভোরের ট্রেনে চড়ে বাসুলিডেঙা নাববেন, চাকবেড়ের মোড়ে আমায় পাবেন—না দেখলি হাঁক পাড়বেন নীলাম্বর গায়েন বলে—'

পরশু আর কথা বলতে পারেনি গায়েন। না ছুটলে ন'টা আটাম্নো মিস্ হয়ে যেতো।

সে রাতেই গোলায় ফিরে ক্ষীরোদ তিনখানা বড় করাত ভাড়া নিয়েছে। গরাণ-বেড়ের লোকজন লাগিয়ে তিনদিনে কুড়োলে কুড়োলে পুরো গাছটা খানকয়েক গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিতে হবে। বাসুলিডাঙা থেকে রেলে বুক করে দিলে পরদিনই চিৎপুর ইয়ার্ডে মাল ডেলিভারি। তারপর কয়েক ক্ষেপে লরিতে পুরো গাছটা গোলায়। তখন ভাড়ার করাতে চেরাই, পেলেন, পালিশ। অতকেলে গাছ—মোদ্দা কত হাজার সি এফটিতে দাঁড়াবে। মনে মনে হিসেব কষতে গিয়ে সব অঙ্ক গুলিয়ে গেছে। এসব কাগজ-কলম ছাড়া জুৎ হয় না। হাঁক দিতে হল না—বরং কানের কাছে গিয়ে আস্তে ডাক দিল ক্ষীরোদ, '—গায়েন মশাই, ও নীলাম্বর গায়েন—'

একটু নড়ে চড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। খালপাড় থেকেই দেখতে পেয়েছে ক্ষীরোদ। পুকুরপাড়ে তুলে দেওয়া শুকনো কচুরিপানার ডাই জুড়ে মা সুদ্ধ পাঁচ-ছ'টা কুকুরছানা রোদ পোহাচ্ছে। তাদেরই দু'টোকে কোলে নিয়ে গায়েন ঝিম মেরে বসে।

'এসে গেছেন। ভাবলুম বেলাবেলি বেইরি আসতে দেরি হবে আপনার, তাই অঘোরের ঘরে বসতিই এই কাণ্ড—।' ভগ্ ভগ্ করে গন্ধ আসছে। সারা মুখে জোর গোটা আটেক দাঁত। তার ভেতর দিয়েই হেসে বলল গায়েন, 'অঘোর বেটে মুকুজ্যেদের চর-হাসিল দশ বিঘে খালি জমি কিনল। ওদের হয়ে অনেক খুনখারাবি করেছি—মুকুজ্যেরা তাই আমাকে দেখেই তিন হাজারের ভেতর সবটা জায়গা অঘোরকে লিখে দিলে। বেটে অঘোর সকালবেলাই তাই এসব ছাইপাশ গিলিয়ে দিলে—'

আল ধরে ধরে গায়েন এগোচ্ছে—ক্ষীরোদ খানিক দৌড়ে তাকে ধরল। দুই ছেলে নিয়ে এক চাষী পাল্লা পেড়ে বসেছে। একটা উঁচু ঢিবিতে পাল্লা খাটিয়ে মাঠের ধান মাঠেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সেকথা বলতে গায়েন তিরিক্ষি হয়ে উঠল, 'লিভির ভয়ে পিচ রাস্তায় ধান নে যাবার পথ নেই—চৌকি বসেছে—'

খানিক জায়গা জুড়ে ধানগাছ সব থাক্। এ সব জায়গায় বর্ষার মুখে মুখে বিষ-পোকার ঝাঁক উড়ে গেছে—ধান দূরে থাক, ভাল খড়ও পাওয়া যাবে না।

পথ ভাঙতে ভাঙতে গায়েন নিচু হয়ে ঘাসের চেয়েও সবুজ খুদে খুদে বরবটি তুলে ক্ষীরোদের হাতে দিল, 'ভেঙে মুখে দিন—রাখাল কড়াই, বয়েসকালে গরু চরাতে এসে ক্ষি:ধের চোটে এসব কত খেয়েছি—শুকিয়ে নিলি ভাল ডাল হয়—'

'গরু ছিল বুঝি—'

'হেলে গরুই বেশি—একাই বিঘেটাক দিন ভরে চষে ফেলেছি। সন্ধ্যেবেলা চরানির মাঠ ঢেকে রেখে দিতুম—রাত থাকতি জোচ্ছনায় সেখানে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতুম, ভোর হলিই হালে জুতে—'

'সাপটাপ—'

'কোথায়? আজকাল আর দেখিনে—'

ক্ষীরোদ কিন্তু সাবধানে পা ফেলে এগোতে লাগল। এমন দশ বিশ হাজার বিঘের মাঠে যে কোন জায়গা থেকেই সাপ উঠে আসতে পারে।

'আছে দু' একটা—খুব রাত না হলি বেরোয় না। ভয়ানক বিষধর। তবে, আগে অনেক ছেল। সত্তর আশিটে কেউটে আমিই সাবাড় করিছি—'

'লাঠি দিয়ে—'

'লাঠি কোথায়! এই হাত দে—' গায়েন দাঁড়িয়ে গেল।

আর কত দূর গরাণবেড়ে। অনেকক্ষণ বসতবাড়ির পরিষ্কার ঢিবি জায়গায় দাঁড়ানো হয়নি। নিশ্চয় সেখানে সাপ থাকে না।

'এখন যেখানে দাঁড়িয়ে—তার মাথায় অন্তত ষাট হাত জল ছেল—বিদ্যেধরীর জল, নৌকো এ জায়গায় এলি পয়সা ছুঁড়ে দিতুম—'

'এখানে? নদী?'

'এ জায়গা তো মধ্যিখান—তিন মাইল চওড়া বুক ছেল, আমিই চাল বোঝাই দে ধোসারহাট ঘুরে চেতলার আচ্যিদের গোলায় কালীগঙ্গা ধরে নৌকো পৌঁছে দিতুম। ওই যে বাবলার ঝাড়—রশি দশেক হবে, ওসব গাছ ত বছর সাতের—নদী ফুরে আসার মুখি পাখিদের কাণ্ড।'

ক্ষীরোদের আর কিছু বলতে হল না অনেকক্ষণ। নীলাম্বর আগে আগে হাঁটছে। পেছনে ক্ষীরোদ, সামনে কেউ নেই। সেই ফাঁকার দিকে তাকিয়ে নীলাম্বর কথা বলছে। উলটো দিক থেকে বাতাস এসে তার কিছু শব্দ তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। ক্ষীরোদ খানিকটা শুনতে পেল—তাকেও পথ দেখে পা চালাতে হচ্ছে।

'বিদ্যেধরীর বুক জেগে উঠতি দু'পাশে লাঠালাঠি শুরু হয়ে গেল। যার জমির লাগোয়া চর ওঠে সেই রাজা—দুশো-পাঁচশো বিঘে হামেশাই অনেকের ক্ষেতের গা দিয়ে জেগে গেল। কিন্তু দখলে রাখা চাই। আর লাঠালাঠি! এখানটায় থেমে গায়েন দু'হাতে তালি দিয়ে হেসে উঠল।

ক্ষীরোদ মানে না বুঝেও সঙ্গে সঙ্গে হাসল। গাছটা নীলাম্বরদের।

'আমি তখন বড় গুণ্ডো। বুকে বুকে খাড়াই গুতো মেরে মাল খেলি—যার লাগে তার চড়চড় করে আওয়াজ হয়—আমি দাঁড়াইনে, ফেড়ে বেইরে যাই। মুকুজ্যেদের বড় তরফ ডেকে নে বললে, নারাণপুরের কাছে পাঁচ হাজার বিঘের চরটা দখল করে দিলি একশো বিঘে জায়গা লিখে দেবে—'

'তা দেছেলে—হোসেনপুরের মোড়লদের বড় ছেলেটাকে কেটে ফেললাম। জোয়ান

বয়েস, রক্তের রঙ কী—জমি দখলে এমন কত হত—' গায়েন থেমে থেকে মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যে রূপশাল ধান দেখিছেন ওখান-টায়—ঠিক ওই থাক্ মত জায়গাটায় খুনটো করি—'

ধান আছে—ভেতরের দুধ পোকার বিষে শুকিয়ে খাক্। এতক্ষণ দু'জনে গরুর গাড়ির লিক্ ধরে এগোচ্ছিল। এবারে গায়েনের সঙ্গে মাঠে নামল ক্ষীরোদ।

'খুনটা হয়ে যাওয়ার পর মন মুষড়ে গেল—কিন্তু তখন ছেলেরা ছোট, আমার ফাঁসি হলে ওদের দেখতো কে? মাঠের মধ্যি বসেই মোড়লদের, ছেলেটাকে ল্যাজা দে এতটুকুন টুকরো টুকরো করে চৌদিক ছড়িয়ে দেলাম—আর কী শকুন! তিন দিনের ভেতর—সব সাফ!

তারপর একশো বিঘে নে কি করব? আর কি মাটি! ধান ছড়িয়ে দি তো ধান বেরোয়—এই তার গোছ—কিন্তু মুশকিল দেখা দেল সাপ নে। যেখানে কোথাও নরম মাটি পেয়ে সাতদিনের ভেতর গোখরো তার ছানা পোনা নে হাজির। গোটা কয়েক মারার পর আমাকে দেখলি ওরা গর্তে গিয়ে লুকোতো। আমি লেজ ধরে টানতুম—উল্টো টানে গায়ের মাংস খাবলা খাবলা উঠি যেত। সে অবস্থায় মাথার ওপর পাক দে ছুঁড়ে দিতুম—তারপর বাচ্চারাই পিটে মারত।'

'গরাণবেড়ে আর কতদূর?'

'এসে গিছি।'

নদীর বুকের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আগেকার পাড়ে এসে উঠতে আরও আধ ঘন্টা লাগল। সেখানেই মার খাওয়া নদীটাকে পাওয়া গেল। খানা কেটে দেওয়া ড্রেনের চেয়েও সরু—জলের ছিটে ফোঁটাও নেই, দু'ধারে কিছু বুনো ফুল ফোটে।

'এই নদী গিয়েই আমাদের সব্বনাশের শুরু। নদীও গেল—মাছ গেল, ব্যবসা গেল—'

এত গাছ, আড়াল আবডাল নেই—শুধু মাঠ, হামেশাই দশ বিশ বিঘের দিঘি—তাতে পলক পড়ে না এমন শালুকের পুরু চাদর, বাতাস একটু থামতেই শুকনো বকুলের ভারি গন্ধ। ক্ষীরোদ এক টিপ নস্যি নিয়ে ফেলল।

'দেখতি পাচ্ছেন?'

দক্ষিণে তাকিয়ে ক্ষীরোদ থমকে দাঁড়াল। আকাশের সবখানি জুড়ে সবুজ একটা মাথা উঠে গেছে। পাতার চেহারা অন্য তেঁতুলের চেয়ে কিছু আলাদা। এক একখানা ডালে শেয়ালদার আধখানা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে যাবে। এ কেটে নিয়ে গরুর গাড়িতে চাপাতে কম করেও মাস খানেক চলে যাবে।

'পিপড়ে হয়নি গাছে? পোকা?'

'নালসের ডিম আছে ঝুড়ি ঝুড়ি। পোকামাকড় নেই একদম। একটুও ঘুণ ধরেনি—'

গাছের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্ষীরোদ নীলাম্বরের সঙ্গে এক উঠোন লোকের মধ্যে এসে পড়ল। জনা ষোল ধান ঝাড়ছে। ইঁটের চেয়েও কঠিন মাটির দাওয়ায় এক তে-মাথা বুড়োর পাশে খেজুর পাতার চ্যাটাইতে বসতে হল। পরামাণিক বুড়োর গালে ফটকিরি বুলিয়ে ক্ষীরোদের থুতনী ধরে ফেলল।

'কামিয়ে নিন্—আপনারা শহরগঞ্জের মানুষ—' নীলাম্বর নিজেই পরামাণিকের বাক্স এগিয়ে দিল।

গাল বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষীরোদ সামনেই আবার তেঁতুলগাছটা দেখতে পেল। গোড়ায় একটা ভাঙা টিউবওয়েল।

'জল ওঠে না?'

'অনেক টাঁকা দে বসাই। দু'বছর না ঘুরতি বালি ঢুকে বন্ধ হয়ে গেল—'

'কত ফুট?'

'সাতশো সাড়ে সাতশো—জল এখানে অনেক নীচে—' সেই বুড়ো এক লাফে মাটিতে নেমে বলল, 'সোঁদরবনের মাটি তো—'

'তাই বুঝি।'

'নোলাম্বর তখন ছোট। ওর বাপ আর আমি দেখিছি—আমাদের খুড়ো মশাই লাঙল টানতে পারতেন না। লাঙলের ফলা মাটিতে ঢোকেই না। ঢুকলিও গুচ্ছের শেকড়বাকড় আটকে যায়—'

'কী রকম?'

'তল্লাট ভরে তো শুধু গাছই ছেল। খুড়োমশাইর বাপ কত গাছ সাবাড় করে লোকজন বসায়। ওই লাউ মাচার নীচি রোজ সন্ধ্যেবেলা বাঘ এসে বসি থাকত। পুকুর দেখিছেন—ওর ভিতর থিকি ওই ঘরের সামনে গাছের গুঁড়ি বেইরেছে—আঁধারের চেয়েও কালো।'

'বাঘ লোক খেত না?'

'খেত। তবে আমাদের কাউকে খায়নি। খুড়োমশায়ের বাপের জন্যি—'

এক গাল কামানো হয়ে গেছে ক্ষীরোদের। এমন সময় গাঁয়ের চৌকিদার এল। খালি গায়ে লুঙ্গির ওপর পেতলের তকমা বেলট্ ঝুলছে। চেঁচিয়ে বলে গেল, দশ-দিনের ভেতর 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' শ্রেণীর রেশন কার্ডের জন্য নাম লেখাতে হবে।

নীলাম্বর বুড়োকে দেখিয়ে বলল, 'খুড়ো মশায়ের বিয়ের পর রেল লাইন বসিছে ইদিকে। ওনাদের খুড়োর বাপ বড় তেজি ছেলেন। বাঘ টাঘ তারি সমঝে চলত—'

ক্ষীরোদ পরামাণিকের হাত থেকে মুখখানা বাইরে এনে নীলাম্বরের খুড়োর দিকে তাকাল। বুড়ো খড়ো এবারে সব ভেঙে বলল, 'আমাদের খুড়ো মশায়ের বাপের লেজ ছেল—'

নীলাম্বর বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি ছেল। তিনি এ গাছ থিকি ও গাছে লাফাতি পারতেন —নিজেরই শোরের খোয়াড় ছেল। পাকাবাড়ির মেঝেয় চড় মেরে দাওয়া ফাটিয়ে দেতেন। শেষ বয়সে দাঁত পড়ে যাওয়ায় কড়া চাপানোই থাকত। আধপোড়া শোরের মাংস গিলি গিলি খেতেন!

—লাউ মাচার নীচে, একবার এক বাঘ এসি ওনার হাতে প্রাণটা দেলে। এক মুগুরের ঘায়ে বাঘের মাথা ফাঁক—'

'কতদিন বেঁচে ছিলেন—'

'লোকে বলে দু'শো বছর—তবে অত নয়'—একটু থেমে নীলাম্বর বলল, 'তিনি কবে মরলেন কেউ তা দেখেনি।'

'মানে?'

'শেষ বয়সে নাকি একা একাই করাতি নদী পার হয়ে সোঁদরবনের দিকে হেঁটে চলে গেছেন—আর ফেরেননি।'

নীলাম্বরের খুড়ো বলল, 'আমরা তখন ছোট। নোলাম্বরের বাপ ওই তেঁতুল গাছের একখানা বড় ডাল কেটে গুছিয়ে রেখিছে। খুড়ো মশায়ের বাপের শরীরটা হেলে গেছে কিছুকাল। মরলিই লাশ চিতেয় দিতে হবে। ছেলে পেলে মাগ কবে কাবার হয়ে গেছে। মুয়ে আগুন দেবার জন্যি আমরা নাতিরা টিঁকে আছি—একদিন সকালে উঠি দেখি

আর নেই। দুপুরের দিকি দূর গাঁয়ের রাখালরা খবরটা দেলে, পোড়ো গায়েনকে তারা ডোঙায় চাপি সোঁদরবনের খাল ধরি এগুতে দেখিছে—সেই শেষ খবর।'

একটা ডাব কেটে নীলাম্বর ক্ষীরোদের হাতে তুলে দিল, 'এই আমাগে অগড়ের তেঁতুলগাছ। খুড়ো মশায়দের খুড়োর বাপ ছাড়া সবাই ও গাছের ডালে পুড়িছে। আমার মেজদি পুড়িছে, শৈলাদি পুড়িছে—আজকাল পাখিরা আর বসে না, আগে ঝাঁক ধরে ওই তেঁতুল ঠুকরে তলায় চলে পড়ি থাকত।'

যাকে নিয়ে এত কথা, ক্ষীরোদ দেখল, এমন বাতাসে মগডালে তার কিছু পাতা শুধু কাঁপছে। ঘন সবুজের মাঝে মাঝে পুরনো কালো গা থম্‌ মেরে দাঁড়িয়ে। ধান-কাটা মাঠে নীলাম্বরের বড় ছেলে লাঙল দিচ্ছে। কড়াই বুনবে। দূর রাস্তা দিয়ে বাস যাচ্ছে, গাছপালা বলে দেখা গেল না, ক্ষীরোদ শব্দ শুনতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল, 'এমন অমঙ্গলে গাছ রেখে কি করবে গায়েন—যদি দিতে, নিয়ে যেতাম'—কথাটা গোড়াতেই এর চেয়ে আর খোলসা করে বলা যায় না।

'এত বড় গাছ কি প্রকারে নেবেন'—কিছু অবাক হয়েছে নীলাম্বর খুড়ো, 'আমার এই বয়সে কত ঝড় দেখলাম ওকে নিতে এল—নড়াতিই পারলো না।'

'লোকজন এসে নিয়ে যাবে। দশটা কুড়োল লাগালেই ভাগে ভাগে মাটিতে শুয়ে পড়বে। নায্য দর যা তাই দেব।'

'আপনি কেটে নে যাবেন?' খুড়োর মাঝখান থেকেই নীলাম্বর জানতে চাইল, 'দর কী রকম—'

'বাজার যা তাই—একটা পয়সাও ঠকাবো না। তবে গাছও কতকালের দেখতে হবে—ওতে কি আর কিছু আছে!' এ কথাটা একেবারে মিথ্যে—কেননা, অমন কাঠে কিছু না থাকলে কোথায় আছে—তাই ক্ষীরোদের গলা একটু কেঁপে গেল।

'আপনার কী কাজে লাগবে?'

'বিশেষ কোন কাজে নয়—তবে, আপত্তি না থাকলে চেরাই করে নিমতলার গোলায় পাঠিয়ে দিতাম'—ক্ষীরোদের চোখের সামনে এখন দশ হাজার ইজিচেয়ার, পঞ্চাশ হাজার পিলসজ, এক লক্ষ পিঁড়ি নাচছে।

নীলাম্বর গাছটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরামাণিক উঠোন পেরিয়ে গেল। বুড়ো খুড়ো বলল, 'লোলাম্বর হয়নি। বিদ্যেধরীর বুক বেয়ে আমাদের খুড়ো মশায়ের বাপ কোণাকুণি পাড়ি দেতেন 'রতের বেলা—তখন জোচ্ছনায় এ গাছের পেল্লয় ভরি আঁধারের দিকে চেয়ে পাড়ে ফিরি আসতেন।'

হাতের একখানা পাকানো কাগজ কথা বলতে বলতে সোজা করে ধরল, 'এই যে চৌকো ঘর দেখিছেন—এগুলো বাড়ি, এই যে রেখার মাথায় চিকে দেওয়া ছবি—এ হল বৃক্ষ—এই আমাদের তেঁতুলগাছ—'

'সেটেলমেন্ট ম্যাপ?'

'উনত্রিশ সনের—তখনকার সেটেলমেন্ট সাহেবের সই দেখিছেন নীচি', বলতে বলতে খুড়ো ধান কাটা মাঠে শুকনো বাবলার ঝাড়টা আঙুল দিয়ে দেখাল, সোত্‌ কম বলে ওইখেনটায় সাহেবের বোট বাঁধা থাকতো—তিনিই আমাগের খুড়ো মশায়ের বাপের ছবি তোলেন। কত টাকা দিতি চাইল সাহেব—পোড়ো গায়েন তবু তার লেজ দেখায়নি—'

'এমনিতে পোড়ো গায়েন রাতবিরেতে রাস্তা পার হত হেসে খেলে—দিনি দিনি কিন্তু রোদ বাড়লিই কানা, ছায়া বেছে নে বসি পড়ত ওই তেঁতুল তলায় পিঁপড়ে

কামড়ালি ধরতি পারত না। ঝাঁক ধরি কামড়ালি তবে উঠে গে তেঁতুল গাছে গা ঘষত—তখন শুকনো ছালবাকল খসি পড়ত। বৃক্ষের আদুল জায়গায় কী মোলায়েম করে হাত বুলে দেত পোড়ো গায়েন তখন।'

ম্যাপখানা মেলে ধরল ক্ষীরোদের চোখের সামনে, 'কেমন চওড়া নদী ছেল দেখিছেন', বুড়ো ম্যাপের ওপরে একটা চ্যাটালো ড্রেনের গা দিয়ে আঙুল টেনে আনল। ক্ষীরোদ ধানকাটা মাঠে তাকিয়ে ফেলেছে। ঢলা রোদের আলো কাৎ হয়ে পড়ে। ন্যাড়া মাঠের এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে গরুর ছোট ছোট ছায়া। তার ভেতর দিয়ে নীলাম্বর হেঁটে আসছে। পেছনে জনা পাঁচেক লোক। তাদের দু'জনের কাঁধে দু'টো কুড়োল।

বুড়ো বলছিল, 'এই পেল্লয় নদী সাঁতরে পোড়ো গায়েন পাত্তার সঙ্গে ওই তেঁতুল জল খেয়ি ঘুম লাগাতো। বেলাবেলি উঠতি চরের মাটিতে গর্ত করে ধান গুঁজে দেত, তখন ত আর লাঙ্গল চলতো না। দু' হাত শেকড়বাকড়—'

লোকজন সুদ্ধ নীলাম্বরকে ঢুকতে দেখে বুড়োর কথা কেঁপে গেল—

'ও তুমি দর ঠিক করে ফেল ক্ষীরোদবাবু—এ গাছ আমরা রাখব না—'

নীলাম্বরকে থামিয়ে দিল বুড়ো, 'বেচে দিবি? আমায় পোড়াবি কি দিয়ে—'

'সে আরও গাছ আছে। বাবলাগুলো কি হবে?'

'তা' বলে পোড়ো গায়েনের তেঁতুলতলা থাকবে না—অমন ছায়া রোদ এসে হাট করে দেবে?'

'তা দিক্‌ খুড়ো। এবার তো ধানের হালচাল দেখি মাথা ঘোরে। শ্রাবণ ভাদ্রে টান ধরলি এতগুলো পেট তো আর তেঁতুল গিলে চলবে না—'এবার দাঁড়ানো লোক-গুলোকে ধমকালো নীলাম্বর, 'নে নে তোরা হাত লাগা—কোথায় কোপাবে দেখে দাও—'।

'দর ঠিক হোক্‌।'

'বেশি কথা কয়ে কাজ কি? না হোক্‌ তিনশো বছরের গাছ হবে—তিনশোটা টাকা দিয়ো—'

এতক্ষণে খুড়োর মুখে কথা এল, 'আমার ভাগ আমি বেচবো না—'

'বাগড়া দিয়ো না খুড়ো—আটকুড়ো লোক তুমি, আমরাই তোমাকে দেখব—এতকাল দেখিনি?'

নীলাম্বরের কথায় কান দিল না, 'আমার স' পাঁচ অংশ—ও আমি বেচব না।'

নীলাম্বর গোঁজ খেয়ে দাঁড়ালো। পেটের খোঁদল বাতাসে ভরে গেছে। মাঠময় গরু ফিরছে—শুকনো ধুলোয় মাটির ওপরের আধ হাত ধোঁয়া হয়ে গেছে। নীলাম্বরের বড় ছেলের বৌ হবে, একগলা ঘোমটা দিয়ে ক্ষীরোদের জন্যে ভাতের থালা নিয়ে দাঁড়ানো।

'তোমার অংশের গুষ্টি মারি। এ সোঁদরবনের গাছ—যে নেয় তার। নে নে তোরা হাত লাগা এইবেলা—।' এবার কিন্তু পাঁচজন নয়—লোকগুলোর মোটে একজন কুড়োল কাঁধে উঠে দাঁড়ালো।

'পোড়ো গায়েন ফিরে এলি কি দেখাবি লোলাম্বর?' গলা ঘড়ঘড় হয়ে উঠতে একদলা কাশি ফেলে দিল খুড়ো।

'তিনখানা একশো টাকার নোট? তোমার পোড়ো গায়েন আর ফিরবে নি!' কী খেয়াল হতে নীলাম্বর হেসে উঠল, 'কোন পথ দে আসবে শুনি? আড়াইশো তিনশো বছরের বুড়ো তো হেঁটে আসতে পারবে নি। নৌকোয় আসবে করাতি, বিদ্যেধরীর বুক শুকিয়ে কাঠ!'

এ সব কথার ভেতর দিয়ে বুড়ো শুধু বলল, 'ঠিক ফিরে আসবে রে। সে বেজো দুষিসনে।'

কথাটায় কী ছিল। তেঁতুল গাছটার সামনেই জুৎসই একখানা হাওয়া চৌদিকের অনেকটা ধুলো হুস্ করে শূন্যে তুলে দিয়েই ফেলে দিল। সংগে সংগে কয়েকটা বড় তেঁতুল শব্দ করে তলায় পড়ল। দাঁড়ানো লোকটা কাঁধ থেকে কুড়োল নামিয়ে ফেলেছে। সবার সঙ্গে ক্ষীরোদও গাছতলায় তাকালো। পরিষ্কার জায়গাটুকুর ওপর খানিক চন্না-রোদ চৌকো হয়ে পড়ে। তার বাইরেরটা পাতলা অন্ধকার। সেখানে গাছটা দাঁড়ানো। এতগুলো লোকের সামনে গুঁড়ি থেকে একটা কালো জিনিস নেমে এল— রোদে পড়তেই সবার আগে নীলাম্বর হেসে উঠল, 'খড়িচোচ্!'

বেশ লম্বা। সাপটা তেঁতুলগুলোর ওপর দিয়ে—রোদের বাইরে নেমে এল। অবেলায় আর ভাত খেতে পারল না ক্ষীরোদ। থালা ঘেঁটে ঠেসে জল খেয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আঁচানোর জন্যেই পুকুরে যাচ্ছিল। এমন সময় নীলাম্বর বলল, 'মেয়েরা মাছ ধুতে পুকুরে নামলিই দু'টো এসে জ্বালাত রোজ। একটাকে কোঁচে গেঁথি ফেলিছি।—এইটে তাহলে গাছে উঠে বসেছেল।'

উঠোনের কোণে দাঁড়িয়ে মুখ ধুয়ে নিল ক্ষীরোদ। খুড়ো-ভাইপোর এখন যা অবস্থা তাতে গাছের দর নিয়ে একটু চাপ দিলেই নীলাম্বর আড়াইশো কী স'দুশোয় রফা করে নিত। যোগাড়যন্তর করে ডেকে আনা পাঁচ পাঁচটা লোক কুড়োলসুদ্ধ উঠোন ছেড়ে মাঠে নেমেছে। ক্যাচকোচ করতে করতে ধানবোঝাই একটা গো-গাড়ি এসে হাজির হল। সামনের গোয়ালে বৌরা ধোঁয়া দিচ্ছে, মশার ঝাঁক সেখান থেকে বেরিয়ে উঠোনের মাথায় এক জায়গায় চাক বেঁধে উড়তে আরম্ভ করেছে। আজ আর গাছ কাটার কথা ভাবাই যায় না। ক্ষীরোদ ধুলো ঝেড়ে পাম্পসুতে পা গলালো। সন্ধ্যের আগের বাতাসে গেয়োবনের নরম ডাল পালা মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ধান মাড়ানোর বলদটার পাঁক খাওয়া থামেনি—খুঁটি আলগা দেখে নীলাম্বর উঠে গিয়ে এঁটে দিল।

'এখন যাবেন কি? আমরা পোড়ো গায়েনের বাড়ির লোক, জেনেশুনে আপনাকে ছাড়তি পারিনে—' বলতে বলতে নীলাম্বরের কাকা এগিয়ে এল। কালচে অন্ধকারে বুড়ো উঠোনে—ওপারের দাওয়ায় ক্ষীরোদ। খুড়ো প্রায় লুফে ধরে ফেলল তাকে। জামার নীচের ফতুয়ার ঘড়ি-পকেটে সাড়ে তিনশো টাকা গজ গজ করছে। খুড়োর মুখ দেখে ভাল বোধ হল না ক্ষীরোদের। এই গাছ, পোড়ো গায়েনের ফেলে যাওয়া বিদ্যেধরীর শুকনো বাদা, চাকা খোলা গরুর গাড়ির ধড়—এখান থেকে বৌবাজার-শেয়ালদার কাঠগোলায় কোনদিন ফেরা যাবে না আর। খানিক আগে তবু কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর দূর রাস্তায় বাসের হর্ন, ঘড় ঘড় আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এইমাত্র পোড়ো গায়েন এক চড়ে সব শব্দ বন্ধ করে দিয়েছে। বাদার মাথায় পোকায় কাটা আধখানা চাঁদ উঠতেই নীলাম্বর তার খুড়োকে বোঝানো ছেড়ে দিল। এতক্ষণ কত রকমে পথে আনার চেষ্টা চলছিল ক্ষীরোদের সামনে। তিনশো টাকার মধ্যে কী বাবদ কত যাবে তার ফিরিস্তিও দিচ্ছিল নীলাম্বর। খুড়ো উল্টো দাওয়ায় ভোম্ মেরে বসে। হ্যাঁ না কিছুই বলে না। ধরা-জ্যোৎস্নায় ক্ষীরোদ শুধু পাঁচ হাত ছম্বা-টাকে উঠোনময় চক্কর খেতে দেখল। এতক্ষণে বাদার গর্ত থেকে লাল কাঁকড়ার কোটি ছানা বাইরের ঠাণ্ডায় উঠে এসেছে।

'তবে খুড়ো খতেন দেখাও—কার কত অংশ বুঝে নেব।'

খুড়ো দাওয়া ছেড়ে রাগে রাগে উঁচু ঘরটায় ঢুকলো, 'লক্ষ নে এসে দেখে যা—মালিক খতেনে আমার স'পাঁচ আনা অংশ—তোর বোন শৈলর ছেলেপেলেরা ভাগ বসালি ও গাছে তোর দু'আনাই নেই—'

গুলতিতে টান দিলেও এত জোরে গুরুল ছুটে যায় না। নীলাম্বর মাথায় ঠোক্কর খেতে খেতে অন্ধকার ঘরে ঢুকে গেল। তারপর খুড়োর কয়েকটা কথা বাইরের দাওয়া অব্দি পৌঁছে শুধু একটা চীৎকার হয়ে গেল শেষে। তাও বেশিক্ষণ থাকল না। মেহগনির প্রথম পালিশেও গন্ধ উঠেই এমন উবে যায়। খুব ভারি নিঃশ্বাসে ঘরের অন্ধকার মাড়াই হচ্ছে প্রায়। কয়লা খেগো পুরনো লোকাল ইঞ্জিনটা ভোরের ট্রেন টেনে বাসুলিডাঙ্গা এসে মাড়ি, দাঁত সব টলে ফেলে নীল ধোঁয়াটে নিঃশ্বাস ফেলছিল আজ সকালে।

পাম্পসু ক্ষীরোদের পায়েই ছিল। নদীর ফেলে যাওয়া মাটি। শেষবারের মত জল চুয়ে নিয়ে পাথর হয়ে আছে। জুতো জোড়া বগলে রয়েছে অনেকক্ষণ। পায়ের নীচে কড়া ফেড়ে যাচ্ছে—তবু না দৌড়ে নিস্তার নেই। রশি দশেক দূরের বাবলার ঝাড়টা পেরোবার সময় এমন একটানা মাঠে এক পোচড়া ভুষোকালির চেয়ে বেশি কিছু লাগল না তার। ওই জায়গাটায় সেটেলমেন্ট সাহেবের বোট বাঁধা থাকত। ফাঁকা দেখে চাঁদ অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে। দৌড়োনের ঝোঁকে একবার নীলাম্বরের গলা হাকড়ানি পেছু-ডাক ছুটে আসছে বুঝতে পেরেছিল। ল্যাজা দিয়ে পুরো একটা মানুষ সাইজে আনে কী করে। এখন দেখে শুনে পথ ঠিক করে নিতে হবে। ওই তো রূপশাল ধানের মাঠ। বোধহয় তাই। সবই একরকম লাগছে। উপরে তাকাতে ক্ষীরোদ চাঁদের কিছু উনিশবিশ বুঝতে পারল না। পোকা এবার ধানের দফা শেষ করেছে। বর্ষার মুখে মুখে আরও কম টাকা নিয়ে নীলাম্বরের উঠোনে এসে দাঁড়ালে ভাইপো সুদ্ধ বুড়ো খুড়ো আজ এই সন্ধ্যের পরেও টিকে থাকলে কাঁধে কুড়োল নেবে ঠিক। মগডালের রসালো কাঠে-হলুদ রঙের পিঁড়ি বানিয়ে ক্ষীরোদ তখন রথের মেলা ছয়লাপ করে ছাড়বে।

হঠাৎ মাঠ নাবি নিতে থমকে দাঁড়াল। এ যে নেবেই যাচ্ছে। বাদা জুড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠল, বিদ্যেধরী শুকোতে শুকোতে করাতি মুছে গেছে। বর্ষার জল দাঁড়ালে বেরোতে চায় না। সেই বাদা ডিঙিয়ে পোড়ো গায়েনকে নাকি ফিরতে দেখেছে নীলাম্বরের বড় ছেলে। যত্ত তেড়েল গেঁজেল।

উল্টে পড়ল ক্ষীরোদ! পা ঠিক জায়গায় রাখতে পারেনি। পাম্পসু কুড়িয়ে উঠতে গিয়ে বসে পড়ল। করাতি-বিদ্যেধরীর শুকনো জল হু হু করে ফিরে আসছে। রূপো রঙের। পড়ি মরি উঠতে গেল। হাঁটুর কল কব্জায় জং ধরে আছে কতদিন। পাম্পসু পড়ে গেল হাত থেকে। হামা টানার কায়দায় বুক ভরে দম নিয়ে ছিটকে বেরোবার চেষ্টা করল ক্ষীরোদ। দৌড় ত দূরের কথা—দাঁড়ানোর মত এমন চেনা জিনিসটাই কিছুতে হল না। হচ্ছে না। হাঁটুই খোলে না। যখন এখানে এভাবে থাকতেই হবে—তখন আর পাম্পসু খুঁজে লাভ নেই বুঝে যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই ক্ষীরোদ একটুও না নড়ে বসে গেল। কোথাও অন্ধকারের ছিটেফোঁটাও নেই। বাদা ভর্তি জ্যোৎস্না। ডোঙায় চড়ে পোড়ো গায়েন ইচ্ছে করলেই ফিরতে পারে এখন।



দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : নভেম্বর, ১৯৩৩। এই কলকাতাতেই জন্মেছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশা—হ্যাঁ, পেশা যা, তাকে সাংবাদিকতা বললেই ঠিক ঠিক বলা হয়। আর পেশার বাইরে যা, তার বোধহয় কোনও সঠিক নামকরণ নেই। কোনও বিশ্বাস বা বিশেষ কোনও মতবাদের নাম দেওয়া যায় না। শুধু এটুকু বলা যায়, মুক্তিকামী মানুষের সহযোদ্ধা এই লেখক। শক্তিশালী যে ক'জন ছোটগল্পকার জন্মেছেন বাংলা সাহিত্যে, এই লেখকের নাম তাঁদের সঙ্গে উচ্চারিত। মাত্র কয়েকটি গল্প দিয়ে বাঙালী পাঠককে এক সময় কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন দীপেনবাবু। ছোট-খাটো চেহারার মানুষটির কী জোর যে তাঁর কলমে, না পড়লে বিশ্বাস করা যায় না। 'চর্যাপদের হরিণী', 'হওয়া না হওয়া', 'অশ্বমেধের ঘোড়া'— এই তিনটি গল্প সংকলনের গল্পগুলিই বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনা। এছাড়া 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাস কিংবা 'ঘোড়েওয়ালাবাবু' রিপোরটাজ্-এর কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। মোট কথা বিরল-প্রসব এই লেখক একটু আলাদা জাতের, এই সত্যটা তুলে ধরাই এই লেখাটির উদ্দেশ্য। আর বিশেষ কিছুই নয়।

গল্প যা লিখেছি তার মধ্যে 'জটায়ুই' আমার সব থেকে প্রিয় রচনা। অবশ্য, আমি জানি, 'অশ্বমেধের ঘোড়া' (প্রথম প্রকাশ: শারদীয় 'ছোটগল্প', ১৯৬০) সম্পর্কে পাঠকদের একটা অন্য ধরনের পক্ষপাত আছে। হয়তো সে কারণে, এবং পরিকল্পিত ভাষান্তরের সুবিধের কথা ভেবে, প্রকাশক নিজে তাঁর সংকলনের জন্য এই গল্প বেছে নিয়েছেন। আমিও শেষপর্যন্ত অমত করি নি।

পঞ্চাশ-দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ও নবীন আমরা কিছু লেখক বাঙলা গল্পের প্রচলিত লোকরঞ্জক ছকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি। এই শিল্পমাধ্যমের শুদ্ধতা রক্ষা ও প্রয়োজনীয় বিকাশ-সাধন ছিল আমাদের অব্যবহিত দায়। সমকালীন ও বহুমুখী জীবনের জটিল গভীর বাস্তবতাকে আমরা তার সমগ্রতায় ধরতে, আধুনিক প্রকরণে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছিলাম। এই দেশেরই মাটিতে ছিল আমাদের আধুনিকতার শেকড়। পুরাণ-প্রাকৃত-লোকায়তে বিধৃত, জাতির স্মৃতি ও অবচেতনায় প্রবাহিত আমাদের জাগর ঐতিহ্য সে-আধুনিকতাকে রোদে জলে পুষ্টি দেয়। সেই সঙ্গে এক শতদল বিশ্ববোধ আমাদের সমগ্র মানবসভ্যতার অংশীদার করে। আমরা বুঝতে পারি ইতিহাস সময় আর মানুষ সম্পর্কে দায়বদ্ধতা বিনা সমস্ত শিল্পচর্চাই বিড়ম্বনা। দুর্ভাগ্যবশত আমাদেরই কেউ কেউ, সমালোচক-পাঠকরাও অনেকে, এই জটিল ও সমগ্রতাসন্ধানী প্রয়াসের মাত্র খোলসটুকুই দেখেছিলেন। লেখালেখির ব্যাপারটা তাই তাঁদের মনে হয়েছিল নিছক, বা মুখ্যত, প্রকরণকেন্দ্রিক। ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের যে-অনন্বয় ঘটছিল—তার উৎস তাঁরা খুঁজছিলেন ফরাসী অস্তিবাদী রচনায়।

কিন্তু মনগড়া ধারণা বা পুঁথিগত তত্ত্বের স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যার প্রতি অন্ধ আনুগত্যবশত পরিপার্শ্ব সম্পর্কে চোখ বুজে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। জগৎ এবং জীবনের প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ অভিজ্ঞতাই ঝুঁটি ধরে আমাদের বহু তল ও মাত্রা বিশিষ্ট বাস্তবতাকে চিনতে শেখাল: শব্দের বিন্যাসে এই নতুন অভিজ্ঞতাকে মূর্ত করতেই প্রয়োজন হল নতুন প্রকরণ। ছবি, গান, নাটক, ফিল্ম---সহযোগী শিল্পমাধ্যমগুলির অভিজ্ঞতা এবং দেশী-বিদেশী সাহিত্য পাঠ—সবই আমাদের কাজে লাগল। বাঙলা কথাসাহিত্যের অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় মননধর্মী শাখায় ক্ষীণভাবে হলেও যে-অন্বেষণ অব্যাহত ছিল, এতদিনে তা যেন এক সমষ্টিগত আন্দোলনের চেহারা নিতে চাইল।

সন্দেহ নেই আমাদের সাধ্যের সীমা ছিল। কখনো বা তাতে আতিশয্যের উৎপাতও ঘটেছে। কিন্তু আমাদের সমবেত চেষ্টা যে সেদিন বাঙলা গল্পের চেনা চেহারায় কিছু বদল আনার চেষ্টা করে, আজ আর তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের চেষ্টার এই পরিপ্রেক্ষিতটি স্মরণ রাখলে 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-র প্রতি সুবিচার করা হবে। এ আমাদের হওয়া না-হওয়া সময়ের যৌবন আর ভালোবাসার গল্প। সমকালীনের ফ্রেমে যেখানে চিরায়তকে ধরার চেষ্টা হয়েছে। নিটোল কোনো

কাহিনী নেই, আছে তার আভাস মাত্র। সময়ের ধারাবাহিকতাকে বারবার ভাঙা হয়েছে। স্মৃতি অনুষঙ্গ তথা ভাবনাপ্রবাহ হঠাৎ হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে অতীত-বর্তমানে কাটাছেঁড়া ভাবে আলো ফেলছে। দুটি শুদ্ধ হৃদয় পরস্পর মিলতে চায়। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাই যার ভিত্তি সেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তাদের স্বপ্ন নিরন্তর মাথা কোটে। পরিপার্শ্বের গ্লানি শুদ্ধ চৈতন্যে কাদা ছেটায়। সত্তার অভিজ্ঞানটি অম্লান রাখতে দুই যুবক-যুবতী নিরন্তর সংগ্রাম করে---নিজস্ব কৌশলে।

আমার গল্পে নায়কদের নাম সাদামাটা হয়। ব্যতিক্রম এই 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। 'কাঞ্চন' যেন রূপকথা থেকে উঠে আসা কোনো নাম। বাঙলাদেশের শুদ্ধ শৈশব এই নামে রিন রিন করে বাজে। কাঞ্চন-রেখা একান্তে মিলবার অক্ষমতায় কলকাতার পথে পথে ঘোরে, শহরটাকে দ্রুত পালটাতে দেখে। প্রতিকূল পরিস্থিতির খাঁচায় বন্দী তাদের জীবনে কোনো বদল নেই। এ-যুগের নিয়তিই হল বাল্য থেকে প্রৌঢ়তা---যৌবন বলে কিছু থাকল না। কাঞ্চন ভাবে যৌবনের বিশাল চত্বরে "ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতা, ভালোলাগা আর কর্তব্যের বিরোধে আমরা পোকার মতো গর্ত খুঁড়ে নিচে নামছি---অথচ সামনে সমুদ্র ছিল। হায় রে সমুদ্র।" শুদ্ধতার এই আর্তি বুকে নিয়ে বণিকী তন্ত্রসাধনার মহাপীঠ কলকাতা শহরের অকারণ নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার আগুনে পুড়তে পুড়তে কাঞ্চন-রেখা পথ হাঁটে, ভালোবাসে। চন্দ্রকোষ রাগে বিসমিল্লা খাঁর সানাই, সারেঙ্গির গাঢ় পুরুষালি ছড়ের টান, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির চন্দন আঁকা রেখার হাতের মুদ্রা, বাতাসে নূপুরের নিক্কন, বৈষ্ণব কবিতা, উনবিংশ শতাব্দীর মহৎ অনুষঙ্গ---কাঞ্চনের স্মৃতিতে আবহমান কালের শুদ্ধতা বাঙময় হয়ে ওঠে। আর, কবিতার এই স্বপ্নচ্ছন্ন পরিবেশেই বিকৃত অর্থনীতির ফাঁদে আটক নষ্ট শহর তার নখ আমূল বসিয়ে দেয় রেখা-কাঞ্চনের প্রেমে, তাদের হৃদপিণ্ডে। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এই আহত শুদ্ধতা ও আর্ত সময়েরই হাহাকার।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪-৮-৭৮

অশ্বমেধের ঘোড়া

'শুনছ? সানাই।'

রেখা থমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ঠিক সেই মুহূর্তে আলোটা ওর মাথার চুলে ভেঙে পড়ে চিবুক আর গলার পাশে একটা হালকা ছায়া সৃষ্টি করল। কাঞ্চন সানাই-য়ের সুর বিস্মৃত হয়ে আশ্চর্য চোখে রেখার সেই ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ রেখাকে অপরিচিতা মনে হল। স্বপ্নের অস্পষ্ট স্মৃতির মতো।

'কি সুর?'

কাঞ্চন চমকে বলল, 'দাঁড়াও'। তারপর ভুরু কুঁচকে অন্যমনস্কের মতো খানিক শুনে উত্তর দিল, 'চন্দ্রকোষ'। হাসল, 'আকাশ ভেঙে বৃষ্টি আসলে কি হয়, আজ শুক্লপক্ষ তো বটে'।

রেখা চোখ নামিয়ে নিয়েছে। আলোটা মাথার চুল ছাপিয়ে সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। কাঞ্চনের একটা আশ্চর্য উপমা মনে এল। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'নাহ্। বেশ একটু মোগলাই মেজাজ হচ্ছে।'

রেখা চকিতে হাতের ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মোস্ট কম্ফর্টেবল্ জানি'?

'ধুৎ!' কাঞ্চন ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিল, 'ও তোমাদের কেরানী ইন্টেলেকচুয়ালদের মানায়। উঠে বসতে না বসতেই পৌঁছে যাওয়া। তার ওপর বেবী ট্যাকসিগুলো তো নেহাৎই ভালগার। যেন বালিগঞ্জে বান্ধবীর বিয়েয় চায়ের নেমন্তন্ন। বড় ট্যাক্সিতে তা-ও বনেদী বাড়ির পাত পেতে বসার আভিজাত্য আছে। তোমাদের এই কলকাতা দিন দিন আধুনিক হচ্ছে, বর্বর হচ্ছে, সূক্ষ্মতার নামে দরকচা মেরে যাচ্ছে।'

রেখা ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'এত বাণী দিও না মাস্টারমশাই। লোকে ধরে বেঁধে মন্ত্রী বানিয়ে দেবে।'

কাঞ্চন হা-হা করে হেসে উঠল। আশ-পাশের লোক চমকে বিরক্ত চোখে তাকাল। লজ্জায় দুজনেই মাথা হেঁট করেছে। একটি প্রৌঢ় পসারী 'ফুল চাই' বলে তখনই সামনে এসে দাঁড়াল। কাঞ্চন কখনও পয়সা দিয়ে ফুল কেনে নি। একবার চকিতে রেখার সিঁথির দিকে তাকাল। তার বড় ইচ্ছে হতে লাগল এক ছড়া মালা কিনে বিনুনিতে জড়িয়ে দেয়। কিন্তু রাস্তায় ফুল কিনতে যথারীতি লজ্জা করল। বলল, 'না।'

রেখা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে দিয়েছে। কাঞ্চন রেখার সাহস দেখে স্তম্ভিত। রেখা কি আজ, রেখা কি, প্রকাশ্যে মালা কিনতে ওর ভয় করল না? ফুলের মালা হাতে একটি মেয়ের সঙ্গে সে এখন বাসে উঠবে!

'চলো, হাঁটি।'

'চলো।'

হাঁটার শেষ নেই। এক পথে পা ফেলা। রাস্তাটা চোখের সামনে পালটাতে দেখি। কলকাতা রোজ পালটায়। আমরা শুধু রাস্তাটুকুর খবর রাখি। হাঁটতে হাঁটতে বড়জোর ময়দান অব্দি যাব। বড়জোর চা খাব এক পেয়ালা। আলো আর অন্ধকারের সমারোহ

দেখব। তারপর বাস ধরব। রেখার পাশে খালি জায়গা থাকলেও আমাকে আলাদা বসতে হবে, বা দাঁড়াতে। ভিড় ঠেলে নেমে যাবার সময় রেখা হাতে একটা টিকিট গুঁজে দিয়ে যাবে। সুযোগ পেলে কিছু একটা বলবে। নয়তো অপরিচিতার মতো রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হবে। কণ্ডাক্টর কি কোনো কৌতূহলী যাত্রী অকারণে একবার আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাবে। তারপর আমি নামব। তারপর বাড়ি যাব। তারপর রাত্রি। তারপর দিন। আর দিনে দিনে হাঁটতে হাঁটতে দেখব রাস্তাটা পাল-টাচ্ছে। কলকাতা কত তাড়াতাড়ি পালটায়।

ইস্, দেখেছ?'

কাঞ্চন যদিও জানত, তবু সেনেট হলের সিঁড়ি আর ছাদের দিকে তাকিয়ে নতুন বার চমকে না উঠে পারল না। কাঞ্চন সত্যিই আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করল। সিঁড়ি নেই, খিলান নেই, দরজা নেই। অন্ধকারে কতগুলো পায়রা উড়ছে। ছাদ জুড়ে আকাশ। শুধু পেছনের দেয়ালটা এখনও ভাঙে নি। রাঙাদি-কে আত্মহত্যা করতে দেখেছিলুম। সমস্ত শরীরটা পুড়ে গেলেও মাথার খোঁপা ঠিক ছিল।

কাঞ্চন ফুটপাতে পা ঠুকে মন থেকে স্মৃতিটা তাড়াল। তারপর গলা ঝেড়ে বলল, 'জানো, বাংলাদেশে নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির মৃত্যু অনেক দিন হয়েছিল। এবার তার কবরটাও ভেঙে গেল।'

রেখা হঠাৎ অদ্ভুত প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, সেই পাগলটা এবার কোথায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবে?'

কাঞ্চন চমকে রেখার দিকে তাকাল। সত্যি, পাগলটা এখন, সত্যি, সেনেট, দাঁড়াও পথিকবর, বন্দী আমার প্রাণেশ্বর, মরি হায় হায় রে।

গমগম করে যেন অজস্র গলা একসঙ্গে হাজার কথা বলে উঠল। কাঞ্চন প্রশ্ন করল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

রেখা হাসল, 'তোমায় চান্স দিচ্ছি।'

হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'কিসের'?

'মালাটা খোঁপায় বেঁধে দেওয়ার।'

রেখা কি মরিয়া? আজকের দিনটাই কি ওকে, আজকের দিনটা, আহ্ দিনটা। দিন গেল, রাত্রি। রাত্রি যায় না। যায় না। কাঞ্চন স্পষ্ট শুনল সানাই বাজছে। চন্দ্রকোষ। সেই আমরা রেস্তোঁরায়—সুকুমার দুটো মালা—আর প্রফুল্ল সকলকে হতবাক করে এক প্যাকেট সিঁদুর, দুটো লোহার নোয়া—আর সেই মুহূর্তে প্রথম রেখাকে অপরিচিত মনে হয়েছিল। আশ্চর্য লোভে, ভয়ে সিঁদুরের প্যাকেটের দিকে তাকিয়েছিল। অথচ শপথ উচ্চারণের সময়ও তাকে এতটুকু বিচলিত দেখি নি। সকলের তাড়া খেয়ে আমি রেখার ঠাণ্ডা কপালে—মুখের দিকে তাকাতে সাহস—কোন্ আঙুল দিয়ে সিঁদুর লাগাতে হয়—প্রফুল্ল বকেছিল আর রেখা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ফেলেছিল। রেখাকে আমার সেই মুহূর্তে বউ বউ মনে হচ্ছিল। কিন্তু মালাবদল কিছুতেই করতে পারি নি। রেখাও কিছুতে মাথায় ঘোমটা—আমরা অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়েছিলাম। মাসের শেষ হলেও প্রত্যেকে কিছু কিছু টাকা এনেছিল। তারপর সন্ধে হল। সুকুমারের টিউশনি আছে, প্রফুল্ল বা চন্দন পালাতে চায়। রেখা রোমাল দিয়ে ঘষে ঘষে কপালের সিঁদুর মুছে ফেলল। রেখার এই মুখটাই আমার পরিচিত। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলুম মাত্র কিছুক্ষণে রেখার কপালের সিঁদুর আমার মনে একটা স্থায়ী স্মৃতি রেখেছে। রেখাকে হঠাৎ বিধবার মতো শূন্য, করুণ

মনে হল। দেখলাম বাচাল প্রফুল্লও দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। রেখার কপালের ঠিক মাঝখানে একটা নীল শিরা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

'দ্যাখো, সেই পেয়ারটা।' কাঞ্চন অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে যুগলটিকে দেখল। কিন্তু তার চোখের সামনে স্পষ্ট করে ভেসে উঠল সুকুমার, প্রফুল্ল আর চন্দন। ওরা প্রায় পালিয়ে গেল। মালা দুটো আমার হাতে ছিল। ফুল নিয়ে আমি হাঁটতে পারি না। রেখার কপাল শূন্য। চাইলেও রেখা মালা হাতে বাড়ি ফিরতে পারবে না। আমার পকেটে বিয়ের দলিল। রেখার হাতটা ছুঁতে ইচ্ছে করছে। রেখাকে একবার বউ বলে ডাকতে —আহ্, কি আশ্চর্য ইচ্ছে। আমরা পাশাপাশি হাঁটছি অথচ নীরবতা। বিয়ের পর একান্তে প্রথম কথা কি হবে, কি হতে পারে? আমি অস্ফুটে বলেছিলাম গঙ্গায় বসলে হয়। রেখা অস্ফুটে বলেছিল, হুঁ। তারপর আমরা চৌরঙ্গীর বাস ধরেছিলাম আর উঠেই দেখেছিলাম রেখার বাবা! তারপর আমি দোতলায় গিয়ে বসলাম। রেখা একতলায়। তারপর অন্যমনস্কের মতো কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাসের যাত্রীদের লক্ষ্য করলাম আর বাসের বিজ্ঞাপন। জনৈক বিজ্ঞাপন দেখে যথার্থ মুগ্ধ হয়েছিলাম। সুন্দর করে লেখা ছিল "ডোন্ট স্মোক্ ইন দি বাস, নট ইভন্ নাম্বার টেন।" তারপর জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চৌরঙ্গী দেখতে খুব ভালো লেগেছিল। হঠাৎ কুয়াশা, মেঘ ও স্তিমিত আলোকমালা শ্রোভিত তীরভূমি আর অন্ধকার, আর মাস্তুলের কথা মনে পড়ায় আমার খুব হাসি পেয়েছিল! অকস্মাৎ লক্ষ্য করেছিলাম আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। তারপর রেখা নেমে গেল। একটিবার ব্যাকুল গ্রীবা তুলে হয়তো সে আমাকে খুঁজেছিল। রেখার জন্য সেই মুহূর্তে আমার খুব মমতা হয়েছিল। হয়তো আমি একটু বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ পেঁৗছে গেছি লক্ষ্য করে হুড়মুড় করে নামছিলাম। দরজার কাছে কণ্ডাক্টর বলল, টিকিট? অভ্যাসে বললাম, হয়ে গেছে। কণ্ডাক্টর বলল, দেখি? মুখ লাল করে পয়সা দিয়ে নেমে শুনলাম কণ্ডাক্টর বলছে, হাতে আবার মালা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! রাস্তায় অসহায় দাঁড়িয়ে আমার কান্না পেয়েছিল। দু-পা হেঁটে মালাজোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই লক্ষ্য করেছিলাম একটা স্থবির বলদ সেটি চিবুচ্ছে। কি এক ভয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। কি একটা ভয় আমাকে তাড়া করল। রেজিস্ট্রারের চেম্বারটা মনে পড়ল—ছোট, ঠাসা। রেস্তোঁরার কেবিনটা মনে পড়ল—ছোট, ঠাসা। বাসের সিঁড়িটা মনে পড়ল—ছোট, ঠাসা। শোবার ঘরটা মনে পড়ল—ছোট, ঠাসা। আমার দম বন্ধ হয়ে এল। স্পষ্ট দেখলাম রেখার কপালে নীল শিরা। মনে হল আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠেছি। চমকে দু-হাতে মুখ চেপে ধরে বুঝলাম, চন্দ্রকোষ। পায়ে পায়ে পানের দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পরদিন রেখার সঙ্গে দেখা হতে বলেছিলাম, জানো, আমাদের বিয়েয় স্বয়ং বিসমিল্লা সানাই বাজিয়েছে।

'এই কাঞ্চনবাবু?'

কাঞ্চন চমকে তাকিয়ে দেখল সুবিমল। :ধহায়ার মতো একবার রেখার দিকে তাকিয়ে সুবিমল বলল, 'তারপর, কি খবর?'

কাঞ্চন কোনো রকমে হেসে বলল, 'বিকেল পাঁচটার পর থেকে এ-পর্যন্ত নতুন কিছু ঘটে নি।'

'না, তাই বলছি। একটা সিগারেট হবে?'

রেখা একটু সরে দাঁড়াল। কাঞ্চন পকেট থেকে চারমিনার বের করে সুবিমলকে

দিল, নিজে ধরাল। সুবিমল রেখার দিকে আর একবার তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আপনার বোন?'

'না।'

'ছাত্রী?'

'না।'

'ও, বুঝেছি।' সুবিমল মুখটা উজ্জ্বল করে বলল, 'দেখেও আনন্দ। আপনাদের আর কি ভাবনা মশাই। জীবন সামনে পড়ে আছে! এই-আমি কলেজ সেরে, টিউশনি সেরে, এখন বাড়ি ফিরে শুনব মা-র সঙ্গে ঝগড়া করে বৌদি রান্না চাপায় নি, ইত্যাদি। আচ্ছা, চলি। যা বিষ্টি আসছে!' দু-পা এগিয়ে সুবিমল আবার থমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'খবর শুনেছেন? ইউ, জি. সি.-র টাকাটা নাকি আরও পেছিয়ে গেল। প্রিন্সি-পালও হয়েছে তেমনি।'

'লোকটি কে মাস্টারমশাই?'

'আমাদের কলেজের, ম্যাথামেটিক্‌স্‌।'

'কি বলল?'

'এই, তুমি আমার কে হও, ইত্যাদি।' শেষ শব্দটা উচ্চারণ করেই কাঞ্চন সচেতন হল যে সুবিমল তার আগাগোড়া মধ্যবিত্ত সংলাপের মধ্যে এই একটি শব্দ প্রয়োগে আভিজাত্যের পরিচয় দিয়ে গেছে।

'জানো, সেদিন আমাদের নমিতা, নমিতাকে মনে নেই তোমার—সেই যে ইস্‌-লামিক হিস্ট্রির- - -।'

'হুঁ, দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ তো। কথায় কথায় তোমার খবর জিজ্ঞেস করল। বলল, কবে বিয়ে করছিস?'

'কি বললে?'

'বললুম, এই ভালো, বিয়ে করলেই তো সব ফুরিয়ে যায়। তার ওপর ছেলে-পিলের ঝঞ্জাট, শাশুড়ী-ননদের ঝামেলা।'

তারপর দুজনেই স্তব্ধ হয়ে খানিক পথ হাঁটল। রাস্তায় ব্যস্ততা বাড়ছিল, কারণ বৃষ্টি আসছে। অথচ পরিপার্শ্ব সম্পর্কে ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

'রেখা?'

'উঁ?'

'রেখা?'

'কি?'

'রেখা?'

এবার জবাব না দিয়ে রেখা হাসিমুখে কাঞ্চনের দিকে তাকাল। কাঞ্চন বলল, 'জানো? ছেলেবেলায় মাকে এমনি অকারণে ডেকে জ্বালাতাম।'

রেখার হাসিমুখ মুহূর্তে শুকিয়ে গেল! মা-র নামে ওর বাড়ির কথা মনে পড়েছে। আমারও পড়ে। রেখা সম্পর্কে মা-র একটা চাপা স্নেহ লক্ষ্য করেছি। অনেক আগে রেখাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, মাত্র একবার। রেখার মা-র চেহারা মনেই পড়ে না। বাবাকেও না। রেখার ভাই বোনেরা এই চার-পাঁচ বছরে নিশ্চয়ই কত বদলে গেছে।

'আচ্ছা, আমি যদি চিৎকার করে লোক জমিয়ে বলি, এই যে দেখছেন ভদ্রমহিলা—ইনি আমার ধর্মপত্নী, তাহলে?'

'পাগল বলে ধরে নিয়ে যাবে, এই আর কি।'

'তাহলে তো বেঁচে যাই'। কাঞ্চন হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারল না। রেখা ঠোঁটে ফুল ফুটিয়ে প্রশ্ন করল, 'আহা, অ্যাজমাটা আবার মাথাচাড়া দিল?' কাঞ্চন বলল, 'জানো, এই কথার খেলা সত্যি আর ভালো লাগে না।' রেখা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল।

ভালো লাগে না। ভালো লাগে না। চুরি করে একটু সময় নেওয়া, দুটো কথা, এক পেয়ালা কফি, লম্পট নদীতীরে নির্জনতার ব্যর্থ অন্বেষণ, তারপর অক্ষম ক্লান্তি ও ক্ষোভে অপরিচিতের মতো ঘরে ফিরে যাওয়া। একদিন, কোনো এক নিকট অথচ বিস্মৃত অতীতে, একদিন অতীতে, সবই ছিল স্বপ্ন। আর আজ, আর এখন, ঘেন্না করে। একই অভ্যাসবোধ, একই পরিবেশ, একই চায়ের দোকান আর রাস্তা আর গঙ্গার ধারের গাছতলা। এক ধরনের কথা বা কথা খুঁজে না পাওয়া। বদল নেই, হায়। অথচ কলকাতা প্রতি মুহূর্তে বদলায়। পৃথিবী বদলায়। জীবন বদলায়। আমাদের বয়েস বেড়ে যাচ্ছে, মনে মনে আমরা আরও দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছি। অথচ সেই মৌলিক ছকের ওপর ঘুঁটির মতো এগোচ্ছি, পেছোচ্ছি। এ-যুগের নিয়তিই হল বাল্য এবং প্রৌঢ়তা—মধ্যিখানে বিশাল চড়ায় ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতা, ভালোলাগা আর কর্তব্যের বিরোধে আমরা পোকার মতো গর্ত খুঁড়ে নিচে নামছি—অথচ সামনে সমুদ্র ছিল। হায় রে সমুদ্র। নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছি কথায়, রেখাকে ফাঁকি দিচ্ছি কথায়। আর পুঁথি থেকে তার সমর্থন খুঁজছি। কি যেন সেই—কি যেন---ফুলগুলি কথা আর পাতাগুলি চারিদিকে পুঞ্জিত নীরবতা। সমুদ্রের মৌন। বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে। দিনে দিনে অর্ঘ মম। দিনে দিনে রূপবতী হবে পৃথিবী। দিনের পর রাত্রি। কিন্তু রাত্রির পর? রাত্রির পর?

'এই, এ-ভাবে হাঁটলে পথেই বৃষ্টি নামবে।'

উত্তরে অন্যমনস্কের মতো কাঞ্চন চিৎকার করে উঠল, 'গাড়োয়ান, রোক্‌কে'। বলেই সে নাকে মালতীফুলের গন্ধ পেল। কারণ শ্রীকান্তর গহর-ভাইয়ের কথা মনে পড়েছিল।

রেখা বলল, 'ক্ষেপেছ?'

কাঞ্চন শুনল, নতুন গোঁসাই ওঠো! অথচ সে সচেতন ছিল এস্‌প্ল্যানেডের সামনে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে রেখা।

'খিদিরপুর কেতনা?'

লুঙ্গির খুঁট দিয়ে গলাটা মুছে গাড়োয়ান বলল, 'সওয়ারী কিধার?'

'দেখতে পাচ্ছ না?' কাঞ্চন বিরক্ত। কারণ গাড়োয়ানের রক্তাভ চোখের হাসি তার অকারণ ও অশ্লীল মনে হল। অথচ বিদেশী উপন্যাস এবং মধুসূদন দত্তের কলকাতার ইতিহাস পড়ে ঘোড়ার গাড়ি সম্পর্কে মনে যে স্মৃতির পরিমণ্ডল জন্ম নিয়েছে, তার চেহারা অন্য।

'পোলের ওপারভি যাবেন?'

'না।'

'গঙ্গার কিনারা দিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'চার টাকা লাগবে স্যার।'

চমকে উঠে বিরক্ত কাঞ্চন বলল, 'ঠিক আছে।'

চলে যেতে দেখে গাড়োয়ান গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'কত দিবেন?'

রেখা হঠাৎ উত্তর দিল, 'দু-টাকা।'

কাঞ্চন গম্ভীর হয়ে রেখার দিকে তাকাল। রেখা দর কষছে? রেখা এই অশ্লীল, ধূর্ত গাড়োয়ানটার সঙ্গে যেচে কথা বলল? রেখা কি আজ প্রতিপদে প্রমাণ করবে আমি কাপুরুষ, আমি জীবন থেকে পালাচ্ছি? রেখা কি আজ, রেখা কি, এইসব ছুটকো স্মার্টনেস্, অথচ রেখার পক্ষে—

'তিনটে টাকা দিন মা।'

রেখা হেসে কেটে কেটে বলল, 'ট্যাক্সিতে দু-টাকাও লাগে না।'

গাড়োয়ানটা আহত ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে একটা ঘোড়ার রোগা পিঠে চাপড় মেরে নিজের জিভে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলল, 'আরে শ্লুয়, মিসিন আর জানোয়ার এক হল দিদি? আচ্ছা, আট আনা বখশিস দিয়ে দিবেন। আচ্ছাসে ঘুমিয়ে দিব।'

লাফিয়ে নেমে যখন দরজাটা খুলে ধরল তখন আবার রেখাকে অপরিচিত মনে হল। বিব্রত, ভীত চোখে সে কাঞ্চনের দিকে তাকাল, তারপর গাড়িটার ভিতরে। ক্রুদ্ধ কাঞ্চন কোনো কথা না বলে ত্বরিতে উঠে পড়ল।

আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে রেখা এক কোণে কুঁকড়ে বসেছিল। উল্টোদিকের গদিতে নিজেকে ছড়িয়ে প্রায় আধশোয়ার ভঙ্গিতে বসে কাঞ্চন চারমিনার বের করল। ভেবেছিল রেখা এত তাড়াতাড়ি আবার সিগারেট ধরাতে নিষেধ করবে! কিন্তু রেখা নির্বাক। লাল আলোর সঙ্কেতে গাড়ি তখনও ট্রাম লাইনের ওপারে যেতে পারে নি। কাঞ্চন অদ্ভুত আনন্দ বোধ করল। রেখা এই আলো, এই অরণ্য, এই পরিপার্শ্বকে ভয় পাচ্ছে। ঘোড়ার গাড়িতে আমার সঙ্গে উঠেছে তাই ভয় পাচ্ছে। আমার সঙ্গে উঠে ভয় পাচ্ছে। ফিটনের দু-পাশ খোলা। সত্যিই চারদিকে অমৃতের অজস্র সন্তান। কে না কে দেখছে জানি না। রেখার পরিবার আছে, সমাজ আছে, আমি একটা পুরুষ। ওহো, আমি পুরুষ। বেড়ে।

"আলোর দিকে মুখ রাখুন। হলদের পর সবুজ আলো জ্বললে দুই দাগের মধ্য দিয়ে সাবধানে রাস্তা পার হন। মনে রাখবেন, জীবন অমূল্য। সামান্য ভুলের মাশুল ভয়ানক। আলোর দিকে মুখ রাখুন।"

কাঞ্চন হা হা করে হেসে উঠল।

'কি?'

'সাবধানে পথ চলুন সপ্তাহ। ফলে আরও ট্রাফিক জাম। বেশ বলেছে, আলোর দিকে মুখ রাখুন। তোমার যাবতীয় জেস্চার আর ঘোষণাটা মিলে পুরো শরৎ চাটুজ্জে টাইপ্।'

'কি আর করি বলো? প্রবোধ সান্যালের নায়কের সঙ্গে প্রমোদভ্রমণে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের নায়িকা হলে গুরুচণ্ডালীর দোষ সামলাবে কে?'

কাঞ্চন সিগারেটে টান দিল। রেখার স্মার্ট উত্তর তাকে এই মুহূর্তে যথেষ্ট বিরক্ত করেছে। অথচ আমি জানি না ঠিক কি চাই। কি হলে খুশি হতাম। রেখার অস্বস্তি মিথ্যে নয়, তুচ্ছ নয়। আমি একটা কলেজের শিক্ষক। রেখাকে এনে সংসারে স্ত্রীর মর্যাদা দেবার সাধ্য আমারই নেই। বাড়িতে ক্রমাগত বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে, যাবতীয় লুকোচুরির নিষিদ্ধ পথে সে তার ভালোবাসা—রেখাই উদ্যোগ নিয়ে রেজিস্ট্রেশন—তার ভয় শেষ পর্যন্ত বাবা নিষ্ঠুর—শেষ পর্যন্ত বাবা কিছুতেই জাতের অভিমান—তখন তাঁকে ঠেকাবে বিয়ের দলিল—কারণ সে জানে আমাদের হতকুৎসিৎ সংসারে হঠাৎ চলে আসা সম্ভব নয়। সে জানে যতদিন না অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ছে ততদিন

তার পক্ষেও বাবাকে আঘাত দেওয়া––। আহ্, এইভাবে, ঠিক এইভাবে আমরা স্বার্থপর হতে পারি না। অথচ যাদের জন্য ত্যাগ, তাদের প্রতিও মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করি। আর দুঃখ পাই। নিজের কাছে ক্রমাগত ছোট হতে থাকি। অথচ জানি না ঠিক কি চাই।

তারপর গাড়ি চলতে শুরু করল। পর পর কতগুলো বাস বাতাসের ঝাপট দিয়ে চলে গেল। জানলার পাশে দু-একজন যাত্রী একটু ঝুঁকে কাঞ্চনদের দেখল। নানা ধরনের শব্দের ভেতর ঘোড়ার ক্ষুরের অলস অথচ একটানা আওয়াজ কাঞ্চনের মনে কিসের যেন অনুষঙ্গ আনতে চাইছে। গাড়িটা দক্ষিণে ঘুরল। কার্জন পার্কের পাশ দিয়ে স্বল্প আলো আর নির্জনতার দিকে ধীরে এগোতে লাগল। এস্প্ল্যানেডের মোড়ের সেই আশ্চর্য শব্দপ্রবাহ স্তিমিত হয়ে পেছনে পড়ে রইল, যেন এক চিত্রিত শব। এখন ক্বচিৎ রিকশার গুঞ্জন, দু-একটা গাড়ির দ্রুত অন্তর্ধান, পথচারীর আকস্মিক কন্ঠস্বর। কাঞ্চন এতক্ষণে অনুভব করল চৌরাস্তার ভিড়ে ঘোড়ার গাড়িতে বসে থাকতে সে অত্যন্ত কম্প্লেক্স বোধ করছিল।

আর বৃষ্টি নামল। রেখা বাইরে হাত পেতে ধরল। ফোঁটা ফোঁটা জলে হাতটা অপরূপ হয়ে উঠল। রেখার আঙুলগুলিতে একটি মুদ্রার ভঙ্গি। ঘোড়ার ক্ষুরের অলস অথচ অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহে কাঞ্চনের মনে হঠাৎ নূপুরের মৃদু, অস্ফুট শব্দ-তরঙ্গের অনুষঙ্গ এল। সারেঙ্গিতে গাঢ় পরুষালি ছড়ের টানে চন্দ্রকোষ বেজে উঠল। রাধার চোখ, রাধার আঙুলে মিনতি! সঙ্গী, কেনা বাঁশী বাএ কালীনী নঈ কূলে। কড়ি মধ্যম সমুদ্র স্তম্ভের মতো কোমল ধৈবতে ভেঙে পড়ে কোমল গান্ধার ছুঁয়ে ষড়জে ফিরে এল। আর বৃষ্টি দ্রুত হল। চাকার শব্দ, ক্ষুরের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ। মাঝে মাঝে সহিসের চাবুক বাতাসে একটা সূক্ষ্ম মীড় টেনে দিচ্ছে। অজস্র জলবিন্দু ওদের ভিজিয়ে দিল।

'বাবু?'

'কেন?'

'পর্দাটা ফেলে দিব?'

কাঞ্চন জানত না এ-জাতীয় ফিটনে পরদা থাকে। অবাক হয়ে বলল, 'দাও।' মুহূর্তে যেটাকে ভেবেছিল গাড়ির ছাউনি, তার ওপর থেকে দুপাশে দুটো চামড়ার পরদা ঝুলে পড়ল। আর হঠাৎ তারা সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

স্তব্ধ দুজনে বসে রইল। কেউ কারোর দিকে তাকাতে পারছে না। এ কি আশ্চর্য ঘটনা। আমরা নির্জনতা খুঁজতাম, যেখানে ঘনিষ্ঠ বসা যায়। কলকাতা শহরে নির্জন-তা নেই। আমরা অবসর খুঁজতাম, যেখানে নিবিড় হওয়া যায়। আমাদের জীবনে অবসর পাই না। আমরা একটা পরিমণ্ডল খুঁজতাম, যেখানে আমরাই অধীশ্বর। আমাদের সময় সে পরিমণ্ডল দেয় না। অথচ আজ, অথচ একি, অথচ এভাবে–– বন্ধ গাড়ি চলছে, বাইরে বৃষ্টি, আজ আমাদের বিবাহের প্রথম বার্ষিকী। আমার স্ত্রী রেখা––পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে––ধর্মপত্নী- - -

'এই, কি ভাবছ?'

কাঞ্চন দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, 'কিছু না।' বলেই হেসে ফেলল। কারণ এর পরেই সে জানে রেখা বলবে––কথা নয়, ভাবনা নয়, তাহলে এখন তোমার মনে 'সিচুয়েশন ভেকেন্ট' নোটিশখানা আবার ঝুলিয়েছ? কিন্তু রেখা কাঞ্চনের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে শুধু বলল, 'কিছু বলো।'

হাতের তেলোর ওপর মাথা রেখে ঘাড়টা পেছন দিকে ঈষৎ ঝুলিয়ে জানুর ওপর আড়াআড়ি করে পা ফেলে রেখা শিথিল ভঙ্গিতে বসেছিল। একগোছা ভেজাচুল কপালের ওপর টিকলির মতো কুঁকড়ে ঝুলে আছে। গর্বে, আনন্দে রেখা যেন রাজেন্দ্রাণী।

প্রায়ই আজকাল রেখাকে অপরিচিত মনে হয়। হঠাৎ সে কি এক ঔদাসীন্যে অনেক দূরে চলে যায়। আসলে গত একবছরে, বিয়ের পর, আহ্, আমাদের বিয়ে একটা কৌতুক। কিন্তু সত্যিই তো তারপর রেখাকে নতুন করে কিছুই জানি নি। রেখার শরীর না, মন না, অভ্যাস না। আসলে আমরা দুজনেই আমাদের অনেক আকাঙ্খা পরস্পরের কাছে গোপন করে যাচ্ছি, নিজের কাছে মহৎ থাকার তাড়নায় পরস্পর ছদ্মবেশ পরেছি।

'কিছু বলো না গো?'

রেখার মুখে গো শব্দটা কাঞ্চনকে চমকাল। বাস্তবিক, অবস্থায় পরিবেশে শব্দের ওজন কি আশ্চর্য বদলে যায়। অন্য সময় হলে গ্রাম্য বলে পরিহাস করার সুযোগ নিশ্চয়ই ছাড়তাম না। আসলে আমি তো জানি, আমার তাবৎ অস্তিত্ব এমনই কিছু সম্বোধনের জন্য কাঙাল হয়ে থাকে।

'বউ?'

রেখা উদ্ভাসিত মুখে কাঞ্চনের দিকে তাকাল।

'বউ?'

'উ?'

'আমাকে একবার স্বামীন্ বলে ডাকবে?'

'যাহ্।'

'ডাকো না?'

'যাহ্।'

'প্লীজ্ একবার ডাকো।'

'না গো, ভীষণ লজ্জা করে।'

'আচ্ছা, ফিশফিশ করে বলো। একবারটি শুনতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। আসলে বুঝলে—'

রেখা কাঞ্চনের কথার মধ্যে হঠাৎ স্পষ্ট করে বলল, 'স্বামীন্'। বলেই দুহাতে মুখ ঢেকে ঝির ঝির করে হেসে উঠল। হাসিটা হঠাৎ ক্ষুরের শব্দের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেল। কাঞ্চন নাকে ভেজা মাটির গন্ধ পেল।

ছুঁতে ইচ্ছে করছে। খোপাটা খুলে একমুঠো ফুলের মতো চুলগুলো যদি রেখার মুখে-বুকে ছড়িয়ে দি। হাতটা ধরব? কান পেতে রেখার হৃদপিণ্ডের শব্দ যদি শুনতে পেতাম? আমার রক্ত, আমার মন বৃষ্টি হতে চায়। একটা কথা ধ্রুব বুঝেছি। বৈষ্ণব কবিরা যৌবন সম্পর্কে যে উল্লাস প্রকাশ করেছেন, তা মিথ্যে। আসলে যৌবন আমাদের লজ্জা, আমাদের যন্ত্রণা। আমি পারি না। আমি পারি না এখানে রেখাকে অপমান করতে।

আঁচল সরে গিয়েছিল। একটা সেফটিপিন। কাঞ্চনের খুব ইচ্ছে হল বলে, জামায় বোতাম লাগিয়ে নিতে পারো না? বলল, 'কি দেখছ এমন করে?'

রেখা হাসল। বলল, 'জানো, আজ প্রথম লক্ষ্য করলাম তোমার গলায় একটা তিল আছে।'

'এই অন্ধকারে?'

'হুঁ'। যখন সিগারেট ধরালে, হঠাৎ তোমার—'

'কি?'

'যাহ্।'

'ভালো লাগছে তোমার?'

'খুউব।'

ভালো লাগছে রেখার। কি অমোঘ এই ভালোলাগা। আমি জানি রেখা কি চায়। আমি জানি আমি কি চাইছি। অশ্বক্ষুরের ধ্বনি চেতনা অবশ করছে। এই আমার শরীর গীর্জার উজ্জ্বল মোমবাতি, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের গর্বিত ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে আগুনের নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল। আর দ্রাবিড়-কন্যা আর্য-ঘোড়সওয়ারের পায়ের তলায় হা হা করে কেঁদে উঠল। তারপর চেঙ্গিজ খাঁর অশ্বারোহী দল শেকল বেঁধে দাসদের টেনে নিল। তারপর লরেন্স ফস্টর ধুলো উড়িয়ে দিল্লীতে পতাকা ওড়াল। আর পতাকার রঙ পালটায়। স্বর্গের উচ্চৈঃশ্রবা এখন ধর্মনিরপেক্ষ কলকাতার মাঠে পাটোয়ারী বুদ্ধিতে বাজি দৌড়য়। আর যে যজ্ঞের অশ্বকে ফিরিয়ে আনতে ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গা এনেছিল, মাত্র আড়াই টাকার বিনিময়ে সে আমাদের খিদিরপুর পৌঁছে দেবে। কাঞ্চন চোখ বন্ধ করে ক্ষুর এবং হ্রেষাধ্বনি শুনতে লাগল। সত্য যে, দিগ্বিজয়ী অশ্বের শোণিতে যজ্ঞের আহুতি পূর্ণ হয়।

'কি গো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

কাঞ্চন চোখ বুজে জবাব দিল, 'হুঁ'। তাকাব না, আমার নিজেকে ভয় করছে। আমার নিজেকে বড় দীন, বড় অসহায় মনে হল।

'শোনো?'

'কি?'

হঠাৎ রেখা দু'-হাতে কাঞ্চনের ডান হাতটা ধরে বলল, 'শোনো'?

কাঞ্চন অস্ফুটে বলল, 'কি?'

'এই মালাটা আমায় পরিয়ে দেবে?'

গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়োয়ান ডাকল, 'বাবু!'

'কি?'

'খিদিরপুর।'

রেখা প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'দাও, পরিয়ে দাও।'

কাঞ্চন বিমূঢ়ের মতো রেখাকে মালা পরিয়ে দিচ্ছিল, সেই সময় পরদাটা উঠেই আবার নেমে গেল। ঘাড় হেঁট করে দু-জনে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। কাছেই ট্রাম-স্টপ। চৌরাস্তায় একটা পুলিস। তাছাড়া জায়গাটা নির্জন।

রেখা ব্যাগ খুলে দুটো টাকা দিল। কাঞ্চন পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে টাকাটা গাড়োয়ানের হাতে দিতেই সে চটে উঠে বলল, 'সে কি? পাঁচ টাকার কম হবে না।'

কাঞ্চন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, 'কেন? তুমিই তো বলেছিলে।'

গাড়োয়ান বলল, 'ফুর্তি করবেন, হোটেল ভাড়াভি দিবেন না?'

প্রায় ফিসফিস করে কাঞ্চন বলল, 'কি বললে?' জিভে তার কথা জড়িয়ে গেল। আর রেখা চমকে দু-হাতে নিজের কান চেপে ধরতে যাওয়ায় মালাটা হাত থেকে রাস্তায় পড়ে গেল।

তারপর সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতো দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দ্রুত পায়ে তারা খানিকটা হেঁটেছিল। কিন্তু কাঁদে নি। কারণ একান্তে কাঁদবার মতো কোনো আশ্রয় তাদের জানা ছিল না।



শংকর

জন্ম: ৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৩—পথের পাঁচালীর দেশ বনগ্রাম, ২৪ পরগনায়। বিভিন্ন মহলে এমন বিপুল জনপ্রিয়তা ইদানীং খুব কম সাহিত্যিকের ভাগ্যেই জুটেছে। বাংলা সাহিত্যে নাগরিক সভ্যতার প্রধান ধারা-ভাষ্যকার। একটা বিশেষ জীবনকে জানার জন্যে দরকার যে-আন্তরিকতার, তার সবটুকু উজাড় করে দিয়ে লেখক সেই ছবি তৈরি করেছেন। নগর-জীবনের মহাকাব্য হল তাঁর 'চৌরঙ্গী' ও 'জন-অরণ্য'। উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকায় আছে সেই প্রথম দিককার 'কত অজানারে' থেকে শুরু করে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত বিশাল উপন্যাস 'ঘরের মধ্যে ঘর' পর্যন্ত। এছাড়া একখানা কৃশকায় গ্রন্থ 'নিবেদিতা রিসারচ্ ল্যাবরেটারি'-র কথা অনেকে বিশেষভাবে মনে রাখেন। আর মনে রাখেন 'পুরোহিত দর্পণ'-এর মতো সব গল্প। নামকরা কোনো সরকারী পুরস্কার ইনি পাননি, কিন্তু বিদগ্ধ পাঠকের ভালবাসা যদি পুরস্কার হয় তাহলে তা পেয়েছেন অবিশ্বাস্য পরিমাণে। তাই উল্লেখও চান না। পেশা? চাপরাশী থেকে 'নায়েব' পর্যন্ত অনেক কাজই করেছেন তিনি এবং বিভিন্ন পেশার অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

আমার সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ গল্প বলতে কেউ কেউ 'পুরোহিত দর্পণ'-এর উল্লেখ করেন এবং আমার মতামত জানতে চান। নিজের সৃষ্টির প্রতিও লেখকরা সব সময় সুবিচার করেন না এবং তাঁদের আত্মবিশ্লেষণ প্রায়ই পক্ষপাতদুষ্ট হয়, এই সাবধানবাণী স্মরণ রেখেও আজকাল মাঝে মাঝে 'পুরোহিত দর্পণ'-এর পক্ষে ভোট দেওয়ার লোভ হয়। পুরোহিত হরকিঙ্কর ও তাঁর কন্যা শুভ্রতা আজও আমার হৃদয়ের অনেকখানি জুড়ে রয়েছেন।

শংকর
১৪-৮-৭৮

পুরোহিত দর্পণ

(যেন শেয়ালদা স্টেশনের ফুটপাথে কোলে-বাজারের বাসি শুকনো বেগুন। হরকিঙ্কর ভটচায্যির চেহারাটা দেখলে সপ্তাহখানেকের শুকনো বেগুনের কথাই মনে পড়ে। বাইরের চামড়াটা কুঁকড়ে গিয়েছে, সেই সঙ্গে ভেতরের মাংসও যেন রোদে শুকিয়ে ছোবড়া হয়ে রয়েছে। সরু লম্বা নাকটা যেন একটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন! রঙটা এককালে বেশ ফর্সা ছিল দেখলেই বোঝা যায়—এখনও খানিকটা আছে। চোখ দুটোও বেশ বড় বড় কিন্তু এখন ঝিমিয়ে পড়েছে—যেন একশো পাওয়ারের লাইট থেকে পঁচিশ পাওয়ারের আলো বেরোচ্ছে।)

খালি গায়ে বাড়ির দাওয়ায় বসে হরকিঙ্কর নিজের পৈতেটা দুহাতে ধরে পিট চুলকোচ্ছিলেন। এমন সময় ডাকপিওনকে দেখে বললেন, 'হরকিঙ্কর ভটচায্যির নামে কিছু আছে নাকি?'

পিয়ন বললে, 'কোনো চিঠি নেই।'

'হরকিঙ্কর দেবশর্মাও লেখা থাকতে পারে।'

'চিঠি থাকলে কেন দেব না বলুন?'

'ওইরকম তো তোমরা বল বাপু, অথচ লোকের চিঠি তো হারাচ্ছেও। সেবার আমার যজমানের চিঠি তোমরাই তো দেরি করে দিলে। চিঠি যখন এসে পৌঁছল তখন রমেশ ঘোষালের শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এতে যে ব্রাহ্মণের কি ক্ষতি হয়, তা তোমরা বুঝবে কী করে?'

পিওন বিরক্ত হয়ে বললে, 'আমাদের বিশ্বাস না হয়, পি-এম-জিকে কমপ্লেন করুন।'

কথা আরও বাড়তো। কিন্তু দূর থেকে হরকিঙ্করের মেয়ে সুব্রতাকে দেখা গেল। সুব্রতা সকালে সরকারী দুধের দোকানে কাজ করে। সেখান থেকেই ফিরছিল। পিওনকে সে-ই সরিয়ে দিল। তারপর বাবাকে বললে, 'আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন।'

হরকিঙ্কর গভীর হতাশার সঙ্গে বললেন, 'শুধু শুধু কি আর ব্যস্ত হচ্ছি মা। নাকতলার সুদর্শন রায় কি সত্যিই এবার দুর্গা পুজো করবে না? কিন্তু কী করে তা হয়? সুদর্শনদের পুজো কি আজকের? আমার ঠাকুর্দা ওদের বাড়িতে মায়ের অর্চনা করেছেন, আমার বাবা করেছেন, আমিও করে আসছি এই এত বছর। পাকিস্তান হবার পরও তো ওদের কাজ বন্ধ হয়নি। মাকে ওরা যশোর থেকে সোজা নাকতলায় এনেছে! ঈশ্বরের আশীর্বাদে সর্বস্ব যায়নি ওদের। এখানেও তো ক'বছর পুজো করলাম আমি। এবারই বা পুজো হবে না কেন? নিশ্চয় চিঠি হারিয়েছে।'

সুব্রতা চুপ করে রইল। হরকিঙ্কর বললেন, 'স্বীকার করলাম, প্রথম চিঠিটা না হয় গোলমাল হয়েছে। কিন্তু আমি যে জোড়া পোস্টকার্ড ছাড়লাম, তার উত্তর?'

সুব্রতার মুখটা এবার সত্যিই মলিন হয়ে উঠলো। 'কেন বাবা, সে-উত্তর তো কালই এসে গিয়েছে।'

'কালই এসেছে? আর আমি পিওনের সঙ্গে ঝগড়া করে মরছি!'—হরকিঙ্কর রেগে উঠলেন।

'আপনি তখন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন,' সুব্রতা উত্তর দিলে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে হরকিঙ্কর গুম হয়ে বসে রইলেন। সুদর্শন রায়রা এবার থেকে পুজো বন্ধ করে দিলেন। ছেলেরা পুজোটাকে বাজে খরচ মনে করছে। হরকিঙ্কর মুখ বিকৃত করে বললেন, 'সনাতন ধর্মের কিছুই আর থাকবে না।'

সুব্রতা বললে, 'বাবা, চা খাবেন তো? জল চাপাই?'

হরকিঙ্কর নিজের মনেই বললেন, 'ভালই হয়েছে—আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ওদের বড় ছেলেটা কোথাকার এক বদ্যির মেয়ে বিয়ে করেছে। বাউনের ঘরে যত অনাসৃষ্টি। সে-বাড়িতে পুজো করে নিজের অমঙ্গল ডেকে না আনাই ভাল।'

সুব্রতা চা নিয়ে এল। হরকিঙ্কর নিজের মনেই বললেন, 'ওদের কর্তা কিন্তু জানতো কেমন করে দেব-দ্বিজের সেবা করতে হয়। ওদের দেওয়া গামছাগুলোর সাইজ দেখেছিস! অন্য লোকেরা আজকাল যে গামছা দেয়, তা দিয়ে রুমালের কাজও হয় না। নামই হয়ে গিয়েছে—পুজোর গামছা!'

মেয়ে বললে, 'বাবা চা খান।'

বাবা বললেন, 'এ-যুগে আর পুরোহিতের কাজ চলবে বলে মনে হয় না। লোকে ভাবে আমরা একটা নুইসেন্স। আমরা কিছু না করেই পয়সা আদায় করি, ভিখিরীর ভদ্র-সংস্করণ।'

মেয়ে বললে, 'বাবা, নবারুণ স্পোরটিং খুব জাঁকিয়ে পুজো করছে এবার। ওদের সেক্রেটারি রোজ সকালে দুধ নিতে আসেন। আজও বলছিলেন আপনার কথা।'

'কী বললি?' হরকিঙ্কর এমনভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন যেন কেউ ভারি বুট-জুতোসমেত পা তাঁর পায়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। 'বারওয়ারি পুজো করতে হবে আমাকে এই বয়সে? কোনদিন হয়তো কেউ বলবে---' পরের কথাগুলো হরকিঙ্কর মেয়ের সামনে উচ্চারণ করলেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, 'হয়তো কোনদিন আমাকে বেশ্যাবাড়িতে শীতলা পুজো করে আসবার কথাও বলবে।'

মেয়ে বললে, 'সেক্রেটারি বলছিলেন, নবারুণ স্পোরটিং-এর পুজো করবার জন্যে পুরুতদের মধ্যে কাড়াকাড়ি।'

'ভাগাড়ের মড়ার জন্যেও কাড়াকাড়ি হয়। বারওয়ারি পুজোর পত্তন করেই সনাতন ধর্ম উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। ও-সব জায়গায় পুরুত না এলেও কেউ খোঁজ করে না; একটা পুরুতই তিনটে বারোয়ারি পুজো সারে।'

সুব্রতা চুপ করে রইল। হরকিঙ্কর বললেন, 'মা মহামায়ার পুজো বলে কথা। তাঁকে তুষ্ট করে রামচন্দ্র রাবণ বধ করলেন। দেবী দশভুজা মহিষাসুর নিধন করে দেবগণকে স্বর্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। পুজোর ত্রুটি হলে তাঁর রোষ থেকে কে আমাকে রক্ষে করবে?'

মেয়ে আর প্রতিবাদ করবার সাহস পেলে না। হরকিঙ্কর বললেন, 'একবার মোড়ের বাসনের দোকানে যাবো। যদি কয়েকটা দানের সামগ্রী বিক্রি করতে পারি। বেটা দিনদুপুরে চৌরাস্তার মোড়ে বসে গলা কাটে। অমন সুন্দর পিতলের চাদরের ঘড়া, ছাঁকা কাঁসার থালা বলে কিনা আড়াই টাকার বেশী দেবে না। কিছুদিন ধরে রাখলে দাম উঠতো। কিন্তু সে সামর্থ্য কোথায়?'

সুব্রতা বললে, 'দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করবেন না বাবা। জানেনই তো ওরা চোর।'

হরকিঙ্কর ভাবলেন, 'সবই ভাগ্য। মায়ের ইচ্ছা—না হলে সনাতন ধর্মের এমন

সর্বনাশ হবে কেন? কেন আমাদের নিজের দেশঘর ছেড়ে এই বিদেশের বস্তিতে এসে উঠতে হবে?'

হরকিঙ্কর বাইরে যাবার জন্যে উঠে পড়েছেন। ঠিক সেই সময়ই বাইরে আওয়াজ শোনা গেল, 'সুব্রতা ভট্টাচার্যের বাড়ি কোনটা?'

সুব্রতা দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে গেল। 'আরে শুভ্রাদি! আপনি? এখানে?'

'কেন, আসতে নেই?' শুভ্রাদি হেসে বললেন।

শুভ্রাদিকে বাবার কাছে নিয়ে এসে সুব্রতা পরিচয় করিয়ে দিলে, 'বাবা, মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপিকা শুভ্রা রায়। ইনিই আমাকে কলেজে ফ্রীশিপ পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

'ও।' নমস্কার করলেন হরকিঙ্কর। মেয়ে ততক্ষণে অতিথির দিকে একটা আসন এগিয়ে দিয়েছে। শুভ্রাদির বয়স বেশী নয়। খোঁজ করলে ওই বয়সের মেয়ে কলেজেই পাওয়া যাবে। তাছাড়া শুভ্রাদির মুখে এমন একটা লাবণ্য আছে যে, মনে হয় আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে। ওঁর মুখের সঙ্গে হরকিঙ্কর নিজের মেয়ের মুখটাও মিলিয়ে নিলেন। অভাবে অযত্নে থাকলেও তাঁর মেয়ের রঙটা অনেক ফর্সা, দৈর্ঘ্যেও কয়েক ইঞ্চি বেশী হবে। এত অনটনের মধ্যেও বাড়ন্ত গড়ন—দেখে কে বলবে এখনও সতেরো পুরো হয়নি!

বেশ বিব্রত হয়েই হরকিঙ্কর সুবেশা শুভ্রাদিকে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, একটু বসতে দেবার জায়গাও নেই।'

'কী ব্যাপার, শুভ্রাদি?'

'ব্যাপারটা তোমার বাবার সঙ্গে। আমি তোমাদের কাছাকাছি থাকি, তাই প্রিন্সিপ্যাল বললেন তুমি নিজেই দেখা করে এস।'

'কেন বলুন তো?' হরকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

'কলেজে এবার আমরা দুর্গাপুজো করবো ঠিক করেছি।'—শুভ্রাদি জানালেন।

'কলেজে দুর্গাপুজো, তাও কিনা মেয়ে কলেজে!' হরকিঙ্কর তার বিস্ময় চেপে রাখবার কোনো চেষ্টা করলেন না।

শুভ্রা রায় স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। সুব্রতা লক্ষ্য করছিল, কি সুন্দর ব্যবহার শুভ্রাদির। শুনেছে খুব বড়লোকের মেয়ে, অথচ কেমনভাবে কথা বলেন। শুভ্রাদি বললেন, 'অনেকেই কথাটা শুনে অবাক হচ্ছেন। পরিকল্পনাটা আমাদের প্রিন্সিপ্যাল সুভদ্রা হালদারের। ওঁর ধারণা, দেশের যা অবস্থা তাতে মেয়েদের শক্তি পুজোর দরকার হয়ে পড়েছে।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'আচ্ছা!'

শুভ্রাদি বললেন, 'আমাদের মধ্যে যারা একটু তথাকথিত মডার্ন তারা খুব আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছে মেয়েরা পুজো-মাইণ্ডেড হোক—তারা পুজোর কাজকর্ম শিখুক। শেলি বায়রণ কীটস পড়ে দেশের কোনো মঙ্গলই হবে না।'

হরকিঙ্কর জানতে চাইলেন, 'আগে কখনও এমন পুজো হয়েছে?'

শুভ্রাদি জানালেন, 'সুভদ্রা হালদার বলেছেন, আগে কী হয়েছে না হয়েছে সে নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ নেই। জিনিসটা যখন ভাল, তখন করতে বাধা কোথায়? মহিষমর্দিনী পুরুষমানুষ ছিলেন না। সুতরাং মেয়েরা ইচ্ছে করলেই নতুন আদর্শ স্থাপন করতে পারে।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'পুজোর তো আর দেরি নেই।'

শুভ্রাদি বললেন, 'ঠিক বলেছেন, মোটেই সময় নেই। অনেকে ভয় পাচ্ছিল, এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সব হয়ে উঠবে না। কিন্তু মিসেস হালদার বললেন, চব্বিশ-ঘন্টার নোটিশে তাঁর নিজেরই বিয়ে হয়েছিল!'

সুব্রতা যা ভয় পাচ্ছিল এবার তাই হলো। হরকিঙ্কর দ্বিধা না করে শুভ্রাদির মুখের উপরই বললেন, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু বারোয়ারি পুজোকে মনে প্রাণে ঘৃণা করি। হাজারজন যেখানে মাতব্বর—পুজোর নাম করে যেখানে কেবল নাচগান হাসিঠাট্টা আর বেলেল্লাপনা হয়—না খেয়ে মারা গেলেও আমি সেখানে পুজো করবো না।'

সুব্রতা বাবাকে বুঝিয়ে শান্ত করবে ভেবেছিল। কিন্তু তাঁর চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে সাহস করলে না।

শুভ্রাদি কিন্তু মোটেই অসন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, 'মিসেস হালদার আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। উনিও চান শুদ্ধ পূজা—যেখানে ধর্মীয় ভাবটা বজায় থাকবে। মাইক, আলোকসজ্জা, প্যাণ্ডাল, প্রসেশন এসব আমরা কিছুই করবো না। আমাদের প্রতিমাও হচ্ছে শাস্ত্রসম্মত।'

'ফিল্ম অ্যাকট্রেসের মুখের আদলওয়ালা আলট্রামডার্ন ফিগার চাইছেন না আপনারা?' হরকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

চিত্রতারকার কথা উঠতেই সুব্রতা কেমন চমকে উঠেছিল। কিন্তু এঁদের দুজনের কেউই তা লক্ষ্য করলেন না।

শুভ্রাদি বললেন, 'আমাদের প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছে, সনাতন আদর্শে পুজো হোক—তবেই তো মেয়েদের মঙ্গল হবে। আমরা সব কিছুর দায়িত্ব নিজেরাই নিয়েছি। মেয়েরাই সব কিছু করছি। আমাদের সকলের অনুরোধ পুজোটা আপনি করুন। মিসেস হালদার আপনার কথা শুনেছেন কোথাও। আপনি যদি ওঁর সঙ্গে একবার সময়মতো দেখা করেন।'

হরকিঙ্কর নিজের মনকে বোঝালেন কলেজের মেয়েদের পুজোকে বারোয়ারি পুজো বলা চলে না। শুভ্রাদিকে বললেন, 'আপনি আমার মেয়েটাকে সাহায্য করছেন অনেক, কী করে ধন্যবাদ দেবো জানি না। তিনপুরুষ ধরে আমরা রায়দের বাড়িতেই পুজো করে এসেছি। আর কোথাও কখনও বোধন করিনি। এবার করে দেখি, মা কি বলেন। আমি আজই কলেজে যাবো'খন।'

হরকিঙ্কর শুভ্রাদিকে বসিয়ে এবার উঠে পড়লেন, বাসনওয়ালার সঙ্গে এখনই দেখা করা প্রয়োজন। বেরোবার আগে মেয়েকে বললেন, 'দিদিমণি তোমার বাড়িতে এসেছেন, একটু চা অন্ততঃ করে দাও।'

শুভ্রাদি এবার হতশ্রী ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। 'ছাদটা ফেটে রয়েছে দেখছি। জল পড়ে?'

'জলে ভেসে যায়।' সুব্রতা উত্তর দিলে।

'কলেজে যাও না কেন?'

'অনেক দিন যাচ্ছি না। কাউকে যেন বলবেন না শুভ্রাদি। তাহলে সকালে দুধের চাকরিটাও যাবে। স্টুডেন্ট ছাড়া গভর্ণমেন্ট কাউকে রাখে না।'

ঘরের অবস্থা এবং সুব্রতার মুখ চোখ দেখে শুভ্রাদি যেন সব বুঝতে পারছেন।

লজ্জা পেয়েছে সুব্রতা। বললে, 'বাবার কথায় রাগ করবেন না, শুভ্রাদি। শাস্ত্রীয় ব্যাপারে ওঁকে একগুঁয়ে বলতে পারেন। ওখানে কোনোরকম শৈথিল্য সহ্য করতে পারেন না। তাই কষ্টও পাচ্ছেন।'

'কেন ?'

'অনাচার হলে যজমানের মুখের উপর যা-তা বলেন। তাতে যজমান সন্তুষ্ট থাকবে কেন? পাড়ায় কিছু পুরুতের অভাব নেই। তাছাড়া আমরা বাইরের লোক, পাকিস্তানে ভিটেমাটি হারিয়ে ভাসতে ভাসতে এখানে হাজির হয়েছি। স্থানীয় যজমানরা নিজেদের লোক ছেড়ে কেনই বা বাবাকে ডাকবে ?'

শুভ্রাদি চুপ করে ওর কথা শুনে যেতে লাগলেন—'বাবাকে বলি, আপনি তো লেখাপড়া জানতেন, কেন এই বাজে লাইনে এলেন। বাবা বলেন, ওঁদের পরিবারের অন্ততঃ একটি ছেলেকে এই লাইনে আসতে হবে এই নিয়ম ছিল। তাছাড়া ওঁদের যৌবনকালে পুরোহিতের সম্মানও ছিল।'

'তোমার কে কে আছেন ?' শুভ্রাদি প্রশ্ন করলেন।

'এক দাদা, বাইরে চাকরি করেন। মা নেই। এখন আমিই সংসার দেখছি।'

'তুমি কলেজ বন্ধ করলে কেন? বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে বুঝি ?'

সুব্রতা কোনো উত্তর দিল না, শুধু হাসলো।

'আচ্ছা, এবার আসি। পুজোর ক'দিন কলেজে যেও', বলে শুভ্রাদি বিদায় নিলেন।

সুব্রতার হাসি থেকে শুভ্রাদি কি বুঝলেন কে জানে। সুব্রতা কিন্তু গুম হয়ে বসে থাকলো! বিয়ে! বিয়েই বটে! ধানবাদে চাকুরে দাদা। তাই বটে। গতমাস থেকে টাকা আসছে না। দাদা নাকি ওখানে কি একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসেছে রেল কলোনির কোন একটা বেজাতের মেয়ের সঙ্গে, ধন্য পুরুষ জাত। কি দায়িত্ববোধ! একশ তিরিশ টাকা মাইনের রেলবাবুর আবার প্রেম!

বাবা যতই গলা ফাটিয়ে ধর্মের জয়গান করুন, টাকা—টাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা। বেঁচে থাকতে গেলে টাকা চাই-ই।

ড্যালটন কোম্পানি এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ড্রামা সেক্রেটারি মিস্টার চ্যাটার্জি রোজ সকালে দুধ নিতে আসেন। তিনিই সেবারে বলেছিলেন—'আপনার গলার স্বরটা খুব সুইট।'

বিরক্ত কণ্ঠে সুব্রতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন বলুন তো ?'

ভদ্রলোক মোটেই বিব্রত না হয়ে বলেছিলেন, 'অভিনয়ের লাইনে এলে উন্নতি করতে পারতেন। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় অফিসে অফিসে খুব চাহিদা। আমরা হঠাৎ বিপদে পড়ে গিয়েছি। আমাদের পার্ট করছিল কমলিনী। বেচারার টাইফয়েড হয়েছে অথচ অভিনয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে, স্টেজের জন্যে বুকিংও করা রয়েছে। এখন পেছোবার উপায় নেই। আসুন না। টাকা পাবেন। মেডেলও পেতে পারেন। একবার নাম হলে তখন দেখবেন বাড়িতে লোক এসে সাধাসাধি করছে।'

সুব্রতা রাজী হয়ে গিয়েছে। লুকিয়ে কয়েক দিন রিহার্সাল দিয়ে এসেছে। তারপর অভিনয়ও। মেডেল পায়নি, কিন্তু টাকা পেয়েছে ষাটটা। কাজে লেগে গিয়েছে টাকা-গুলো। সুব্রতা প্রশ্ন করেছিল, 'আপনাদের অফিসে একটা চাকরি পাওয়া যায় না ?'

'মেমসাহেব ছাড়া এরা রাখে না। তাছাড়া, কোন দুঃখে আপনি চাকরি করতে যাবেন? এ লাইনে চাকরির দশগুণ রোজগার করবেন। আর যদি একবার কোনো সিনেমা প্রোডিউসারের নজরে পড়ে যান, তাহলে তো কথাই নেই!'

কথাটা মন্দ বলেননি ভদ্রলোক। একবার নজরে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। মিস্টার চ্যাটার্জির এক বন্ধু স্টুডিওর অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান। তার সঙ্গে দেখাও করেছে সুব্রতা।

সে বলেছে, 'ফিচার খুব শার্প ক্যামেরায় খুব ভাল আসবে। নায়িকা হবার সমস্ত গুণই রয়েছে আপনার। এ-লাইনে কোনো চাঁইকে ধরবার চেষ্টা করুন। ওই প্রথম-বারই যা একটু ধরা-করা প্রয়োজন। তারপর যদি তেমন লাক ফেবার করে, সেই একই লোক আবার বাড়িতে গিয়ে সুটিং ডেটের জন্যে কান্নাকাটি করবে।'

লোকে হয়তো যা-তা বলতে চাইবে। কিন্তু কিছুই তোয়াক্কা করে না সুব্রতা। নিজের ভবিষ্যতের জন্যে তার যা খুশি সে করবে। টাকা যখন কেউ দেবে না, তখন কারুর কথাতেই সে কান দেবে না। সত্যি কথা বলতে কি, বাবা নিতান্তই ভাল মানুষ, একমাত্র বাবাকে নিয়েই চিন্তা। এত শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য নিয়েও অন্নের সমস্যা সমাধান করতে পারছেন না। বাবা না বুঝেই বাধা দেবেন। ওঁকে এখন কিছু না-বলাই ভাল। তবে যখন সুব্রতার অনেক টাকা হবে, সে তখন বাবাকে একটা খুব সুন্দর মন্দির করে দেবে। সেখানে নিজের মনে নিজের ঠাকুরকে পুজো করবেন। যজমানদের দরজায় দরজায় তখন তাঁকে আর ঘুরে বেড়াতে হবে না।

ভেবেছিল, শুভ্রাদিকে সে সব বলবে। কিন্তু বলা হয়নি কিছুই। বোধ হয় ভালই হয়েছে। এখন নয়। যখন সুব্রতা ভট্টাচার্য দেশজোড়া সুনাম পাবে, সবার মুখে মুখে যখন তার নাম ফিরবে, তখন সব প্রকাশ করবে। কাগজের প্রতিনিধিরা যখন তার জীবনী লিখতে আসবে, সুব্রতা তখন শুভ্রাদির মহৎ হৃদয়ের কথাও বলবে। তাঁর জন্যেই যে বিনা মাইনেতে কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল সে কথা গোপন করবে না।

তাকের ওপর টাইমপীসটার দিকে এবার নজর পড়ে গেল। বসে বসে আর সময় নষ্ট করা চলবে না। এখনই একবার বেরনো প্রয়োজন।

আর তো ভাবা চলবে না। এখনই সুযোগের সন্ধানে বেরোতে হবে।

বালিকা মহাবিদ্যালয়ে পূর্ণোদ্যমে পুজোর আয়োজন চলেছে।

হরকিঙ্কর গায়ের চাদরটা ঠিক করে নিয়ে বললেন, 'শাস্ত্রমতো সব যোগাড় যন্তর না করলে, শুধু আপনাদের নয় আমারও অমঙ্গল। দুর্গা পুজো বলে কথা। অনেক জিনিস লাগে—সিঁদুর, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, ঘট, কুশুহাঁড়ি, দর্পণ, তেকাটা, তীর, পুষ্প, দূর্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, ধূপ, দীপ, কলাগাছ, কচুগাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তী গাছ, ডালিম ডাল, অশোকডাল- - -'

তালিকা আরও দীর্ঘ হতো, কিন্তু শুভ্রা বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা সব গুছিয়ে যোগাড় করে রাখবো। আপনি শুধু পুরো ফর্দটা আমাকে দিয়ে যান।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'তুমি মা বোধহয় কখনও পুজোর যোগাড় করোনি।'

শুভ্রা সলজ্জ ভাবে বললেন, 'শুনেছি এক সময় নাকি আমাদের বাড়িতে পুজো হতো। কিন্তু তখন আমি খুব ছোট। এবার কিন্তু আপনার কাছে সব শিখে নেবো।'

হরকিঙ্কর অনেকদিন এমন মধুর ব্যবহার পাননি। অন্ততঃ পাঁচভূতের রাজত্বে এমন নিষ্ঠাবতীর সন্ধান পাবেন আশাই করেননি। উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'কিছু চিন্তা নেই মা, এবার আমি সব শিখিয়ে দেবো। আমাদের মায়েদের জন্যেই তো সনাতন ধর্ম আজও কোনোরকমে টিকে আছে। লেখাপড়া জানা মায়েরা যদি আবার আগ্রহ নিয়ে সব শিখতে আরম্ভ করে, তবে আমাদের কিসের ভয়?'

শুভ্রা নম্রভাবে বললেন, 'নিজের দেশের নিজের ধর্মের নিয়মকানুন জানবো না, এটা তো গর্বের কথা নয়। এর মধ্যেই তো আমাদের দেশের সভ্যতার এবং সমাজের যুগ-যুগান্তের ইতিহাস নিহিত রয়েছে।'

'কিন্তু সে কথা কে বোঝে মা? বারোয়ারি পুজো আমি করি না; লোকে বলে গোঁড়া পুরুত; কেউ কেউ পাগলও বলে। কিন্তু মা ওখানে পুজোর প-ও থাকে না। কেউ জিজ্ঞেস করে না পুজোর সব উপকরণ ফর্দ অনুযায়ী এলো কিনা। যদি কোনো কিছু না থাকে, বলবে যা এসেছে তাই দিয়ে সেরে নাও। কিন্তু মা, সেরে নেবার মালিক কি পুরোহিত? তার পিতৃপুরুষেরও জন্মাবার হাজার হাজার বছর আগে এ-সব কাগজে কলমে লেখা হয়ে গিয়েছে।'

শুভ্রা বললেন, 'আমরা আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের প্রিন্সিপ্যাল বলেন, যদি পুজো করতে হয় ভালভাবে করো, না হলে কোরো না।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'ফর্দ আমার মুখস্থ। বলে যাচ্ছি, টপাটপ লিখে নিন। প্রথমে নবপত্রিকার দ্রব্যাদি, নিয়ম হচ্ছে প্রতিপদ থেকে দেওয়া। প্রথম দিন—মাথাঘসা ফুলের তেল, আতর, চিরুণী, গোলাপজল। দ্বিতীয়াতে মাথা বাঁধবার পাটি, তৃতীয়াতে দর্পণ, সিঁদুর, আলতা। চতুর্থীতে মধুপর্ক, কাঁসার বাটি, তিল, চন্দন। পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ এবং অলঙ্কার।'

হরকিঙ্কর একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'বরং পুজোর ফর্দটাই আগে লিখুন —বোধনের দ্রব্যাদি- - -'

আমন্ত্রণের জিনিস, অধিবাসের ডালার তালিকা শেষ করে হরকিঙ্কর সপ্তমী পুজোর ফর্দ শুরু করলেন—'নারায়ণবরণ, গুরুবরণ, পুরোহিতবরণ, ব্রহ্মবরণ, সদস্য-বরণ, হোতৃবরণ, আচার্যবরণ, বরণাঙ্গুরীয়, তিল, হরিতকী, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধুনা- - -'

ছাত্রীজীবনে শুভ্রা অত্যন্ত দ্রুত লিখতে পারতেন। কিন্তু পুরুতমশায়ের গতির কাছে তাঁকে হার মানতে হলো।

হরকিঙ্কর হেসে ফেললেন। বললেন, 'দরকার নেই; আমিই লিখে দিচ্ছি মা। অনেকে লিস্টিও নেয় না, দশকর্ম ভাণ্ডার থেকে সোজা গিয়ে সাপ ব্যাঙ যা পায় তাই নিয়ে আসে। আগেকার সে-সব দশকর্ম ভাণ্ডারও নেই—বেশীর ভাগই জোচ্চোর। যা-তা জিনিস দিয়ে দেয়।'

শুভ্রা এবার হরকিঙ্করের দিকে কাগজ এগিয়ে দিলেন। ফর্দ লিখতে লিখতে হরকিঙ্কর বললেন, 'যে কোনো ফর্দের প্রথমেই লিখতেই হয়—সিদ্ধি; সিদ্ধিদাতা গণেশ তবেই তো সিদ্ধি দেবেন।'

শুভ্রা পণ্ডিতমশায়ের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। লিখতে লিখতে হরকিঙ্কর বললেন, 'মহাস্নানের জিনিসগুলো একটু সাবধানে যোগাড় করতে বলবেন মা। দোকানে যা দেয় তা প্রায়ই ভেজাল।'

'শুভ্রা, কাজ কেমন এগোচ্ছে?' সুভদ্রা হালদার প্রশ্ন করলেন।

'খুব ভাল। পুরুতমশাইটি চমৎকার—একটু রাগী বটে কিন্তু নিষ্ঠাবান।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'নিষ্ঠাবান পুরোহিতের আজকাল খুবই অভাব। অবশ্য দোষ আমাদেরই। আমাদের কাছে আজকাল পুরুতঠাকুরও যা, রাঁধুনীঠাকুরও তাই।'

কলেজের সর্বত্র এখন পুজো পুজো ভাব। বেশ হৈ চৈ চলেছে। কাজের বাড়ির চাপে প্রিন্সিপ্যালও তাঁর চিরাচরিত গাম্ভীর্যের মুখোসটা খুলে রেখেছেন। সেই সুযোগ

নিয়েই টিচারস্-রুমে অর্থনীতির অধ্যাপিকা শিপ্রা মিত্র প্রশ্ন করলেন, 'একথা বলছেন কেন মিসেস হালদার?'

'জানি বলেই বলছি। আমাদেরও বলতে গেলে পুরোহিতের বংশ। কিন্তু আয় নেই বলে কেউ আর ও-লাইনে যায়নি। আজকাল যার লেখাপড়া হয় না সে-ই যাজক হচ্ছে—কিন্তু শিক্ষিত না হলে, সে কী করে শাস্ত্র পাঠ করবে?'

প্রিন্সিপ্যালের কথায় অনেক অধ্যাপিকা সায় দিলেন। মিসেস হালদার বললেন, 'এ যুগে মুড়ি মিছরির একদর—এইটাই দুঃখ। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে একখানা সুরেন ভট্টচায্যির পুরোহিত দর্পণ ছিল। তাতে দেখেছি তিনি দুঃখ করছেন, সূপকার ষষ্ঠীপুজো করলে যা পাবে, একজন জ্ঞানী পুরুষও সেই পাবে। এই জন্যেই ভাল লোক ব্যবসা ছেড়ে যাচ্ছে।'

'সূপকার মানে কি, দিদিমণি?' স্বেচ্ছাসেবিকাদের লিডার ও ছাত্রী ইউনিয়নের সেক্রেটারি রমলা প্রশ্ন করলো।

সুভদ্রাদি বললেন, 'শুভ্রা, আজকাল তোমরা কি যে বাংলা শেখাচ্ছো। আমাদের সময় বাংলার কোশ্চেনও ইংরিজীতে হতো—তবু আমরা অনেক কথা জানতাম। এখন তোমরা শুধু নাটক নভেল পড়াচ্ছ—তাও আধুনিক। তাই ছাত্রীরা সূপকার মানে জানে না।'

দিদিমণির কথায় রমলা লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু সুভদ্রা হালদার বললেন, 'লজ্জার কিছু নেই। না-জেনে পণ্ডিত সেজে থাকার চেয়ে, বোকার মতো প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া অনেক ভাল। সূপকার মানে রাঁধুনী—আজকাল নভেলে যাদের বাবুর্চি বলে!'

অধ্যাপিকাদের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা হালদার বললেন, 'আপনারা অনেকে হয়তো এইভাবে পুজোর ব্যবস্থা করায় আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন—ভাবছেন আমি সময় এবং অর্থ অপব্যয় করছি। কিন্তু একটা দুর্গাপুজো হাতে কলমে করলে, আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে মেয়েরা যা জ্ঞান লাভ করবে, তা দেড় ডজন টেক্স্টবুক থেকেও পাবে না।'

একবার ঢোক গিলে তিনি বললেন, 'কত অদ্ভুত সব জিনিস লাগে, আমি পুরুত-বাড়ির মেয়ে হয়েও খোঁজ রাখতাম না। যদি চোখ কান খুলে রেখে, ওগুলোর মধ্যে একটু ঢোকা যায়, তাহলে আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আমাদের জীবন-যাপন সম্বন্ধে আমরা কত কি জানতে পারি।'

সুভদ্রাদি বললেন, 'এই মহাস্নানের কথাই ধরুন না কেন। সপ্তমীর দিনে দর্পণ স্নান—শুভ্রা তোমার হাতেই তো লিস্ট রয়েছে, পড় না।'

শুভ্রা পড়তে লাগলেন, 'শোধিত পঞ্চগব্য—অর্থাৎ গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত। শিশির, আখের রস, সাগরোদক, গজদন্ত মৃত্তিকা, রাজদ্বারমৃত্তিকা, চতুষ্পথমৃত্তিকা---' এবার হঠাৎ শুভ্রা থমকে দাঁড়ালেন।

'কী, থামলে কেন? পড়ে যাও', সুভদ্রাদি বললেন।

কিন্তু শুভ্রা আর পড়তে পারছেন না। তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠলো।

'কী হলো?' বলে শিপ্রা মিত্র এবার একটু সরে এসে তালিকার দিকে তাকালেন। তাঁরও মুখটা যেন কেমন অপ্রস্তুত দেখালো। 'কী আছে, শিপ্রাদি?' দুজন ছাত্রী একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলো।

'না কিছু নয়, ও-নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।' শিপ্রাদি উত্তর দিলেন।

ঠিক বুঝতে না পেরে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'হাতে অনেক কাজ রয়েছে—এখন

এ-ভাবে সময় নষ্ট করলে চলবে না। পড়ে যাও।' শিপ্রা বললেন, 'ওটা বাদ দিয়েই না হয় পড়ে যা।'

বাদ দেবার কথা উঠতেই সবার কৌতূহল যেন বেড়ে গেল। আরও কয়েকজন অধ্যাপিকা এবার শুভ্রার কাছে উঠে এসে ফর্দর দিকে তাকালেন। তাঁদের মুখের অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে শুরু করলো।

একজন বললেন, 'সত্যি নাকি? ও-সব লাগে তা তো কখনও শুনিনি, এতো পুজোয় গিয়েছি!'

আর একজন বললেন, 'লাগে নিশ্চয় না হলে পুরুতমশায় লিখে দেবেন কেন?'

ছাত্রীরা তখনও বুঝে উঠতে পারছে না। তারা বললে, 'কী দিদিমণি? পুজোতে কী লাগে?'

অধ্যাপিকারা এবার সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। শুভ্রাদি কোনোরকমে বললেন, 'না কিছু নয়।' তিনি এবার সেই বিশেষ জিনিসটি বাদ দিয়ে পড়া শুরু করবার চেষ্টা করলেন—'মধু, কর্পূর, অগুরুচন্দন, কুঙ্কুম-—' কিন্তু বাদ দেওয়া চললো না। সবার দৃষ্টি যেন বাদ দেওয়া জায়গাতেই আটকে গিয়েছে। সুভদ্রা হালদার বললেন, 'কী ব্যাপার?'

শুভ্রা অগত্যা এবার নিজের চেয়ার থেকে প্রিন্সিপ্যালের কাছে উঠে এসে তালিকাটা দেখালো। এবার তাঁর চোখেও বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো। ঘরের মধ্যে ক'জন ছাত্রী আছে তিনি দেখে নিলেন। মাত্র দু'জন। তাদের বললেন, 'তোমরা এবার ফল-টলের ব্যবস্থাগুলো দেখো। আর তো সময় নেই।'

মেয়েরা বুঝলে কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। তারা আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রিন্সিপ্যাল এবার বললেন, 'হুঁ—জানতাম না।'

শিপ্রা মিত্র বললেন, 'মোস্ট এমব্যারাসিং। কম বয়সের কুমারী মেয়েরা রয়েছে। পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে পুজোতে কিনা বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা লাগে!'

'বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা দিয়ে কী হবে?' আর একজন অধ্যাপিকা প্রশ্ন করলেন।

'হরকিঙ্করবাবুর তালিকা অনুযায়ী ওই দিয়ে সপ্তমীর দিনে মহাস্নান হবে'—শুভ্রা বললেন।

ইতিমধ্যে আর সবাই লজ্জায় এমনই লাল হয়ে উঠেছেন যে, কথা বলতে পারছিলেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'স্বীকার করছি জিনিসটা এমব্যারাসিং—বিশেষ করে আমাদের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে। কিন্তু অনেকদিন আগে থেকে যা হয়ে আসছে তার উপায় কি?'

'ওইটুকু বাদ দিলেই হয়', একজন প্রস্তাব করলেন।

সুভদ্রাদি বললেন, 'তার উপায় কোথায়? বাদ দিলে সমস্ত পুজোটাই বাদ দিতে হয়।'

সুভদ্রাদি এবার সমাজনীতির অধ্যাপিকা তন্দ্রা রায়ের মুখের দিকে তাকালেন। 'ব্যাপারটা কি বলুন তো? শুভকাজে এই সব নোংরামি কি করে ঢুকতে দেওয়া হলো?'

অধ্যাপিকা রায় সদ্য ডক্টরেটপ্রাপ্তা। বললেন, 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিকসটা খুঁজে দেখলে হয়। কিছু পাওয়া যেতেও পারে। তবে আমার মনে হয় দুটো কারণ হতে পারে।'

'কী কারণ?'

তন্দ্রা রায় বললেন, 'আমাদের দেশের বিশ্বাস পতিতাগৃহে প্রবেশের পূর্বে পুরুষ তার সমস্ত সদ্‌গুণ দরজার বাইরে ফেলে রেখে যায়। হয়তো সেই জন্যেই এই মৃত্তিকা বিশেষভাবে গুণান্বিত।'

কারুর মুখেই তখন কথা নেই। সবাই, এমন কি শিপ্রা মিত্রও, তন্দ্রা রায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তন্দ্রা রায় বললেন, 'আর একটা হতে পারে হিন্দু ঋষিরা দুর্গোৎসবে উচ্চনীচ সবার সহযোগিতা কামনা করতেন। সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে বলতে পারেন।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'ইন্টারেস্টিং। তবে ছাত্রীদের সামনে এ সব আলোচনা না করাই ভাল। আপনারা এখন যে-যার কাজগুলো সেরে ফেলুন।'

হরকিঙ্কর সন্ধ্যাহ্নিকে বসেছেন। মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা কিলবিল করছে। ছেলেটা মনের মতো হয়নি। অমানুষ জানোয়ারও বলা চলতে পারে। না হলে নিজের সমস্ত দায়িত্ব ভুলে গিয়ে শূদ্রা রমণীকে অঙ্কশায়িনী করে ধানবাদে সে কী করে পড়ে রয়েছে? কেন এমন হয়? ছেলেটা জন্মাবার আগে তিনি তো কোনো প্রকার শাস্ত্রীয় আচরণের ত্রুটি করেননি। যথাসময়ে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, ষষ্ঠী, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন—শাস্ত্রীয় কোনো পুজোতেই কোনো অনাচার হয়নি। তবুও ছেলেটা শেষপর্যন্ত কেন এমন হলো স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন। এবার মহাশক্তির বোধনের সময় মার কাছে তিনি সব দুঃখের কথা নিবেদন করবেন।

কারা যেন কড়া নাড়ছে। কারা আবার এই সময় জ্বালাতন আরম্ভ করলে? বাড়িটা সত্যিই যেন ভূতের হাট হয়ে উঠেছে। ওরা কারা কে জানে? মেয়েটা ওদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে মনে হচ্ছে। বলছে, 'শোভনবাবু, আসুন আসুন। কতদিন খবর পাই না। শেষপর্যন্ত মনে পড়লো তাহলে?'

লোকটা যেন অভিনয় সম্বন্ধে কি আলোচনা করছে। সুব্রতাকে বলছে, 'তুমি চিন্তা করছো কেন, তোমাকে একটা ভালো রোল দেবই।'

'সে তো কতদিন হয়ে গেল শোভনবাবু। এই অ্যামেচার থিয়েটারী অসহ্য হয়ে উঠেছে। থিয়েটারের দিনটা তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু এই রিহার্সেলটাই আর পারি না। আগে তবু দু'তিন দিন রিহার্সেল হলেই চলতো। এখন চোদ্দদিন হলে বাবুরা খুশি হন। তাও ট্যাক্সি ভাড়া দিতে চান না।'

হরকিঙ্করের কানে কথাগুলো ভেসে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে একটা লাঠি নিয়ে তিনি দরজার দিকে তেড়ে যান। কিন্তু যেন পক্ষাঘাতের রোগী তিনি। আসন থেকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই তাঁর।

হরকিঙ্কর শুনলেন, মেয়ে চলচ্চিত্রে নামবার জন্যে পাগল। লোকটা বলছে, 'সাইড পার্ট থেকে শুরু করো। তারপর আস্তে আস্তে উঠবে।'

মেয়ে বলছে, 'শোভনবাবু, তা হয় না। আপনি তো এ লাইনে অনেক দিন রয়েছেন। যে হিরোইন হয়, সে প্রথম দিন থেকেই হয়। সাইডগার্ল যে, সে চিরকাল সাইড-গার্লই থেকে যায়।'

মেয়ে যেন শোভনবাবুর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। বলছে, 'না শোভনবাবু,

আপনার 'এক্সট্রা' যোগাড় করবার কনট্রাক্ট—আপনি যোগাড় করুন, সাপ্লাই করুন। কিন্তু আমাকে ভাল একটা প্রোডিউসার ধরিয়ে দিন। সুযোগ যদি পাই, দেখিয়ে দেবো কোথায় লাগে আপনাদের- - -'

শোভনবাবুর গলা যেন এবারে নিচু খাদে নেমে এল। ফিসফিস করে কি বলছে মেয়েটাকে। বাড়িটা হলো কি? এতো বড়ো আস্পর্ধা, বাড়ির কর্তা কি মারা গিয়েছে? কিন্তু প্যারালিসিসটা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে—আঙুল নাড়াবার শক্তিও নেই হরকিঙ্করের।

হরকিঙ্করের মনে পড়লো বাড়িভাড়া বাকি। মালিক উকিলের চিঠি দিয়েছে, ছাড়তেই হবে বাড়ি। ওরা বলেছে, বাড়ি ভেঙে ফেলবে। কিচ্ছু নেই বাড়িটার। অন্য বাড়ি দেখেছেন হরকিঙ্কর। অনেক ভাড়া চায়। তিন মাসের আগাম। এখানেও সাত মাস বাকি। টাকা চাই—অনেক টাকা। তবে যদি বাঁচা সম্ভব হয়। টাকাটাই যেন বিষ হয়ে গলে গলে দেশের রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে—যেন তারই ক্রিয়ায় স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে প্যারালিসিসের সূচনা করেছে।

ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে। হরকিঙ্কর চোখ বুজে তখন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন—ওংভূর্ভুবস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি।- - -

আবার যেন বল ফিরে পাচ্ছেন হরকিঙ্কর। তিনি এবার আসন থেকে উঠে পড়লেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েটা বলছে, 'আচ্ছা তাই ঠিক রইল। কোনো অসুবিধে হবে না।'

ভুলে যাবার চেষ্টা করছেন হরকিঙ্কর। যেন তাঁর চোখ কান সব বিষে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিরাট পেট নিয়ে এক সর্বভুক হরকিঙ্কর যেন শুধু বেঁচে রয়েছেন।

মেয়ে এবার বাবার দিকে তাকাল। 'বেরোচ্ছিস নাকি তুই?'

'হ্যাঁ বাবা, একটু কাজ আছে।'

বাবা চুপ করে রইলেন, মেয়ে বললে, 'একটা বাড়ির খবরও সেই সঙ্গে নিয়ে আসবো।'

বাবার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না। মেয়ে বললে, 'বাবা, কী এতো ভাবেন বলুন তো? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হরকিঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা দশকর্ম ভাণ্ডারে গিয়েছেন। পুজোর জিনিসগুলো কেনবার দায়িত্ব শুভ্রা শেষ পর্যন্ত ওঁর ঘাড়েই চাপিয়েছেন। পৃথিবীর যত উদ্ভট জিনিস সব দশকর্ম ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। ফর্দ মিলিয়ে কিনতে শুরু করেছেন হরকিঙ্কর। 'আপনারা সব আসল জিনিস দেন তো? না পুজোর জিনিসেও ভেজাল ঢুকেছে আজকাল?'

দোকানদার বিরক্ত হয়ে বলেছে: 'কেন বলুন তো?'

হরকিঙ্কর উত্তর দিয়েছেন, 'মায়ের পুজোয় আজকাল তেমন ফল হয় না কেন? হয়তো ভেজালের জন্যেই।'

দোকানদার গুম হয়ে থেকেছে। 'ভরসন্ধ্যেবেলায় এমন কথা শুনিয়ে গেলেন?'

জিনিস মেলাতে মেলাতে হরকিঙ্কর বললেন, 'মৃত্তিকা কই? বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা কোথায়?'

'নেই।'

'রাখেন না?'

'ভেজাল। এমনি মাটি তুলে পুরিয়া করে বিক্রি করি আমরা', দোকানদার উত্তর দিয়েছে।

'তাহলে চাইনে।' মুটের মাথায় মাল চাপিয়ে হরকিঙ্কর সোজা কলেজে চলে এসে-ছেন। সেখানে তখন পুরোদস্তুর হৈ-হৈ চলছে। রাত পেরোলেই পুজো। ঢাকি আসবে এখনই। আর ঢাকের বাদ্যি শুরু হলেই তো পুজো আরম্ভ হয়ে গেল।

হরকিঙ্কর মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরা মা মহাশক্তির পুজো করবে? করুক না, করতে আপত্তি কি, তিনি নিজের মনেই বললেন।

শুভ্রা জিজ্ঞেস করলেন, 'সব জিনিস পেয়েছেন তো হরকিঙ্করবাবু?'

'একটা বাকি আছে, এখনই আনছি', হরকিঙ্কর উত্তর দিলেন।

আবার পথে বেরিয়েছেন হরকিঙ্কর। কি যেন খুঁজছেন তিনি। জায়গাটা কোথায়? নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও পল্লীটা আছে। ছোটবেলায় ওঁদের দেশের পল্লীটা চিনতেন। গ্রামের এককোণে, কয়েকখানা মেটে বাড়ি। আমোদিনী দাসী বলে একটা বুড়ি ও-লাইন ছেড়ে দুধের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। ছোটবেলায় কয়েকবার তার বাড়িতেও গিয়েছিলেন হরকিঙ্কর।

কিন্তু এখানে পাড়াটা কোথায়? খবর রাখেন না কোনো কিছুরই তিনি। রাস্তার মোড়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। কিছুদিন আগে কাগজে বেরিয়েছিল বেশ্যাবৃত্তি বেআইনী হয়ে গিয়েছে। সত্যিই যদি কোনো দিন পতিতাবৃত্তি উঠে যায়, তাহলে পুজোর সময় বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা কোথা থেকে আসবে?

কিন্তু কাগজেই তিনি পড়েছেন, আইন করে কিছুই হয়নি—ব্যবসা পুরোদস্তুর চলেছে। সুতরাং এখন থেকে সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কী লাভ?

পানের দোকানে খোঁজ নেওয়াই বোধ হয় ভাল, ওরা নিশ্চয় খবর রাখে। সোজা গিয়ে দোকানদারকে প্রশ্ন করেছিলেন। ওরা ফিকফিক করে হেসেছে। 'এই বয়সেও! বুড়ো হয়ে মরতে চলেছে এখনও!'

একজন বললে, 'তোর অত গার্জেনগিরিতে দরকার কি? জিজ্ঞেস করছেন রাস্তাটা বলে দে।'

পানে চুন লাগাতে লাগাতে দোকানদার বলেছে, 'জরুর। বহুত আদমীই খবর নেয়। কিন্তু ঠিক এই সময় নয়, আর কিছুক্ষণ পরে।'

তারপর হরকিঙ্করকে আর একবার ভালভাবে দেখে, মুখ-টিপে হাসতে হাসতে বলেছে, 'নতুন শখ হয়েছে বুঝি? বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে সোজা চলে যান। মিনিট পাঁচেক পরে ডান দিকের পাকা রাস্তাটা ধরবেন। ওইখানেই সিনেমা হল। হলের পিছন দিকেই গোটা কয়েক গলি—ওইখানেই যা চাইছেন, তা পাবেন!'

আর সময় নষ্ট না করে হরকিঙ্কর এগোতে শুরু করেছেন। সিনেমা হলের কাছে আরেকটা দোকানে জিজ্ঞেস করতে হলো। তারাও মুচকি হাসলে। বললে, 'শরাব চাই নাকি বাবু? ভাল জিনিস পাবেন।'

দাঁতে দাঁত চেপে হরকিঙ্কর গলিতে ঢুকে পড়লেন। কয়েকটা দরজার কাছে কারা যেন সেজেগুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হরকিঙ্কর একবার থমকে দাঁড়ালেন। গ্যাসপোস্টের আলোয় মেয়েগুলোও তাঁকে ভাল করে দেখে নিলে। এমন নামাবলী গায়ে সদ্ব্রাহ্মণ অতিথি তারা বড় একটা পায় না। তাই আহ্বান জানালে, 'আসবেন নাকি ঠাকুর?'

হরকিঙ্কর ওদের দরজার দিকে তাকালেন। লাল সিঁদুরে কী যেন লেখা—শ্রীশ্রী-দুর্গা|মা সহায়। পাশের দরজাতেও তাই লেখা। ব্যাপার কী?

এগিয়ে গেলেন হরকিঙ্কর। এখানে লেখা—'ভদ্রলোকের বাড়ি।' হরকিঙ্করের দেহটা যেন ঘুলিয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি মৃত্তিকা সংগ্রহ করে ফিরে যেতে হবে।

এইখানটা একটু অন্ধকার মনে হচ্ছে। দরজার মাথায় মায়ের নামও রয়েছে। এ-বাড়ির মেয়েরা এখনও বেরিয়ে আসেনি। হয়তো এখনও সাজপোশাক করছে, কিংবা ওদের হয়তো বাইরে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয় না। এইখানকার মৃত্তিকাতেই কাজ চলে যাবে। উবু হয়ে বসে মাটি সংগ্রহ করতে বসলেন হরকিঙ্কর। এমন সময় কে যেন নারীকণ্ঠে বললে, 'ও-মাগো, লোকটা ওখানে বসে কী করছে?'

হৈ হৈ করে ভিতর থেকে আরও দুটো-তিনটে মেয়ে এসে হরকিঙ্করের হাত চেপে ধরলো। 'এই মিন্‌সে, এখানে কী করছিস?'

হরকিঙ্কর ঘাবড়ে গিয়েছেন। 'না মা, কিছু করছি না।'

'মুয়ে আগুন মিন্‌সের, ঢঙ দেখলে মরে যাই। উনি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না!'

'সত্যি বলছি মা', হরকিঙ্কর কাতর আবেদন করলেন।

'ওর হাতে কী রয়েছে, দেখ তো?' একজন বললে, আর একজন জোর করে হরকিঙ্করের মুঠোটা খুলে ফেললো। 'এক মুঠো ধুলো নিয়ে বুড়ো কী করছিল গা?'

আর একজন মেয়ে প্রসাধন অর্ধসমাপ্ত রেখেই বোধ হয় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। গা দিয়ে তার সস্তা স্নো-এর গন্ধ বেরোচ্ছে! সে এবার ভয়ে শিউরে উঠলো। সর্বনাশ করেছে, কাপালিক নিশ্চয়, তুক করছিল।'

'না না, আমি পুরুত মানুষ, তুক করবো কেন?' হরকিঙ্কর একটু ভয় পেয়েই বললেন।

মেয়েদের গলার স্বরে একটা মোটকা লোকও কোথা থেকে হাজির হয়েছে। 'ঘেঁটুবাবু, দেখুন না, লোকটা এখানে বসে মাটি তুলছিল। কি তুক-তাক করে গেল কে জানে।'

ঘেঁটুবাবু এবার হরকিঙ্করের গলার চাদরটাকে টেনে ধরলো। অশ্লীল গালি দিয়ে বললে, 'তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো।'

'বিশ্বাস করুন, আমি কেবল এখানকার মৃত্তিকা নিতে এসেছি দুর্গাপুজোর জন্যে।'

ঘেঁটুবাবু হরকিঙ্করের হাতে আচমকা একটা থাপ্পড় দিলে। সমস্ত মাটিটা ঝরে পড়ে গেল। মেয়েরা বললে, 'কী সর্বনাশ গা, এত বাড়ি থাকতে আমাদের দরজা থেকে মাটি তোলা। মরণ আর কি! গতর বেচে করে খাচ্ছি, তাও সহ্য হচ্ছে না মিন্‌সের।'

ঘেঁটুবাবু বললে, 'যা শ্লা! আর খবরদার মাটি নিতে আসিস না এখানে। তাহলে জান নিয়ে নেবো।'

ঘেমে নেয়ে উঠেছেন হরকিঙ্কর। উত্তেজনায় দেহটা কাঁপছে। সামান্য মৃত্তিকা সংগ্রহ করতে এসে এ কি বিপত্তি! কেন বাপু, সামান্য একটু মাটি নিলে কী তোমাদের ক্ষতি হতো?

হরকিঙ্করের দেহটা ঘিনঘিন করছে। যেন কয়েকটা নর্দমার ধেড়ে ইঁদুর তাঁর গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। স্নান করতে হবে তাঁকে। গঙ্গাজলে নিজেকে পবিত্র করতে হবে।

কিন্তু মাকে কী দিয়ে স্নান করাবেন তিনি? মহাস্নানের সময় এই মৃত্তিকা আসবে

কোথা থেকে? পাগল নাকি তিনি? এত ভাববার কী আছে? হাজার হাজার পুজো তো দশকর্ম-ভাণ্ডারের ভেজাল মাটি দিয়েই হচ্ছে। আরেকটা হবে।

একটা রিকশা ডাকবেন নাকি হরকিঙ্কর? কিন্তু এই অবস্থায় রিকশায় চড়লে লোকে মাতাল ভাববে। হাঁটছেন হরকিঙ্কর।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছেন হরকিঙ্কর। ক্যাঁচ করে একটা মোটর এসে প্রায় ঘাড়ের কাছে থামল।

গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবিপরা এক ভদ্রলোক নামলেন। পেটটা বেশ মোটা, গলায় হার ঝুলছে। 'সুব্রতা দেবীর বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? ক্লাবে ক্লাবে থিয়েটার করে বেড়ায়?'

হরকিঙ্কর বিরক্তভাবে লোকটার মুখের দিকে তাকালেন। 'সুব্রতা দেবীর বাড়িতে এত রাত্রে দেখা হয় না।'

লোকটা এবার নেশার ঘোরে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

'মাইরি আর কি? গোঁসাই বাড়ির মেয়ে বুঝি।'

'যা বলছি, তাই শুনুন। সুব্রতা এমন সময় কারুর সঙ্গে দেখা করে না।'

'আহা-হা, চু চু! তাহলে সব বলবো নাকি? কিন্তু কে হে তুমি বাবার ঠাকুর?'

'মুখ সামলে কথা বলুন বলছি।'

'ওরে বাপরে, মানে মানে কেটে পড় বাছাধন, নইলে, স্রেফ ট্রেনে কাটা পড়বে।'

'এটা ভদ্দরলোকের পাড়া, যদি বেশী কিছু করেন।'—হরকিঙ্করের দেহে শক্তি থাকলে লোকটার গালে একটা থাপ্পড় মারতেন।

'ও বাবা! সুব্রতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো, কবে থেকে উনি ভদ্দরলোকদের পাড়ায় উঠে এসেছেন!'

দু'জনেই এবার বাড়ির দরজার সামনে হাজির হয়েছেন।

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না হরকিঙ্কর। হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোকের পাঞ্জাবির উপরের দিকটা ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লোকটার সঙ্গে তিনি পারবেন কী করে। এক ঝটকায় সে হরকিঙ্করকে মাটিতে ফেলে দিলে। 'শালা, আমি ভাবছিলাম আমিই শুধু মাতাল হয়েছি। দেখছি তুমিও মাল টেনেছো।'

লোকটা হয়তো এবার হরকিঙ্করের বুকের উপর চেপে বসতো। হরকিঙ্করও গড়াতে গড়াতে লোকটার পা ধরে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিলেন। হয়তো সর্বনাশা কিছু একটা ঘটতো। কিন্তু গোলমাল শুনে সুব্রতা এসে দরজা খুলে থমকে দাঁড়াল।

'এই যে সুব্রতা দেবী। একটু আগে আপনি বাড়িতে আসতে বারণ করে দিলেন। কিন্তু আপনি চলে আসবার পর দেখলাম হাতে কাজ নেই। আপনাকে দেখবার জন্যে মনটাও কেমন হুহু করতে লাগল।'

হরকিঙ্কর মাটি থেকে উঠে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মা, তুই ভিতরে চলে যা। কোথাকার মাতাল এসে পাড়ায় ঢুকেছে। কোত্থেকে তোর নাম জেনেছে। আমি ওর দেখাচ্ছি মজা।'

কিন্তু এ কি হলো? এখনও মেয়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?

লোকটা বললে, 'কোথাকার এই বুড়োটাকে আপনার বাড়ির খোঁজ জিজ্ঞেস করে ফ্যাসাদে পড়েছি। আপনি তৈরি হয়ে নিন। গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

সুব্রতা তখনও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে আস্তে আস্তে বললে, 'আপনি এখন যান। আমি যাবো না।'

'কেন, কী হলো আপনার? এই তো কিছুক্ষণ আগে হোটেল থেকে এলেন। ডার্ক-রুমে টেস্ট দিলেন। এর মধ্যেই ক্যারাকটার পাল্টিয়ে গেল? বইতে নাবার ইচ্ছে নেই বুঝি!'

'কী?' হরকিঙ্কর আবার লোকটার দিকে তেড়ে গেলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, যা-বলছি ঠিক তাই।' লোকটা দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

সুব্রতা এবার চিৎকার করে উঠলো, 'যান বলছি। না হলে এখনই লোক ডাকবো। চাই না আপনার বইতে পার্ট নিতে।' সুব্রতা এবার ঠক ঠক করে কাঁপছে।

লোকটা বুঝলো কোথাও আজ একটা মস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছে। বললে, 'ঠিক হ্যায়, যাচ্ছি।' তারপর হরকিঙ্করকে শুনিয়েই যেন বললে, 'অন্য কারুর সঙ্গে অ্যাপ-য়েন্টমেন্ট আছে নিশ্চয়।'

দরজা বন্ধ করে দিলেন হরকিঙ্কর। ঘামে নেয়ে উঠেছে তাঁর দেহটা। সুব্রতা হাঁপাচ্ছে আর কাঁপছে। কাঁপছে আর হাঁপাচ্ছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন হরকিঙ্কর। মেয়ে বললে, 'বাবা!'

বাবা চুপ করে রইলেন।

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'বাবা, লোকটা সপ্তমীর দিনে আমার সঙ্গে ফিল্মের কন্ট্রাক্ট সই করবে বলেছিল। এই একবারই—ঢোকবার সময় কেবল ওদের কাছে ছোট হতে হয়। তারপর নাম হয়—সব ঠিক হয়ে যায়।'

বাবা পাথরের মতো চুপ করে রইলেন।

মেয়ে ডাকল, 'বাবা!'

বাবা কোনো উত্তর দিলেন না।

এখন রাত অনেক। ওরা শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ সুব্রতার ঘুম ভেঙে গেল। দরজাটা যেন খোলা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ তাই তো, খোলাই রয়েছে। বাবার বিছানাটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সুব্রতা। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো, বিছানায় তো কেউ নেই।

তড়াং করে সভয়ে উঠে দাঁড়াল সুব্রতা। 'বাবা, বাবা, আপনি কোথায় গেলেন?'

বাবা দরজার বাইরে রয়েছে। 'বাবা, এখনও জেগে রয়েছেন আপনি? কাল ভোরবেলাতেই না পুজো!'

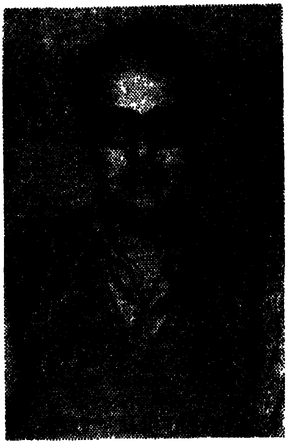
দরজার সামনে উবু হয়ে বসে হরকিঙ্কর কি যেন করছিলেন। হরকিঙ্কর এবার মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটো রাত্রের অন্ধকারে কাপালিকের চোখের মতো জ্বলছে।

'ওখান থেকে কী কুড়োচ্ছিলেন বাবা?'

হরকিঙ্করের চোখ দুটো থেকে এবার যেন সত্যিই আগুন বেরিয়ে আসতে শুরু করলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'মাটি।'

সুব্রতা বাবার মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছে। তবু কাছে গিয়ে পরম স্নেহে বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরে বললে, 'মাটি কী করবেন বাবা?'

বাবা প্রথমে নির্বাক হয়ে রইলেন। মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাঁর ঠোঁট দুটো এবার কাঁপতে শুরু করলো। 'পুজোয় লাগবে', এই বলে রাত্রের অন্ধকারে পুরোহিত হরকিঙ্কর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।



অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : ১৯৩৪ সাল, ঢাকায়। ঢাকার সেই স্মৃতি আজ আর তেমন উজ্জ্বল নয়। জীবনের উপর দিয়ে এত প্রবল ঝড় বয়ে গেছে যে, উত্তরকালের সেই সব ঘটনা জায়গা জুড়ে আছে অনেকখানি। বড্ড কষ্টে কাটে এই লেখকের কৈশোর। প্রথম যৌবনের দিনগুলিও তেমনই।

কী না করেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। জাহাজের চাকরি, শিক্ষকতা, তারপর প্রকাশন সংস্থায় চাকরি, এখন সাংবাদিক। অভিজ্ঞতার সোনার ফসলে পরিপূর্ণ এই লেখকের ঘর। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মায়াবী, নরম, আশ্চর্য এক গদ্যরীতি। ফলে তাঁর যে-কোনও রচনা পাঠ মানে একটা আলাদা জগতে, আলাদা একটা পরিবেশের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া। সমুদ্র কিংবা সামুদ্রিক জীবন নিয়ে লিখেছেন এই লেখক। এই বিষয়টিতে এই ভাষায় ইনিই প্রধান। 'সমুদ্র-মানুষ', 'নগ্ন ঈশ্বর', 'মানগানু উপত্যকার বেড়াল' এবং 'অলৌকিক জলযান' উল্লেখযোগ্য রচনা। শেষোক্তটি মহাকাব্য-বিশেষ। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' তাঁর আর এক মহৎ গ্রন্থের নাম। 'রোদ্দুরে জ্যোৎস্নায়', 'মানুষের ঘরবাড়ি' প্রভৃতিও তাঁর বহু-পঠিত উপন্যাস।

বাংলা ছোটগল্পেও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব একটি আসন চিহ্নিত। গ্রেট ক্যালকাটা শো, বৃষ্টির পরে, শাদা অ্যাম্বুলেনস্, মানিকলালের জীবনচরিত, ডেথ ডেথ খেলা ইত্যাদি তাঁর বিশিষ্ট গল্পের নাম। পুরস্কার? অজস্র পাঠকের ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ১৯৫৮ সালের মানিক স্মৃতি এবং ১৯৭৬ সালের মতিলাল পুরস্কার।

'রাজার টুপি' গল্পটিতে আছে মধ্যবিত্ত মানুষের রক্তাক্ত ছবি। সমাজে এরাই সব চেয়ে বড় ক্রীতদাস। জীবন যাপনে তার কোন স্বাধীনতা নেই—তার স্বাধীনতাবিহীন এই জীবনে সে আবদ্ধ পাগলের মতো। নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই জীবনে, সুখ অথবা ভালবাসা বার বার তার কাছ থেকে কে কেড়ে নিতে চায়। এই যে মানুষ এবং মধ্যবিত্ত জীবন বড়ই জটিল, সে কোথাও মুক্ত নয়। নিজের জীবনে নিজেই বন্দী। এমন একটি চরিত্রকে নিয়ে রাজার টুপি গল্পটি রচিত এবং যেহেতু আমরা মধ্যবিত্ত মানুষ, আমাদের জীবনের আশ্চর্য এক প্রতিফলন ঘটেছে এই গল্পে। যে-গল্পে নিজের জীবনের প্রতিফলন থাকে, কারণে, অকারণে তা প্রায়ই প্রিয় গল্প হয়ে যায়। এ-জন্য গল্পটির অনিবার্যতা আমার জীবনে খুবই অমোঘ।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯-৮-৭৮

রাজার টুপি

জলের মত রঙ ছিল সেদিন আকাশের। সুরমা বিছানায় শুয়ে ছিল। সুরমা রুগ্ন। বাবুল বারান্দায় রেলগাড়ী চালাচ্ছিল। সতীশ রথের মেলা থেকে বাবুলকে রথ কিনে না দিয়ে রেলগাড়ী কিনে দিয়েছিল। রেলগাড়ীর চাকায় সামান্য শব্দ হচ্ছিল; পাখী ডাকছিল আকাশে। ভোরের সূর্য উঠে আসছে। জানালায় পাতাবাহারের গাছ। গাছে লাল, নীল, হলুদ পাতা। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় পাতার উপরে পরিচ্ছন্ন ভাব: সতেজ এবং স্নিগ্ধ। বাবুল গাড়ী চালাতে চালাতে ডাকল, বাবা আমার গাড়ীটা চলছে না।

সতীশ গাড়ীটাতে দড়ি বাঁধা দেখল। গাড়ীর চাকা ঘুরছে না বলে বাবুল দড়ি ধরে টানছে এবং চালাবার চেষ্টা করছে। সতীশ নুয়ে গাড়ীটা উল্টে দিল। আর পিন লাগালে গাড়ীর চাকা আবার ঘুরতে থাকল। বাবুল রেলগাড়ীটা টানতে টানতে দেয়ালে বোধ হয় পাখী দেখল, বোধ হয় পাখী উড়ে গেলে দেয়ালে সে নিজের ছায়া দেখে থেমে গেল এবং কেমন ভয় পেয়ে বলল, বাবা তুমি আমার পাশে বসবে।

বুঝতে না পেরে সতীশ বাবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বড় চোখ বাবুলের। হাসলে গালে টোল পড়ে। কালো রঙ। মুখের ভিতর চোখ দুটোই সার। ছোট করে ছাঁটা চুল এবং মুখশ্রীতে কেমন যেন যাদু আছে। যেন দূরের কোন মাঠে বৃষ্টিপাতের পর সামান্য জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নায় ছোট্ট শিশু দু'হাত তুলে ছুটছে। সতীশ মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, কি বললে?

বাবুল এবার গাড়ীটা বগলে নিয়ে সতীশের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, এখানে তুমি আমি বসব। বলে সে এনজিনের দিকটাতে স্থান নির্দিষ্ট করলে সতীশ বলল, মা কোথায় বসবে? কথা শুনে বাবুল একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। মা পাশে না বাবা পাশে? কে পাশে বসবে সে এ-মুহূর্তে কিছুই স্থির করতে পারল না। ওর চোখে-মুখে ক্লিষ্ট এক ভাব ফুটে উঠছে। সুতরাং সতীশ বলল, তুমি যেখানে বলবে আমরা সেখানেই বসব। তোমার গাড়ীতে কে কোথায় যাবে তুমিই ঠিক করবে। বাবুল এবার গাড়ীটা ফেলে মায়ের কাছে ছুটে গেল। সুরমা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। ওর দেরী করে ওঠার অভ্যাস। ঝি আসবে। এসে সব হাতের কাছে এনে দিলে সে রান্না করবে। ওর পেটে কী যেন কষ্ট সব সময়। সামান্য অপারেসনের দরকার। এবং অপারেসন হলেই, সুরমা মরে যাবে এমন একটা ভয় তার। বাবুল বিছানার পাশে আসতেই সুরমা মাথায় হাত রাখল। বলল, ভোরবেলা গাড়ী নিয়ে খেলতে নেই। এখন পড়তে বোস। এমন কথায় বাবুল বিষণ্ণ হয়ে গেল। সতীশের দিকে না তাকিয়েই বলল, বাবা তুমি আমার পাশে বসবে। মা দিদি পিছনে বসবে। ভোর হলে সূর্য আপন মহিমায় যেমন আকাশে উঠে আসে, এই বাবুল, ছোট্ট বাবুল সেই রকম দাপাদাপি করে এই সংসার ভরে তুলছিল। পড়ার কথায় সে বিষণ্ণ হয়ে গেল।

—তার পিছনে কে বসবে? কারণ বাবুলের গাড়ী চার কামরার। সে এবার কি ভাবল। জানালায় পাতাবাহারের গাছ। তারপর পথ। এই প্রাসাদের মত বাড়ীর ভিতর এক ফালি ঘর নিয়ে সতীশ রয়েছে। স্ত্রী সুরমা আছে। এই বড় বাড়ীর দু' পাশে ফুলের বাগান। বাগানে কত বিচিত্র ফুল। এবং বাগান পার হলে পুকুর, পাড়ে

পাড়ে আমলকি গাছ। এখন কি মাস্ সতীশের যেন মনে আসছিল না। ওই আমলকি গাছের ছায়া এবং বন তার পরে মাঠ, এসব তার মনে আসছিল।

বাবুল তখন বলল, তার পেছনে দিদিমা।

—আর কেউ নয়?

—না।

—তোমার ঠাকুমা ঠাকুর্দা।

এবারেও সে দ্বিধায় পড়ে গেল। সে কিছু না বলে গাড়ীটাকে টেবিলের উপর রেখে দিল। তারপর একটা চেয়ারে বসে ইতিহাসের পাতা খুলে পড়তে বসল। রাম-রাবণের ছবি। রামের মাথায় রাজার টুপি। বড় লম্বা টুপি দেখলে বাবুলের মনে হয় এই বুঝি রাজার টুপি। সে বাবাকে কতবার এমন একটা টুপি কিনে দিতে বলেছিল, সতীশ বলেছিল রথের মেলা থেকে কিনে দেবে। কিন্তু রথের মেলা থেকে না রথ, না টুপি। সে লম্বা এক রেলগাড়ী কিনে এনেছে।

বাবুল কি ভেবে ফের নিবিষ্ট হল ছবিতে। সতীশ কি ভেবে জানালাতে পাতা-বাহারের গাছ দেখল। আর সুরমা দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল ঝি মঙ্গলা এসেছে কিনা। অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ চোখ সুরমার। দুই সন্তানের জননী সুরমা। চোখে-মুখে বিস্বাদের ছাপ শুধু। সে উঠতেই বাবুল বলল, আমি আর পড়ব না মা।

—কেন পড়বে না?

—বাবা বলেছিল টুপি কিনে দেবে, রাজার টুপি। টুপি না দিলে আমি পড়ব না। বলে সে একটা খাতা টেনে ছবি আঁকতে বসে গেল।

সুরমা ধমক দিল এবার।—বাবুল তুমি পাকা পাকা কথা বলবে না। এখন পড়াশোনা কর। কেবল ছবি এঁকে খাতা নষ্ট করা। সতীশ এলে বলল, তোমার ছেলেমেয়েকে বলে যাবে দুপুরে বাইরে বের না হতে।

এই এক ভয় সুরমার। সুরমার কেন, সতীশেরও। বাড়ীর বাইরে ফুলবাগান, বাগান পার হলে বড় জলাশয়। জলে কালো রঙের শ্যাওলা। এবং বড় গভীর। এত বড় বাড়ীর এক কোণায় সতীশের তিনকামরার ঘর। প্রাসাদের মত এই বাড়ীর কোন ভগ্নাংশে যেন সতীশ এবং সুরমা তাদের দুই সন্তানের প্রতি স্নেহ নিয়ে জীবনের বাকী অংশটুকু কাটিয়ে দিচ্ছে। সতীশের ভয়, বাবুল একা একা—যখন সুরমা দুপুরে ঘুমিয়ে পড়বে, যখন নির্জন দুপুরে পাতাবাহারের গায়ে কিছু পাখী ডাকবে—তখন এই বাবুল তালপাতার টুপি মাথায় দিয়ে কাঁধে খেলনার বন্দুক নিয়ে দৈত্য শিকারে বের হয়ে পড়বে। আর সঙ্গে থাকবে মিন্টু। দুই ভাইবোনে চুপি চুপি বের হয়ে ফুল ফল পাখীর জন্য আমলকির বনে হারিয়ে মার অসুখের দৈত্যটাকে খুঁজবে।

এই বড় শহরে এসে সুরমার স্বাস্থ্য ক্রমে ভেঙে গেল। সতীশ সেই পাতাবাহারের পাতা দেখতে দেখতে কথাটা ভাবল। এই বড় শহরে বড় নিঃসঙ্গ সে। ক্রমে সে অস্থির হয়ে উঠছে। কারখানার কিছু কিছু ঘটনার কথা মনে পড়ছে এ সময়। সতীশ একদা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত। সুরমা শিক্ষয়িত্রী ছিল। বড় মাঠ ছিল সামনে। মাঠ পার হলে স্টেশন। স্টেশনে রেলগাড়ী এসে থামত। বাবুল আর মিন্টু রেলগাড়ী এলে জীবন দপ্তরীর কাঁধে মাঠ পার হয়ে স্টেশনে উঠে যেত। বারান্দায় ইজিচেয়ার থাকত। সুরমা এবং সতীশ বসে বসে ওদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখত। এখন কেন জানি সে সব ছবি স্বপ্নের মত মনে হয়। এখন শুধু

কানে কারখানার ঘন্টা পেটানোর শব্দ ভেসে আসে। কে যেন অন্ধকারে লাল বলের মত এক অগ্নিগোলক ঝুলিয়ে রেখেছে এবং কারা যেন মাথায় রাজার টুপি পরবে বলে ক্রমান্বয় ঘন্টা পিটিয়ে যাচ্ছে। এই ঘন্টা পেটানোর শব্দ কানে এলেই সতীশের হাত পা কাঁপতে থাকে। কেবল মনে হয় কারা যেন সব সময় হল্লা করে ওর পেছনে ছুটে আসছে। আজ সোমবার। বোনাস সম্পর্কে শ্রমিক পক্ষ থেকে কথা বলতে আসছে। কথায় কথায় বচসা হবে। নানারকমের ভয় ভীতিতে ওর গলা শুকিয়ে আসছিল। সে ঝি মঙ্গলাকে ডাকল; জল, এক গ্লাস জল দিতে বলল মঙ্গলাকে। সুরমাকে বলল, আজ ফিরতে দেরী হতে পারে। অযথা অমার জন্য ভাববে না।

সুরমা মুখ ফেরাল না। বলল, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

--কি কথা?

--বাবার চিঠি এসেছে। অফিস ফেরত চিঠি পড়ে রেগে যাবে বলে দিই নি।

সতীশ সামান্য হাসল।--কই দেখি চিঠিটা। সুরমা বালিশের নীচ থেকে চিঠি বের করল এবং সতীশের হাতে দেবার সময় বলল, এ নিয়ে তুমি মাথা গরম করবে না। সুরমা সতীশকে শপথ করাতে চাইল। সতীশ জবাব দিল না। চিঠির ভাঁজ খুলে সেই বৃদ্ধ মানুষটির হস্তাক্ষর দেখল। হস্তাক্ষরে সতেজ সবল ভাবটা ক্রমে কেটে যাচ্ছে। পরম কল্যাণবর--এখন এই শব্দ এবং অর্থ ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। সতীশ গত মাসে বাড়িতে নিয়মিত যে টাকা দেয় তা দিতে পারে নি। তাঁর কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হবার দরুণ রোজগার কমে গেছে। সুতরাং বাজেট ঘাটতি। বাবা নিশ্চয়ই চিঠিটা খুব রেগে গিয়ে লিখেছেন। সে পড়ল--তুমি অবিবেচক হয়ে পড়েছ। শুনেছি তোমার আয় পাঁচশত টাকার মত। আমাকে প্রতি মাসে একশত টাকা দাও। আমরাও চারজন, তোমরাও চারজন।---এ মাসে সেই সামান্য দান তুমি আরও সংক্ষিপ্ত করেছ। এই বৃদ্ধ বয়সে অনাহারে দিন যাপন করতে হবে ভাবতে কষ্ট লাগে। কল্যাণীর সম্বন্ধ এসেছিল। পাত্রপক্ষ কলকাতায় তোমার বাসার কাছেই থাকে। ---শতীশ কেমন অন্যমনস্কভাবে চিঠিটা পড়ছে। পাত্রপক্ষের খোঁজখবর নেবে। নিম্নে ঠিকানা দেওয়া থাকল। শেষে আরও অস্পষ্ট কয়েকটি শব্দ। সতীশ চোখের কাছে এনে উদ্ধার করতে পারল। যতীনের আবার একটি মেয়ে হয়েছে। দাদা কি ক্ষেপে গেলেন। সতীশ কেমন অসহিষ্ণু গলায় না বলে পারল না। এবার পত্রের খুব নীচে 'পুনঃ' এই শব্দ ব্যবহারে চিঠি শেষ করেছেন। তুমি লিখেছ একা তোমার পক্ষে সংসারের দায়দায়িত্ব বহন করা ক্রমে কঠিন হয়ে পড়েছে। তুমি বলতে চাইছ, যতীন সংসারে সামান্য সাহায্য করুক। যতীন রেলে চাকুরী করে। সামান্য তিনশত টাকা মাহিনা। ছয়টি কন্যাসন্তান এবং ওরা দুজন। তাও বড় মেয়েটিকে আমি এ-মাসে নিয়ে এসেছি বলে রক্ষা। তিনি যেন দয়া করে পত্র শেষ করেছেন। চিঠিটা সতীশ ভাঁজ করে সুরমাকে দিয়ে দেবার সময় কথাটা না ভেবে পারল না।

বাবার এই এক অজুহাত। সংসারে সতীশ সামান্য বেশী আয়ের চাকুরী করে বলে এবং বিদ্বান বলে সব চাপ ওর উপর। সুরমা সংসারে বড় ঘর থেকে আসায় এবং মা-বাবার অমতে বিবাহের দরুণ সকলেই সুরমার প্রতি যেন সংগোপনে আক্রোশ বহন করে বেড়াচ্ছে। কারণ বিয়ের আগে সতীশ শেষ কপর্দক মায়ের হাতে দিয়ে দিয়েছে এবং সংসারে সেই প্রায় সব দিল। কোথাকার এক উটকো যুবতী এসে সতীশকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। সতীশ চিঠিটা সুরমার হাতে দিয়ে বলল, ভেবেছি বাবুলকে দাদার কাছে দত্তক দিয়ে দেব।

সুরমা বলল, তার মানে?

সতীশ হাসতে হাসতে বলল, দাদার পুত্রসন্তানের বড় শখ।

—শখ না বলে বল স্বার্থপর মানুষ। সুরমা ক্ষেপে গেল। এই মানুষ সতীশ যেন উৎসর্গকৃত প্রাণ। সব দায় দায়িত্ব তার। কেন বাপু—সুরমার রুগ্ন হাত-পা কাঁপতে থাকল, অন্য দুই ভাই আছে তোমার, ওরা কাজ করছে। লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টার ত্রুটি ত তুমি কর নি। শুনেছি তুমি টিউশনি করে, পত্রিকা হকারী করে তোমার পড়ার খরচ চালিয়েছ। আর তুমি ছোট ভাইদের পড়ার জন্য কি না করেছ—ওরা মানুষ না হলে কার দায়! একটানা কথা বললেই সুরমা বড় বেশী কাতর হয়ে পড়ে। সে বিছানায় উঠে বসল।—ওরাও কিছু কিছু করে বাবাকে সাহায্য করতে পারে।

সতীশ তেমনি সরল সহজ মুখে বলল, দেখলে ত মাথা খারাপ কে করছে।

সুরমা বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, আমার বাবুলকে আমি দিতে যাব কেন?

—না দিলে দাদা রেস চালিয়ে যাবে। সতীশ ঠাট্টা করে বলল।

—রেস চালালে দারিদ্র্য বাড়বে। তাতে আমার কি। সুরমা ক্রমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। সতীশের ভাল লাগছিল সুরমাকে রাগিয়ে দিতে। বলল, দাদার কাছে থাকাও যা আমার কাছে থাকাও তাই। সতীশ বারান্দায় নেমে গিয়ে সুরমার মুখ দেখতে চাইল।

—বাবুল আমার। সংসারে তুমি তোমার মা-বাবা দাদার জন্য সব করতে পার। আমি পারি না। তোমার যা চাকরি—কবে কোনদিন সব যাবে আমাদের। আমরা পথে গিয়ে দাঁড়াব। কি সঞ্চয় তোমার বল? এতদিন চাকুরি করে কি করেছ তুমি? মিণ্টু বড় হচ্ছে। ওদের দিকে তুমি একবার ভাল করে তাকাও। তোমার কারখানা, শ্রমিক, মা-বাবা দাদা ওরাই সব। তারপর আরও কি বলতে গিয়ে সুরমা থেমে গেল। এই এক অভ্যাস সুরমার। রেগে গেলে সকলকে টেনে আনবে। কোথায় যেন সুরমা অনিশ্চয়তায় ভুগছে। সতীশ নিজেও মাঝে মাঝে জীবনযাপনের নিরাপত্তা-বোধের অভাবে ভুগছে। কারখানার ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে ঋণ বাড়ছে এবং কারখানার নাভিশ্বাস উঠছে। সে যেন কোনদিকে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পুরানো যন্ত্রপাতি এবং প্রাচীন সব পদ্ধতির জন্য প্রতিযোগিতায় ক্রমে তারা হটে যাচ্ছে। ফলে কারখানার দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠলেই মনে হয়, এক বড় অগ্নিগোলক, অতিক্রম করতে পারলেই রাজার মাথায় টুপি। সতীশ বার বার প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই অগ্নিগোলক অতিক্রম করতে পারছে না। সতীশ জামাকাপড় পরার সময় ভাবল, বাবুলকে আজ হোক কাল হোক সে একটা টুপি কিনে দেবে। সে রাজার টুপি পরে রাম অথবা রাবণ সেজে বাবাকে ভয় দেখাবে। সে ডাকল, বাবুল তোমার পড়া হয়েছে?

কোথায় বাবুল! তখন বাবুল টেবিলের নিচে বসে মা'র অসুখের দৈত্যটাকে খুঁজছে। হাতে বন্দুক, কোমরে বেল্ট এবং তাতে আঁটা চকচকে লোহার পাত। সব রাংতা দিয়ে মোড়া। মনে হয়, বাবুল যথার্থই সৈনিক সেজে এই সংসার থেকে সব অমঙ্গল দূর করে দিতে চাইছে। বের হবার মুখে সুরমা ফের সতীশকে বলল, ওদের তুমি বারণ করে যেও।

সতীশ বলল, মিণ্টু তুমি বাবুলকে নিয়ে দুপুরে বের হয়ে যাবে না।

বাবুল টেবিলের নিচে থেকে বলল, না বাবা, আমি বের হব না। দিদি আমাকে কেবল যেতে বলে।

মিণ্টু বলল হ্যাঁ আমি তোমাকে কেবল যেতে বলি। নিজে যেন যেতে জানে না।

ওদের ঝগড়া দেখে সতীশ বলল, তুমি যাবে না। তুমি সাঁতার জান না। জলে পড়ে গেলে কেউ টের পাবে না। তারপর ভয় দেখানোর জন্য বলল, পুকুরটাতে বড় একটা অজগর সাপ আছে। যাবে না। গেলেই খেয়ে ফেলবে। এক জলাশয়ের দৃশ্য সতীশকে কেমন ভীত বিহ্বল করে রাখে। অথবা অফিসে সময় সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে মনে হয়, বাবুল এবং মিন্টু যেন এক প্রাচীন দিঘির পুরানো ভাঙা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কি যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মা রুগ্ন। মা সারাদিন শুয়ে থাকেন। মা'র জন্য বনের ফুল ফল অথবা মা'র জন্য অমৃত ফল তুলে আনতে হবে। জলাশয়ের পারে পারে ওদের ছুটে বেড়ানোর দৃশ্য সতীশকে মাঝে মাঝে বড় অন্যমনস্ক করে দেয়।

পথে বের হলেই মিশনারীদের এক বড় দেয়াল এবং সদর গেট। একটু পথ হেঁটে বাসে উঠতে হয়। সেখানে এক কুষ্ঠরুগীর মুখ, তার হাত হাওয়ায় নিয়ত দুলতে থাকে। বয়সে প্রাচীন সেই নারীর গলিত শবের মত হাত পা মুখ; আর কী করুণ ইচ্ছা তার দু' হাতে সূর্য স্পর্শ করার। সতীশ এখানে এলেই সামান্য সময় দাঁড়ায়, কিছু সাহায্য দেয়।---তারপর যদি তুমি কোনদিন দ্যাখো সংসারের সব দুর্যোগ তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে? এমন কথা মনে হয়, তখন? সতীশ তখন ছুটে পালাতে চায়, কিন্তু কে যেন তখন পাখীর মত ডেকে ডেকে বলে, বাবা তুমি আমায় রাজার টুপি কিনে দেবে না? তুমি আমাকে বড় মাঠে নিয়ে যাবে না?

অফিসে ঢুকেই সতীশ শুনল, দু'জন লোক ওর সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে। সে টেবিলের উপর কিছু চিঠি পড়ে আছে দেখতে গেল। লোক দু'জন বাইরে বসে আছে। সে বেল টিপে অবিনাশবাবুকে ডাকাল। বলল, কারা এসেছে? কি চায় ওরা? ইউনিয়ন থেকে আসেনি তো! সতীশ ওদের ডাকাল। এবং বলল, আপনি বসুন অবিনাশবাবু। ওরা এলে বলল, কি চাই? ওরা জবাবে বলল, স্যার প্লেট কিনতে চাই।

সতীশ এবার চেঁচিয়ে উঠল।—এখানে প্লেট বিক্রি হয় না। এখানে প্লেট কেনা হয়। সে কেন জানি সহসা মাথা গরম করে ফেলল। মাথা গরম করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। সে খুব শান্তশিষ্ট বালকের মত মুখ করে বসে থাকার চেষ্টা করে দেখল, ওরা কিছু বলার চেষ্টা করছে।—বলুন। ওরা সাহস পেল যেন বলতে। স্যার অনেক কোম্পানী ত আজকাল কোটা বের করে বিক্রি করে দিচ্ছেন।

আমরা দিচ্ছি না। অথচ সতীশ জানে আজকাল ব্যবহারের চেয়ে বিক্রি ভাল। বিক্রিতে লাভ বেশি। কর্তৃপক্ষের বিক্রির দিকে একটা ঝোঁকও আছে। অথচ এইসব মিথ্যাভাষণের দায়দায়িত্ব তার থাকবে। সে অত্যন্ত কষ্ট করে যেন বলল, এখানে তা হয় না। লোক দু'জন উঠে গেলেই একটা কোলাহল শুনতে পেল। সকলে মিলে অফিসের দিকে ছুটে আসছে। ফ্যাক্টরির ভিতর মোটর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চাকা থেমে গেছে।—কি, কি হল? সতীশ অবিনাশকে বলল, দেখুন ত কি ব্যাপার! ওরা সকলে ছুটে আসছে কেন! তখন বাইরে গলা পাওয়া গেল—স্যার অ্যাকসিডেন্ট। তেওয়ারীর হাত উড়ে গেছে। এখন অ্যাকসিডেন্ট রিপোর্ট—হাসপাতাল এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। ওদের কোলাহল আসছে না। সতীশ অন্য এক সহকারীকে ডেকে বলল, ওরা সকলে বাইরে কেন! ওদের ভেতরে যেতে বলুন, কাজ করতে বলুন। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

দু'জন লোক তেওয়ারীকে হাসপাতালে নিয়ে চলে যাচ্ছে। সতীশ ওদের ডেকে বলল, এবার তোমরা বল কি বলবে?

—স্যার পাঞ্চিং মেশিন খারাপ ছিল।

---সুপারভাইজারকে রিপোর্ট করেছ?

ওরা বলল, করেছি। তবু সুপারভাইজার ওকে কাজ করতে বলেছেন।

সতীশ মনে মনে হাসল। কারণ এমন সব অভিযোগে সব সময় সত্যমিথ্যা জড়িত থাকে। শ্রমিক পক্ষ সব সময় কর্তৃপক্ষের উপর দোষটা চাপাতে চায়, কর্তৃপক্ষ শ্রমিকপক্ষের উপর। সে কী চিন্তা করে বলল, চল দেখছি। ভিতরে ঢুকে সে নিজেই প্যাডেলে চাপ দিল এবং বলল, কই ডাবল ত পড়ছে না। ঠিক আছে মেশিন। নিশ্চয়ই তেওয়ারী অন্যমনস্কভাবে কাজ করছিল। তারপর সে চাবিটাতে হাত দিয়ে বুঝল ভিতর চাবির ঘাট ক্ষয়ে গেছে। ঘাট ক্ষয়ে গেলে মাঝে মাঝে চাবি ধরবে না এবং ডাবল পড়ার সম্ভাবনা আছে। ভিতরে ভিতরে তার বুক কাঁপছিল। মেশিন আজই খুলে ফেলতে হবে। অন্য চাকা এবং চাবি লাগিয়ে দিতে হবে। সে অজুহাত বের করার তালে চারিদিকে কি খুঁজে দেখল। কিছু ভাজাভুজির অংশ নিচে এবং নিচের দিকে চোখ রেখেই বলল, এখানে এসব কেন? নিশ্চয়ই খেতে খেতে পাঞ্চিং চালাচ্ছিল তেওয়ারী। সে অভিযোগটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিতে পারলে কোনো ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন থাকবে না। দায় দায়িত্ব সব শ্রমিকের। ইউনিয়নের দু'জন পাণ্ডাকে ডেকে চারপাশটা দেখাল---এখানে এসব কি হয়! সে সুপারভাইজারকে পর্যন্ত শাসাল। ঘটনাটাকে এবার হুস করে কাক তাড়ানোর মতন ফুস মন্তরে মুছে দিতে চাইল।

সে রিপোর্টে লিখল, কাজে অন্যমনস্কতা এবং দুর্ঘটনা। দু'জন শ্রমিককে সাক্ষী নিয়ে রিপোর্ট লিখে দিতেই প্রাণের ভিতরে কেমন এক রক্তশোষা জীব উঁকি দিয়ে ফের রক্তের ভিতরে ডুবে গেল। যা হয়, প্রাণের চেয়ে মানের মূল্য বেশি, দুই মুখ তখন উঁকি দেয়---মিন্টু, বাবুলের মুখ। রক্তশোষা জীব যেন এবার ওদের তেড়ে যাচ্ছে। বাবুল একবার ছবিতে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখেছিল। যুদ্ধ দেখে বলেছিল, বাবা আমি রাম সাজব। আমাকে রাজার টুপি কিনে দেবে বাবা। রিপোর্ট সই করার পরই সতীশের মেজাজটা কেমন রুক্ষ হয়ে গেল। রথের মেলা থেকে রাজার টুপি কিনতে হবে সেকথা সে ভুলে গেল।

সে অফিসে অন্যমনস্কভাবে কতগুলি বিল সই করল। চিঠি সই করল---না পড়েই। একবার চোখও বোলাল না। এই এক বিশ্রী অভ্যাস তার, ভিতরে কোন পাপবোধ কাজ করতে থাকলে সে কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। সংসারের বিবিধ কারণ শিয়রে তার সোনার কাঠি রাখতে দিচ্ছে না। সে অসহায় আর্ত এক মানুষ। তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না তেওয়ারীর রিপোর্ট এমন হোক। তবু কার জন্য, বুঝি দুই শিশু-সন্তান এবং যুবতী রুগ্না স্ত্রী আর মা বাবা ভাইবোনের কথা ভেবে সোনার কাঠি সে শিয়রে রাখল না। সব ফেলে দিয়ে সে কেমন অমানুষ এবং ক্রীতদাস হয়ে গেল।

ট্যাক্সিতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় তেওয়ারীর বউটা কাঁদছিল। জানালা দিয়ে সতীশ সেই মুখ দেখল। সতীশ ক্রমে ক্ষেপে যাচ্ছে। এই ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না সে সহ্য করতে পারছে না। ক্রমে সে অসহায় হয়ে পড়ছে। সে উঠে দাঁড়াল এবং অফিসের ভিতর পায়চারি করতে থাকল---যেন সে সাহস সঞ্চয় করছে। সে অবিনাশকে ডেকে বলল, ওদের এবার যেতে বলুন। এখানে কান্নাকাটি করে আর কি হবে। বস্তুত সতীশ এখন নিরালম্ব মানুষের মত। সংসারের অন্ধকারে এক কালো ঘোড়া আছে, তাতে চড়ে নিরন্তর ডাইনি-বুড়িটা মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে যেমন হয়---কোন দুঃখের ছবি, আর্তের কষ্ট আর---নিরাপত্তাবিহীন জীবিকা দেখলে যেমন হয়, সংসারে পাখী ওড়ে না। মরুভূমির মত মাঠ শুধু সামনে, আর এক উট---

দীর্ঘপথবাহী নদী নালা বিহীন মাঠে অনবরত উট ছুটছে। সতীশ তেমনি নিজেকে কিসের আশায় ছুটতে দেখল। কারা যেন পেছনে তাড়া করছে; ফুটপাথের বাসিন্দা, অনাহারে মৃত বালকের ছবি এবং সেই কুষ্ঠরুগী। সে চীৎকার করে উঠল, অবিনাশবাবু!

—আজ্ঞে আমাকে ডাকছেন স্যার!

—দ্যাখুন ত তেওয়ারীর বউটা এখনও কাঁদছে কিনা।

—না স্যার কাঁদছে না। কখন ওরা চলে গেছে!

সতীশ কেমন নিশ্চিন্ত মনে এবার বসে পড়ল। সে দুই হাতলে হাত রেখে শরীর সোজা করে দিল। কোনও দিকে তাকাল না। বোনাস সম্পর্কে কথা বলতে হবে আজ, সম্ভবত ঘেরাও করবে শ্রমিকেরা এবং ওদের দাবিদাওয়া নিয়ে চীৎকার চেঁচামেচি হবে। সে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য কোম্পানীর যে কী ভয়ঙ্কর দুরবস্থা চলছে, আর এ-ভাবে চললে বেশীদিন কাজ চালানো যাবে না, উৎপাদন না বাড়ালে প্রতিযোগিতায় হটে যেতে হবে—এ সব নিয়ে নিজের মনেই যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করতে করতে কখন দেখল সতীশ আর সতীশ নেই—সে এক ভাঙ্গা রেলগাড়ি হয়ে গেছে। ওকে সাইডিং-এ ফেলে ঝকঝকে নীল রঙের ট্রেন ওর সামনে ছুটে বের হয়ে যাচ্ছে। সে এবার সোজা হয়ে বসল এবং বলল, হবে না। শ্রমিকরা বলল, তা কি করে হয়। সে বলল, পাঁচ বছরে আমি তোমাদের বেতন ডাবল করেছি, তোমরা উৎপাদন এক বিন্দু বাড়াও নি। কোম্পানী সেই অনুপাতে মালের দাম বাড়াতে পারে নি। আমরা ক্রমশ হেরে যাচ্ছি—কোম্পানীর ক্রমশ ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু বলা নিরর্থক, ওরা কিছুই শুনবে না। উৎপাদন বাড়াবে না। সে এবার বলল, সরকার তোমাদের বোনাসের যে রেট বেঁধে দিয়েছেন তাই পাবে। মানে ফোর অর ফরটি—বলে সতীশ শেষ করতে পারল না। সমস্বরে চীৎকার শোনা গেল—আমাদের দাবী মানতে হবে। সতীশ এবার অবিনাশবাবুর দিকে তাকাল। অবিনাশবাবু বিনোদবাবুর দিকে তাকাল—ওরা সকলে ঘেরাও হয়ে গেল—ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কথা বলতে পারছিল না। ক্রমে এ-অঞ্চলে অন্ধকার নেমে আসছে শুধু এইটুকু ওরা টের পাচ্ছে। তোমরা দরজা ছেড়ে দাও—আমরা যাব। সতীশের বলার ইচ্ছা হল। কিন্তু দরজায় মানুষগুলো আরও জট পাকিয়ে বসল। এবার ওরা তেওয়ারীর কথা তুলবে। জুলুমের কথা তুলবে। সতীশ ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে থাকল। বাবুলটা এখন কি করছে কে জানে! মা ছেলে! মার অসুখ বাড়লে ছেলের ফুল ফলের জন্য যেন আকর্ষণ বেড়ে যায়। সে এবার অবিনাশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন তবে উঠি। কিন্তু যারা দরজা আগলে বসে ছিল তারা বসেই থাকল। উঠল না কেউ। সতীশ অথবা অবিনাশকে দরজা ছেড়ে দিল না। ওদের দাবী না মেনে নিলে সতীশ এবং অবিনাশ যেতে পারবে না। ওদের পাংশু এবং ভয়ঙ্কর চোখ কেমন বিব্রত করছে সতীশকে। সতীশ ক্রমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। এমন মুখ ওদের দেখলে মনেই হয় না সামান্য কথায় এখন দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। সে বলল, দরজা ছেড়ে বস। আমরা যাব। ওরা আরও ঘন হয়ে বসল, দরজা পুরোপুরি আটকে দিল। আমাদের দাবী মানতে হবে—দরজা আটকে দিয়ে এমন কথা বলতে চাইল।

—তবে তোমরা আমাদের আটকে রাখতে চাও।

—সে আমরা পারি স্যার!

—কি আমার বিনয়ের অবতার—সতীশ যথার্থই ক্ষোভে দুঃখে বলে ফেলল। সে অবিনাশবাবুর দিকে তাকাল—কি করবেন এখন, এমন বলার ইচ্ছা। অবিনাশবাবু

একটা কাগজ দলা পাকাচ্ছিল। কাগজের সেই খণ্ড বিনোদবাবুর দিকে ছুঁড়ে দিল—যেন এক ধরনের খেলা। অবিনাশবাবু কাগজের গুলতি তৈরি করে পাখী শিকার করবেন এমন এক মুখ করে উঠে দাঁড়ালেন। একমাত্র পুলিসের সাহায্য এই সময় দরকার। এইসব মানুষ বিনয়ের অবতার অথচ ফোনে হাত রাখলে হা হা করে ছুটে আসবে। সুতরাং অবিনাশ ঘরের ভিতর উটের মত মুখটি তুলে পায়চারি করার সময় বিনোদবাবুকে সংকেতে কি সব বলে দিতেই তিনি বের হয়ে গেলেন। প্রায় একশত মুখ এখন দরজায় জানলায়। কিছু কিছু মানুষ সামনের মাঠের অন্ধকারে উঁকি দিয়ে আছে। সাহস সঞ্চারের জন্য ওরা মাঝে মাঝে ধ্বনি দিচ্ছিল—আমাদের দাবী মানতে'হবে। যেন ওরা বাঘের মত থাবা উঁচিয়ে বসে আছে, অবিনাশ অথবা সতীশ বের হলে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। তখন বিনোদবাবু সদর রাস্তায় হাঁটছিল—হাতে আবেদনপত্র—উই আর রংফুলি কনফাইণ্ড। সে রাস্তায় নেমে চিঠিটা পড়ল এবং দৌড়ে থানায় জমা দিলে পুলিস-গাড়ি এল। নিমেষে সব কিছু ফাঁকা হয়ে গেল। সতীশ পুলিসের গাড়িতে বসে কেমন কাপুরুষের গলায় বলল, তেওয়ারীর বউটা খুব কাঁদছিল অবিনাশবাবু।

ঘরে ফিরে সতীশ দেখল, সুরমা শুয়ে আছে। ক্ষোভ দুঃখ হতাশা ক্রমে জোয়ারের জলের মত বাড়ছে। সুরমাকে শুয়ে থাকতে দেখে সে কেমন ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। —তুমি এখন শুয়ে আছ! বলার ইচ্ছা সতীশের। ও-ঘরে কার গলা!—কে এল সুরমা! সুরমা না তাকিয়েই বলল, বড়দা এসেছেন। সতীশ বলল, বাবুল কোথায়!

—বাবুল দাদাকে কবিতা শোনাচ্ছে।

—তুমি কখন এলে? সতীশ দরজায় মুখ রেখে বলল। বাবুল লাফাচ্ছে, গাইছে এবং ছুটে ছুটে কবিতা আবৃত্তি করছে। এখন পড়ার সময়। কেউ এলেই বাবুলের দাপাদাপি বেড়ে যায়। সে এখন পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছে।—তুমি পড়তে বসো বাবুল। সে বাবুলকে ধমক দেবার সময়ই মনে করতে পারল কাপুরুষের মত সে আজ পালিয়ে এসেছে। এই কাপুরুষ ভূমিকার জন্য সে কেমন নীচ হীন হয়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই বড়দা কোন কাজের আশায় এসেছেন। বড় মেয়েটিকে বাবার কাছে রেখেছ, মেজ মেয়েটিকে আমার কাছে---কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল, চা খেয়েছ?

—খেয়েছি সব। এখন তুই তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে আয়। কিছু জরুরী কথা আছে।

হাত মুখ ধুলে জরুরী কথা, সেই এক কথা—সম্বন্ধটার কি করলি। পাত্রপক্ষ পণ চাইছে। দাবী দাওয়া অনেক। এমন পাত্র ছাড়াও যাবে না। ওদের কল্যাণীকে খুব পছন্দ হয়েছে। সতীশ দাদার কথা বোধ হয় ভালভাবে শুনতে পাচ্ছিল না। সে বাবুলকে দেখছে। বাবুল তাক থেকে কিসব নামাচ্ছে। কাচের পাত্র হলে ভেঙ্গে যাবার ভয়। দাদার সামনে খুব জোরে সে ধমকও দিতে পারছে না। দাদা আহত হতে পারেন। সে খুব নরম গলায় বলল, বাবুল তুমি নীচে নেমে এস। পড়ে যাবে। পড়ে গেলে হাত পা ভাঙবে। বাবুল কথা শুনছে না। জ্যাঠামশাইকে দেখে ওর বেজায় সাহস বেড়ে গেছে। রাগে সতীশের মাথায় রক্ত উঠে আসছে। তখন দাদা বললেন, সকলে তোমার আশায় আছে। তুমি মত না দিলে এ পাত্রটিও হাত ছাড়া হবে।

সতীশের দু হাত তুলে চীৎকার করতে ইচ্ছা হল, আমাকে তোমরা কি ভাব! আমি কি চুরি করব! আমাকে তোমরা চুরি করতে বলছ। আমার কি আয়! আমি কোথা থেকে এত টাকা পাব। সতীশ অথচ ক্ষোভে এবং দুঃখে জবাব দিতে পারল না। সে মাথা নীচু করে বসে থাকল। এবং ধীরে ধীরে বলল, দেখি কি করতে

পারি। দাদা চলে গেলে হতাশ মুখে ঘরে ঢুকল সতীশ। ওর চোখ মুখ টানছে। ক্লান্তিকর জীবন এবং সারাদিনের খণ্ড খণ্ড হঠকারী ঘটনা ওকে কিছুতেই স্থির থাকতে দিচ্ছে না। বাবুলের উপর রাগটা কিছুতেই মরছে না। বাবুলের কাছে সতীশ বুঝি ধরা পড়ে গেছে। কাপুরুষের মত চোখ যার, যার মাথা উঁচু নয়—সে মেলা থেকে কি করে রাজার টুপি কিনবে! সে চেষ্টা করছিল ভেতরের রাগটা দমন করতে। ভেতরের রাগ দমন হলে বাবুলকে পড়তে বলবে। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই সুরমা সতীশকে অভিযোগ করল, তুমি বারণ করে গিয়েছিলে ছেলে-মেয়েকে বাইরে বের হতে। দেখবে কোনদিন ওরা জলে ডুবে মরবে। দুপুরে কোন ফাঁকে বের হয়ে গেছে।

সতীশ এবার দু-হাত উপরে তুলে ছুটে গেল। যেন সে মেরে ফেলবে বাবুলকে। সে বলল, বাবুল তুমি বাইরে গিয়েছিলে, পুকুরে গিয়েছিলে! সতীশের এক ভয়, নিরন্তর এক ভয়। বাবা আজ তাকে মারবে বুঝে বাবুল ছুটে বারান্দায় চলে গেল। সতীশ বারান্দায় গেলে বাবুল ঘরে। ঘর বারান্দা, দুই দরজা দিয়ে সামান্য এক বাবুল সতীশকে ঘর আর বারান্দায় ছুটিয়ে মারছে। বাবা কেমন এক দৈত্য হয়ে গেছে। সে ছুটছিল আর বলছিল, বাবা আর যাব না। তোমার পায়ে পড়ছি বাবা আমি আর যাব না। সে হাউ হাউ করে কাঁদছিল। সতীশ চীৎকার করছিল, বাবুল তুমি ছুটবে না। বাবুল তত বলছিল, তুমি আমাকে মেরো না বাবা, আমি আর যাব না। কিন্তু হায় কে কাকে রক্ষা করে—সতীশ ছুটতে ছুটতে সত্যি অমানুষ হয়ে গেল অথবা এক দৈত্য, সে বাবুলের চুলে ধরে ফেলল, তারপর দু-হাতে উপরে তুলল, দোলাতে থাকল আর আঘাতে আঘাতে ওকে জর্জরিত করল। সুরমা ছুটে এসে ধরে ফেলল, তুমি কি পশু হয়ে গেছ, তুমি কি ছেলেটাকে মেরে ফেলবে?

মিন্টু তখন খাটের নীচে চলে গেছে। কারণ বাবুলের হয়ে গেলেই বাবার মিন্টুর কথা মনে পড়তে পারে।

খেতে বসে সতীশ বলল, ওদের দিলে না?

—তোমার দেরী দেখে ওদের খাইয়ে দিয়েছি।

সতীশ থালায় বড় পুঁটি মাছ ভাজা দেখে বলল, মাছ! কে মাছ দিল! কারণ সতীশের মাছ সপ্তাহে দু দিন, একদিন ডিম এবং রবিবারে মাংস। বাবুলের মাছ না হলে হয় না। কিন্তু সতীশকে বাজেট রক্ষা করতে সপ্তাহে তিন দিন নিরামিষ খেতেই হয়। নিরামিষ খাবার কথা। বড় পুঁটি মাছ দেখে সতীশ তাজ্জব বনে গেল।

সুরমা বলল, তোমার ছেলের কাণ্ড। পুকুর থেকে দারোয়ানদের কেউ বোধ হয় মাছ ধরছিল। ওকে তিনটে মাছ দিয়েছে।

—ওকে দিয়েছে, না, ও চেয়ে এনেছে।

—সে আমি জানি না। মাছ দিয়ে বলল, একটা বাবা খাবে। একটা আমি খাব।

সতীশের গলায় মনে হল ভাত আটকে যাচ্ছে। সুরমা মাছ প্রসঙ্গে এত বলছিল যে সতীশের গলায় ভাত আটকে যাচ্ছে। জানো! সুরমা বড় বড় চোখ করে বলল, বড় মাছটা বাবা খাবে। জানো! সুরমা এবার ডালের বাটি এগিয়ে দেবার সময় বলল, বিকেলে সারাক্ষণ ছুটে এসে দেখে গেছে মাছ ঠিকমত রেখেছি কিনা—না বেড়ালে বাদুড়ে খেয়ে নিল—ওর কি উদ্যম এই মাছের জন্য, কোথায় রেখেছি, কিভাবে রেখেছি—কি উৎসাহ ছেলের—বড় মাছটা ওকে খেতে দিলে খেল না, তোমার জন্য তুলে রেখে দিল—বাবা খাবে।

সতীশের কি যেন কষ্ট ভিতরে। এবার যথার্থই গলায় ভাত আটকে গেল। সে জল খেল ঢক ঢক করে। সে ভাতগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকল। কোথায় যেন এই বর্ষার রাতে একটা ব্যাও ডাকছে। সতীশের ভীষণ কান্না পাচ্ছে। কে এই শিশু, কি তার পরিচয়—সারা সংসার জুড়ে সে যেন কেবল দাপাদাপি করে বেড়ায়। এখন মনে হল সে নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্করভাবে অসহায়। যত অসহায় বোধ করছে তত এই সংসারের সব কিছু অপ্রীতিকর ঠেকছে। সুরমার রুগ্ন মুখ, বাবুলের অসহায় চোখ এবং দাবদাহের মত এই সংসার নিয়ত ওকে ভীত বিহ্বল করে দিচ্ছে। সে ভয়ে খেতে পারল না। বাবুলের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে ওর ভিতরে ভিতরে জলের স্রোতের মত এক কান্না উঠে এল। সে আবেগে কেমন অস্থির হয়ে উঠল এবং যেখানে বাবুল কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওকে বুকে তুলে যেমন অন্যদিন নিজের বিছানায় নিয়ে আসে, বুকে নিয়ে শুয়ে থাকে এবং দু'হাতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তেমন—এখন সেই ভালবাসায় সন্তানের মুখ দেখতে গিয়ে মনে হল, পিঠে বড় বড় দাগ, ফুলে ফেঁপে কেটে গেছে। অন্ধকারে রক্তপাত হচ্ছিল। সতীশ সেই মানুষের মত, হায় এক মানুষ—ক্রীতদাস প্রায় মানুষ, সতীশ পাগলের মত ওর পিঠে মুখে ভালবাসার হাত ছড়িয়ে দিতেই চাপ চাপ রক্ত। সে তার দুই নরকপ্রায় হাত নিয়ে ছুটে গেল, দ্যাখো সুরমা আমি কি করেছি। ক্ষত স্থানে হাত পড়াতেই বাবুল ককিয়ে উঠল। এক অমানুষ, ভিতরে এক অমানুষ কেবল খেলা করে বেড়ায়। সতীশ দু-হাত সুরমার মুখের সামনে ধরে চীৎকার করে উঠল, আমি কি করেছি দ্যাখো।

তারপর বাবুলের পাশে বসে আহত, স্থানগুলোতে নরম নরম চাপ দিয়ে দেখতে পেল টেবিলে নীল আলো জ্বলছে। রাত ক্রমে গভীর হয়ে আসছে। কোথাও আর যেন রাতের কীট পতঙ্গ ডাকছে না। ধরণী শান্ত এবং স্থির। সে দেখতে পেল তখন নীল আলোর ভিতর দুই ছবি। রাম রাবণের ছবি। রামের মাথায় রাজার টুপি, রাবণের মাথায় কাক। নীচে বাবুল ভাল নামে সই করছে—শুভাশিস। রাত ক্রমে আরও গভীর হয়ে আসছে। সতীশের এখন সারাদিনের ঘটনা এক দুই করে মনে হতে থাকল। তেওয়ারীর বউটা বোধ হয় বসে বসে এখনও কাঁদছে। সংসারে কি যে শুভ কি যে অশুভ এ সময় সে কিছুই স্থির করতে পারল না। কেবল দেখল বাইরে বাবুলের রেলগাড়ীটা সাদা জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে। বর্ষাকালের বৃষ্টি—এই আসে এই যায়, এই সাদা জ্যোৎস্না, এই অন্ধকার। বাবুলের রেলগাড়ীতে সে যেন এখন একা বসে আছে। কেউ নেই। সকলে ওকে এক বড় মাঠে ফেলে কোন এক অজ্ঞাত স্টেশনে নেমে গেছে। সে শুধু এনজিনটা নিয়ে মাঠের ভিতর ভূতের মত রেলগাড়ী হয়ে গেছে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠলে সে আর রেলগাড়ী থাকল না। বাবুলের জন্য রাজার টুপি কিনে আনতে হবে, সুতরাং সতীশ ঘরের সব দরজা জানালা খুলে দিল। সে যে ক্রীতদাস এ সংসারে তা আর মনে থাকল না। সে বাবুলকে কাঁধে নিয়ে পাতাবাহারের গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে ভোরের সূর্য দেখতে দেখতে বলল, সামনের দিকটাকে আমরা পুব দিক বলি, ডানদিক দক্ষিণ, পেছনের দিকে সূর্য অস্ত যায় বলে পশ্চিম এবং বাঁদিকে—তুমি যত দূরই চলে যাও না উত্তর দিক হবে। সতীশ ছেলেকে কাঁধে নিয়ে ভোরবেলায় আজ কি ভেবে দিকনির্ণয় শেখাতে থাকল।



সত্যেন্দ্র আচার্য

জন্ম : ১৯৩৪ সালে। ২৪ পরগণার দক্ষিণ রামনগরে। কিন্তু সেই সুদূর কৈশোরেই চলে এসেছেন কলকাতায়। এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগে গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত আছেন।

সাহিত্য রচনার শুরু পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই। জীবনযাত্রায় কিছু বিঘ্নের ফলে মাঝখানে কিছুদিন বিরতি ছিল। ষাট দশক থেকে আবার নব-পর্যায়। কবিতা এবং গল্প দুটো দিকেই তাঁর অনায়াস গতায়াত। খ্যাতি দুটোর জন্যেই। নানান পত্র পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত লেখা দৃষ্টি কেড়েছে বিদগ্ধ মহলেরও।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলতে প্রথমেই 'অন্তরঙ্গ সপ্তর্ষি' নামক কাব্যগ্রন্থটির কথা মনে পড়ে। এছাড়া আছে 'লীলা অভিনব'—এই উপন্যাস। আর ছোটগল্পের সংগ্রহ 'প্রিয়জনোচিত'। এর অনেকগুলি গল্পই পাঠকদের প্রিয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। সপ্রতিভ, হাসি-খুশী এই মানুষটি কারও কারও প্রিয়জন তো বটেই, অনেকেরই প্রিয় লেখক, প্রিয় গল্পকার।

'শ্রেষ্ঠ' শব্দটি আমার কাছে একেক সময় গোলকধাঁধার চাইতেও জটিল বলে মনে হয়। অভিধানের পাতায় লেখা আছে যা, তা ছেড়ে যখন শিল্প-সাহিত্যের সদর দরজায় চলে আসে তখন তার অবয়ব আমার কাছে অন্যরকম। বিশেষ করে, আমার অদ্ভুত লাগে যখন কেউ প্রশ্ন করেন শ্রেষ্ঠ লেখা কোনটি। শিল্প-সাহিত্যে যখন শব্দটিকে একেশ্বর বানিয়ে বিচার চাওয়া হয়, তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে নমস্কার জানাই। কারণ শিল্প-সাহিত্য আর 'বিউটি কান্টেস্ট' এক নয়। ওখানে জাজেরা যত সহজে পটিয়সীকে মর্যাদা দিতে পারেন, শিল্পের ক্ষেত্রে এই রায় অত সহজ নয়। সোজা নয়। শ্রেষ্ঠত্বের নির্বাচন তাই সেখানে অভিধানের অর্থের চাইতেও জটিল। বিশেষ করে আমার কাছে।

সততই সে ক্ষেত্রে আমি পাঠককুলের একজন। দলে মিশে গিয়ে স্বাদ আস্বাদনে অংশ গ্রহণ করি। 'কাণ্ডারী' গল্পের বিষয়, বিবরণ অংশত বাস্তব। কোন এক রাজরক্তের ভাদু উৎসব। প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক বন্ধুর মুখে এই উৎসবের মুখ্য কাহিনী শুনে সারারাত ভীষণ একটা উৎকন্ঠায় কাটে। এবং এই উৎকন্ঠার অবসান ঘটে 'কাণ্ডারী'-র জন্মসূত্রে। জানিনা কেন, সেই থেকে গল্পটি আমার একান্ত প্রিয়। কিন্তু এসব গৌণ হয়ে গিয়ে, সব কিছু মিলেমিশে এমন একটা ব্যাপার হয়ত 'কাণ্ডারী'-তে রূপ নিয়েছে, যার জন্য সমর্থক পাঠককুলেরও বিরুদ্ধাচারণ করতে আমি রাজী নই।

সত্যেন্দ্র আচার্য
৯-৮-৭৮

কাণ্ডারী

বড় নিজীব, ঠিক সাপের খোলসের মত এই অঞ্চলটা গেরুয়ার রঙ গায়ে মেখে চুপচাপ পড়ে আছে। রাঙামাটির বুকের ওপর ছোট্ট ছোট্ট টিলা। টিলার ওপর বন-ঝোপ, সবুজ। কিন্তু হাওয়ায় গেরুয়া ধুলোর পুরু আস্তরণে সবুজ গাছ নক্ষত্রের রঙ নেয়। কিছু বাড়ি চোখে পড়ে। খোলা খাপরির। মাটির দেওয়ালে নানা নকশা আঁকা এবং এসব ছাড়ালে ডুলং নদী। নদীটা যুদ্ধ শেষের ছাউনির মত। শুধু অস্তিত্বে বেঁচে আছে।

নদীর নামে ছোট্ট একটা ইস্টিশান আছে প্রায় চোখ বুজেই। দূরপাল্লার ট্রেন রাঙাধুলো উড়িয়ে চোখ বুজিয়ে চলে যায়। নিতান্ত তাচ্ছিল্যে দিনে রাতে দুবার থামে প্যাসেঞ্জার। এই প্যাসেঞ্জারেই নেমেছিল লোকটা।

সোজা হেঁটে সামনে একটা বাড়ি পেয়ে দাঁড়াল লোকটা। দেখল বাড়িটা। গোবর-মাটির আলপনা দেওয়ালে। দরজার মুখেই বনমহিষের সিং ঝোলান। লোকটা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কাকে চাস বাবুজী?

লোকটা অবাক চোখে চোখ তুলে তাকাল। ভরযৌবনের দেহাতী মেয়েটা চোখ না নামিয়ে নিচু গলায় বলল, রাজবাড়ি? লোকটার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আঙুল তুলল মেয়েটা। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে ইশারায় পথ দেখিয়ে বলল, অইদিকে।

লোকটা তবু হাঁটল না। মেয়েটিকে দেখছিল, অবাক চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, মেলায় যাবি না? একটু হেসে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল মেয়েটা। যাব না কেনে, মেলা যাব, ফুল দিব মাথায়, রাজবাড়ি যাব, মাগন না আমাদের?

ঠিক ভাদু উৎসব এটা নয় কিন্তু ভাদুর আচরণ আর লক্ষণ নিয়ে এই মাগন উৎসবটা চলে আসছে। তখন ভিন গাঁয়ের লোক নামে এই ইস্টিশানে। মেয়ে মরদ লটবহর সঙ্গে নিয়ে। ডুলং-এর রাজবাড়ি সেদিন সাজে। ফুলের সমারোহ। আলোর রোশনাই। খানাপিনা আর মাইফেল। এই গান বাজনার জমাট আসর শেষ হলে শুরু হয় ফুল খেলা। কিছু যুবক-যুবতী ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাজার সামনে অন্তঃপুরে খেলা করে। রাজার একান্ত অনুগতরা রাজাকে তারিফ করে। নেশার পাত্র হাতে তুলে দেয় অনুগতরা। খেলা শেষ হলে দেওয়ানজী হাঁক দেন, বিল্লী, বাওয়া, নয়না—

যাদের ডাক পড়ল তারা ভাগ্যবতী। দেওয়ানজী হাঁকে, অন্যরা চলে যাও। রুক্ষ গলায় তারপর বলে, বিদায় নিস দারোনজীর হাত থেকে। এক লোটা, এক রুপিয়া। যা—

এত গর্বের ভেতর তবু চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে বিল্লী, বাওয়া, নয়না। রাজার একান্ত অনুগতদের দিকে তাকিয়ে কস্তুরীর জলে ভেজানো পান তুলে মুখে পুরে দেন দেওয়ানজী। চিবোতে চিবোতে উচ্চারণ করেন যা, বাবুদের ঘরে যা। সুপরির একটা অংশ কটাং করে শব্দ তুলে ভেঙে ফেলে দাঁতের ওপর। বলে, সারা রাত্তির সেবা দিবি, না চাইলে যেচে দিবি, মাঝের পায়ের কাদা নিবি, যা।

আলোর ভেতর দাঁড়িয়ে কালো কালো দাঁতে শব্দ না তুলে হাসে ওরা। নয়নাও

হাসে। সেই সকালের দেখা লোকটার দিকে চোখ তুলে তাকায়। তাকিয়ে বলে, ধরম লিবি, শরম লিবি আর লিবি কি, মাগন বিবির সঙ্গ আছে, রাজার আছে কী?

রাজা তখন বেহুঁশ। সত্যিই রাজার আজ কিছুই নেই। নিতান্ত উৎসব, তাই আসে, নইলে কলকাতায়। যুবরাজ এখনো যুবক নয়। আসেও না।

লোকটা রাজাকে কতদিন বলেছে, এই উৎসবের কোন মানে নেই রাজা। তুলে দিলে হয় না?

রক্তে, আভিজাত্যে বাধে রাজার। বলে, পূর্ব পুরুষের রক্ত আমার গায়ে। মাগন প্রথা তোলা কি যায়?

যায়।

না। রাজা গর্জায়। দম্ভভরে পায়চারি করেন মেঝের ওপর। বলেন, প্রথাকে বাতিল করে দেব, এত বড় স্পর্ধা আমার নেই। তুমি কাফের।

লোকটা হাসে। তবুও একান্ত অনিচ্ছায় এই প্রথম এসেছিল উৎসবে। সকালের প্যাসেঞ্জারে নেমেছিল, গা-গতর ক্লান্ত। সূর্য সবে উঠেছিল। স্টেশনের অনেক আগে থেকেই সবুজের সমারোহ শেষ। প্রান্তর ধূ ধূ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট অই বনঝোপ। রুক্ষ মাটির বুকে অনেক সন্তর্পণে যেন দাঁড়িয়ে হাওয়া দিচ্ছিল। লোকটা ট্রেন থেকে নেমে হকচকিয়ে চারিদিক দেখছিল। হাওয়ায় এখনো শীতের রেশ স্পষ্ট নয়। পাখির ডাক কানে এল না। উড়ন্ত পাখির ঝাঁক চোখে পড়ল না লোকটার। কিন্তু সামনেই অই বাড়িটা পেয়ে গেল। দাঁড়াল। আর দাঁড়াতেই অই চোখাচোখি। মেয়েরা বলেছিল, রাজবাড়ি?

সে। এখন লোকটা চোখ নামিয়ে নিতে আবার হাসল মেয়েটা। চ।

বিল্লী কিন্তু বেঁকে বসে। উঁহু। তবু হাত ধরে টানে তবলচি। চ—

ক্যানে? হাসিতে গড়িয়ে পড়ে বিল্লী। ধরম দিব, শরম দিব। দাম বাড়ায়।

দেওয়ানজী গর্জায়। বিল্লী উত্তুঙ্গ বুকের ওপর লাল পাড় শাড়ি আরো শক্ত করে জড়ায়। পিঠের দিকে ঝুঁকে পড়া ঝুলন্ত আঁচলটা কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে জোর করে বাঁধে। তারপর বলে, আচ্ছা, চ—

লোকটাও পিছু পিছু এল নয়নার। একটা ঘরে এসে বলল, তুই নতুন গো বাবু। আমি কিন্তু পুরনো এ বাড়িতে। তারপর হাসল ভঙ্গি করে। হেসে বলল, বাড়ি আমার কাছে পুরনো হলে হবে কি, আমি কিন্তু আনকোরা।

তবু লোকটা কথা বলছিল না। সারাদিন ঘুরেছে বাড়িটা। অঞ্চলটা। মেলা দেখেছে। রাজপ্রাসাদ। সারা সন্ধ্যা নদীর চরে বসেছিল লোকটা। বসে বসে দেখেছে সন্ধ্যা নামল। অস্পষ্ট হল আকাশ। রাঙা ধুলোর চত্বর অন্ধকারে একাকার হয়ে গেল। মেলা ভাঙলো। উড়ো পাখির ঝাঁক, নদীর বাঁক পার হয়ে, রাজপ্রাসাদ পার হয়ে উড়ে কোথায় চলে গেল।

নয়না বলল, কি ভাবিস? খাটিয়ার এক কোণে বসে পড়ে বলল, বসে নে ত নে। মাঝ আকাশে তারা চলে পড়লে আমি কিন্তু ঘুমোবো।

লোকটা কোন আগ্রহ না দেখিয়ে তেমনি চিৎ হয়ে শুয়ে থেকেই বলল, নয়না এ বাড়িতে আর কে আছে রে।

বাব্বা! নয়না জিবের ওপর শব্দ তুলল একটা। সব কিছু তোকে জানতে হবে। তারপর পা নাচাতে নাচাতে বলল, তুই কেমনধারা মরদ গো? নয়না এবার পায়ে হাত রেখে বলল, আচ্ছা, কামে কাটে না তোরে? তারপর হাসিতে ঢলে পড়ে হেঁট হয়ে বুকটা ছোঁয়াল পায়ে। তবে আমি ঘুমোই।

নয়না খাটিয়া থেকে নেমে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে কাপড়টা খুলে ফেলল। ছোট সায়াটা কোমর কামড়ে ধরে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুলছে। পা দিয়ে অন্ধকারেই মেঝের ওপর বিছিয়ে নিল কাপড়টা। কুঁকড়ে ধনুক হয়ে শুয়ে আঙুলের সাঁড়াশি দিয়ে বারবার পা পর্যন্ত কাপড়টা টানবার চেষ্টা করল নয়না।

নয়না। লোকটা এবার ডাকল, নয়না মেঝের ওপর শুয়ে পড়লে?

নয়না উঠল না। বলল, কি বলিস।

পাপ বুঝিস, পাপ?

নারে। নয়না জবাব দিল। বুঝিনে।

পুণ্য?

পুণ্যি? নয়না এবার আড় হয়ে শুয়ে উত্তর দিল, বুঝি না ক্যানে?

লোকটা আর কিছু বলল না। এক সময় অনুভব করল নয়না ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে বুকের ওঠানামা লক্ষ্য করা যায় না কিন্তু অনুভবে বুঝল নয়না জেগে নেই। সমস্ত রাজবাড়িটা এখন নিঝুম। উৎসবের আমেজ বুকে নিয়ে গোটা বাড়িটা নিঝুম হয়ে আছে। পাথর হয়ে গেছে।

বাইরে এল লোকটা। ওপরে অজস্র নক্ষত্র। প্রেতের মত এ-ঘর থেকে ও-ঘর ঘুরে বেড়াল লোকটা। শেষ রাতের এই হাওয়ায় শীত। শিশির জমেছে রুক্ষ মাঠে। মাটি ভিজেছে। দূরে কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু রাজার ঘরে বাতি জ্বলছে।

বেশ বেলা করেই ঘুম ভাঙলো নয়নার। আলো এসেছিল ঘরে। হাই তুলল। পাশ ফিরল। ফিরেই চোখে পড়ল খাটিয়াটা। লোকটা নেই।

আস্তে আস্তে প্রাণের সাড়া অনুভব করল ঘুমন্ত এই প্রেতপুরীতে। অবাক চোখে হকচকিয়ে তাকাল চারিদিক। তারপর শাড়িটা পরে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। এ বাড়ির প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়নার চেনা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকাল। কয়েদখানা। জীর্ণ দরজা হাঁ হয়ে আছে। উত্তরে চিড়িয়াখানা ছিল আগে। এখানে দাঁড়িয়ে জন্তুদের নিঃশ্বাস এবং গর্জন অনুভব করতেন পূর্ব পুরুষরা। আজ কিছু নেই।

নয়না কয়েক সিড়ি নেমে আবার দাঁড়াল। তারপর একেবারে উঠোনে নেমে এল। না কোথাও নেই লোকটা। ওদিকে ঘুরে নয়না এসে দাঁড়াল মন্দিরের চাতালে। না বন্ধ দরজা।

চাতালে বসল নয়না। রাজবাড়ির সামনে অই ভগ্ন নহবতখানা থেকে একটু দূরে বিস্তৃত খোয়াই। খোয়াই যেখানে শেষ, সেই শেষ চিহ্নের ওপর পাহাড়ের রেখা। পাহাড় নয়। টিলা। লোকটা রাত্তিরে অই দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আচ্ছা, এই ফুল-খেলা উঠে গেলে তোমরা খুশী হও না?

না। অতশত বোঝেনি নয়না। উত্তর দিয়েছিল।

কেন? লোকটা বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার প্রশ্ন করেছিল।

অতশত না বুঝেই নয়না উত্তর দিয়েছিল, তোর সহ্য হয় না?

না।

না ক্যানে? নয়নার ঘুম পাচ্ছিল। ঘন ঘন হাই তুলছিল। মশা তাড়াচ্ছিল অন্ধকারে চাপড় মেরে মেরে।

ওমনি করে বেঁচে আছিস বলে?

বলে কি লোকটা? নয়না প্রথমে হাসতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। তারপর কি একটু ভেবে নিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ে বলেছিল, জিন্দারে জিন্দা। লোকটার হাতটা টেনে

নিয়ে বুকের ওপর ছুঁইয়ে বলেছিল, দ্যাখ না বেঁচে নেই? কলজের ভেতর পরাণটা তোর সঙ্গে বসবার জন্যে হাহুতাশ করছে না?

লোকটা হাত সরিয়ে নিয়েছিল। নয়না দস্তুরে খাটিয়ার ওপর থেকে উঠে এসে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে সায়াটা খুলে ফেলেছিল। শুয়ে পড়ে বলেছিল, তবে আমার ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোই।

নয়না এই মন্দিরের চাতালের ওপর এখন বেশ আরাম করে বসল। বসে বসে ভাবল এই নিয়ম, এই প্রথা। কবে এ নিয়ম চালু হয়েছিল, নয়না অতশত বোঝে না। জানে না। শুধু রূপকথার গল্পের মত জানে সে, দশ পুরুষ আগে রাজার মেয়ে অকালে মারা গেলে তাকে স্মরণ করেই এই উৎসব। নয়নার মা-ও নয়নার মত কাঁচা ছিল একদিন। নয়নার মত ফুল খেলত। তিনদিন আগে থেকে মহড়া দিত তখন রমণীরা। বারটি মেয়ে ছ'জোড়া পুরুষ-রমণীতে বিভক্ত হয়ে নকল খেলা খেলত। ফুল ছুঁড়ে মারত। অভিনয়ের পুরুষ মেয়েটা প্রকাশ্যে চুম্বন করত। খেলতে খেলতে এক সময় হাত ধরে বিবস্ত্র করে দিত।

একদিন ফুল খেলার শেষে এক মরদ দেওয়ানজী নয়নার মাকে বলেছিল, চল চলে যাই।

কোথায়?

রাজার এই পুরী থেকে দূরে। অন্য কোথাও।

নয়নার মা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল।

কোথায়? দেওয়ানজী কমলির কথাটাকে উচ্চারণ করেছিল। করে বলেছিল, অনেক দূরে। অই পাহাড় পেরিয়ে। দুজনে থাকব। ঘর বাঁধব।

কেন এখানে থাকলে?

কঠোর হয় দেওয়ানজী। আমার চোখের ওপর তুই ফুল খেলবি আমি দেখব?

ছিঃ ছিঃ বলিস না। দেওয়ানজীর মুখে কমলি হাত চাপা দিয়েছিল। উৎসব না আমাদের। মাগনঠাকরুণ সগ্‌গে বসে রাগ করবে।—এ গল্প কমলি বৃদ্ধ বয়েসে কতবার শুনিয়েছে নয়নাকে।

এসব ভাবনার ভেতর নয়নার এখন মনে হল লোকটা তবে গেল কোথায়? নয়না পড়শীদের জিজ্ঞেস করলে কেউ বলল, এই ত ছিল। কেউ বলল, নহবত ঘরে একটু আগেও বাঁশী শুনছিল। দূরের খোয়াই-এ কারো ছায়া নেই। না, পাহাড়ের দিকে কেউ হেঁটে যাচ্ছে না। তবে গেল কোথায়? নয়না শুধু এই একটা প্রশ্ন নিয়েই ঘরবার করল।

অথচ লোকটা একদিন এল। এই রাজবাড়ি দেখতে। এই রাজবাড়ির বয়েস তখন আরো পঁচিশ বছর বেড়ে গেছে। উৎসব বেঁচে আছে। প্রথাও বেঁচে আছে। লোকটা নিজের বয়েস হিসেব করে দেখল, এখন সে পঞ্চাশের কাছাকাছি। রাজা মারা গেছে। যুবরাজ ফুল খেলে এখন। নিজেই অবাক হল, প্রায় পঁচিশ বছর আগে এ বাড়িতে একবার এসেছিল সে।

এখন লোকটার মাথায় জটা। একটা ঝোলা কাঁধে, হাতে লাঠি নেই। একটা চন্দনা পাখি কাঁধের ওপর বিনা শিকলিতে বসে। লোকটা রাজবাড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে বাড়িটা নিরীক্ষণ করল। বাড়িটা আরো জীর্ণ। আরো যেন কংকালসার। তারপর ঝোলা থেকে সিঙা বার করে তিনবার ফুঁকল। সকলে ঘিরে দাঁড়াতে লোকটা বলল, আমি দেবতা নই, মানুষ। আমি সন্ন্যাসী নই, রাজার আত্মীয় নই, তোদের একজন।

এই অদ্ভুতবেশী লোকটাকে দেখতে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল সকলে। পরনে ময়লা হাঁটু-ছুঁই ধুতি। গায়ে একটা হাত দুই চাদর। অথচ কী সুঠাম চেহারা। ঋজু, গৌরকান্তি এই লোকটার পায়ে হাত দিয়ে কেউ কেউ প্রণাম করছিল। কেউ দূরে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে হাতজোড় করছিল।

লোকটা আপত্তি করছিল। না না, পায়ে হাত দিতে নেই। মাথা নোয়াবে কেন? লোকটা মৃদু মৃদু হাসছিল। মেরুদণ্ড সোজা রাখ।

লোকটাকে হকচকিয়ে দেখল লোকে। কথা শুনছিল আর অবাক হচ্ছিল। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ, আত্মশক্তিকে দৃঢ় কর। কুসংস্কার যম, কুপ্রবৃত্তি রাবণের গদা। তারপর এক সময় বলল, কাল তোদের উৎসব না? মাগন না?

বিগ্রহের ভাঙা দেউলে বসান হল লোকটাকে। দুধ দিয়ে পা ধুইয়ে দেওয়া হল। হবিষ্যান্নের সমস্ত যোগাড় করে সিধে পাঠিয়ে দিলেন যুবতী রানী নিজে।

লোকটার মুখে কিন্তু অই একই কথা। না না আমি কোন দেবতা নই, মানুষ। দেবতা যা পারে না, দ্যাখ মানুষ তা পারে। লোকটা কাঁচা চাল মুঠো মুঠো করে খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করল। দেখছিস ত কোন অলৌকিক ক্ষমতা আমার নেই। শুধু ইচ্ছা শক্তি। আত্মশক্তি। যে শক্তিতে মানুষ অলৌকিক হয়।

মৃদু হাসতে হাসতে চন্দনা পাখিটার চোখে এক একবার তাকাচ্ছিল। দ্যাখ আমি ব্যবসায় জানি না। যাগযজ্ঞ আমি শিখিনি। তাই ভক্ত আমার জোটেনি। আমি একা। তাই আমার কথা কেউ শোনে না। সমবেত কণ্ঠে না বললে এতবড় অট্টালিকে পার হয়ে রাজার কানে সব কথা যাবে রে?

তত লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা আসছিল সকলের। দেবতা ভাবছিল। সন্ধ্যা নামছিল। ভাঙা দেউলের বাইরে ও আশ্রয় নিল। ঝোলা গোছাল। চন্দনা পাখি রাখল। রেখে বলল, দ্যাখ না, পাখিটা আমায় কত ভালবাসে?

লোকে দেখছিল।

কোন শিকলি আছে পায়ে? বাঁধা আছে?

সকলে তাকালে লোকটা বলল, উত্তর ত সোজা রে, দুই আর দুই-এ চারের মতন। আমিও বাসি বলে?

আবার মৃদু মৃদু হাসল লোকটা। হেসে বলল, এ বাসা ভয়ের নয়, ভক্তিরও নয়। ভালবাসার জন্য ভালবাসা। বাস না বোকা।

অবাক চোখে শুনছিল। দেখছিল লোকটাকে।

দেখবি সব কেমন জাদু হয়ে যাচ্ছে। দেবতাকে ভালবাসি ভয় করি বলে, বুঝিস না?

যত শুনছিল, লোকগুলো তত অবাক হচ্ছিল।

তারপর বেশ জোরে একটু কেশে নিয়ে বলল, তোরা প্রথাকে ভালবাসিস, রাজাকে কি ভগবানকে ভয় করিস বলে। আবার হাসল মৃদু। বলল, নিজেকে ভালবাস, শ্রদ্ধা কর, দেখবি কুসংস্কার, কু-প্রথা কোথায় সব হারিয়ে গেছে। না না, এবার তোরা আমায় ঘুমোতে দে। যা যা——

সকাল হতেই বেরিয়ে গেল লোকটা। রাঙা ধুলোর ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কখনো হাঁটল। কখনো দাঁড়াল। উদাস তাকাল ধূ ধূ প্রান্তরে। তারপর এক সময় ঘোড়া ঘরের সামনে এসে হকচকিয়ে গেল।

একটা দেহ শুয়ে আছে। সারা দেহ বসন্তে ভর্তি। লোকটা বুঝল গুটি বসন্ত। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কখনো কখনো, উঠে বসতে চাইছে। সারা দেহটা টেনে টেনে

একটু তুলছে, আবার নেশাগ্রস্তের মত ঢলে পড়ছে। লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে ডাকল, নয়না?

কে? ঘোলাটে চোখে নয়না তাকাবার চেষ্টা করল, করে বলল, একটু জল খাব।

লোকটা জল আনল। জল দেবার আগে কপালে হাত রেখে বলল, আমি।

প্রায় প্রৌঢ়ত্বে এসেছে নয়না। জীর্ণ দেহ। মাথার চুল কিছু পেকেছে। মুখে চোখে বয়েসের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট। মাথায় হাত রেখে লোকটা বলল, চিনতে পার?

মাথা নাড়িয়ে নয়না বলল, না।

কষ্ট হচ্ছে?

নয়না চুপ। চোখ বুজে অনেকক্ষণ পড়ে থেকে বলল, না।

জল খাও। লোকটা অনেক সন্তর্পণে গালে জল ঢেলে দিল। আড়ষ্ট জিব, জল গিলতে কষ্ট হচ্ছিল নয়নার। একটা চাটাই-এর ওপর নয়না শুয়ে আছে। সারা অঙ্গ গুটিতে ছেয়ে। কিছু ফেটেছে। রস গড়িয়ে পড়ছে।

নিজের বসনের খানিকটা ছিঁড়ে রস মোছাল লোকটা। মাছি তাড়াল। আলতো দেহটা তুলে ধরে ছেঁড়া টেনা খানিকটা পেতে দিয়ে বলল, শোও। আমি আসছি।

লম্বা লম্বা পা ফেলে আবার ঘুরল লোকটা। শুকনো গাছ-গাছালির ডাল ভাঙল। কাঠ সংগ্রহ করল। শক্তিমান পুরুষের মত নিজের মাথায় করে বয়ে এনে দেহটার অনতিদূরে আগুন জ্বালাল।

নয়নার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লে লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস তুলল। তুলে বলল, ছিঃ, কেঁদ না। আগুনের তাপ স্তিমিত হয়ে গেলে শুকনো পাতা ছুঁড়ে দিল। একটা কাঠ সেই আগুনের ভেতর গুজে দিল। তুমি ভাল হয়ে যাবে।

লোকটা দেবতা। সারা গ্রাম রটে গেল। কেউ অই বয়েসে নিমগাছের মগ ডালে উঠতে দেখেছে বলল। কেউ বলল, মাথায় রাশীকৃত কাঠ নিয়ে নদী পার হয়ে এল, পায়ে এতটুকু জলের দাগ পর্যন্ত লাগল না। কেউ বলল, বান মেরে পোকা মারছে ঝুড়ি ঝুড়ি। শুধু আগের চেয়ে একটু সুস্থ হয়ে নয়না বলল, তুমি কে, আমি কিন্তু এখনো চিনতে পারিনি।

তুমি নয়না। আমি কিন্তু চিনেছি।

তুমি দেবতা। যেন নেশার ঘোরে অইটুকু বলে নয়না পাশ ফেরবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

আমি মানুষ। লোকটা আবার মাথায় হাত রাখল। তুমি ঘুমোও। নিমের কচি-পাতা সারা দেহে বুলিয়ে বুলিয়ে স্বস্তির পরশ দিল। নয়না ঘুমিয়ে পড়ল।

দিন গড়িয়ে এখন বিকেল। শুকনো চাল, ফলমুল খাওয়াল চন্দনাকে। তারপর পাখিটাকে পাশে নিয়ে বসে ভাবল লোকটা—

এই সুদীর্ঘ দিন ঘরছাড়া। গোটা পঁচিশ বছর ধরে সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছে। দেখেছে অনেক। অনেক অভিজ্ঞতা জড়ো হয়েছে এই পঞ্চাশ বছরের জীবনটাতে। দেখেছে বেগার প্রথা। খেতখামারের দায়িত্ব নিয়ে যে লোকটা অন্ন সংগ্রহ করে সংসারের, সে প্রভু সেবা করে মাসে অন্তত একদিন। প্রভু অতিথি হন রাত্তিরে। যুবতী স্ত্রী অথবা কন্যা তাঁকে সেবা করেন দেহ দিয়ে।

এই লোকটা রুখে দাঁড়িয়েছিল। বুঝিয়েছিল, এ পাপ, এ অন্যায়। প্রহার দিয়ে প্রভুর ভৃত্যই গ্রামছাড়া করে দিল।

দেখেছে নর্মদা ঝরনায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা। স্বর্গ লাভের বাসনায়।

রুখে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। স্বর্গ নেই। এই বোধ অন্ধত্ব। এই অজ্ঞতা অক্ষম পিচুটির মত। রাতের অন্ধকারে এই বাসনার মৃত্যু তবু কমেনি।

দেখেছে সতীদাহ নিম্ন এক শ্রেণীর জাতের ভেতর। মা-এর পুণ্যকামী দেহাত যুবক সহায় সম্বলহীন অশীতিপর বৃদ্ধাকে টাকা দিয়ে কেনে। তারপর মা-এর বেনা-মীতে পিতার শ্মশান চুল্লীতে এখনো বেঁধে পুড়িয়ে মারে। লোকটা রুখে দাঁড়িয়েছিল। পুড়িয়ে মারবে বলে ধরতে গিয়ে লোকটাকে খুঁজে পায়নি।

প্রথা সর্বস্ব এই সংস্কার পাপ। মুক্তি চাই। আত্মার মুক্তি। বিবেকের বিকাশ চাই। ইচ্ছা শক্তিকে প্রবলতর কর। কেউ শুনল, কেউ শুনল না। কেউ বলল, পাগল। কেউ কেউ গুন গুন করল লোকটা দেবতা।

এই ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল, কারণ লোকটা এখন দেখল। নয়নার গলা দিয়ে কেমন একটা ঘড় ঘড় শব্দ উঠছে।

লোকটা তাকাল দূরে। সন্ধ্যা অনেক আগেই নেমেছিল। ঠাণ্ডা থেকে আগলহীন ঘরের ভেতর কোলে করে নিয়ে গেল অচৈতন্য নয়নাকে। ঘরের ভেতর থেকে বাইরে তাকাল লোকটা। দূরের মাঠ পার হয়ে টিলা। তার ওপর চাঁদের রেণুকণা ছড়িয়ে পড়েছে। রাজবাড়ি মুখর হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। ধূপের গন্ধ, আতরের মাতাল সুবাস মিলেমিশে একাকার। বাতাসে জড়িয়ে আছে। লোকটা ভাবল, হয়ত এ-মুহূর্তে রাজার অনুগতদের হাতে ফুল। রাজগৃহের প্রমোহ উৎসবে যুবতীরা ব্যস্ত। মাগন উৎসব আরম্ভ হবে যুবরাজ বাজুবন্ধ পরে উৎসবে এসে দাঁড়ালেই।

শুকনো চাল, জল আর কলা চিবিয়ে চিবিয়ে লোকটা রাতের আহার অনেক আগেই শেষ করেছিল। উঠে গিয়ে পাখিটাকে ঝোলার ভেতর সযত্নে শুইয়ে রেখে নয়নার পাশে এসে বসল।

দেখতে দেখতে রাতের আঁধার সব কিছু গ্রাস করে নিল। চাঁদ ডুবে গেল। নক্ষত্রের আলো আরো যেন মরে এল। লোকটা এখন বাইরে আকাশে তাকিয়ে বুঝল, মাঝরাত পার হয়ে গেছে। আগলহীন দরজার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝল, একটা ছায়া যেন এদিকে আসছে।

কে? লোকটা উঠে বসল। শেষ বাতিটা জ্বলতে জ্বলতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। বাইরে কাঠের আগুন প্রায় নিবু নিবু। তবু যেটুকু জ্বলছিল তার অস্পষ্ট আলোয় কোন রমণীর ছায়া বলে মনে হল।

ভূত প্রেত কোনদিন বিশ্বাস করেনি লোকটা। বাইরে এসে দাঁড়াল। ছায়া এগিয়ে আসছে।

ছায়াটা এল। সর্বাঙ্গ চাদরে মোড়া। এই প্রথম ভয় পেল লোকটা। গলা ছেড়ে চিৎকার করতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর ভাঙা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে অস্পষ্ট উচ্চারণ করল, কে, কে তুমি?

কোন উত্তর নেই।

কে? প্রায় চিৎকার করে উচ্চারণ করল লোকটা।

চাদর খুলে এবার সামনে দাঁড়াল ছায়াটা। অস্পষ্ট আলোয় যতটুকু প্রত্যক্ষ করা চলে, সেই আলোয় দেখল লোকটা, ছায়া নয়, একজন রমণী। রমণী প্রণাম করল লোকটাকে।

কে তুমি? এবারে অনেকখানি সাহস আনল গলায় লোকটা।

তবু কথা নেই। আরো কাছে সরে এল লোকটা। রমণী এবার বুঝল লোকটা তাকে দেখছে। নিরীক্ষণ করছে। শুধু বলল, আপনি দেবতা, তাই এলাম।

না না আমি মানুষ। ঠিক বিনয় নয়, যথাসম্ভব কর্কশ উচ্চারণ করল। আপাদ-মস্তক আবছা অন্ধকারে প্রত্যক্ষ করে বলল, আমি মহাপুরুষ নই, কেন বিশ্বাস করে না লোকে?

আমি অসহায়। রমণী স্থির দাঁড়াল লোকটার সামনে। বলল, আপনি জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারেন আমি শুনেছি। আপনি হাত বাড়ালে গাছের ডাল নুয়ে আসে। আমাকে বাঁচান।

বল। লোকটা এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আমি রাজার বংশধর চাই। একটু থেমে মাথা নিচু করে বলল, রাজা অক্ষম, অথচ আমার সন্তান না হলে এই প্রথা উঠে যাবে। উৎসব উঠে যাবে। এই পাপের দায়ভাগ নিয়ে প্রজাদের কাছে কী করে আমি মাথা তুলে দাঁড়াব?

সব নিঝুম। সমস্ত পৃথিবীটা যেন এই রাজপুরীকে কোলে নিয়ে আশ্চর্য একটা ঘুমে চলে আছে। এই প্রথম পাশে কোথাও কামিনী গাছে ফুল ফুটেছে বলে মনে হল লোকটার। সুন্দর গন্ধ অনুভব করে বুঝল রমণী যুবতী। পূর্ণ যৌবনবতী। রমণী এখন আরো কাছে এল। মুখাবয়ব ভাল করে চোখে পড়ছে না। তবু আশ্চর্য সুন্দরী বলে মনে হয় লোকটার।

আপনি মুখ তুলে চান ঠাকুর। চাদরের এক কোণের গিট খুলে রমণী এবার দেখল বাইরেটা। তারপর বলল, এই নিন পুষ্প, আমাকে ছুঁড়ে মারুন। আমাকে গ্রহণ করুন।

লোকটা তবু কোন আগ্রহ দেখাল না।

আপনার সেবার জন্য এই রাত্তিরে এই বিরাট সমুদ্দুর পার হয়ে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

দিনের আলোয় কামিনীর ঝোপ কি ফুল, অত চোখে পড়েনি লোকটার। এখন বুঝল ফুলে ফুলে ভতি গাছগুলো। এতক্ষণ কোন পাখির ডাক লক্ষ্য করেনি লোকটা। এখন বুঝল, এই রাতে কোন না-ঘুমের পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছে। ডাকছে। তারায় তাকাল লোকটা। জ্বল জ্বল করে তারাগুলো জ্বলছে। অস্পষ্ট আলোয় সব কিছু কেমন সুন্দর বলে মনে হল লোকটার। রমণী এবার মধুর গলায় বলল, উৎসবকে বাঁচান ঠাকুর। আপনি দেবতা। মাগনকে বাঁচান।

এতক্ষণ স্থির দাঁড়িয়েছিল লোকটা। কেমন চঞ্চল হল এখন। বার বার শরীরে তাকাল। মুখাবয়ব লক্ষ্য করতে চাইল। রমণী এবার স্পষ্ট গলায় বলল, তুমি তো দেবতা, এতটুকু করুণা নেই?

না না আমি মানুষ। লোকটা বাধা দিল।

তবে দয়া নেই কেন শরীরে? এবারে কঠোর হল রমণী।

লালসা, লালসা, এই প্রথম একটা কেমন লালসা অনুভব করল মানুষটা। তারপর ত্রস্ত পায়ে ভেতরে ঢুকে গেল। লজ্জায়, অভিমানে রমণী আর দাঁড়াল না।

ত্রস্ত পায়ে ভেতরে ঢুকে বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল। নয়নার মৃতদেহটা একটানে দেওয়ালের দিকে সরিয়ে দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভাঙা গলায় ডাকল, কই এস।

কেউ এল না।



প্রফুল্ল রায়

জন্ম : ১৯৩৪। জন্মেছেন পূর্ববঙ্গের ঢাকায়। সম্পূর্ণ ছেলেবেলাই কেটেছে পূববাংলায়।

পূর্ববাংলার মানুষ এবং প্রকৃতিকে টুকরো টুকরো ভাবে ধরে রেখেছেন তার প্রথম দিককার লেখায়। এইসব লেখার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'কেয়াপাতার নৌকো' বাঙলা দেশের বাইরের বিভিন্ন পরিবেশ এবং মানুষকে চিত্রিত করেছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখাগুলিতে। এর মধ্যে 'পূর্ব পার্বতী' এবং 'নোনাজল মিঠে মাটি' উল্লেখযোগ্য। অনেকে বলেন প্রফুল্ল রায় বাংলা সাহিত্যের ভূগোল বাড়িয়েছেন।

ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত জীবনের নানা সমস্যা ও ছবি নিয়ে তৃতীয় পর্যায়ের লেখাগুলি পুরোপুরি কলকাতা-কেন্দ্রিক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চারদিকে যুদ্ধ' এবং 'আলোয় ফেরা'।

তাঁর লেখায় একদিকে যেমন রয়েছে উষ্ণ হৃদয়ধর্মিতা, আর একদিকে নির্মোহ বিশ্লেষণ। অজস্র মানুষের ভালোবাসার পুরস্কারে পুরস্কৃত এই লেখক।

আমার জন্ম পূর্ববাংলায়। তখনও দেশভাগ হয়নি। পূর্ববাংলার প্রবহমান নদীর রূপালীধারা তার পাখ-পাখালি, বৃক্ষলতা, তার আদিগন্ত নীলাকাশ, সীমাহীন শ্যামল প্রান্তর—সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সেই ভূখণ্ডটি সেদিন এক আশ্চর্য মায়াবী জগৎ। এই রমণীয় নিসর্গে সেদিন যারা বাস করত প্রকৃতিলালিত সেইসব মানুষের প্রাণশক্তি ছিল অফুরন্ত। পৃথিবীর সমবয়সী প্রকৃতির যাবতীয় গুণাবলীর আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছিল তাদের মধ্যে। তাদের জৈব কামনা, আদিম লালসা, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা থেকে শুরু করে মহত্ত্ব বা উদারতা, সবকিছুর মধ্যেই ছিল প্রকৃতির মত বিশালতা। নিসর্গের এই রমণীয় স্বর্গে একদিন নেমে এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের পিছু পিছু এল দুর্ভিক্ষ এবং দেশভাগ। পর পর এতগুলি আঘাত বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে দিল।

আবহমান-কাল এই পূর্ববাংলায় হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায় ছিল পরস্পরের কাছাকাছি। কিন্তু উনিশ শ সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট রাজনীতি গোটা বাংলাদেশকে ভাগ করে পূর্ববাংলায় মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি 'হোমল্যাণ্ড' তৈরী করল। তখন প্রাথমিক উত্তেজনায় সাধারণ গরীব মুসলমানদের ধারণা হয়েছিল এবার তাদের সব দুঃখের অবসান ঘটল। অনাহার, দারিদ্র্য, হতাশা—এসব আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু সত্যিই কি তাদের সব দুঃখ ঘুচে গেছে? 'রাজা যায় রাজা আসে' গল্পটির মধ্যে আমি এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চেয়েছি। এই গল্পের নায়ক রাজেক অখণ্ড বাংলাদেশে ছিল একজন ভূমিহীন কৃষাণ। দেশভাগের পর হিন্দুরা যখন সাত-পুরুষের ভিটেমাটি, ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে সীমান্তের এপারে চলে এল তখন রাজেকের আশা হয়েছিল হিন্দুদের ফেলে-আসা জমি-জমার একটা অংশ সে-ও পাবে। মাঠে মাঠে শস্যকণা কুড়োনো বা খাল-বিল-নদীতে মাছ ধরা ইত্যাদি উঞ্ছবৃত্তি করে আর জীবন কাটাতে হবে না। নিরাপত্তা এবং সুখের মুখ সে এবার থেকে দেখতে পাবেই। কিন্তু পাকিস্তান হবার কিছুদিন বাদেই রাজেকের মোহভঙ্গ ঘটল। একদিন অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে সে আবিষ্কার করল একদা অখণ্ড বাংলাদেশে যে ভূমিহীন কৃষাণ সে ছিল পাকিস্তানেও সে ঠিক তা-ই আছে। সে আবিষ্কার করল, রাজনীতির চতুর চালে দেশের এক রাজা হয়ত যায়, তার জায়গায় নতুন রাজা আসে, কিন্তু সমাজের নীচের তলার সাধারণ মানুষ যেখানে থাকে চিরকাল সেখানেই থেকে যায়। চিরাচরিত রাজা বা শাসক বদল ঘটলেই যে অর্থনীতিক এবং সামাজিক কাঠামো সহজে বদলায় না, একটি গরীব ভূমিহীন কৃষাণের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এই সরল সত্য এই গল্পে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি। আমার অধিকাংশ গল্প এবং উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। সেদিক থেকে এ গল্পটি আমার খুবই প্রিয়।

প্রফুল্ল রায়
৩১-৭-৭৮

রাজা যায় রাজা আসে

ভোরবেলা পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে পা নাচাচ্ছিল রাজেক। পরনে সবুজ জমির ওপর হলুদ হলুদ রেখ্‌কাটা লুঙ্গি আর জালি গেঞ্জি। এই সাতসকালেই চুলে কাকুই পড়েছে; মাথায় পেখম তুলে টেরি কেটে নিয়েছে সে। তার বুকে এখন সুখের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আজই শুধু? ক'মাস ধরেই সুখের নদীতে বান ডেকে আছে তার।

পুবের ঘর বাদ দিলে উত্তর এবং পশ্চিমের ভিটের বড় বড় পঁচিশের বন্দের দু'খানা ঘর। সেগুলোর মাথায় ঢেউটিনের নক্সা-করা চাল; গায়ে শালকাঠের খিলান-দেওয়া দেয়াল, বিলিতী মাটির পাকা মেজে।

রাজেক যেখানে বসে আছে, তার তলা থেকে ঢালা উঠোন। উঠোনটার একধারে সারি সারি ধানের ডোল, আরেক ধারে শিউলি গাছ। উঠোনের পর খানিকটা নামাল জমি; পিঠক্ষীরা আর সোনালের ঝোপে জায়গাটা ছেয়ে আছে। তারপর পুকুর। পুকুর পেরিয়ে ধানের খেত। বর্ষায় পুকুর এবং ধানখেত ভেসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এখনও তেমনটিই রয়েছে, দুয়ের মাঝখানে সীমারেখা নেই কোথাও।

এতগুলো বড় বড় টিনের ঘর, প্রকাণ্ড উঠোন, পুকুর, পুকুরের পর একলপ্তে নব্বুই কানি দো-ফসলা জমি—সমস্ত মিলিয়ে রাজা-বাদশার ঐশ্বর্য। আর এ সবই এখন রাজেকের। অথচ আট মাস আগে? আট মাস আগের কথা এখন নয়।

আশ্বিন মাস যায় যায়। সারা বর্ষার জলে ধুয়ে ভাদ্রের গোড়ায় আকাশ সেই যে আশ্চর্য রকমের নীল হয়ে গিয়েছিল, এখনও তা-ই আছে। তার গায়ে থোকা থোকা ভবঘুরে মেঘ। উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে সেজে রয়েছে। সেই কবে থেকে, শরৎ আসবার আগেই বুঝি সারা গায়ে ফুল ফোটাতে শুরু করেছিল গাছটা, এখনও ফুটিয়েই যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে সূর্য উঠে গেল। গলানো সোনার মতো রোদের ঢল নামল চারদিকে। কোত্থেকে দুটো মোহনচূড়া পাখি উত্তরের ঘরের চালে উড়ে এসে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে খুনসুটি জুড়ে দিল। সামনে-পেছনে, পুবে-পশ্চিমে—যেদিকেই চোখ ফেরানো যায়, শরৎকাল যেন জাদুকরের বেশে দাঁড়িয়ে।

পা নাচাতে নাচাতে অন্যমনস্কের মতো ধানখেতের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজেক। ক'মাস ধরে রোজ সকালবেলা এমনিভাবে পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে অলস চোখে তাকিয়ে থাকছে সে। এটা যেন বিলাসের মতো, কিংবা তার মনেরই কোন প্রিয় খেলা।

দূরে, অনেক দূরে ধানখেত চিরে চিরে একটা নৌকো আসছিল। নৌকোটা ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। ধানবনের ওপর গোল ছই, একটা কালো কুচকুচে মাঝি আর উঁচু লগির ওঠানামা চোখে পড়ছিল।

রোজ সকালে কত নৌকোই তো ধানখেত ভেঙে কত দিকে চলে যায়। ওই নৌকোটা কোথায় কোনদিকে চলেছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই রাজেকের। চারধারে আশ্বিনের নরম রোদের ছড়াছড়ি, মোহনচূড়া পাখি দুটোর নাচানাচি কিংবা আকাশের ভাসমান

মেঘ—কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। রাজেক ভাবছিল—নিজের কথা, নিজের তিরিশ বছরের একটানা দীর্ঘ জীবনটার কথা।

হায় রে, কী জীবন ছিল তার! আজ এই যে জালি গেঞ্জিটি গায়ে দিয়ে মাথায় শৌখিন টেরিটি কেটে, সুখের নদীতে গা ভাসিয়ে রাজেক পা নাচাচ্ছে, আট মাস আগে তা ছিল অসম্ভব। দেশখানা যদি দু ভাগ না হত, বৈকুন্ঠ সাহারা যদি এই ছিপতিপুর গ্রাম ছেড়ে চলে না যেত, এত সুখ কপালে ছিল না।

ভাবনাটা পুরো হল না। তার আগেই কি আশ্চর্য, ধানখেতের সেই নৌকোটা পুকুর পাড়ি দিয়ে ঘাটে এসে ভিড়ল।

ভুরু কুঁচকে খাড়া হয়ে বসল রাজেক। ভেবেই পেল না, সকালবেলায় তার কাছে কে আসতে পারে। সে জন্য অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরে নৌকো থেকে যে নামল সে আর কেউ না, স্বয়ং তোরাব আলী—ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড় ধনী গৃহস্থ।

দুশো কানি তেফসলা জমি তোরাব আলীর, হাল-হালুটি অগুনতি, গরু আর বলদ পঞ্চাশ-ষাটটা, নৌকো গোটা চল্লিশেক। পঁচিশ-তিরিশটা কামলা বারো মাসই খাটছে। ধান-পাট-মুগ-মসুর সব মিলিয়ে এলাহী কাণ্ড। মাস আস্টেক আগেও তার বাড়ি কামলা খেটেছে রাজেক। এই ছিপতিপুর গ্রামের সে মাথা; সব চাইতে গণ্যমান্য ব্যক্তি।

বড় গৃহস্থই শুধু না, তোরাব আলী মানুষটি ভারি শৌখিনও। এই সকাল-বেলাতেই পরিপাটি সাজসজ্জা করে বেরিয়েছে। পরনে সিল্কের লুঙ্গি, কলিদার পাঞ্জাবি, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা, চুল-দাড়িতে কলপ। রাজেক জানে, কাছে গেলে তার চোখে সুর্মার টান দেখতে পাবে, আতরের ভুরভুরে গন্ধ নাকে এসে লাগবে।

তোরাব আলী কি তার কাছেই এসেছে? প্রথমটা বুঝতে পারল না রাজেক। তোরাব আলীর মতো মানুষ তার কাছে আসতে পারে, এর চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা জগতে আর বোধ হয় কিছু নেই। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ একভাবে বসে থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রাজেক; তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে পুকুরঘাটে চলে এল। হাত কচলাতে কচলাতে খুব সম্ভ্রমের গলায় বলল, 'আপনে!'

দু-হাতে দাড়ি তোয়াজ করতে করতে সামান্য হাসল তোরাব আলী। বলল, 'হ, আমিই তর কাছে আইলাম—'

হায় আল্লা! শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না রাজেক। প্রতিধ্বনির মতো করে বলল, 'আমার কাছে!'

'হ—হ, তরই কাছে।'

কী উত্তর দেবে, রাজেক ভেবে পেল না।

খুব তরল গলায় তোরাব আলী এবার বলল, 'পুঁকের (পুকুর) ঘাটেই খাড়া করাইয়া রাখবি নিকি? ঘরে নিয়া যাবি না?'

সুরটা অন্তরঙ্গ। সেই ছোটকাল থেকে তোরাব আলীকে দেখছে রাজেক; এভাবে তাকে কথা বলতে আগে আর কখনও শোনে নি।

যাই হোক, রাজেক খুব লজ্জা পেয়ে গেল। ব্যস্তভাবে বলল, 'আসেন—আসেন—'

বাড়ি এনে তোরাব আলীকে কোথায় বসাবে, কিভাবে আপ্যায়ন করবে, ঠিক করে উঠতে পারল না রাজেক। প্রথমে ছুটে গিয়ে একটা পাটি এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিল। কিন্তু নিজের কাছেই তা মনঃপূত হল না। তক্ষুনি সেটা গুটিয়ে একটা জলচৌকি নিয়ে এল।

তোরাব আলী কিন্তু বসল না। তার সমাদরের জন্য রাজেকের ছোটাছুটি ব্যস্ততা দেখে সে খুব সন্তুষ্ট। প্রসন্ন গলায় বলল, 'আমার লেইগা অস্থির হইস না রাজেক। বসুম পরে। আগে তর ঘরদুয়ার দেখা—'

চমকে সংশয়ের চোখে তোরাব আলীকে একবার দেখে নিল রাজেক। তার বাড়ি-ঘর দেখার জন্যই কি সকালবেলা ছুটে এসেছে লোকটা? তোরাব আলীর মনে কী আছে, কে জানে!

রাজেকের মুখচোখের সন্দিগ্ধ চেহারা দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে নিল তোরাব আলী। মৃদু কৌতুকের সুরে বলল, 'ডর নাই, তর বাড়িঘর আমি কাইড়া নিমু না। তর জিনিস তরই থাকব।'

মুখ ফুটে তোরাব আলী একবার যখন দেখতে চেয়েছে তখন তার 'না' বলা যাবে না। মনের ভেতর স্তূপাকার সন্দেহ নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাল রাজেক।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত দেখে জলচৌকির ওপর জাকিয়ে বসল তোরাব আলী। বলল, 'তামুক আছে রে?'

খেয়াল করে তামাক-টামাক নিজেরই দেওয়া উচিত ছিল। রাজেক দিতও। কিন্তু সন্দেহে মনটা হঠাৎ মেঘলা হয়ে যাওয়ায় ভুলে গিয়েছিল।

যাই হোক, ছুটে গিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এল রাজেক। আয়েশ করে হুঁকো টানতে টানতে তোরাব আলী বলল, 'বৈকুন্ঠ সা বাড়িঘর তরে দেখাশুনা করতে দিয়া গেছে, না?'

লোকটার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রায় দম বন্ধ করে রাজেক উত্তর দিল, 'হ'।

সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তোরাব আলী বলল, 'ঐ পুকৈরও তো বৈকুন্ঠ সা'র?''

'হ।'

'পুকৈরের ওই পারের জমিন?'

'হেয়াও (তাও) সা' কত্তার।'

'কত জমিন আছে?'

'নব্বই কানি।'

'হগলই (সবই) অখন তর হ্যাফাজতে (হেপাজতে)?'

আবছা গলায় রাজেক বলল, 'হ।'

একটু নীরবতা। দ্রুত বারকতক হুঁকো টেনে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ল তোরাব আলী। তারপর বলল, 'বৈকুন্ঠ সা'রা আট মাস আগে গেরাম ছাইড়া গেছে না?'

লোকটা দেখা যাচ্ছে, অনেক খবর রাখে। আগের সুরেই রাজেক বলল, 'হ।'

'কই গেছে জানস?'

'শুনছিলাম কইলকাতার দিকে যাইব।'

'খোঁজখপর কিছু পাইছস?'

'না।'

'এইর ভিত্রে তরে চিঠিপত্তর দিছে?'

'না।'

একটু চুপ করে থেকে কপাল কুঁচকে কি ভাবল তোরাব আলী। তারপর বলল, 'তর কী মনে হয়?'

প্রশ্নটা বুঝতে পারল না রাজেক। জিজ্ঞেস করল, 'কোন ব্যাপারে?'

'বৈকুন্ঠ সা'রা আর ফিরব ?'

'কেম্‌নে কমু ?'

রাজেকের কথা যেন শুনতে পেল না তোরাব আলী। অনেকটা আপন মনেই বলে উঠল, 'আমার মনে লয় অরা (ওরা) ফিরব না।'

রাজেক উত্তর দিল না।

তোরাব আলী আবার বলল, 'বৈকুন্ঠ সা'রা না ফিরলে তার জমিন, বাড়িঘর পুকৈর—সগল তর হইয়া যাইব। হইয়া যাইব কি, হইয়া গেছেই।'

রাজেক এবারও চুপ।

বৈকুন্ঠ সাহা এবং তার বিপুল সম্পত্তি সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো কিছুক্ষণ খবর-টবর নিল তোরাব আলী। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'এইবার কামের কথাখান সাইরা লই।'

দম বন্ধ করেই ছিল রাজেক। আবছা গলায় বলল, 'কী কাম ?'

'আমার ইচ্ছা, কাইল দুফারে (দুপুরে) আমাগো বাড়িত্ চাউরগা (চাট্টি) ডাইল-ভাত খাবি।'

সামনে বাজ পড়লেও এতখানি চমকাত না রাজেক। ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড়, সব চাইতে সম্মানিত, সব চাইতে মর্যাদাসম্পন্ন গৃহস্থ—যার বাড়ি ক'দিন আগেও সে কামলা খেটেছে, সেই তোরাব আলী কিনা নিজে এসে তাকে নেমন্তন্ন করছে। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল রাজেক, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

এদিকে হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়েছে তোরাব আলী। বলল, 'তাহলে ঐ কথাই রইল। কাইল দুফারে আসবি কইলাম।'

সজ্ঞানে না, অনেকটা ঘোরের মধ্যেই যেন ঘাড় কাত করল রাজেক।

তোরাব আলী বলল, 'আবার ভুইলা যাইস না। আমরা কিন্তুক তর লেইগা বইসা থাকুম।' বলে আর দাঁড়াল না। সামনের খোলা উঠোন, তারপরের সোনাল আর পিঠক্ষীরা গাছের জঙ্গল পেরিয়ে পুকুরঘাটে চলে গেল। একটু পর তার নৌকো দূর ধানখেতের ভেতর অদৃশ্য হল।

তোরাব আলী চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ একইভাবে বসে থাকল রাজেক। পুকুরঘাট পর্যন্ত যে তাকে এগিয়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল, এই কথাটা রাজেকের একবারও মনে পড়ে নি। আসলে এত বিস্মিত, এত স্তম্ভিত, এত বিহ্বল আগে আর কখনও হয় নি সে। এমন ভয়ও কখনও পায় নি।

তোরাব আলী তার কাছে এসেছিল, কাল দুপুরবেলা খাবার জন্য নেমন্তন্ন করে গেছে—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। তোরাব আলীর মতো মানুষ তার কাছে আসতে পারে, শুধু আসাই না, এত খাতির করতে পারে—এমন ঘটনা ভাবাই যায় না। আজ না হয় বৈকুন্ঠ সাহারা দেশ ছেড়ে যাবার পর একটু সুখের মুখ দেখেছে। নইলে আট মাস আগেও তার দিন যে কিভাবে চলত !

আশ্বিনের এই সকালে বিমূঢ়ের মতো পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সময়ের উজান ঠেলে পেছন ফিরে গেল রাজেক।

হায় রে, কী জীবন ছিল রাজেকের। ছোটকালেই তো বাপ-মা খেয়ে বসেছে। তারপর থেকে দু গরাস ভাতের জন্য কুকুরছানার মতো ছিপতিপুরের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াত। কখনও যেত মৃধাদের বাড়ি, কখনও সর্দারদের, কখনও বা খাঁয়েদের। তবে সব চাইতে বেশি যেত হিন্দু পাড়ায়। কোথাও কিছু জুটত, কোথাও আবার

কিছুই না। খিদে ছাড়া সে সময় আর কোন অনুভূতি ছিল না; সর্বক্ষণ খিদেটা তার পায়ে পায়ে ফিরত।

একটু বড় হবার পর রাজেকের মনে হয়েছিল, অন্যের করুণার ওপর চিরকাল বাঁচা যায় না; আর তা সম্মানজনকও না। কাজেই খানিকটা টোন সুতো আর বঁড়শি যোগাড় করেছিল সে। লোকের বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে এনেছিল খানদুই মুলি বাঁশ। বাঁশ চিরে চিরে 'পোলো' এবং 'চাই' বানিয়েছিল আর বুনে নিয়েছিল একখানা 'ধর্মজাল'। তখন থেকে কঠিন জীবন-সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল তার।

এ দেশে সারা বছরই জল। খাল শুকোয় তো বিল আছে, বিল শুকোয় তো গাঙ তার বুক ভরে রেখেছে। বঁড়শি নিয়ে, ধর্মজাল নিয়ে, পোলো নিয়ে খাল-বিল কি দু-মাইল দূরের বড় নদীতে চলে যেত রাজেক। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ যে মাছ মিলত তাই নিয়ে সে ছুটত সুনামগঞ্জের হাটে। মাছ বেচে সন্ধ্যের পর ছিপতিপুরের এক কোণে যে গরীব মুসলমান পল্লীটা আছে সেখানে চলে যেত। ওদের রান্নাবান্না হয়ে গেলে কারো উনুনে চাট্টি ফুটিয়ে নিত। তারপর খেয়েদেয়ে তাদেরই ঘরের দাওয়ায় টান হয়ে শুয়ে পড়ত।

সারাটা বছর জলে-জলেই কেটে যেত রাজেকের। ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলে লোকের বাড়ি কামলা খাটত। এর ধান কেটে দিত, ওর পাট 'তুলে' দিত। বেশির ভাগ সময় সে খাটত তোরাব আলীর কাছে। পৌষ মাঘ মাসে ধান উঠে গেলে মাঠে যে শস্যের দানাগুলো কৃষাণদের চোখ এড়িয়ে পড়ে থাকত সেগুলো খুঁটে খুঁটে তুলে আনত রাজেক, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান বের করত। কুড়নো ফসল থেকে এক-আধটা মাস ভালই কেটে যেত।

জলে-স্থলে সারা বছরই তার নিদারুণ জীবন-সংগ্রাম। ডাঙায় অবশ্য বেশিদিন থাকতে পেত না রাজেক। প্রায় বারো মাস জলে ভিজে ভিজে চামড়া ফেটে ফেটে গিয়েছিল; গা থেকে সর্বক্ষণ খই উড়ত। চুল-দাড়িতে জট পাকিয়ে গিয়েছিল; চোখ দুটো থাকত ঘোলাটে হয়ে। নখের কোণে পাঁক ঢুকে 'কুনি' হয়েছিল। হেজে হেজে আঙুলের ফাঁকে থকথকে ঘা। রাজেকের চোখের সামনে দিনরাতের একটাই মোটে রঙ তখন। তার নাম দুঃখ অসীম অন্তহীন দুঃখ।

হায় রে, কী জীবন ছিল রাজেকের!

শীত-গ্রীষ্ম, শরৎ-হেমন্ত——ঋতুর চাকায় পাক খেয়ে খেয়ে তিরিশটা বছর কিভাবে কেটে গেছে, রাজেক জানে না।

একদিন সকালবেলা এক কোমর স্রোতে নেমে ধর্মজাল বাইতে বাইতে হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল, স্কুলবাড়ির সামনের বড় মাঠটায় কাতারে কাতারে মানুষ গিয়ে জমা হয়েছে। চিত্রবিচিত্র পোশাক-পরা একদল লোক বিলিতী বাজনা বাজাল; কারা যেন গলার শির ফুলিয়ে ফুলিয়ে, প্রচুর মাথা নেড়ে বক্তৃতা করল; সিল্কের নতুন পতাকা উঠল আকাশের দিকে।

সকালবেলা বর্ণশূন্য ধূসর চোখে স্কুলবাড়ির মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজেক। সন্ধ্যের পর ওখানেই যখন বাজি পোড়াবার ধুম পড়ে গেল তখন আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে শুধিয়েছিল, 'এত রং-তামশা ক্যান? বাজি ফুটানের হইল কী?'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন ধিক্কারের গলায় বলে উঠেছিল, 'আরে আহাম্মক, তুই আল্লি (এল্লি) কইথন (কোথা থেকে)? দেখি, দেখি তর চোপাখান (মুখখানা)।'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখে নিয়ে লোকটা এবার বলেছিল, 'তাই কই, আমাগো রাজেইকা ছাড়া এমুন কথা আর কার মুখ দিয়া বাইর হইব! জলে থাইকা থাইকা বুদ্ধিসুদ্ধি তর গেছে। কোন খবরই রাখস না--'

'প্যাচাল না পাইড়া কী হইছে হেই কথাটা কও--'

লোকটা এবার বুঝিয়ে দিয়েছিল। সে একটা দিনের মতো দিন। সেদিন দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনই শুধু না, কোটি কোটি মানুষ যার স্বপ্ন দেখেছে, যার জন্য মৃত্যুপণে সংগ্রাম করেছে, সেই পাকিস্তানেরও প্রতিষ্ঠা সেই দিনটিতে। এমন একটা দিন বছরের, এক-আধ বছরের কেন, বহু বহু বছরের বহু লক্ষ ম্যাড়মেড়ে আটপৌরে দিন থেকে আলাদা। তাকে তো অন্যমনস্কের মতো উদাসীনভাবে হাত পেতে নেওয়া যায় না; বিপুল সমাদরে রাজকীয় সমারোহে বরণ করে নিতে হয়। তাই এত লোকজন, এত বাজি পোড়াবার ধুম, এত উদ্দীপনা।

মনে আছে, অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন স্কুলবাড়ির মাঠে ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল রাজেক। এত আলো, এত হৈ-চৈ, এত উত্তেজনা, এত রোশনাই, এত রঙ--সবই ভাল লেগেছিল তার, নতুন নতুন মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাল লাগার আয়ু মোটে একটা রাত। পরের দিনই 'পোলো' নিয়ে খালে গিয়ে নামতে হয়েছিল তাকে।

সেই চমকপ্রদ বিশেষ দিনটির পর বছরখানেক কাটল। হঠাৎ একদিন কার্তিক মাসের পচা জলে 'চাই' পাততে পাততে রাজেক খবর পেল, ছিপতিপুর গ্রামে ভাঙন লেগেছে। গোঁসাই বাড়ির লোকেরা নাকি জমিজমা ঘরদুয়ার বেচে কলকাতায় চলে গেছে। গোঁসাইদের পর গেল ভুঁইমালীরা, তারপর একে একে বারুইরা, কুমোররা, যুগীরা। দেখতে দেখতে ছিপতিপর একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

বারো মাস জলে থেকে থেকে অনুভূতিগুলো প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল রাজেকের। গ্রামে কারা থাকল, কারা গেল--তা নিয়ে আদৌ দুর্ভাবনা নেই। তার দিনরাতের একমাত্র চিন্তা--জলের তলা থেকে কেমন করে জীবন্ত রুপোলী ফসলগুলোকে তুলে আনবে।

দেশভাগ, স্বাধীনতা দিবসের জমকালো উৎসব কিংবা গ্রামের ভাঙন--সমস্ত কিছুই রাজেককে আলতোভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। সে সব নিয়ে বসে থাকার মতো যথেষ্ট সময় তার নেই। কেন না, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য তাকে এত খাটতে হত যে তারপর আর কোন ব্যাপারে মেতে ওঠার মতো উৎসাহ থাকত না।

কিন্তু খুব বেশি দিন চারপাশের জগতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকা গেল না। মাঘ মাসের এক শীতল দুপুরে মাঠে মাঠে ফেলে-যাওয়া শস্যের দানা কুড়োচ্ছিল রাজেক। হঠাৎ বুড়ো বৈকুন্ঠ সাহা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

রাজেক শুধিয়েছিল, 'আমারে কিছু কইবেন সা-মশয়?'

'হ--' বৈকুন্ঠ সাহা মাথা নেড়েছিল।

'ক'ন (বলুন)--'

'আমরা তো গেরাম ছাইড়া চললাম--'

'কই চললেন?'

'কইলকাতা।'

'ফিরবেন কবে?'

'ফিরনের ঠিক নাই।'

রাজেক আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি।

বৈকুণ্ঠ সাহা আবার বলেছিল, 'তর লগে একখানা কামের কথা আছে।'

'কী?'

'আমরা কইলকাতা গেলে আমাগো ঘরদুয়ার জমিন-পুকৈর সগল তুই দেখবি। এমনে এমনে দেখতে কই না; ধান পাট যা হয় সব তুই পাবি। যদি কুনোদিন ফিরি তখন বাড়িঘর ফিরাইয়া দিস। না ফিরলে বেবাক তরই হইয়া যাইব।'

বৈকুণ্ঠ সাহারা সত্যিই চলে গেল। তার বিপুল সম্পত্তি, বিশাল ঐশ্বর্য এসে পড়ল রাজেকের হাতে। আট মাস ধরে জীবনধারণের জন্য জলে-স্থলে উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াতে হচ্ছে না তাকে। এ ব্যাপারে এখন সে নিশ্চিন্ত। আরামে আর সুখে থেকে থেকে পায়ের হাজা, নখের কুনি-টুনি সেরে গেছে রাজেকের। খই-ওড়া চামড়ায় চকচকে মসৃণতা এসেছে, মাথায় ঢেউখেলানো টেরি দেখা দিয়েছে। মেজাজটিও হয়ে উঠেছে শৌখিন। আজকাল সিল্কের লুঙ্গি, জালি গেঞ্জি, কলিদার পাঞ্জাবি ছাড়া চলে না। গন্ধতেলটি না হলে মন খুঁত খুঁত করে।

ইদানীং সব সময় রাজেকের মনে হয়, ভাগ্যে দেশখানা দু ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যে বৈকুণ্ঠ সাহারা চলে গিয়েছিল! না হলে তার কপাল কি খুলত! এত সুখের মুখ কি সে দেখতে পেত!

দিনগুলো ভালই কাটছিল কিন্তু ছিপতিপুর গ্রামে এত মানুষ থাকতে আজ তোরাব আলী কেন যে বেছে বেছে হঠাৎ তার কাছেই আসতে গেল! শুধু আসা না, দাওয়াতও করে গেল! লোকটার মনে কী আছে, কে জানে।

তোরাব আলী নেমন্তন্ন করে গেছে। না গেলেও নয়, আবার যেতেও ভরসা হয় না। পরের দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে ভাবল রাজেক; ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার তোরাব আলীর উদ্দেশ্যটাকে বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর নিজের অজান্তেই এক সময় চানটান সেরে, রঙচঙে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবিটি পরে, কাঁচা চামড়ার নাগরা পায়ে দিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠল।

ছিপতিপুর গ্রামের শেষ মাথায় একটা দ্বীপের মতো জায়গায় তোরাব আলীর বাড়ি। যেমন তেমন বাড়ি না, রীতিমত পাকা দালান। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়িটা, অসংখ্য ঘর। মানুষজনও প্রচুর।

ধানবন ঠেলে ঠেলে রাজেক যখন সেখানে পৌঁছল, আশ্বিনের বেলা অনেকখানি হেলে গেছে। রোদে হলুদ আভা লাগতে শুরু করেছে।

ঘাটে নৌকো ভিড়তে না ভিড়তেই তোরাব আলী ছুটে এল। সমাদরের গলায় বলল, 'আইছ মেঞা! আমি তো ভাবছিলাম, তুমি ভুইলাই গেছ—'

উত্তর দেবে কি, রাজেক স্তম্ভিত। এই সেদিনও অবজ্ঞার সুরে তাকে 'তুই' বলত তোরাব আলী, সম্ভাষণের ভাষাটা ছিল 'রাজেইকা'। বেশি দূর পিছিয়ে যেতে হবে কেন, কালও তাকে 'তুই তোকারি' করে এসেছে তোরাব আলী। রাতারাতি হঠাৎ এমন কি ঘটে গেল যাতে সে এত সম্মানিত হয়ে উঠেছে! 'তুই' থেকে 'তুমি', 'রাজেইকা' থেকে 'মেঞা'—এতখানি বিস্ময় রাজেক সহ্য করতে পারছে না।

তোরাব আলী বলল, 'আসো—আসো—'

নিঃশব্দে নৌকো থেকে পাড়ে নামল রাজেক। তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে তোরাব আলী বলতে লাগল, 'এত দেরি হইল ক্যান?'

জড়ানো গলায় রাজেক কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার এক বর্ণও বোঝা গেল না।

তোরাব আলী বলল, 'আরেটু (আরেকটু) দেখতাম। হে'র (তার) পরও যদি না আইতা, তোমার বাড়িত্ লোক পাঠাইতাম।'

অনেক কষ্টে স্বরটাকে গলার ভেতর থেকে এবার মুক্ত করে আনল রাজেক, 'আপনে কাইল কইয়া আইলেন। না আইসা কি পারি, ঘেটিতে (ঘাড়ে) আমার কয়টা মাথা?'

তোরাব আলী কিছু না বলে হাসল।

বাড়ির ভেতরে এনে ধবধবে ফরাসের ওপর খুব যত্ন করে রাজেককে বসানো হল। তক্ষুনি সরবত এল, পান-তামাক এল। বাড়ির যত বয়স্ক মেয়ে-পুরুষ সবাই এসে রাজেককে ঘিরে বসল। বাচ্চাগুলো দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল।

রাজেক ঘামতে শুরু করেছিল। আট মাস আগেও সে এ বাড়িতে কামলা খেটেছে, মাঠ থেকে ধান কেটে এনেছে, পাট 'জাগ' দিয়েছে—এই কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তোরাব আলীরা কিন্তু সে-সব ভুলে গেছে। অন্তত তাদের আদর-যত্ন এবং খাতিরের ঘটা দেখে তাই মনে হয়। সে যেন এ বাড়ির অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি।

তোরাব আলী বলল, 'খাও মেঞা, সরবত খাও। রান্ধনের (রান্নার) দেরি আছে! দুই-একখানা পদ অখনও বাকি।'

বাড়ির অন্য লোকেরাও সায় দিল, 'হ-হ, খাও—'

কাঁপা কাঁপা হাতে সরবতের গেলাস তুলে নিল রাজেক।

সরবতের পর তামাক সাজা হল। তোরাব আলী হুঁকোয় দু-চারটে টান দিয়ে রাজেকের দিকে এগিয়ে দিল।

সঙ্কোচে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল রাজেক। দু হাত এবং মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'না-না, না-না—'

তোরাব আলী হুঁকোটা প্রায় তার হাতে গুঁজেই দিল, 'আরে মেঞা, ধর ধর। মাইয়া মাইনষের লাখান (মতো) অত সরম ক্যান!'

মুখ নীচু করে আবছা গলায় রাজেক বলল, 'আপনের সুমখে (সামনে) নিশা (নেশা) করুম! না-না—'

'আমার সুমখে বইলা কী? খাও-খাও—'

অনেক বলার পর তোরাব আলীর দিকে পেছন ফিরে বার কয়েক দ্রুত হুঁকো টানল রাজেক। তারপর কাছে যাকে পেল তার হাতে হুঁকোটা দিয়ে আবার ঘুরে বসল।

সরবত আর তামাকের পর গল্প শুরু হল। দেশভাগের গল্প, গ্রামে ভাঙন লাগার গল্প। ধান-পাট, এ বারের বর্ষা—কিছুই বাদ গেল না। তবে বেশির ভাগ কথাই হল বৈকুণ্ঠ সাহা আর তার বিষয়-আশয় নিয়ে।

কথায় কথায় বেলা আরো হেলে গেল। পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা যখন অনেকখানি নেমে গেছে সেই সময় ভেতরবাড়ি থেকে খবর এল রান্নাবান্না শেষ।

তোরাব আলী ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ইস, বেইল (বেলা) যায়! তোমার বড় কষ্ট হইল মেঞা।'

রাজেক বলল, 'না, কষ্ট কিসের!'

'লও লও, খাইতে যাইবা।'

খাবার ব্যবস্থা ভেতর-বাড়িতে। তোরাব আলী আয়োজনও করেছে প্রচুর। পাঁচ-

ছ রকমের মাছ, মাংস, পায়েস, পাতক্ষীর, বড় বড় মোহনবাঁশি কলা, পুরু সরওলা হলুদ বর্ণ ঘন দুধ।

একা রাজেক না, তার সঙ্গে তোরাব আলী এবং এ বাড়ির বর্ষীয়ান ক'টি মানুষ-ও খেতে বসল। খেতে খেতে আবার বৈকুণ্ঠ সাহাদের কথা উঠল, তাদের ফেরার সম্ভাবনা আছে কিনা তাই নিয়ে আলোচনা হল।

রাজেক অবশ্য বিশেষ কথা বলছিল না। সে এত বিস্মিত এত স্তম্ভিত হয়ে আছে যে তোরাব আলীর প্রশ্নের উত্তরে খুব সংক্ষেপে এক-আধটা 'হুঁ' 'হাঁ'র বেশি তার মুখ থেকে বেরুচ্ছিল না।

মাথা নীচু করেই খাচ্ছিল রাজেক। হঠাৎ তোরাব আলীর এক বুড়ো চাচার কথায় মুখ তুলে পাশেরদিকে তাকাতে গিয়েই ওধারের এক জানালায় তার চোখ আটকে গেল। সেখানে কামরণ দাঁড়িয়ে আছে; তোরাব আলীর মেয়ে কামরণ। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ, দীঘল টান দেওয়া নাক-চোখ চিবুক। মুখখানা পানপাতার মতো। ছোট কপালের ওপর থেকে থাক থাক কোঁচকানো চুল; ফুরফুরে পাতলা ঠোঁট। পরস্তাবে (রূপকথায়) সেই যে গুলেবাখালী রাজকন্যার কথা আছে, কামরণ যেন তাই।

মেয়েটা খুব সম্ভব একদৃষ্টে পলকহীন তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতেই সলজ্জ মধুর হেসে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

কামরণকে অবশ্যই এই প্রথম দেখল না রাজেক। কামলা খাটতে এসে কত বার দেখেছে। কী দেমাক ঐ মেয়ের! রূপের দেমাক, বড়মানুষির দেমাক। দুনিয়া-খানাকে যেন পায়ের তলায় রেখে দিয়েছে। মানুষকে মানুষ বলেই সে ভাবত না।

সেই কামরণ যে এমন হাসতে পারে, তা যেন এক অভাবনীয় ব্যাপার।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরের ফরাসে এসে বসতে না বসতেই সন্ধ্যে নেমে গেল। রাজেক বলল, 'অখন আমি যাই।'

তোরাব আলী আর তাকে আটকাল না, 'আইচ্ছা যাও, আবার আইসো।' ঘাট পর্যন্ত গিয়ে রাজেককে নৌকোয় তুলে দিয়ে এল সে।

যতদূর চোখ যায় এখন গাঢ় অন্ধকার। সমস্ত চরাচর জুড়ে লক্ষ লক্ষ জোনাকি জ্বলছে। আশ্বিনের এলোমেলো ঝিরঝিরে হাওয়া ছুটছে দিগ্বিদিকে।

ধানখেতের ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে যেতে যেতে রাজেক সেই পুরনো কথাটাই ভাবছিল। তোরাব আলীর এত খাতির, এত সমাদর—এ সবের উদ্দেশ্য কী? এগুলো ফাঁদ নয় তো? ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৈকুণ্ঠ সাহার জমিজমা বাড়িঘর সে গ্রাস করতে চায় কী?

•

সেই যে নেমন্তন্ন খাওয়া শুরু হল, কার্তিকের শেষাশেষি পর্যন্ত একটানা তার জের চলল। দু-চারদিন পর পরই একটা না একটা উপলক্ষে তোরাব আলীর বাড়ি যেতে হয়েছে রাজেককে। প্রথম দিনের মতো প্রত্যেকবার সেখানে আদর-যত্ন-খাতির মিলেছে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে রাজেক, ইদানীং কামরণ তার সামনে আসে না। খেতে বসে কিংবা গল্প করতে করতে জানালার ফাঁকে চকিতের জন্য এক-আধবার তাকে দেখা যায়। অথচ আট-দশ মাস আগেও বাড়িতে সে কামলা খাটতে আসত, সর্বাঙ্গে রূপ আর গর্বের ঝিলিক দিয়ে গরবিনী মেয়েটা তাদের সামনে দিয়ে ঘুরে

বেড়াত। সেই কামরুণের এজাতীয় আচরণের কোন কারণ খুঁজে পায় না রাজেক। ভেবে ভেবে কূলকিনারা চোখে পড়ে না তার।

শেষ পর্যন্ত রহস্যটা পরিষ্কার হল। অঘ্রাণ মাসের গোড়ায় একদিন সকালবেলা তোরাব আলী রাজেকের কাছে এল, 'তোমার লগে কামের কথা আছে মেঞা—'

এতদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নেমন্তন্নই খাইয়েছে তোরাব আলী আর প্রচুর খাতির-যত্ন করেছে। এলোমেলো গল্প ছাড়া বিশেষ কোন কথা বলেনি। তবে সে যে বলবে, নিদারুণ উদ্দেশ্যপূর্ণ কিছু তার মুখ দিয়ে বেরুবে, তা আন্দাজ করতে পারছিল রাজেক। সে জন্য রাজেকের ঘুম নেই, একটা ধারাল কাঁটা বুকের ভেতরে সবসময় যেন আড় হয়ে বিঁধে আছে।

তোরাব আলীর কাজের কথাটা কী, কে বলবে। নিশ্বাস বন্ধ করে রাজেক তাকিয়ে থাকল। তোরাব আলী বলল, 'আমার মাইয়া কামরণরে দেখছ তো?'

লোকটা কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো মাথা নাড়ল রাজেক, 'হ—'

'আমার ইচ্ছা, কামরণের লগে তোমার শাদি দিমু—'

ভীষণভাবে চমকে উঠল রাজেক, 'এ আপনে কী ক'ন বড় মেঞা—'

তোরাব আলী শুধলো, 'ক্যান, কী কই?'

'আপনে কত বড় মানুষ, কত বড় ঘর আপনেগো! আপনের কাছে হেই দিনও কামলা খাইটা গেছি। হেই মাইনষের মাইয়ারে শাদি! না-না—'

'কামলা খাটার কথা ভুইলা যাও মেঞা। আর বড় মানুষ, বড় ঘরের কথা যখন তুললা তখন কই তুমিও ছোট না। বৈকুন্ঠ সা'র অত জমিন পাইছ, ঘর-দুয়ার হাল-হালুটি পাইছ। তুমি কম কিসে? জাতে উইঠা গেছ মেঞা—'

দ্বিধান্বিত সুরে রাজেক বলল, 'কিন্তুক—'

'আবার কী?'

'আমার লগে মাইয়ার শাদি দিলে মাইনষে আপনেরে কী কইব?'

'কোন হালায় (শালায়) কিছু কইব না। সুম্‌খা-সুমুখি (সামনা-সামনি) কওনের সাহস কারো নাই। হেয়া (তা) ছাড়া—'

'কী?'

'আমার দেখতে হইব মাইয়া কোনখানে বেশি সুখে থাকব। তুমি ছাড়া আর কোন হালার নব্বই কানি জমিজেরাত আছে, এমুন সোন্দর ঘরদুয়ার আছে? লোক না পোক। মাইনষের কথায় আমি কান দেই না।'

এ একেবারে আশাতীত, অকল্পনীয়। জামাই করবে বলেই তবে তোরাব আলীর এত ছোটাছুটি, এত সমাদর, এত মেজবান খাওয়াবার ঘটা! সুখের নদীতে ভাসতে ভাসতে রাজেক বলল, 'তাইলে আমি আর কী কমু, আপনে যা ভাল বোঝেন—'

একটু ভেবে তোরাব আলী বলল, 'ভাবছি, ধান টান উইঠা গেলে তোমাগো শাদিটা সারুম—'

রাজেক উত্তর দিল না, মুখ নীচু করে বসে থাকল।

তোরাব আলী বলল, 'তাহলে ঐ কথাই রইল। অখন আমি যাই—'

তোরাব আলী চলে যাবার পরও উঠল না রাজেক। বসে বসে ভাবতে লাগল, ভাগ্যি দেশখান দু'ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যি বৈকুন্ঠ সাহারা চলে গিয়েছিল! নইলে এত সুখ কি তার কপালে ছিল!

অঘ্রাণের মাঝামাঝি ধান কাটার মরসুম শুরু হল। মাঠ থেকে ধান তুলে এনে সেই ধান ঝেড়ে শুকিয়ে, ডোলের ভেতর সেঁতে রাখতে মাঘ মাস পেরিয়ে গেল। তারপর আবার এল তোরাব আলী। বলল, 'ফসল টসল তো উঠল, এইবার মোল্লা-মুন্সুল্লিগো খবর দেই—'

নখ খুঁটতে খুঁটতে রাজেক বলল, 'আপনার যা ইচ্ছা—'

খানিক চিন্তা করে তোরাব আলী বলল, 'আইজ কী বার?'

'বুদ (বুধ)—'

'শনিবার দুফারে নাও পাঠাইয়া দিমু, তুমি আমাগো বাড়িত যাইও। মোল্লামুন্সুল্লিগো খবর দিয়া রাখুম, তারাও আইব। হেইদিন শাদির কথা, দেন-মোহরের কথা পাকা হইব।'

রাজেক বলল, 'নাও পাঠাইতে হইব না, আমি এমনেই যামু গা—'

তোরাব আলী শুনল না। জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলল, 'এট্টা ভাল কামে যাইবা, নাও না পাঠাইলে হয়! তোমার সোম্মান নাই?'

বুধবার তোরাব আলী চলে যাবার পর দিন যেন আর কাটতেই চায় না। শিরায় শিরায় সীমাহীন উত্তেজনা নিয়ে সর্বক্ষণ অস্থির হয়ে থাকল রাজেক।

তবু একে একে বেস্পতি গেল, শুক্র গেল। শনিবার সকাল থেকে সময় যেন একেবারে থেমেই গেছে। সূর্যটা অন্যাদিনের চাইতে অনেক দেরী করেই বুঝি আজ উঠেছে; আর চলছে দেখ না! এক ঘণ্টার রাস্তা পাড়ি দিতে আজ দশ ঘণ্টা লেগে যাচ্ছে তার।

রাজেক ঘুরছে ফিরছে আর দূর মাঠের দিকে তাকাচ্ছে। সকাল থেকে কত বার যে পুকুরের ওধারের মাঠটার দিকে সে তাকিয়েছে তার হিসেব নেই।

এই ফাল্গুনে মাঠে অবশ্য জল নেই। কিন্তু তার পাশ দিয়ে একটা বড় খাল আছে; খালটা সোজা এসে বৈকুণ্ঠ সাহার পুকুরে থেমেছে। তোরাব আলীর নৌকো ঐ খাল দিয়েই আসবে।

যত ধীরেই যাক, এক সময় দুপুর হল। আর তখনই অনেক দূরে নৌকোর গোলুই চোখে পড়ল রাজেকের। সঙ্গে সঙ্গে দোতারায় এলোপাথড়ি ছড় টানার মতো বুকের ভেতর ঝড় বইতে লাগল তার এটা যেন সাধারণ দু-মাল্লাই নৌকো না, পরস্তাবের মনোহারিণী রাজকন্যা তার জন্য একখানা ময়ূরপঙ্খীই পাঠিয়ে দিয়েছে।

দেখতে দেখতে নৌকোটা পুকুরঘাটে এসে ভিড়ল। নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিল রাজেক; ভাবছিল ঘাটে যাবে কিনা।

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই নৌকো থেকে যে নামল, এই মুহূর্তে—এই মুহূর্তে কেন, দু-তিন মাসের ভেতর তার কথা স্বপ্নেও ভাবে নি! রাজেক চমকে উঠল; সামনে বাজ পড়লেও মানুষ এত চমকায় না। হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো সিরসিরিয়ে কী যেন বয়ে গেল তার।

একা বৈকুণ্ঠ সাহাই না, তার সঙ্গে আর একজনও নেমেছে। পোশাক-আশাক এবং চেহারা-টেহারা দেখে মুসলমান বলেই মনে হয়; বয়েস ষাটের কাছাকাছি।

পুকুরঘাট থেকে সঙ্গীকে নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে এল বৈকুণ্ঠ সাহা। রাজেককে

দেখে ভারি খুশী সে। বলল, 'ভালই হইল রাজেক, বাড়িতে পা-ও দিয়াই তরে পাইয়া গেলাম। ভাবছিলাম, পামু না। তা আছস কেমুন? শরীল-গতিক ভাল তো?'

বাজ-পড়া অসাড় মানুষের মতো দাঁড়িয়ে ছিল রাজেক। কোন রকমে বলতে পারল, 'আপনে সা-মশয়!'

বৈকুন্ঠ সাহা বলল, 'হ, আমিই। তরে খবর দিয়া আইতে পারি নাই। হঠাৎ সুযুগ হইল, আইসা পড়লাম।'

'এ্যাদ্দিন আছিলেন কই?'

'মেলা জায়গায়। কইলকাতা, বনগাঁ, দত্তপুকৈর—কতখানের নাম কমু? শ্যাষম্যাষ মুশশিদাবাদে থিতু হইছি।' বলতে বলতে সঙ্গী সম্বন্ধে সচেতন হল বৈকুন্ঠ সাহা। তার উদ্দেশে বলল, 'বসেন বসেন আমিন সাহেব। দে রে রাজেক, একখানা জলচৌকি বাইর কইরা দে। তামুক-টামুক থাকলে সাজ—'

জলচৌকি এলে আমিন সাহেব বসল। বৈকুন্ঠ সাহাও বারান্দার একধারে বসল। তারপর গল্প-সল্প শুরু হল। দেশের হালচাল, গ্রামে কারা কারা আছে, কারা কারা গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা। বৈকুন্ঠ সাহাই এক তরফা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল। রাজেক মনে মনে অবসন্ন বোধ করছিল; নির্জীব গলায় উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

এলোমেলো অনেক রকম কথার পর আসল কথা পাড়ল বৈকুন্ঠ সাহা, 'তারপর ঘর দুয়ার ভাল কইরা রাখছস তো?'

এতকাল পরে হঠাৎ বৈকুন্ঠ সাহা গ্রামে ফিরে এল, বোঝা যাচ্ছে না। আর এল এমন দিনে [illegible] শাদির কথা পাকা হবে। অন্যমনস্কের মতো রাজেক বলল, 'দ্যাখেন না, কেমুন কইরা রাখছি—'

বৈকুন্ঠ সাহা তক্ষুনি উঠে পড়ল। আমিন সাহেবকে ডেকে বলল, 'আসেন, আসেন। নায়ে কইরা আসনের সময় আমার জমিন দেখাইছিলাম। অখন আমার বাড়িঘর দ্যাখেন—'

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমিন সাহেবকে চারদিক দেখাতে লাগল বৈকুন্ঠ সাহা। রাজেক কিন্তু তাদের সঙ্গে গেল না; আকন্ঠ দুর্ভাবনা আর উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকল। বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল তার।

বৈকুন্ঠ সাহা এতদিন পর বউ-ছেলে-মেয়ে, সংসারের কাউকে নিয়েই আসেনি সত্যি কিন্তু আমিন সাহেবকে সঙ্গে এনেছে। আমিন সাহেব এদিককার লোক না। হলে রাজেক নিশ্চয়ই চিনতে পারত। এই মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গে বৈকুন্ঠ সাহার সম্পর্ক কী? আসবার সময় তাকে ধান জমি দেখিয়েছে বৈকুন্ঠ; এখন বাড়িঘর দেখাচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাই রাজেকের কাছে রহস্যময় লাগছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

কিছুক্ষণ পর আমিন সাহেবরা ফিরে এল। দাওয়ায় বসতে বসতে বৈকুন্ঠ সাহা শুধলো, 'বাড়িঘর কেমুন দেখলেন?'

আমিন সাহেব বলল, 'ভাল।'

'পছন্দ হইছে তো?'

'হ্যাঁ।'

আমিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল বৈকুন্ঠ সাহার। তাড়াতাড়ি রাজেকের দিকে ফিরে বলল, 'ভাল কথা, তর লগে তো আমিন

পলাতক ও অনুসরণকারী

—তুমি?

রবি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ। চকিতে একবার পেছন দিকে তাকালো। এক পা এগিয়ে এসে বলল, পিসেমশাই বাড়িতে আছেন? অশোকদা আছেন?

জয়ন্তী দু'দিকে মাথা নেড়ে জানালো, ওঁরা নেই।

—পিসীমা আছেন তো?

—হ্যাঁ।

জয়ন্তী রবির সর্বাঙ্গে চোখ বোলালো। তারপর বলল, তোমার পায়ে এত কাদা। উঠোনের ঐ কলে পা ধুয়ে নাও ভাল করে।

জয়ন্তী নিজেই কলটা খুলে দিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, এতদিন কোথায় ছিলে?

—বৌদি, আমার খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার আছে? মুড়িটুড়ি হলেই চলবে।

—ওপরে এসো।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। সিঁড়ির মুখেই পিসীমা। চোখে ভাল দেখতে পান না।—কে এসেছে বৌমা?

—আমাদের রবি।

আবছা দৃষ্টিময় দুটি চোখ রবির দিকে। একটি শিশু এখন যৌবন পেয়েছে, তবু শিশুটিকেই দেখে ঐ চোখ।

—আয় দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?

—সেজো পিসী, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

প্রৌঢ়ার পা দু'খানি প্রণাম নেবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ক্ষুধার্তের কি ওসব মনে থাকে? সে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, একটু তাড়াতাড়ি—

পিসী জিজ্ঞেস করলেন, এক্ষুনি চলে যাবি নাকি? আজ থাকবি না?

—অশোকদা আসুক। অশোকদার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

—বড়দা কেমন আছে এখন?

—একই রকম।

—আর তোর মা? অনেকদিন চিঠি পাই নি।

—রবি রেগে গিয়ে কড়া গলায় বলল, বলছি না, আমার খিদে পেয়েছে? খাবার-টাবার কিছু দেবে কিনা বলো, নাকি শুধু জেরাই করবে?

—ছেলের মেজাজ কি! ক'দিন ধরে খাস নি?

এক বাটি মুড়ির সঙ্গে পেঁয়াজ, লঙ্কা, চানাচুর মিশিয়ে মোটামুটি সুখাদ্যে পরিণত করে নিয়ে এল জয়ন্তী। রবির হাতে তুলে দিয়ে বলল, এখন এটা খাও। লুচি ভাজছি এক্ষুনি—

—এতেই হবে। লুচি-টুচি ভাজতে হবে না।

—চায়ের জল বসাই?

—বসাও।

—এই এক মাসেই তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ। নিজের ওপরেও কি একটু মায়া দয়া নেই?

—অশোকদা দিন দিন মোটা হচ্ছে। তোমার স্বামীর শরীরের যত্ন নিতে পারো না?

—চোখ দুটো তো একেবারে বসে গেছে। ক' রাত্তির ঘুমোও নি?

—যাও তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসাও।

রবি মুড়ি চিবোতে চিবোতে চলে এল জানলার কাছে। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। চোখ সরু করে চেয়ে রইল বাইরে। একটু ক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেল তিনজন লোক পাশাপাশি হেঁটে আসছে, নিজেদের মধ্যে গল্পে মত্ত। এ বাড়ির কাছাকাছি এসে তারা একসঙ্গে মুখ তুলে তাকালো। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর, যেন একটা সমবেত দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা এগিয়ে আসতে লাগল এই বাড়ির দিকে।

রবি হাতের অর্ধসমাপ্ত মুড়ির বাটিটা ঠক্ করে নামিয়ে রাখল নিচে। দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাড়ির কারুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে নেমে এল নিচে, বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। বেরিয়েই সে দৌড়োতে লাগল।

সেই তিনজন লোক এ বাড়ি পেরিয়ে এসে এক পলক দেখতে পেল অপসৃয়মাণ রবির চেহারা। তারা ব্যস্ত হল না, কোনো রকম চাঞ্চল্যও প্রকাশ পেল না।

এক নং অনুসরণকারী বলল, এবারেও চলে গেল।

দু' নং অনুসরণকারী বলল, ঠিক আছে।

তিন নং অনুসরণকারী পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে চোখের সামনে রেখে বলল, এবার কোথায়, দমদম না শ্রীরামপুর?

১নং বলল, দমদম।

২নং বলল, তা হলে এখানকার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক্।

৩নং কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, শীতটা বেশ জমিয়ে পড়েছে আজ। মোড়ের দোকানে দেখে এলাম গরম গরম চপ ভাজছে।

১নং তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটা বোমা বার করে ছুঁড়ে মারল বাড়িটার দরজার ওপরে।

২নং বেশ সন্তুষ্টভাবে বলল, বাঃ, আওয়াজটা বেশ।

৩নং বলল, তাড়াহুড়ো তো কিছু নেই, চলো, কয়েকটা চপ খাওয়া যাক্।

রবি একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ গলায় ডাকল, চন্দন, চন্দন!

কেউ সাড়া দিল না। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। মফস্বল পাড়া নিঝুম। মাঝে মাঝে শোনা যায়, সাইকেল রিক্‌শার শব্দ। অনাবশ্যক কুকুরের ডাক।

রবি এবার জোরে ডাকল, চন্দন—

দোতলার বারান্দা থেকে একটি অল্প বয়েসী মেয়ে শরীর ঝুঁকিয়ে বলল, কে?

—চন্দন আছে?

—দাদার জ্বর!

—বিছানা থেকে উঠতে পারবে না?

—ঘুমোচ্ছে।

—একবার দরজাটা খুলে দাও।

—আপনার নাম কি?

—দরজাটা আগে খুলে দাও।

—রবি ঝট্ করে পেছনে ঘুরে দাঁড়ালো। দুটো সাইকেল রিক্সা তখন বড় রাস্তাটায় সদ্য থেমেছে। দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করতে পারল না রবি, দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সেই তিনজন এসে দাঁড়ালো বাড়িটার সামনে। ১নং বলল, ভেতরে ঢোকে নি, আমি দেখেছি।

১নং কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেল দরজার সামনে। সে ধাক্কা মারবার আগেই দরজা খুলে গেল। একটি চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে, সদ্য শাড়ি পরা ধরেছে, এখনো ভাল করে শেখে নি।

২নং শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, চন্দনের সত্যি জ্বর হয়েছে?

মেয়েটি বলল, আজ একশো চার উঠেছিল। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

—রবিবাবুর কাছ থেকে। তোমার দাদাকে একটু দেখে আসবো?

—এখন তো ঘুমোচ্ছে।

—আচ্ছা যাক্।

—কিছু বলতে হবে?

—বলে দিও, রবিবাবুর খোঁজে তিনজন লোক এসেছিল। তা হলেই বুঝতে পারবে।

২নং দরজার কাছ থেকে সরে আসার পর ৩নং জিজ্ঞেস করল, এখানে কি আর ওটার দরকার আছে?

১নং বলল, আমার তো মনে হয়—

৩নং বলল, আমারও ছোট ভাইটার জ্বর। আমিও মনে হচ্ছে জ্বরে পড়বো এবার।

২নং তার কপালে হাত দিয়ে বলল, কই টেম্পারেচার নেই তো!

—ভেতরে ভেতরে টের পাচ্ছি। আঃ, যদি এখন একটু লেপের তলায় শোওয়া যেত!

১নং বলল, এখানকার কাজটা সেরে ফেলা যাক। দেরি করে লাভ নেই।

৩নং বলল, ক'দিন ধরে এক ফোঁটা ঘুম নেই। আর শীতও পড়েছে তেমনি। ভগবানের একটু মায়া দয়াও নেই।

২নং বলল, হারামীর বাচ্চাটা বড্ড জ্বালাচ্ছে!

১নং থলে থেকে বার করে আর একটা বোমা ছুঁড়ল বাড়ির দরজায়। নিস্তব্ধ নিশীথ কেঁপে উঠল সেই শব্দে। কুকুরগুলো তারস্বরে ডেকে উঠল।

রবি সারারাত্রি গঙ্গার ঘাটে শ্মশানে গিয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝে ঘুমের ঢুলুনি আসতেই সে উঠে একটু পায়চারি করে নিচ্ছিল, কখনো দাঁড়াচ্ছিল চিতার ধারে। সারারাত ধরেই চারটে চিতা জ্বলেছে, লোকজনের আনাগোনার বিরাম নেই, কারো তাকে কোনো প্রশ্ন নেই। চিতার ধোঁয়ায় সর্বক্ষণ তার চোখ ছলছলে, অনায়াসেই তাকে শ্মশানযাত্রীদের অন্যতম মনে করা যায়। বহুদিন কারুর মৃত্যুতে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে নি। বিশেষত শ্মশানে এলে মনে হয়, মৃত্যু নিছক একটা নির্লিপ্ত-তার ব্যাপার—এর কোনো ভাল বা মন্দ দিক নেই। রবি তার গেঞ্জিহীন বুকে হাত রাখে। হঠাৎ তার নিজেকে আদর করতে ইচ্ছে হয়। নিজের বুকটা অন্যর বুক মনে করে সে হাত বুলোয়।

ভোর হবার পর স্নানের পুণ্য অর্জনকারীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে হাওড়া স্টেশনে। শ্রীরামপুরের ট্রেন ধরে।

সুশান্ত তখন বাজারে বেরুচ্ছিল, রবি তাকে বলল আমি আজ এখানে থাকবো।

সুশান্ত ইতস্তত করে বলল, দিল্লী থেকে আমার বাবা আসছেন এখানে।

রবি বলল, আজকের দিনটা অন্তত থাকতেই হবে আমাকে।

---খোকন আছে গোঁসাই পাড়ায়। ওদের কাছে খবর পাঠাবো?

---না, কোনো দরকার নেই।

সারাদিনটা রবি পড়ে পড়ে ঘুমোলো। অনেক দিনের ঘুম পাওনা ছিল তার। মাঝখানে উঠে একবার শুধু স্নান করে খেয়ে নিল। স্নান করল অনেকক্ষণ ধরে, খেতে বেশি সময় লাগল না।

তার শার্ট ও প্যান্ট এতদূর অপরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে স্নান করে উঠে ঐ পোশাক আর পরা যায় না। সুতরাং তাকে পরে নিতে হল সুশান্তর ধুতি ও পাঞ্জাবি। এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে তাকে। সে বলল, অন্য রকম পোশাক পরার মতন আমি যদি অন্য একটা মানষ হয়ে যেতে পারতাম! এই বলেই সে ঘুমিয়ে পড়ল আবার। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে একটা জাহাজের স্বপ্ন দেখল।

ঘুম ভেঙে উঠে রবি দেখল বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গেছে। সন্ধ্যা এখন গাঢ়। সে আশ্রয় পেয়েছে ছাদের একটি ছোট্ট ঘরে, চটপট উঠে ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে দেখে নিল চতুর্দিক। কেউ নেই।

তখন সুশান্তর স্ত্রী রূপা তার জন্য চা নিয়ে এসেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে রবি জিজ্ঞেস করল আপনার কাছে অ্যাসপিরিন বা ঐ জাতীয় কিছু আছে?

---না তো। আনিয়ে দেবো?

---থাক্। সন্ধ্যের পর রোজই এক ধরনের মাথার যন্ত্রণা, আবার কমেও যায় আপনি আপনি। সুশান্ত ফেরে নি অফিস থেকে?

---আর একটু বাদেই ফিরবে।

---আপনি এখন নিচে যান। সুশান্ত এলে পাঠিয়ে দেবেন।

---আপনি এখন কিছু খাবেন?

---আমাকে সাধাসাধি করে কেউ কখনো খাওয়ায় না। খিদে পেলে আমি চাইবো। বাড়িতে মুগের ডাল আছে? এ বেলা রাঁধতে পারবেন? বহুদিন খাই নি।

---আপনার বাড়িতে---

---আপনি নিচে যান। আমি একটু একা থাকতে চাই।

ঘরের আলো না জ্বালিয়ে রবি গুম হয়ে বসে রইল দেয়ালের দিকে। একবারও দৃষ্টি ফেরালো না। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে একটু নড়ে উঠে দু'হাতে চেপে ধরল কপালের দু'পাশের রগ।

সুশান্ত এসে বলল, কি রে, আলো জ্বালিস নি যে?

রবি বলল, অনেকক্ষণ ধরে একটা কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি। ছেলেবেলায় আমি একটা কুকুর পুষেছিলাম---তার ডাক ছিল ঠিক এই রকম। অবিকল এই রকম।

---সে কুকুরটা এখন কোথায়!

---তখন আমরা শিবসাগরে থাকতাম। কুকুরটা ছিল আমার সব সময়ের সঙ্গী, খুব বাধ্য ছিল আমার। হঠাৎ কি হল, সেটা খুব অবাধ্য আর রাগী হয়ে গেল। সবাইকে ভয় দেখায়। মা-বাবা বললেন, কুকুরটা পাগল হয়ে গেছে। আমি কিছুতেই মানতে চাই নি---কিন্তু ওঁরা কুকুরটাকে আর বাড়িতে রাখতে সাহস করলেন না। একদিন ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নৌকায় চাপিয়ে নদীর একটা চরায় রেখে আসা হল।

সেই চরটা মাঝে মাঝে জলে ডুবে যায়। সেই থেকে কোনো নির্জন জায়গায় কোনো কুকুরের ডাক শুনলেই—

—তুই এখান থেকে কোথায় যাবি?

—জানি না।

—এখানে থাকতে পারিস দু'একদিন। এই ঘরটা তো কাজেই লাগে না।

রবি এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুশান্তর দিকে। হঠাৎ সদর্পে বলল, মাথার ওপর ছাদ না থাকলেও আমার কিছু আসে যায় না। ঘরের কথা চিন্তা করে আমি রাস্তায় বেরোই নি—

সুশান্তও কড়া গলায় বলল, এবার আমাদের রাস্তা বদলাতে হবে। তুই যে পথে যাচ্ছিস, সেটাকে রাস্তা বলে না, এঁদো গলি।

—তোর বাড়িতে গ্রামাফোন আছে নিশ্চয়ই?

—হঠাৎ?

সুখী গৃহকোণ, শোভে গ্রামাফোন—এ না হলে মানায় না।

—এর নাম বোকা অহংকার।

রূপা এসে সুশান্তকে বলল, তোমাকে তিনজন লোক ডাকতে এসেছেন।

রবি তড়াক করে চলে গেল ছাদের পাঁচিলের কাছে। সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে ফিরে এসে শান্তভাবে বলল, তোদের বাড়ির পেছন দিক থেকে বেরুবার কোনো রাস্তা আছে?

সুশান্ত রবির হাত চেপে ধরে বলল, তুই চলে যাবি?

—একদম সময় নেই।

—তোকে যেতে হবে না। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি। অত ভয়ের কি আছে?

—ভয় না, ঘৃণা। একদম সময় নেই।

রূপা বলল, আপনি এরকম করছেন কেন? পাশের বাড়িতে টেলিফোন আছে, আমি থানায় খবর দিচ্ছি।

রবি রূপার দিকে একবারও তাকালো না পর্যন্ত। সে ছাদের উল্টো দিকের পাঁচিল টপকে পাইপ ধরে ঝুলে পড়ল। একটু দূরে প্রবল ট্রেনের শব্দ।

১নং অনুসরণকারী বল..., এদিকে রাস্তার বাড়ির নম্বরগুলো একেবারে উল্টো পাল্টা। সাঁইত্রিশের পর বাহান্ন—বিচ্ছিরি ব্যাপার।

২নং অনুসরণকারী বলল, কোনো কোনো বাড়িতে নম্বর প্লেটই নেই।

৩নং বলল, হেঁটে হেঁটে পা ধরে গেল মাইরি!

১নং বলল, গত বছর এই সময় আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। তাতে থ্রিল বেশি।

২নং বলল, বর্ধন যেদিন মারা যায়—

৩নং বলল, আমার মামা বাড়িতে একটা পেয়ারা গাছ আছে—ভেতরটা লাল রঙের। ছেলেবেলায় সেই পেয়ারা গাছ থেকে একবার পড়ে গিয়েছিলাম, সেই থেকে আমার একটা পা কমজোরী হয়ে আছে।

২নং বলল, পেয়ারার ভেতরটা লাল!

১নং বলল, দেওঘরেও ওরকম পেয়ারা পাওয়া যায়। আমি অনেকদিন আগে গিয়েছিলাম দাদা বৌদির সঙ্গে।

২নং বলল, এখানকার ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যাক্।

৩নং বলল, তারপর বাড়ি গিয়ে ভাল করে ঘুমোবো। বাড়ির রান্না গরম গরম ভাত, মুসুরির ডাল আর আলুসেদ্ধ—

১নং এগিয়ে গেল দরজার কাছে সুশান্তর সঙ্গে কথা বলতে। অন্য দু'জন ছড়িয়ে গেল বাড়ির দু'পাশে।

রবি ছুটতে ছুটতে একজন লোককে সামনে দেখে জিজ্ঞেস করল, স্টেশনটা কোনদিকে?

লোকটি বলল, এই অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন কেন? ঐ তো, ঐ দিকে রাস্তা।

---মাঠের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যাবে না?

---যাওয়া যেতে পারে---আপনি রাস্তা চিনতে পারবেন না।

রবি এক ধমক দিয়ে বলল, ঠিক চিনতে পারবো। কোনদিকটা আপনি দেখিয়ে দিন না।

ধমক খেয়ে দমে না গিয়ে লোকটি বলল, আপনি যখন অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়েই যেতে চান---তখন নিজেই রাস্তা খুঁজে নিন।

রবি লোকটির দিকে রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আর কথা না বলে দৌড়াতে লাগল। সে মেপে মেপে নিশ্বাস নিচ্ছে, তাকে সহজে ক্লান্ত হলে চলবে না। সে এখন একা---কিন্তু পৃথিবীর হাওয়ায় বহু মানুষের নিশ্বাস মিশে থাকে। এমন কি যারা বেঁচে নেই---তাদেরও নিশ্বাস বাতাস থেকে হারিয়ে যায় না।

পেছন দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আর সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে রবি। শীতের রাত্তিরেও তার শরীরে ঘাম। হঠাৎ সে সামনের একটা দেয়ালে ধাক্কা খেল।

দেয়াল নয়, তিনজন মানুষ। নিপুণ হাতে তারা রবিকে আঁকড়ে ধরে নিশ্চল করে দিল। রবিও ছটফট করল না, দু' হাতে মুখ চাপা দিল শুধু।

১নং রবির মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রে বলল, কি রে, রবি, চিনতে পারিস?

২নং বলল, বর্ধনকে তোরা তিনজন---

৩নং বলল, শালা, অনেক ভুগিয়েছিস---

রবি কোনো কথা বলল না। আকস্মিকভাবে তার মনে পড়ল, তার ছোট বোনকে ছবি আঁকার এক বাক্স রং পেন্সিল পাঠাবার কথা ছিল---দু' তিনবার চিঠি লিখেছে---

ছুরি চালাবার কাজটা সমাধা হল নিঃশব্দে। মাটিতে পেড়ে ফেলে রবির বুক পেট ফালা ফালা করে দিয়েও ওরা তিনজন রবির শেষ নিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইল। পৃথিবীর বাতাস ব্যবহার রবির ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে।

এই সময় দূরে একটা কলরব শোনা গেল। আট দশজন লোক এদিকে ছুটে আসছে।

এই তিনজন সেই দিকে একটু বিমূঢ়ভাবে তাকালো। ওরা কি তাদের অভিনন্দন জানাতে আসছে, না ধরতে? উভয় ক্ষেত্রেই চিৎকারটা প্রায় একই রকম হয়। এই তিনজন কোনো ঝুঁকি নিল না। তৎক্ষণাৎ এরা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল, পালাবার সুবিধের জন্য, তিনজন তিন দিকে।

অবিলম্বে সেই দলটি এখানে এসে পৌঁছলো। ভূতপূর্ব রবির দিকে এক পলক তাকালো শুধু, তারপর শোনা গেল একটা প্রতিজ্ঞার উচ্চারণ।

এই দলে ছিল ন'জন ব্যক্তি। এরা তিনজন করে তিনটে দলে ভাগ হয়ে ছুটতে শুরু করল তিন দিকে।

একটু আগে যে ছিল এক নং অনুসরণকারী, এখন সে এক নং পলাতক---তাকে যারা তাড়া করে আসছে তাদের মধ্যে এক নং অনুসরণকারী তিন নং অনুসরণকারীকে বলল, যাবে কোথায়? পকেট থেকে কাগজটা বার কর। দেখে নে।



শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ২ নভেম্বর, ১৯৩৫। ময়মনসিংহে। ছোটবেলা থেকে কেটেছে নানা জায়গায়, আসামে, উত্তরবঙ্গে এবং পরে কলকাতায়। এখন পেশা—সাংবাদিকতা এবং লেখা। অধুনা বাংলা সাহিত্যের শীর্ষদেশে এবং পাঠক-মনোলোকে যে-কজন লেখক বিরাজ করছেন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সেই মুষ্টিমেয় ক'জনের একজন। এবং তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গভীর ও মহৎ—এই দুটি বিশেষণ তাঁর নামের আগে অনায়াসে বসানো হয়ে গিয়েছে।

একজন মানুষ তাঁর কৃতির সাহায্যে দেবত্বে উন্নীত হয়ে যাচ্ছেন। 'পারাপার'-এর রমেনকে মনে পড়ে? এমন একজন মানুষ, যিনি মানুষের মুক্তির জন্যে, এই দুঃখ-কষ্টময় পৃথিবীতে সঠিক রাস্তার সন্ধান দিতে জন্ম নেন। মুক্তির সেই আশ্বাস, পথের সেই ঠিকানা মেলে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নানা লেখায়। জীবনের প্রতি গভীর প্রত্যয় আর মানবতাবোধ-জাত তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তি—দুটি ধারা গঙ্গা যমুনার মতো মিশেছে লেখকের হৃদয়-প্রদেশে।

'ঘুণপোকা' থেকেই এই লেখক সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেন। তারপর তাঁর মহৎ রচনাগুলির তালিকায় একে একে যুক্ত হয়েছে 'উজান', 'ফেরিঘাট', 'যাও পাখি', 'দিনকাল', 'আশ্চর্য ভ্রমণ', 'কাগজের বউ', 'ফজল আলি আসছে', 'শ্যাওলা' প্রভৃতি। ক্রমশ আর একটি রাজ্য শীর্ষেন্দু জয় করেছেন। সেটি শিশুদের জগৎ। তাঁর বরদাচরণ আর গোঁসাই বাগানের ভূত আজ কিশোরদের অপরিচিত নয়। আর ছোটগল্প? বাংলা ছোটগল্পের বাগানে তিনি ফুটিয়েছেন অজস্র নিটোল, বর্ণময়, সৌরভসম্পন্ন ফুল। তার কয়েকটি : 'দুনিয়ার চারদিক', 'পটুয়া নিবারণ', 'শেষ বেলায়', 'উড়োজাহাজ', 'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু', 'দুরন্ত', 'আমরা', 'আমাকে দেখুন' প্রভৃতি।

পুরস্কার প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দু জানালেন, পুরস্কার একটি (আনন্দ), তিরস্কার অনেক। আমরা জানি আরও ঢের, ঢের বেশি হল অভিনন্দন, যা তিনি পেয়েছেন।

১৯৬১ কি ৬২ হবে। কলেজ স্ট্রীটের কাছে নবীন পাল লেনের এক নিতান্তই হাড়হাভাতে বোর্ডিং হাউসে থাকি। এম. এ. পরীক্ষা বার দুয়েক ছাড় গেছে। দিন রাত কেবল লেখা আর লেখার চিন্তা। সেই সময়ে একদিন হঠাৎ এ গল্পের প্রথম দুটো লাইন মাথায় আসে। দীর্ঘ মাস খানেক ব্যবধানে আসে পরের কিছু লাইন। লিখি, কাটি, নতুন করে লিখি। তখন এ ব্যাপারে আলস্য ছিল না, বার বার লিখতে ক্লান্তি আসত না। বহু কালের কথা তো, ঠিকঠাক সব মনে পড়ে না। আন্দাজ মাস দেড় দুয়েকের চেষ্টায় 'ঘরের পথ' লেখা শেষ হয়। একটু রূপকথার ছোঁয়া আর কবিতাপ্রতিম ভাষা প্রয়োগ করে আমার অক্ষম চেষ্টা ছিল কিছু দাঁড় করানোর। মনে হয় না গল্পটা একটা কিছু হয়েছে। তবে লেখার সময় ওই জায়গাটা বেশ দেখতে পেতাম। সেই বুড়ো ঘোড়া বা গাঁওবুড়ো একদম মুখোমুখি এসে বসে আমার লেখার কাজের তদারকি করত তখন। ছাপা হলে ভাল মন্দ দুরকম মতই শুনতে হয়েছিল। আমি অবশ্য নিজের লেখা তেমন করে বিচার করতে পারি না। যা লিখেছি, লিখেছি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
৯-৮-৮৪

ঘরের পথ

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। মা গিয়েছিল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে।

কেউই আর ফিরল না।

আমাদের বাড়িটা ছিল মাটির। তাতে ফাটল ধরেছিল। যখন বাতাস বইত তখন সেই ফাটলের মুখে শিস্ দেওয়ার মতো শব্দ হত। যেন বাইরে থেকে কেউ ডাকছে। কখনো কখনো রাত্রিবেলা সেই শব্দে ভয় পেয়ে আমি মাকে জড়িয়ে ধরতাম, মা আমাকে। মাটির দাওয়ায় কিংবা দেওয়ালে অশ্বত্থ গাছের চারা দেখলেই মা আমাকে সেটি কেটে ফেলতে বলত। অশ্বত্থ চারা কাটতে কাটতে আমার অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবসর পেলেই আমি দা হাতে অশ্বত্থ চারা খুঁজে বেড়াতাম।

ঘরের চালে ভাল খড় ছিল না। বর্ষাকালে জল পড়লে আমাদের ভিজতে হত। সারা ঘর যখন জলে থই থই করত তখন মা আমাকে আধখানা আঁচলের আড়ালে রেখে আমাদের আগের দিনের সুখের গল্প বলত। আমাকে আঁচল দিয়ে ঢাকা ছিল মার স্বভাব। শীতে কিংবা বর্ষায় কিংবা ঝড়ে আমি মার আঁচলের আড়ালে চাপা থাকতাম। আমার বাবার একটা বুড়ো ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটা কোনো কাজ করত না। আমি ঘাস কেটে এনে ওকে খাওয়াতাম। ঘোড়াটাকে বাবা খুব ভালবাসত। আমি বাবাকে দেখিনি। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। তারপর আর ফেরেনি। আমি বাবার ঘোড়াকে ভালবাসতাম। ওর গায়ের গন্ধে আমার বাবার কথা মনে পড়তো।

বাবা ফিরল না দেখে মা পাহাড়ে কাঠপাতা কুড়োতে যেত। আমাদের গাঁয়ের গরীব মানুষেরা সবাই কাঠ কুড়োত। মা তাদের সঙ্গে খুব ভোরে চলে যেত। ফিরত সন্ধ্যেবেলায়, কখনো কখনো রাত্রি হ'ত। যাওয়ার সময় মা বলত, সারাদিন ঘর পাহারা দিও। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিও। সন্ধ্যেবেলায় শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটা আগুন জ্বেলে তার পাশে বসে থেকো। পাহাড় থেকে আগুনটি দেখতে পেলেই আমি বুঝবো তুমি ভাল আছো, ঘরে আছ। তা হলেই আমার ভাবনা থাকবে না।

আমি সারা দিন ঘরে থাকতাম। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিতাম। আর সন্ধ্যে হলেই শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটি মস্ত আগুন জ্বালাতাম। আগুনের পাশে বসে দেখতাম দূরে বহু দূরে নীল পাহাড় দৈত্যের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাঁ দিকে মস্ত মাঠের ওপাশে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পাহাড়টি মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হয়ে যেত। তবু পাহাড়টি আমার চোখ থেকে কখনো হারিয়ে যায়নি। ছবির মতো হয়ে পাহাড়টা আমার চোখের ওপর স্থির থাকত। আগুন জ্বলতে জ্বলতে নিবে আসত। পাহাড়টিকে আমার বড়ো ভয়। ঐ পাহাড় পেরিয়েই আমার বাবা চলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। মা কখন ফিরবে ভাবতে ভাবতে আমি কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়ে মা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখতাম।

কখনো কখনো মা আমাকে বাবার গল্প বলত। ঐ পাহাড়ের ওপাশে অনেক নদী-নালা খাল-বিল পেরিয়ে বাবা বিদেশে গেছে। সেখানে যেতে হলে ক'টা নদী ক'টা পাহাড় পার হতে হয় তা মা জানে না। মা শুধু জানে, একদিন বাবা অনেক রোজগার করে ফিরে আসবে। তখন আমি নতুন জামা জুতো পরে একটা বাচ্চা ঘোড়ায় চড়ে বাবার বুড়ো ঘোড়াটার পাশে পাশে টগবগিয়ে কোথাও চলে যাব।

মা কখনো কখনো পাহাড়টাকে অভিশাপ দিত, ওটা গোটা পৃথিবীটাকে আড়াল করে আছে বলে। আবার কাঠ-পাতা কুড়োতে ঐ পাহাড়েই যেত।

একদিন মা আর ফিরল না। অনেকক্ষণ জ্বলে জ্বলে আগুনটা নিবল। দূরের নীল পাহাড় মেঘ আর কুয়াশার মত আবছা হ'ল। মা আর ফিরল না।

ভোর হতেই আমি মার খোঁজে বেরোলাম।

যারা কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরেছে, শুধু আমার মা বাদে। তাদের মধ্যে একজন বলল, "তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। তুই ছিলি গলার কাঁটা, তাই তোকে ফেলে গেছে।"

আমার বিশ্বাস হ'ল না। ওরা হাসল প্রাণ খুলে। আমার পিঠে চওড়া হাতের চাপড় মেরে বলল, "তার জন্য ভাবনা কি, তুইও তো জোয়ান মরদ হয়ে উঠবি দু-দিন বাদে। খেটে খেতে পারবি না? চিরকাল কি মায়ের আঁচল-চাপা থাকে কেউ, না কি আমাদের তাই করলে চলে?"

মা আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে ভেবে সারা গাঁ পাতি পাতি করে খুঁজলাম!

ওরা বলল, "খুঁজে কি করবি! তার চেয়ে পাহাড়ে চল। পাতা কুড়োবি।"

আমি পাহাড়ে গেলাম। কিন্তু কাঠ-পাতা কুড়োতে মন গেল না।

ওরা বলল, "তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। আয়, কাঠ কুড়োবি।"

আমি জেনেছিলাম যে আমি আছি বলেই মার সুখ। সুখ মানেই দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি। আমি আছি বলেই মার সেই শক্তি আছে। অনেক বড় হয়ে জেনেছিলাম যে আমিই মার দুঃখ, আমি ছিলাম বলেই মা সুখের খোঁজে চলে যেতে পারছিল না। দুঃখ মানেই সুখের পথ আগলে যে দাঁড়ায়।

আমার বাবা গেল পাহাড়ের ওপারে, আমার মাও আর ফিরল না। রইল শুধু ঘোড়াটি। সেই ঘোড়াটাও বুড়ো হয়েছে। কাজকর্ম করতে পারে না। কখনো মাঠে চরতে যায়, বেশীর ভাগ সময়েই ঘরে বসে ঝিমোয়। আমি ঘাস কেটে এনে খাওয়াই, জল দিই। যেমন বাপ বুড়ো হলে ছেলে তার কাজকর্ম করে। মাঝে মাঝে ওর প্রকাণ্ড বুড়ো মাথাটি আমার কাঁধে নামিয়ে রাখত। তখন ওর ঘন, গাঢ়, দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। সে নিঃশ্বাসে ওর গায়ের চামড়া থরথর করে কাঁপত। ওর মুখে, চোয়ালে, ঘাড়ে শিরাগুলো থাকত ফুলে, ওর ভাঙাচোরা মুখটা ছিল গাছের কাণ্ডের মত এবড়োখেবড়ো। ওর প্রকাণ্ড ঘাড়টা দু হাতে জড়িয়ে থেকে আমার মনে হত যেন বহুদিনের পুরোনো একটা বটগাছ শাখাপ্রশাখা মেলে আমায় আশ্রয় দিয়েছে।

একদিন ঘোড়াটিকে দেখে গাঁওবুড়ো বলল, "ঘোড়াতে চেপে তোর বাপ বিয়ে করতে গিয়েছিল। ঘোড়াটি তোর বাপের মতন। ওকে যত্ন-আত্তি করিস।"

ঘোড়াটিকে নিয়ে ছিলাম মেতে। বাদবাকি সময়টা কাটতো চুপচাপ দাওয়ায় বসে। সারা দিন বাতাস আমাদের ফাঁকা বাড়িটায় শিস দিয়ে খেলা করত। দেখতাম, শুড়মি শাকের জঙ্গলে চড়াই নেচে বেড়াচ্ছে, ধনে পাতার গন্ধে বাতাস ভারী, সরসর

করে গাছের শুকনো পাতায় বাতাস বইছে। কুয়োর পারের মাটিতে ছোট্ট একটু গর্তে জমে থাকা জলে শালিক চান'করছে জল ছিটিয়ে। ও চলে গেলে জলের কয়েকটা সরু রেখা থাকতো মাটিতে, কয়েকটা পালক বাতাসে। আমার চকচকে দাঁটাতে মরচে পড়ল। সারা বাড়িটায় অশ্বত্থ চারা উঠলো গজিয়ে।

দিন কাটে। সন্ধ্যে হ'লে পাতা জড়ো করে আগুন জেলে চুপ করে শুয়ে থাকি। আগুনটা মরে এলে তার নরম আঁচ অনেকটা মার শরীরের তাপের মত মনে হয়। তাই কখনো ঘুম আসে। শরীর অবশ করে দিয়ে।

যে দাই আমার নাড়ী কেটেছিল সে এসে একদিন বলল, "এমনি করে কি না খেয়ে মরবি? তার চেয়ে আমার কাছে চল। আমার তো ছেলে নেই, একটা মাত্র মেয়ে। দু'জনে বেশ থাকবি।"

"উঁহু। আমি রাতে স্বপন দেখি বাবা ফিরে আসছে।"

"হ্যাঁ, যেমন তোর মা মুখপুড়ী ফিরল। তা খাস কি?"

"শাকপাতা যখন যা হয়।"

বুড়ী গজগজ করে আমাকে বকতে বকতে চলে গেল।

তারপর থেকে দাইমার মেয়ে চন্দ্রা আমার জন্য ভাত আনত। রোজ। ভাতের থালাটা মাটিতে রেখে বেড়ালের মত থাপ পেতে আমার দিকে চেয়ে থাকত চন্দ্রা, যেন শহরের মানুষ দেখছে।

একদিন আমি বললাম, "কি দেখছিস? কি দেখিস রোজ?"

ও বলল, "তোকে। তুই একটা বুড়ো জানোয়ারের সঙ্গে থাকিস কেন?"

"ওকে আমি আমার বাপের মতো ভালবাসি।"

ও খিলখিল করে হাসল। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে থামল। বলল, "ভালোবাসার আর লোক পেলি না! ওটা চড়ে তুই কোন দেশ জয় করতে যাবি?"

আমি ভাবলাম, যাব, একদিন যাব। পুবদিকে যাব—যে দিকে সূর্য ওঠে। একদিন আমি রাজা হয়ে ফিরব, দেখিস। আমি বললাম, "জানি না রে।"

ও হাত তুলে আমাকে আমার ঘর দেখাল। বলল, "ওই দেখ গাছের শেকড়গুলো সাপের মতো দেওয়ালের মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। তোর চারপাশের দেয়াল আর বেশীদিন থাকবে না; ধসে পড়বে! সময় থাকতে শত্তুরগুলোকে মুড়িয়ে কাট।"

আমি ঠাট্টা করে বললাম, "ওরা আমার মায়ের মত। কেটে ফেললে বাইরে থেকে ডালপালা দেখা যায় না, কিন্তু মনের মধ্যে ওদের শেকড় থাকে।"

শুনে ও রাগ করে চলে গেল। বলে গেল, "তোর মরণ এসেছে ঘনিয়ে। একদিন তুই দেয়ালচাপা হয়ে মরবি।"

আমি ভাবলাম, শেকড়গুলো গর্ত খুঁড়বে, আরো গভীর হবে। মনের দেয়ালে চিড় ধরবে, ফাটল হবে। তারপর একদিন চৌচির হয়ে ভাঙবে। সেদিন আমি আমার বুড়ো ঘোড়ায় চেপে পুবদিকে রওনা দেব। গাঁয়ের লোকেরা দেখবে আমার লাঠির আগায় বাঁধা পুঁটলিটা আস্তে আস্তে দূর থেকে দূরে পাকা ধানের ক্ষেতের আড়ালে মিলিয়ে গেল। ওরা জানবে, আমি ফিরে আসবো একদিন। রাজা হয়ে।

একদিন চন্দ্রা আমার ভাত নিয়ে এল না। ফাগনলালের ঘরের পাশ দিয়ে মৌরি-ক্ষেতের কিনারায় কিনারায় যে পথটা ধরে চন্দ্রা আসে, সে দিকে চেয়ে সারা দুপুর কাটল। চন্দ্রা এল না। তার পরদিনও না। তার পরদিনও না। চন্দ্রা এল না দেখে

আমি উঠে খুঁজে পেতে আমার পুরোনো মরচে ধরা দা'টা বের করে পাথরে শান দিতে বসলাম।

সারাটা দুপুর পাথরে মুখ ঘষে দা'টা ঝকঝক করে হেসে উঠল। ওর গায়ে আগুন ছুটল। দা'য়ে শান দিয়ে দিয়ে আমার হাতপায়ের মাংসগুলো ফুলে উঠল, শিরায় শিরায় গরম রক্ত ছুটল টগবগিয়ে। কেমন যেন খুশী লাগল, নেশা পেল।

ভেবেছিলাম সূর্য ডোবার আগেই অশ্বত্থের চারাগুলো কেটে ফেলব। এমন সময় চন্দ্রা এল হাতে ভাতের থালা নিয়ে। রোজ যেমন আসত।

আমি বললাম, "এতদিন আসিসনি কেন?"

ও গম্ভীর হয়ে বলে, "একটা বাঘ রোজ আমার পথ আগলে থাকে। বলে, কোথায় যাচ্ছিস? থালা নামিয়ে রাখ আমার সামনে, আর বসে বসে আমার লেজে হাত বুলিয়ে দে। নইলে তোকে যমের বাড়ি পাঠাবো। রোজ এমনি করে বাঘটা তোর ভাত খেয়ে ফেলে।"

আমি বললাম, "জানি। এ গল্প আমি মার কাছে শুনেছি। এক বুড়ী রোজ তার ছেলের কাছে খাবার নিয়ে যেত, আর পথ আগলে থাকত বাঘ।"

"হ্যাঁ, শুনেছিস। তাতে কি? এমন বুঝি হয় না?"

আমি ভেবেছিলাম, বড় হয়ে আমি বাঘটাকে মেরে ফেলব। খিদেকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই, ভেগটাকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। পথ আগলে যেই থাকবে তাকে সাফ করে দাও।

চন্দ্রা খিলখিল করে হাসল মুখে আঁচল দিয়ে। বলল, "তুই বাঘটাকে মারবি না ওর লেজে হাত বুলিয়ে দিবি?"

আমি বললাম, "জানি না।"

ও বলল, "মা দেখছিল, তুই খিদের জ্বালায় আমাদের বাড়ি যাস কি না। মা তোকে যাচাই করছিল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মা বলেছে, তুই মানুষ নয়। তোর বাপটা ছিল এমনি গোঁয়ার, তাই একমুখো চলে গেছে। ঘরের পথ ফিরে চিনল না। তুইও যাবি, যাবি। কাঁদতে কাঁদতে মা ভাত বেড়ে দিল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অনেক ভেবে চন্দ্রা বলল, "কিন্তু আমি জানি তুই যাবি না।"

এই বলে ও চলে গেল। আমি আমার দা'টা হাতে নিলাম। এক এক কোপে অশ্বত্থের মোটা মোটা ডালগুলো খ'সে পড়তে লাগল। আমার শরীর গরম হ'ল, ছলাৎ-ছল করে রক্ত বইল শিরায় শিরায়। আমি আপন মনে হাসতে লাগলাম। শীতকালে আমাদের বুড়ো ঘোড়াটার গা থেকে ধোঁয়ার মত একটা ভাপ বেরোত। সেই ভাপে ওর রক্তমাংস আর ঘামের গন্ধ পাওয়া যেত। নিজের শরীর থেকে আমি তেমনি এক গন্ধ পেলাম। মদের যেমন স্বাদ নেই, এ গন্ধেরও তেমন ভালমন্দ নেই। এ শুধু আমাকে মাতাল করে। আমি আপন মনে হাসলাম। যেন আমার নেশা হ'ল। আমার ইচ্ছে হ'ল নিজের শরীরটাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করি। মাটির দাওয়ায় আমি শরীরটাকে গড়িয়ে দিলাম। আমার শরীরের ঘাম মাটির সঙ্গে মিশল। শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে আমার কাছে এক বাঁশীওয়ালা এল। তখন বাতাসে টান লেগেছে। শুকনো পাতাগুলো টুপটাপ করে ঝরে ঝরে শেষ হয়েছে। ক্ষেতের মটর শাকে পাক ধরল। যারা শুকনো কাঠ-পাতা কুড়োতে যেত তাদের দিন গেল।

এমনি একদিন শেষ দুপুরে অনেক দূর থেকে বাঁশীওয়ালা এসে আমার দাওয়ায়

বসল। তার গায়ে এক শো রঙের এক শো তালি দেওয়া একটা জোব্বা, মাথায় একটা মস্ত পাগড়ি। সেই পাগড়িটা তার কপালটিকে ঢেকে ফেলেছে। রোগা দুটো পা রাঙা ধুলোয় মাখা। আমি কখনো এই বাঁশীওয়ালাকে দেখিনি।

সে বলল, "আমি বাঁশী বিক্রি করি না। বাঁশীর সুর বিক্রি করি।" এই বলে সে তার বাঁশীতে একটা অদ্ভুত সুর বাজাল।

আমি বললাম, "বাঁশীতে তুমি ওটা কি সুর বাজালে? আমি তার কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না।"

বাঁশীওয়ালা তার ঘন ভ্রূর নীচে গভীর গর্তের মত চোখ দুটো দিয়ে আমায় দেখল। বলল, "এ সুর আমি কোথাও শিখিনি বাবা, কেউ আমাকে শেখায়নি। আমার কোনো গুরু নেই। আমি হাটে মাঠে ঘাটে যা শুনি তাই বাজিয়ে বেড়াই। কখনো নোঙর-করা নৌকোয় জলের ঢেউ লাগবার সুর, কখনো শীতের শুকনো পাতায় বাতাস লাগবার সুর।"

সে আবার তার বাঁশীতে ফুঁ দিল। শেষে শীতের শুকনো বাতাসে বাঁশীর টান লাগল। কয়েকটা সুর তীরের মতো আকাশে ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল। আমার চোখের সামনে দুপুরটা মাতালের মত টলতে লাগল। যেন অনেক দূর পথ! আমাদের এই মৌরি-ক্ষেত ডিঙিয়ে ধানের আবাদের পাশ দিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে চলেছে—চলেছে—চলেছে। কত গঞ্জ, কত ব্যাপারীর আস্তানা, কত বন্দর, মাঠ মাঠ পেরিয়ে যাওয়া দেশ। বাঁশীর সুর সেই দূর দূরান্তের আভাস মাত্র নিয়ে কোকিলের অস্পষ্ট ডাকের মত নরম, বিষন্ন হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। সেই পথ ধরে, অনেক আলো, অনেক অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে কে যেন আসছে—আসছে—আসছে।

বড় ক্লান্ত পথ! বড় দীর্ঘ পথ! আমি চোখ বুজে ভাবলাম, সে আমার বাবা। কত দিন গেল, কত রাত গেল। ঘোড়াটা বুড়ো হ'ল। বাবা ফিরল না।

বাঁশীওয়ালা সুর পাল্টে নতুন সুর ধরল। কখন আমার চোখ ছাপিয়ে কান্না এসেছে। এ কেমন সুর যা দিনের আলোকে অন্ধকার করে দেয়?

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "এর মানে কি? আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

বাঁশীওয়ালা থামল না।

যেন এতদিন মাঠটা ছিল রোদে পোড়া, ফাটা ফাটা। একদিন পাহাড়ে মেঘ জমল। বৃষ্টি নামল। আঝোর ধারে বৃষ্টি। মাটির কোষে কোষে জল ঢুকল। বীজধান ফুলে উঠল। বুক ফাটিয়ে শীষ বার করল আকাশে।

বাঁশীওয়ালা থামল। বলল, "এর অর্থ যেমন করে কুঁড়ি থেকে ফুল হয় আস্তে আস্তে, তোমার চোখের আড়ালে অন্ধকারে যেমন করে আস্তে আস্তে পাপড়িগুলো মেলে দেয়, যেমন করে শুকনো পাতা ঝরে পড়ে আবার নতুন পাতায় ছেয়ে যায় গাছ—তেমনি করে তোমার দেহেও একটা ঋতু আসে আর একটা যায়।"

এই বলে বাঁশীওয়ালা আবার তার বাঁশীতে সুর দিল। যেন বলল, বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ ক'রো না। এক-একটি ঋতু যায়, আর একটি আসে। দুঃখকে সহ্য কর। ক্ষেতে আগুন লাগলে ফসল ভাল হয়।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "এ সুর তুমি কোথায় পেলে?"

সে দাঁড়িয়ে উঠে হাসল।

আমি বললাম, "আমাকে এ সুর শিখিয়ে দাও। আমি তোমার মতো জোব্বা পরে বাঁশী বাজিয়ে বেড়াব।"

বাঁশীওয়ালা ফিরে বলল, "তুমি আমাকে অবাক করলে বাবা, এ জোব্বা কি তোমাকে মানায়। আমি যেখানে যখন যেমন পেয়েছি তেমন কুড়িয়ে-বুড়িয়ে এই কাপড়ের টুকরোগুলো জুড়ে সেলাই করে এই জোব্বা বানিয়েছি। যারা সুখে আছে এ জোব্বা তারা সাধ করে পরে না। আমার মনে রঙ নেই, তাই বাইরে এত রঙের বাহার।"

বাঁশীওয়ালা চলতে লাগল। আমি দেখলাম শীতের ঘন রোদে রোগা দুটো পায়ে রাঙা ধুলো মেখে সে আস্তে আস্তে আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ডাকছে না। শেষ শীতের গরম দুপুরে সেই অদ্ভুত বাঁশীওয়ালা আর তার সুর দূর থেকে দূরান্তরে মিলেয়ে গেল।

আমি কাঁদতে কাঁদতে ভাবলাম: এ সুর তুমি কোথায় পেলে বাঁশীওয়ালা? আমার সারাটা দিন যেন টালমাটাল-টালমাটাল। যেন আমি বিনিমদের মাতাল। যেন আমি এক পাগল বাঁশীওয়ালা। শিরা ছিঁড়ে সুর তৈরি করে—সে সুরে আমি সারাদিন গাই। কাঁদি। কেন বাঁশীওয়ালা আমাকে দিল সারাদিন বাজাবার এই বাঁশী? আমি যে একে ছাড়তে পারি না। এ যে আগুনে দিলে পোড়ে না, ঝড়ে ওড়ে না। পোষা কবুতরের মতো নড়ে-চড়ে ঘুরে বেড়ায়। উড়ে যায় না।

উঁচু-নীচু পথ। পাথর ছড়ানো। চড়াই উৎরাই ভেঙে বাঁশীওয়ালা চলেছে। শুকনো হাওয়ায় তার চামড়া ফেটেছে, পাথরে তার পা ফেটেছে। তবু তার চলবার শেষ নেই। সে পুব থেকে পশ্চিমে গেল। যেদিকে সূর্য ওঠে সেদিক থেকে যেদিকে সূর্য ডোবে সেদিকে গেল, যে পথে আমার বাবা গেছে তার বুড়ো ঘোড়াকে রেখে, যেদিকে মা গেছে আগুনের পাশে তার ছেলেকে বসিয়ে রেখে।

বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ ক'রো না। ক্ষেতে আগুন দিলে ফসল ভাল হয়। মাটির কোষে কোষে বৃষ্টির জল ঢুকবে, বীজধান কেঁচোর মতো ফুলবে, বুক ফাটিয়ে শীষ বের করবে আকাশে। আমি জানি বাঁশীওয়ালা আর ফিরবে না। কোনোদিন না। দাওয়ায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন আমার দিন গেল।

একদিন সকালে ঘোড়াটাকে দেখে মনে হল আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমার চোখের সামনেই বুড়ো ঘোড়াটা কখন যেন আরো একটু বুড়ো হয়ে গেছে। ওর গায়ে হেলান দিয়ে আমি আমার মাকে ভাবলাম। কিন্তু মার মুখ আমার মনে এল না। রোদ লেগে ঘাসের বুক থেকে শিশির যেমন ভাপ হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি করে মা'র মুখটা হারিয়ে গেছে। শাড়ির আঁচল, পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকা শান্ত ছায়ায় ঢাকা দীঘির মত সেই চোখ আমি আগের জন্মে দেখেছিলাম।

গাঁওবুড়ো আমায় দেখে চোখ কুঁচকে বলল, "তুই যে আড়েদীঘে রীতি মতো পুরুষ মানুষ হয়ে উঠলি! কখন এত ঢ্যাঙা হয়ে উঠলি, বেড়ে উঠলি আমাদের চোখের সামনে, টেরও পেলাম না।"

আমি লজ্জা পেলাম।

গাঁওবুড়ো বলল, "তোর গড়নপেটন হয়েছে তোর বাবার মতন, কিন্তু চোখ দুটো পেয়েছিস মা'র। তা এবার তো জোয়ান হলি, কাজকর্মে লেগে যা। বসে থাকিস না, দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস, ঘর সামলে রাখিস।"

আমি ভাবলাম গাঁওবুড়োকে বাঁশীওয়ালার কথা বলব।

আমার চোখের দিকে চেয়ে গাঁওবুড়ো হাসল, "জানি রে জানি, তোর কাছে এক বাঁশীওয়ালা এসেছিল। সে মাত্র একবারই আসে। মাত্র একবার।" গাঁওবুড়ো তার

নড়বড়ে মাথাটা দোলাল, "তাই তো বলছি দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বসে থাকিস না। ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। ঘরদোর সামলে রাখিস।"

চন্দ্রা এসে বলল, "তুই নাকি পয়সা দিয়ে বাঁশীর সুর কিনেছিস?"

আমি বলি, "হুঁ।"

চন্দ্রা আমার কাছে এসে বসল, "পাখি কিনেছিস, আর খাঁচা কিনিসনি? সুর কিনেছিস, আর বাঁশী কিনিসনি? তবে তোর ঘরে রইল কি, তোর নিজের বলতে থাকল কি? কিনতে হয় এমন জিনিস কিনবি যা হাত দিয়ে ধরাছোঁয়া যায়, চোখ দিয়ে দেখা যায়, যাকে ধরে ছুঁয়ে দেখে মনের সুখ, ভাল না লাগলে যাকে বেঁচে দিয়ে আবার পয়সা পাওয়া যায়।"

এই বলে ও হাসল। বলল, "আমি আর কতকাল তোর জন্য ভাত বয়ে আনব? তোরই তো ভাত দেওয়ার বয়স হল। তুই কাজকর্ম করবি, না সারা দিন দাওয়ায় বসে হাঁ করে আকাশ গিলবি?"

আমি বললাম, "জানি না।"

"গাঁওবুড়ো বলছিল ঘরে মেয়ে না দিলে জোয়ানগুলো কাজকর্মে মন দেয় না।"

এই বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ও চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম ওর বাসন্তী রঙের ডুরে শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়তে উড়তে ফাগনলালের দাওয়া পেরিয়ে মৌরিক্ষেতের পাশ দিয়ে ওর শরীরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল। খুব পাতলা বুটিদার একটা মেঘ রোদের মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল। সেই ছায়াটা একটু সময়ের জন্য ওর মুখের ওপর থাকল। বাতাস ওর চারদিকে একটু খেলা করল। ওর চারপাশে উড়ে বেড়াতে লাগল কয়েকটা মৌমাছি।

আমি বাঁশীর সুর কিনেছি বলে গাঁয়ের বুড়োরা আমার নিন্দে করল। দুঃখ করে বলল, আমার ঘরে কিছুই থাকবে না। যেমন করে আমার বাবা থাকল না, মা থাকল না। গাঁয়ের জোয়ান মরদরা এসে আমার পিঠ চাপড়ে গেল: এই তো চাই। বাঁশীর সুর কিনবি, পাখির ডিম কিনবি। যেমন করে পারিস উড়িয়ে দিবি রোজগারের টাকা। আমরা জোয়ান মরদ, আমাদের রোজগারের ভাবনা কি? দেখছিস্ না বুড়ো-গুলোর দশা, দু' আঙুলের ফাঁক দিয়ে পুরো আয়ুটা খরচ হয়ে গেল। ওরা আমাদের বেহিসেবী বলে। কিন্তু সামনের শীতে ওরা যখন মরবে তখন তো আমরাই থাকব। এই শুনে আমি বুড়ো ঘোড়াটার কাছে গেলাম। ও আমার কাঁধে ওর প্রকাণ্ড মাথা রাখল।

কখন আমার শরীর দীঘল হয়েছে, হাত পা কোমর হয়েছে সরু, আমার চামড়ায় টান লেগেছে, রুক্ষ হয়েছে মুখ তা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ও যেন টের পেল। আমার কাঁধে মুখ ঘষে শরীর কাঁপিয়ে ওর খুশি জানাল। আমি ওর গাছের কাণ্ডের মতো এবড়ো-খেবড়ো মুখে আমার গাল রাখলাম। ওর রেশমের মতো কেশর আমার হাতে খেলা করল। আমি বললাম, "বুড়ো, তুই আমার বাপ। কোনো ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।"

এই শুনে পাঁজর কাঁপিয়ে ও নিঃশ্বাস ছাড়ল। ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে বলে দুঃখ ক'রো না। ও বুড়ো হচ্ছে তার মানে তুমি বড়ো হয়েছ। কবে শীত আসবে তার জন্য দুঃখ করে দিনগুলোকে চলে যেতে দিও না। মনে রেখ, দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে স্রোতের জল বয়ে যায়। আটকানো যায় না। সামনের শীতে ঘোড়াটা যদি মরে, তুমি থাকবে।

"বুড়ো, তুই আমার বাপ।" আমি বললাম, "কোনো ভাবনা করিস না বুড়ো, আমি তোকে দেখব।"

ঘোড়াটা পুরোনো ঠাণ্ডা শরীর দিয়ে আমার শরীর থেকে তাপ নিল। আমি দু' হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে চোখ বুজে রইলাম। যেন আমি পুরোনো প্রকাণ্ড একটা বটগাছের আশ্রয়ে আছি।

চন্দ্রা এসে বলল, "সারা দিন ঘরে বসে কি বকিস্ একা একা?"

আমি শান্তভাবে ওর দিকে তাকালাম। ওর শরীর ঘামে ভিজে তেলতেল করছে। দু' চোখে মিটমিটে আলো। এ কেমন আলো? আমি কোনোদিন এমন আলো দেখিনি। ওর শরীর থেকে কেমন একটা মাতাল মাতাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আমি ভাবলাম, বোধহয় কোনো ফুলের গন্ধ। এ কেমন ফুল? জানি না। কেমন তার রঙ? জানি না।

ও আমার হাত টেনে বলল, "চল্, তোকে আজ একটা নতুন জিনিস দেখাব।"

"কি জিনিস?"

ও ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, "সে একটা রাজার বাড়ি। খুব অদ্ভুত।"

"কোথায় সেটা?"

ও হাসল, "আছে আছে। তোর খুব কাছেই আছে। অথচ তুই দেখিসনি।"

চন্দ্রা ওর বুকের কাপড় সরিয়ে নিল। তারপর কাপড়টা ওকে একা রেখে মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়ল। চোখে হাত চেপে ও বলল, "এ এমন রাজা যে দখল নেয় না, দখল ছাড়েও না। আমি সারাদিন সব কাজ ফেলে তার বাড়ি পাহারা দেব কেন?"

ওর বেলেমাটির মতো শরীরের দিকে চেয়ে আমি ভয় পেলাম।

চোখে হাত চেপে ও কাঁদছিল; "আমার সারা দিনের কাজ পড়ে থাকে। আনমনে আমার বেলা বয়ে যায়। তোর বাঁশীওয়ালা কি তোকে এ কথা বলেনি?"

সেই অচেনা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। এ কেমন ফুল জানি না। কেমন তার গন্ধ জানি না। আমার বুক ফেটে কান্না এল। আমি ভেবেছিলাম, যে বাঘটি রোজ পথ আগলে থাকে, বড় হয়ে তাকে মেরে ফেলব। কিন্তু ক'টা বাঘকে মারব আমি? গাঁওবুড়ো বলেছিল, ঘরদোর সামলে রাখিস। গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল, বাঁশীর সুর কিনিস না।

চন্দ্রা দু' হাতে আমার মাথাটা টেনে নিল। বলল, 'আমি তোকে কতক বুঝি, কতক বুঝি না।"

ওর বুক, ছিঁড়ে-নেওয়া ফুলের বোঁটার মত আমার কপালে, চোখের পাতায় নরম হয়ে লেগে লেগে মুছে গেল।

ও বলল, "একদিন তুই পাহাড়ে যাবি কাঠ কুড়োতে। সেদিন আমি তোর ঘর পাহারা দেব। পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালব বাইরে, যেন তুই পাহাড় থেকে দেখতে পাস।"

বাঁশীওয়ালা তার প্রথম সুরে বলেছিল, ঘর বলতে তোর কোনো কিছুই নেই। কোনোদিন ছিল না। বৃথাই তুই সারা বিকেল আগুন জ্বেলে পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলি। যারা পাহাড়ের ওপারে গেছে তারা আর ফিরবে না। আমি কাঁদতে লাগলাম।

চন্দ্রা কেঁদে কেঁদে বলল, "তুই যদি আমাকে ছেড়ে না যাস, আমিও যাব না। আমরা ঘর বাধব।"

ওর চোখের জলে আমার মাথা ভিজল। আমি ভয় পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমাকে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল। চুমু খেল আমার ঠোঁটে। জন্মের পর আমরা যেমন ছিলাম তেমনি হয়ে শুয়ে রইলাম।

বসন্তকাল প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার বুড়ো ঘোড়াটা আরো বুড়ো হয়েছে। খুটখুট করে সারাদিন ঘাস খায়, কখনো ঝিমোয়।

বাতাসে গরম হলকা ছুটল। বুড়োরা বলল, "এইবার আকাল এল। ঘাট শুকোবে, মাঠ ফাটবে। সেই বর্ষা যতদিন না আসছে।"

কাছাকাছি মাঠের ঘাসগুলো হলদে হয়ে এল। তাই আমি একদিন বুড়ো ঘোড়াটাকে দূরের মাঠে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। সন্ধ্যেবেলা ও নিজেই খুটখুট্ করে ঘরে ফিরতে লাগল। কিন্তু একদিন ও ফিরল না। সারা সন্ধ্যে আমি দাওয়ায় বসে রইলাম পথের দিকে চেয়ে। দূরের পাহাড় ঝাপসা হয়ে এল। ও এল না। আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠলো। জ্যোৎস্নার বান ডাকল দিগন্ত জুড়ে। কিন্তু পেটের নীচে নিজের বাঁকাচোরা বুড়ো ছায়াটা নিয়ে ঠুকঠুক্ করে ও ফিরল না। অনেক ভেবে আমি হাতে দড়ির ফাঁস নিলাম। তারপর পথে নামলাম। মনে মনে বললাম: যখন আমি ছোট ছিলাম তখন কেউ কেউ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বুড়ো, তোকে আমি চলে যেতে দেব না। আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব। চলতে চলতে আমি ধানক্ষেত ছাড়িয়ে, মরা মটরশাকের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, বুড়ো বটের তলায় মহাবীরের থান পেরিয়ে গেলাম। তারপর দিগন্তজোড়া মাঠ। মাঠে বান-ডাকা সমুদ্রের মত টলটল করছে জ্যোৎস্না। কিন্তু তার কোথাও আমার বুড়োর ছায়া নেই।

আমি পাগলের মতো সারা মাঠ বুড়োকে খুঁজতে লাগলাম। আমার ভাঙা গলার ডাক আমাকে ঘিরেই ঘুরতে লাগল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "বুড়ো, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব।"

আমি মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলাম। আমার চারধারে ঘন গাছ। আলো আর ছায়ার মধ্যে আমি হাঁটতে লাগলাম। তারপর আমি ভয় পেলাম। আমার মনে হ'ল কেউ যেন আছে। কাছেই—পাশেই। মৃত শুকনো পাতাগুলোতে শব্দ হল। মনে হল, যেন কোনো আত্মা আমার পিছু নিয়েছে। আমার গায়ে কাঁটা দিল। যেন সেই আত্মা আমার হাত ধরল, তারপর আমাকে চেনা পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলল কোথাও। আমি ভাঙা গলায় বুড়োকে ডাকতে লাগলাম। বন পার হয়ে আমি একটা জলার ধারে এলাম। তাকিয়ে দেখলাম, আমি এর আগে কখনো এখানে আসিনি। এত জ্যোৎস্না আমি কোনোদিন দেখিনি। জলাটা মস্ত বড়। তার ওপাশে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও যেন কিছু শুনছে, কিছু দেখছে। আমি ডাকলাম, "বুড়ো বুড়ো।"

ও শুনল না। তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম, ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, "বুড়ো, তোকে আমি পেয়েছি।"

ও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখল। তারপর ভয় পেয়ে ও সরে গেল। আমি বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পারল না। আমি ওর কাছে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ও চীৎকার করে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে লাগল। ওর ছায়াটা এবড়ো-খেবড়ো

মাঠের ওপর টাল খেতে লাগল। আমি ওর পিছনে ছুটলাম। প্রাণপণে ওকে ডাকলাম। সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নার মধ্যেও বুড়ো আমাকে চিনতে পারল না। আমি দড়ির ফাঁসটা মুঠো করে ধরলাম। তারপর শেষবারের মত ওকে ডাকলাম। ও শুনল না। কাকে যেন ও দেখতে পেয়েছে। কে যেন ওকে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি ফাঁসটা ছুঁড়ে দিলাম। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাত-ধরা দড়িটা থরথর করে কাঁপল। আমি বুঝলাম ফাঁসটা ওর গলায় পড়েছে।

আমি বললাম, "বুড়ো, আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।"

আমি কাছে এগোতেই বুড়ো চীৎকার করে ছুটতে চাইল। ফাঁসের দড়িটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বুড়ো দড়িটা ছিঁড়ে চলে যেতে চাইল। আমি দড়িটা ছাড়লাম না। বললাম, "বুড়ো, আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।"

ও চীৎকার করে বারবার যেন আমাকে অভিশাপ দিল। আমি বললাম, "বুড়ো, আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দেব।"

বুড়ো শুনল না। ও ছেড়ে যেতে চাইল। আমি ধরে রইলাম।

কিন্তু বুড়োকে একসময় থামতে হ'ল। চারটে পা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল বুড়ো। তারপর কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ল।

কাছে গিয়ে দেখলাম ফাঁসটা ওর গলায় আটকে গেছে। ও দম নিতে পারছে না। আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, "বুড়ো, তোকে আমি যেতে দেব না। আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দিয়েছি।"

এই বলে আমি ওর গলার ফাঁসটা খুলতে চাইলাম। কিন্তু ফাঁসটা খুলল না। নীচু হয়ে দেখলাম দড়ির গায়ে ছোট একটা গিটে ফাঁসটা আটকে গেছে, গভীর হয়ে বসেছে বুড়োর গলায়।

আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম। কপালে বিন্‌বিনে ঘাম ফুটল। কিন্তু ফাঁসটা নড়ল না। বুড়ো ছটফট করতে লাগল। আমি দড়িতে দাঁত দিলাম। দড়িটা লোহার মতো বসেছে। আমার গলার রগ ফুলল, রক্তে ভরে গেল সারাটা মুখ। বুড়ো আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে এল। আমি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে চীৎকার করে বললাম, "বুড়ো, আমি ফাঁসটা খুলব, খুলব।"

বুড়ো আমার দিকে তাকাল। আমার পা থেকে পিতৃহত্যার সমস্ত পাঁপ মুছে নিতে চাইল। তারপর সেই ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নার ভেতর ওর দুটো চোখ ঘোলা হয়ে গেল। আমি বললাম, "বুড়ো, এই ফাঁসটা দিয়ে আমি তোকে ধরতে চেয়েছিলাম।"

আমি দড়িটা ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরলাম। ভাবলাম—আমার হাত দিয়ে কে তোকে মেরেছে আমি তা জানি না। জানি না।

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। আমার মা গিয়েছিল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে। আমাদের ঘোড়াটা গিয়েছিল জলার ধারে, ঘাস খেতে। কেউই আর ফিরল না।

গাঁওবুড়ো একদিন সবাইকে ডেকে বলল, "শোনো তোমাদের এক গল্প বলি। গাছের তলায় ধুনী জ্বেলে একটা সাধু বসে থাকত। তাকে মস্ত বড় সাধু ভেবে গৃহস্থরা তার চারধারে হাতজোড় করে থাকত। একদিন একটা লোক এসে বলল, সাধুবাবা, আমার ইচ্ছে তোমাকে কিছু খাওয়াই। সাধু রাজী হ'ল। লোকটি কিছু রুটি কিনে আনল। তারপর আবার বলল, সাধুবাবা, তুমি এই শুকনো রুটি কি করে খাবে?

তামার লোটাটা দাও, দুধ নিয়ে আসি। সাধু খুশী হয়ে লোটা দিল। লোটা নিয়ে াকটা সেই যে চলে গেল আর ফিরল না।"

সবাই বলল, "তারপর?"

গাঁওবুড়ো বলল, "তারপর লোটার শোকে সাধুর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সে কি কা। সবাইকে ডেকে ডেকে বলে, "দেখ দেখ, চোট্টার কাণ্ড দেখ, আমাকে এক গো রুটি খাইয়ে আমার রূপোর লোটাটা নিয়ে ভেগেছে।"

সই বলল, "তারপর?"

গাঁবুড়ো হাসল, "যার লোটা চুরি যায় সে বোকা। কিন্তু সেই লোটার শোকে যে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে সে আরও বোকা।"

এইভাবে শীত আসবার আগেই গাঁওবুড়ো মরে গেল। গাঁয়ের বুড়োরা জমায়েত হয়ে ব "জন্মের পর মৃত্যু, তারপর আবার জন্ম। ঠিক যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ। চলতে তে পড়ে যাওয়া, আবার ওঠা। কে যেন আমাদের নিয়ে দিনরাত এই খেলা খে। এ খেলার শেষ নেই।"

শীত ছু শুনে বুড়োরা ভয় পেল। বলল, "এবার ঘর ছাড়তে হবে।"

কেউ ব, "ঘর আর কোথায়! ঐ তো নড়বড়ে পাতার ছাউনি, রোদ মানে না, জল মানে।"

বুড়ো ের মতো খুটখুট করে শীত এল। তারপর বুড়োদের কাঁধে মাথা রেখে তাদের দেহকে তাপ শুষে নিতে লাগল। বুড়োরা পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালল। গোল হয়ে বসল। তারপর প্রাণপণে বলতে লাগল, "কে যেন জন্মের পর স্রোতে ভাসিল! তাই চেয়ে দেখলাম মাথার ওপর ছাদ নেই, চারিদিকের দেয়াল নেই।"

কেউ বলল অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে ... তাদের মুখ দেখা যায় না, ডিঙিয়ে। তার অন্ধকার হ'ল, যারা ছিল সাথের সাথী পাশে কে চল না যায় না। অন্ধকারকে গাল পাড়ি, কিন্তু ঠাহর করে দেখলে এ অন্ধকারও সু।"

কেউ বলল, "আর কোথায়, সেই ফিরে আসতেই হয়। অণু অণু হয়ে আমি বাতাসে মাটিতে । কিন্তু দেখো, তারপর একদিন পাহাড়ে মেঘ জমবে বৃষ্টি আসবে, বাতাস , মাটির কোষে কোষে ঢুকবে জল। তখন আমি ফুল হয়ে ফুটব, নদীর জল বয়ে যাব, বাতাস হয়ে খেলব, মেঘ হয়ে ভাসব।" এইসব শুনে গাঁয়ের জোয়ানরা হাসল।

তাই আমি চন্দ্রাবে য়ে ঘর বাঁধলাম।

আমার মা বলেছি বাইরে একটি আগুন জ্বেলে রেখো। পাহাড় থেকে আমি যন দেখতে পাই তু রে আছ, তুমি ভাল আছ। ঘর সামলে রেখো, কোথাও যও না।"

দাইমা বলেছিল: আ কাছে চল। আমার ছেলে নেই, তোকে ছেলের মত পালব।

বাঁশীওয়ালা বলেছিল: ষ্টির জল লেগে বীজধান ফুলবে। বুক ফাটিয়ে শীষ বের করবে আকাশে। বু ঘোড়াটার জন্য দুঃখ ক'রো না। একটা ঋতু আসে, আর একটা যায়।

গাঁওবুড়ো বলেছিল: ঘরদ সামলে রাখিস। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস।

বসে থাকিস না, দিনগুলো চলে যেতে দিস না। মনে রাখিস বাঁশীওয়ালা মাত্র এ
আসে।

গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল: বাঁশীর সুর কিনিস না। তা হলে তোর ঘরে থাকবে না।

আমি বলেছিলাম: বুড়ো, তুই আমার বাপ। ভাবনা করিস না, আমি দে। দেখব।

আমি আগুন জ্বেলেছিলাম। ঘর আগলে ছিলাম। তবু কেন যে আমার বাবা : বিদেশে, রোজগার করতে। আমার মা গেল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে! আমার ঘোড়া গেল জলার ধারে, ঘাস খেতে।